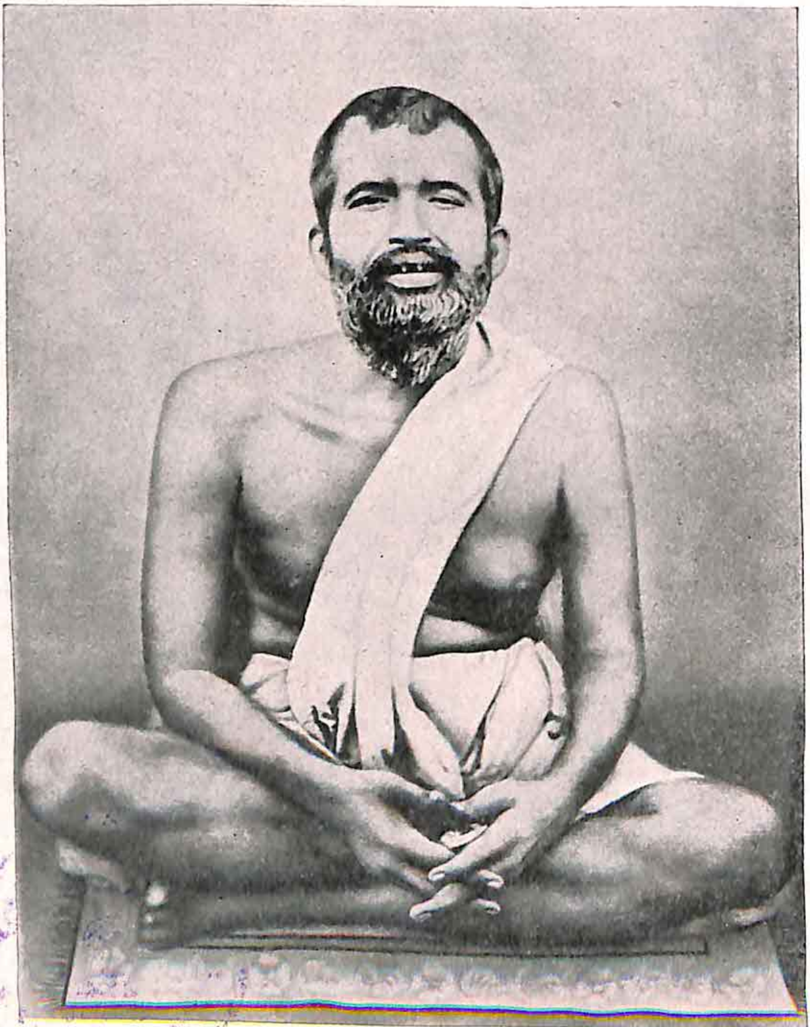


শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ পরমহংসদেব

শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণকথামৃত

শ্রীম-কথিত

প্রথম ভাগ

"তব কথামৃতম্ তপ্তজীবনম্ কবিভিরীড়িতং কল্মষাপহম্
শ্রবণমঙ্গলং শ্রীমদাততম্, ভুবি গৃণন্তি যে ভূরিদা জনাঃ ॥"

শ্রীমদ্ভাগবত, গোপীগীতা

বলিয়াছেন যে তাঁহাকে চিন্তা করিলেই হইবে আর কিছু করিতে হইবে না। তিনি জগতের আদর্শ—তাঁহাকে চিন্তা করাই মুখ্য সাধন। আর সাধন যদি দরকার হয়, তিনিই সমস্ত করাইয়া লইবেন। ইতি—কলিকাতা—কার্তিক সংক্রান্তি, ১৩১৪।

পঞ্চম সংস্করণের উপক্রমণিকা:—

মা, শ্রীশ্রীঠাকুরের জন্মমহোৎসব আবার উপস্থিত। আজ শ্রীশ্রীকথামৃতের পঞ্চম সংস্করণ হইল। ইহার ইংরাজী অনুবাদও হইয়াছে। আপনার আশীর্বাদ এখন সমস্ত ভারতবর্ষে এবং ইউরোপে ও আমেরিকায় তাঁহার অমৃতময়ী কথা প্রচার হইতেছে। মা, আপনি কৃপা করিয়া আশীর্বাদ করুন, যেন ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণের শ্রীপাদপদ্ম চিন্তা করিয়া লোকের শান্তি, আনন্দ ও অন্তে ঈশ্বর লাভ হয়। ইতি—ফাল্গুন শুক্লা দ্বিতীয়া ১৩১৬—শ্রীজন্মমহোৎসব।

ষষ্ঠ সংস্করণের উপক্রমণিকা:—

প্রথম ভাগের ষষ্ঠ সংস্করণ প্রকাশিত হইল। দক্ষিণেশ্বরে কালীবাড়ি যে বৎসর ও যে দিন প্রতিষ্ঠা হয় তাহা রাণী রাসমণির উদ্যান ক্রয়ের কবালা হইতে গৃহীত হইল, এ কথা ১৩১৬ সালের পঞ্চম সংস্করণেই বলা হইয়াছে। ১২৬২ সাল ১৮ই জ্যৈষ্ঠ বৃহস্পতিবার, স্নানযাত্রার দিন, ২১শে মে ১৮৫৫ খৃষ্টাব্দ। ১২৫৯ সাল নহে।

এই সংস্করণে সুরেন্দ্রের বাগানের বিবরণ ও পণ্ডিত শশধরের সহিত সাক্ষাৎ বিবরণ যেটুকু বাকি ছিল তাহা দেওয়া হইল।

ঠাকুরের চিত্রখানি ছাড়া আরো কয়েকখানি চিত্র সন্নিবেশিত হইল যথা—রাসমণির কালীবাড়ির "প্ল্যান", মন্দিরের দৃশ্য—প্রাঙ্গণে ও ভাগীরথীবক্ষে, শম্ভু মল্লিক ও মথুরবাবুর চিত্র, কাশীপুরবাগান ও বলরাম বাটী, বিদ্যাসাগর, কেশব সেন, বিজয় গোস্বামী ও ডাক্তার মহেন্দ্রলালের ছবি, আর ঠাকুরের সময়ের অনেকগুলি ভক্তের চেহারা।

ষষ্ঠ সংস্করণ হওয়াতে বুঝা যায় যে, শ্রীঠাকুরের বিষয় অনেকেই চিন্তা করিতেছেন। শ্রীশ্রীকথামৃতের আবার ইংরাজী, মহারাষ্ট্রী, গুজরাটী অনুবাদ হইয়াছে, হিন্দি হইতেছে, ইহাতে নানা জাতির ভিতরে তাঁহার অমৃতময়ী কথা ছড়াইয়া পড়িতেছে সন্দেহ নাই। ইতি—কাশীধাম, ৭ই মাঘ, ১৩১৯ শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ অদ্বৈত আশ্রম।

শ্রীমুখ-কথিত চরিতামৃত
Three Classes of Evidences.

ঠাকুরের জন্মাবধি ঘটনাগুলি লইয়া তাঁহার চরিতামৃত ধারাবাহিকরূপে বিবৃত করিয়া প্রকাশ করিবার অনেকদিন হইতে ইচ্ছা আছে। শ্রীশ্রীকথামৃত অন্ততঃ ছয় সাত ভাগ সম্পূর্ণ হইলে শ্রীমুখ-কথিত চরিতামৃত অবলম্বন করিয়া এইটি লিখিবার উপকরণ (materials) পাওয়া যাইবে—

১ম (Direct and Recorded on the same day) :—

ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ শ্রীমুখে বাল্য, সাধনাবস্থা ইত্যাদি সম্বন্ধে অথবা ভক্তদের সম্বন্ধে নিজ চরিত যাহা বলিয়াছেন,—আর যাহা ভক্তেরা সেই দিনেই লিপিবদ্ধ করিয়াছিলেন। শ্রীশ্রীকথামৃতে প্রকাশিত শ্রীমুখ-কথিত চরিতামৃত এই জাতীয় উপকরণ। শ্রীম নিজে যেদিন ঠাকুরের কাছে বসিয়া যাহা দেখিয়াছিলেন ও তাঁহার শ্রীমুখে শুনিয়াছিলেন, তিনি সেইদিন রাত্রেই (বা দিবাভাগে) সেই-গুলি স্মরণ করিয়া দৈনন্দিন বিবরণে Diary-তে লিপিবদ্ধ করিয়াছিলেন। এই জাতীয় উপকরণ প্রত্যক্ষ (Direct) দর্শন ও শ্রবণ দ্বারা প্রাপ্ত। বর্ষ, তারিখ, বার, তিথি সমেত।

২য় (Direct but unrecorded at the time of the Master) :—

ঠাকুরের শ্রীমুখে ভক্তেরা নিজে যাহা শুনিয়াছিলেন আর এক্ষণে স্মরণ করিয়া বলেন। এ জাতীয় উপকরণও খুব ভাল। আর অন্যান্য অবতারে প্রায় এইরূপই হইয়াছে। তবে চব্বিশ বৎসর হইয়া গিয়াছে। লিপিবদ্ধ থাকাতে যে ভুলের সম্ভাবনা, তাহা অপেক্ষা অধিক ভুলের সম্ভাবনা।

৩য় (Hearsay and unrecorded at the time of the Master) :—

ঠাকুরের সমসাময়িক ৺হৃদয় মুখোপাধ্যায়, ৺রাম চাটুয্যে প্রভৃতি অন্যান্য ভক্তগণের নিকট হইতে ঠাকুরের বাল্য ও সাধনাবস্থা সম্বন্ধে আমরা যাহা শুনিয়াছি, অথবা ৺কামারপুকুর, ৺জয়রামবাটী, শ্যামবাজার নিবাসী বা ঠাকুর গোষ্ঠীর ভক্তদের মুখ হইতে তাঁহার চরিত সম্বন্ধে যাহা শুনিতে পাই, সেগুলি তৃতীয় শ্রেণীর উপকরণ।

শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণকথামৃত প্রণয়নকালে শ্রীম প্রথম জাতীয় উপকরণের উপর নির্ভর করিয়াছেন। তাঁহার ধারাবাহিক চরিতামৃত যদি ভিন্ন আকারে শ্রীম প্রকাশ করেন সেও প্রধানতঃ এই প্রথম শ্রেণীর উপকরণের উপর, অর্থাৎ শ্রীমুখ-কথিত চরিতামৃতের উপর নির্ভর করিয়া লেখা হইবে। ইতি, কলিকাতা সন, ১৩১৭, ইং ১৯১০।



যোগীর চক্ষু

শ্রীরামকৃষ্ণ (মণি অর্থাৎ মাষ্টার মহাশয়ের প্রতি)—যোগীর মন সর্বদাই ঈশ্বরেতে থাকে,—সর্বদাই ঈশ্বরেতে আত্মস্থ। চক্ষু ফ্যাল্‌ফেলে, দেখলেই বুঝা যায়। যেমন পাখী ডিমে তা দিচ্ছে—সব মনটা সেই ডিমের দিকে, উপরে নামমাত্র চেয়ে রয়েছে। আচ্ছা, আমায় সেই ছবি দেখাতে পার?

মণি—যে আজ্ঞা, আমি চেষ্টা করবো যদি কোথাও পাই।

[১৮৮২—২৪শে আগষ্ট, দক্ষিণেশ্বর

[শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণকথামৃত, ৩য় ভাগ—২য় খণ্ড]

শ্রীশ্রীঠাকুর ও বিবিধ তত্ত্ব

সূচীপত্র

শ্রীশ্রীমার আশীর্বাদ

বাবাজীবন,

তাঁহার নিকট যাহা শুনিয়াছিলে সেই কথাই সত্য। ইহাতে তোমার কোন ভয় নাই। এক সময় তিনিই তোমার কাছে এ সকল কথা রাখিয়াছিলেন। এক্ষণে আবশ্যকমত তিনিই প্রকাশ করাইতেছেন। ঐ সকল কথা ব্যক্ত না করিলে লোকের চৈতন্য হইবে না জানিবে। তোমার নিকট যে সমস্ত তাঁহার কথা আছে তাহা সবই সত্য। একদিন তোমার মুখে শুনিয়া আমার বোধ হইল, তিনিই ঐ সমস্ত কথা বলিতেছেন।

জয়রামবাটী, ২১শে আষাঢ়, ১৩০৪

OPINIONS

SWAMI VIVEKANANDA TO 'M'

*In a letter dated 7th Feb, 1889 from Antpore *, says,—*

Thanks ! 100000 Master ! You have hit Ramkristo in the right point. Few alas, few understand him !!

My heart leaps in joy—and it is a wonder that I do not go mad when I find any body thoroughly launched into the midst of the doctrine which is to shower peace on Earth hereafter.

In a letter dated October 1897 C/o Lala Hansaraj Rawalpindi, says :—

"Dear M. *C'est bon mon ami*—Now you are doing just the thing. Come out man. No sleeping all life. Time is flying. Bravo that is the way.

"Many many thanks for your publication. Only I am afraid it will not pay its way in a pamphlet form.** Never mind—pay or no pay. Let it see the blaze of day-light. You will have many blessings on you and many more curses but বৈসাহি সব কাল বনতা সাহেব। (That is always the way of the world, Sir.) This is the time."

In a letter dated 24th November 1897 from Dehra Dun, says :

My dear 'M.' Many many many thanks for your second leaflet. It is indeed wonderful. *The move is quite original and never was the life of a great teacher brought before the public untarnished by the writer's mind as you are doing.* The language also is beyound all praise—so fresh, so pointed and withal so plain and easy, I cannot express in adequate terms how I have enjoyed them. I am really in a transport when I read them. Strange, isn't it ?

---

* Antpore is a village in the Hooghly district,—the birth place of Premananda. The Swamiji, M., and many of his fellow disciples were at this time, staying as guests at the house of Swami Premananda. When Swamiji wrote the above, he was observing a vow of silence (মৌনব্রত)।

Our teacher and Lord was so original and each one of us will have to be original or nothing. *I now understand why none of us attempted his life before. It has been reserved for you—this great work. He is with you evidently.*

P. S. "Socratic dialogues are Plato all over. You are entirely hidden. Moreover, the dramatic part is infinitely beautiful. Every body likes it, here or in the West."

Srijut Girish Chandra Ghosh in a letter dated 22nd March 1900 says :—

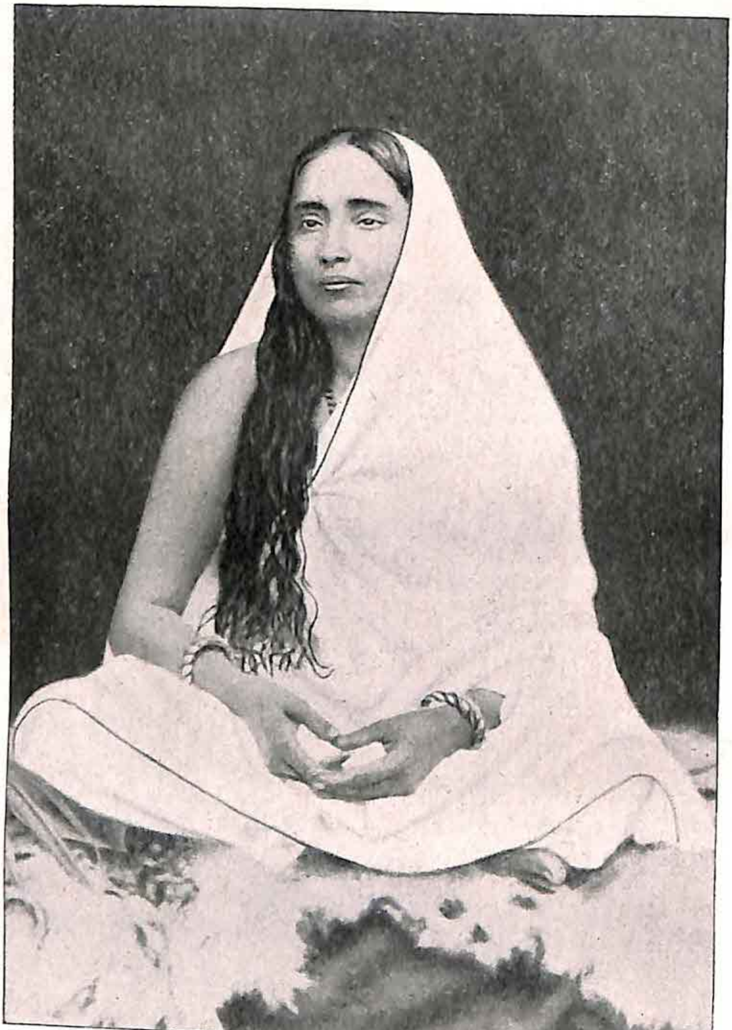
** "If my humble opinion go for anything I not only fully endorse the opinion of the great Swamy (Vivekananda) but add in a loud voice that *kathamrita* has been my very existence during my protracted illness for the last three years. ** You deserve the gratitude of the whole human race to end of days."

Swamy Ramkrishnanda (Sasi Maharaja). Belur Math now of the Madras Math, in a letter dated 27th Oct, 1904, says :—

** "You have left whole humanity in debt by publishing these invaluable pages fraught with the best wisdom of the greatest Avatar of God."

Mr. N. Ghosh in the Indian Nation 19th May 1902 says :—

Ramkrishna Kathamrita by M. (part I.) is a work of singular value and interest. He has done a kind of work which no Bengalee had ever done before, which so far as we are aware no native of India had ever done. It has been done only once in history namely by Boswell. But then the immortal biography is only the life of a scholar and a kindhearted man. This Kathamrita, on the other hand, is the record of the sayings of a Saint. What is the wit or even the wordly wisdom of the great Doctor by the side of the Divine teaching of a genuine devotee? Its value is immense. We say nothing of the sayings themselves for the character of the Teacher and teaching is well-known. They take us straight to the truth and not through any metaphysical maze. Their style is Biblical in simplicity. What a treasure would it have been to the world if all the sayings of Sree-Krishna, Buddha, Jesus, Mohammad, Nanak and Chaitanya could have been thus preserved.



শ্রীশ্রীমা

ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণের সংক্ষিপ্ত চরিতামৃত

[শ্রীরামকৃষ্ণের জন্ম—পিতা ক্ষুদিরাম ও মাতা চন্দ্রমণি—পাঠশালা রঘুবীর সেবা—সাধুসঙ্গ ও পুরাণ শ্রবণ—অদ্ভুত জ্যোতিঃ দর্শন—কলিকাতায় আগমন ও দক্ষিণেশ্বর কালীবাড়িতে অদ্ভুত ঈশ্বরীয় রূপ দর্শন—ঠাকুর উন্মাদবৎ—কালীবাড়িতে সাধুসঙ্গ—তোতাপুরী ও ঠাকুরের বেদান্ত শ্রবণ—তন্ত্রোক্ত ও পুরাণোক্ত সাধন—ঠাকুরের জগন্মাতার সহিত কথাবার্তা—তীর্থদর্শন—ঠাকুরের অন্তরঙ্গ—ঠাকুর ও ভক্তগণ—ঠাকুর ও ব্রাহ্মসমাজ—হিন্দু, খৃষ্টান, মুসলমান ইত্যাদি সর্বধর্ম সমন্বয়—ঠাকুরের স্ত্রীলোক ভক্ত—ভক্ত পরিবার।]

ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ হুগলী জেলার অন্তঃপাতী কামারপুকুর গ্রামে এক সদ্ব্রাহ্মণের ঘরে ফাল্গুনের শুক্লা দ্বিতীয়া তিথিতে জন্মগ্রহণ করেন। কামারপুকুর গ্রাম, জাহানাবাদ (আরামবাগ) হইতে চার ক্রোশ পশ্চিমে আর বর্ধমান হইতে ১২/১৩ ক্রোশ দক্ষিণে।

ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণের জন্মদিন সম্বন্ধে মতভেদ আছে—

অম্বিকা আচার্যের কোষ্ঠী। এই কোষ্ঠী ঠাকুরের অসুখের সময় প্রস্তুত করা হয়, ৩রা কার্তিক ১২৮৬, ইংরাজী ১৮৭৯। উহাতে জন্মদিন লেখা আছে ১৭৫৬ শক, ১০ই ফাল্গুন, বুধবার, শুক্লা দ্বিতীয়া, পূর্ব-ভাদ্রপদ নক্ষত্র। তাঁহার গণনা ১৭৫৬।১০।৯।৫৯।১২।

ক্ষেত্রনাথ ভট্টের ১৩০০ সালে গণনা, ১৭৫৪।১০।৯।০।১২। এই মতে ১৭৫৪ শক, ১০ই ফাল্গুন, বুধবার শুক্লা দ্বিতীয়া, পূর্বভাদ্রপদ, সব মিলে। ১২৩৯ সাল, ২০শে ফেব্রুয়ারী ১৮৩৩। লগ্নে রবি চন্দ্র বুধের যোগ*। কুম্ভরাশি। বৃহস্পতি শুক্রের যোগহেতু 'সম্প্রদায়ের প্রভু হইবেন।'

নারায়ণ জ্যোতির্ভূষণের নূতন কোষ্ঠী (মঠে প্রস্তুত)। এ গণনা অনুসারে ১২৪২ সালে, ৬ই ফাল্গুন, বুধবার ১৮৩৬; ১৭ই ফেব্রুয়ারী ভোর রাত্রি ৪টা, ফাল্গুন শুক্লা দ্বিতীয়া, ত্রিগ্রহের যোগ, নক্ষত্র—সব মিলে। কেবল অম্বিকা আচার্যের লিখিত ১০ই ফাল্গুন হয় না। ১৭৫৭।১০।৫।৫৯।২৮।২১।

ঠাকুর মানব শরীরে ৫১/৫২ বৎসর কাল ছিলেন।

ঠাকুরের পিতা ৺ক্ষুদিরাম চট্টোপাধ্যায় অতি নিষ্ঠাবান ও পরম ভক্ত ছিলেন। মা ৺চন্দ্রমণি দেবী সরলতা ও দয়ার প্রতিমূর্তি ছিলেন। পূর্বে তাঁহাদের দেরে

---

* লগ্নে রবি চন্দ্র বুধের যোগ—শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণকথামৃত—৪র্থ ভাগ, ২৩ খণ্ড।

নামক গ্রামে বাস ছিল। কামারপুকুর হইতে দেড় ক্রোশ দূরে। সেই গ্রামস্থ জমিদারের হইয়া মোকদ্দমায় ক্ষুদিরাম সাক্ষ্য দেন নাই। পরে স্বজন লইয়া কামারপুকুরে আসিয়া বাস করেন।

ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণের ছেলেবেলার নাম গদাধর। পাঠশালে সামান্য লেখাপড়া শিখিবার পর বাড়িতে থাকিয়া ৺রঘুবীরের বিগ্রহ সেবা করিতেন। নিজে ফুল তুলিয়া আনিয়া নিত্যপূজা করিতেন। পাঠশালে 'শুভঙ্করী ধাঁধা লাগতো'।

নিজে গান গাহিতে পারিতেন—অতিশয় সুকণ্ঠ। যাত্রা শুনিয়া প্রায় অধিকাংশ গান গাহিয়া দিতে পারিতেন। বাল্যকালাবধি সদানন্দ। পাড়ার আবালবৃদ্ধবনিতা সকলেই তাঁহাকে ভালবাসিতেন।

বাড়ির পাশে লাহাদের বাড়ি, সেখানে অতিথিশালা—সর্বদা সাধুদের যাতায়াত ছিল। গদাধর সেখানে সাধুদের সঙ্গ ও তাঁহাদের সেবা করিতেন। কথকেরা যখন পুরাণ পাঠ করিতেন, তখন নিবিষ্ট মনে সমস্ত শুনিতেন। এইরূপে রামায়ণ, মহাভারত, শ্রীমদ্‌ভাগবত কথা, সমস্ত হৃদয়ঙ্গম করিলেন।

একদিন মাঠ দিয়া বাড়ির নিকটবর্তী গ্রাম আনুড়ে যাইতেছিলেন। তখন ১১ বৎসর বয়স। ঠাকুর নিজ মুখে বলিয়াছেন, হঠাৎ তিনি অদ্ভুত জ্যোতিঃ দর্শন করিয়া বাহ্যশূন্য হয়েন। লোকেরা বলিল, মূর্চ্ছা—ঠাকুরের ভাব সমাধি হইয়াছিল।

৺ক্ষুদিরামের মৃত্যুর পর ঠাকুর জ্যেষ্ঠ ভ্রাতার সঙ্গে কলিকাতায় আসিলেন। তখন তাঁহার বয়স ১৭/১৮ হইবে। কলিকাতায় কিছুদিন নাথের বাগানে কিছুদিন ঝামাপুকুরে গোবিন্দ চাটুয্যের বাড়িতে থাকিয়া পূজা করিয়া বেড়াইতেন। এই সূত্রে ঝামাপুকুরের মিত্রদের বাড়িতে, কিছুদিন পূজা করিয়াছিলেন।

রাণী রাসমণি, কলিকাতা হইতে আড়াই ক্রোশ দূরে দক্ষিণেশ্বরে কালীবাড়ি স্থাপন করিলেন। ১২৬২ সাল ১৮ই জ্যৈষ্ঠ বৃহস্পতিবার স্নানযাত্রার দিন। (ইংরাজী ৩১শে মে, ১৮৫৫ খৃষ্টাব্দ)*। ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণের জ্যেষ্ঠভ্রাতা পণ্ডিত রামকুমার কালীবাড়িতে প্রথম পূজারী নিযুক্ত হইলেন। ঠাকুরও মাঝে মাঝে কলিকাতা হইতে আসিতেন ও কিছুদিন পরে নিজে পূজাকার্যে নিযুক্ত হইলেন। তখন তাঁহার বয়স ২১/২২ হইবে। মধ্যম ভ্রাতা রামেশ্বরও মাঝে মাঝে কালীবাড়ির পূজা করিতেন। তাঁহার দুই পুত্র শ্রীযুক্ত রামলাল ও শ্রীযুক্ত শিবরাম ও এক কন্যা শ্রীমতী লক্ষ্মী দেবী।

---

* এ সমস্ত রাণী রাসমণির কালীবাড়ির বিক্রি কবালা হইতে লওয়া হইয়াছে—
Deed of Conveyance, Date of purchase of the temple grounds 6th

কয়েকদিন পূজা করিতে করিতে শ্রীরামকৃষ্ণের মনের অবস্থা আর এক রকম হইল। সর্বদাই বিমনা ও ঠাকুর প্রতিমার কাছে বসিয়া থাকিতেন।*

আত্মীয়েরা এই সময় তাঁহার বিবাহ দিলেন—ভাবিলেন, বিবাহ হইলে হয়তো অবস্থান্তর হইতে পারে। কামারপুকুর হইতে দুই ক্রোশ দূরে জয়রামবাটী গ্রামস্থ রামচন্দ্র মুখোপাধ্যায়ের কন্যা শ্রীশ্রীসারদামণি দেবীর সঙ্গে বিবাহ হইল, ১৮৫৯ সাল। ঠাকুরের বয়স ২২/২৩, শ্রীশ্রীমার ৬ বৎসর।

বিবাহের পর দক্ষিণেশ্বর কালীমন্দিরে ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ ফিরিয়া আসিবার কিছুদিন পরে তাঁহার একেবারে অবস্থান্তর হইল। কালী বিগ্রহ পূজা করিতে করিতে কি অদ্ভুত ঈশ্বরীয় রূপ দর্শন করিতে লাগিলেন। আরতি করেন, আরতি আর শেষ হয় না। পূজা করিতে বসেন, পূজা শেষ হয় না; হয়তো আপনার মাথায় ফুল দিতে থাকেন।

পূজা আর করিতে পারিলেন না—উন্মাদের ন্যায় বিচরণ করিতে লাগিলেন। রাণী রাসমণির জামাতা মথুর তাঁহাকে মহাপুরুষ বোধে সেবা করিতে লাগিলেন ও অন্য ব্রাহ্মণ দ্বারা মা কালীর পূজার বন্দোবস্ত করিয়া দিলেন। ঠাকুরের ভাগিনেয় শ্রীযুক্ত হৃদয় মুখোপাধ্যায়ের উপর মথুরবাবু এই পূজার ও ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণের সেবার ভার দিলেন।

ঠাকুর আর পূজাও করিলেন না, সংসারও করিলেন না—বিবাহ নাম মাত্র হইল। নিশিদিন মা! মা! কখন জড়বৎ, কাষ্ঠপুত্তলিকার ন্যায়, কখনও উন্মাদবৎ বিচরণ করেন। কখনও বালকের ন্যায়, কামিনী-কাঞ্চনাসক্ত বিষয়ীদের দেখিয়া লুকাইতেন। ঈশ্বরীয় লোক ও ঈশ্বরীয় কথা বই আর কিছু ভালবাসেন না। সর্বদাই মা! মা!

কালীবাড়িতে সদাব্রত ছিল (এখনও আছে)—সাধু-সন্ন্যাসীরা সর্বদা আসিতেন। তোতাপুরী এগার মাস থাকিয়া ঠাকুরকে বেদান্ত শুনাইলেন; একটু শুনাইতে শুনাইতে তোতা দেখিলেন, ঠাকুরের নির্বিকল্প সমাধি হইয়া থাকে। সম্ভবতঃ ১৮৬৬ খৃষ্টাব্দ।

ব্রাহ্মণী পূর্বেই (১৮৫৯) আসিয়াছেন, তিনি তন্ত্রোক্ত অনেক সাধন করাইলেন ও ঠাকুরকে শ্রীগৌরাঙ্গ জ্ঞানে শ্রীচরিতামৃতাদি বৈষ্ণব গ্রন্থ শুনাইলেন। তোতার কাছে ঠাকুর বেদান্ত শ্রবণ করিতেছেন দেখিয়া ব্রাহ্মণী তাঁহাকে সাবধান করিয়া দিতেন ও বলিতেন—'বাবা, বেদান্ত শুনো না—ওতে ভাব ভক্তি সব ক'মে যাবে।'

September, 1847. Date of Registration, 27th August 1861; price of the Dinajpur Zamindari which supports the Temple, Rs. 2,26,000.

* দ্বিতীয়ভাগে 'রাসমণির বরাদ্দ' দ্রষ্টব্য।

বৈষ্ণব পণ্ডিত বৈষ্ণবচরণও সর্বদা আসিতেন। তিনিই ঠাকুরকে কলুটোলায় চৈতন্য সভায় লইয়া যান। এই সভাতে ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ ভাবাবিষ্ট হইয়া শ্রীচৈতন্যদেবের আসনে গিয়া উপবিষ্ট হইয়াছিলেন। বৈষ্ণবচরণ চৈতন্যসভার সভাপতি ছিলেন।

বৈষ্ণবচরণ মথুরকে বলিয়াছিলেন, এ উন্মাদ সামান্য নহে,—প্রেমোন্মাদ। ইনি ঈশ্বরের জন্য পাগল। ব্রাহ্মণী ও বৈষ্ণবচরণ দেখিলেন ঠাকুরের মহাভাবের অবস্থা। শ্রীচৈতন্যদেবের ন্যায় কখনও অন্তর্দশা, (তখন জড়বৎ, সমাধিস্থ); কখন অর্ধবাহ্য; কখনও বা বাহ্যদশা।

ঠাকুর মা মা করিয়া কাঁদিতেন—সর্বদা মার সঙ্গে কথা কহিতেন, মার কাছে উপদেশ লইতেন। বলিতেন, 'মা তোর কথা কেবল শুনবো; আমি শাস্ত্রও জানি না, পণ্ডিতও জানি না। তুই বুঝাবি তবে বিশ্বাস করবো।' ঠাকুর জানিতেন ও বলিতেন, যিনিই পরব্রহ্ম, অখণ্ড সচ্চিদানন্দ, তিনিই মা।

ঠাকুরকে জগন্মাতা বলিয়াছেন, 'তুই আর আমি এক। তুই ভক্তি নিয়ে থাক—জীবের মঙ্গলের জন্য।' ভক্তেরা সকলে আসবে। তোর তখন কেবল বিষয়ীদের দেখতে হবে না; অনেক শুদ্ধ কামনাশূন্য ভক্ত আছে, তারা আসবে।' ঠাকুরবাড়িতে আরতির সময় যখন কাঁসরঘণ্টা বাজিত, তখন শ্রীরামকৃষ্ণ কুঠিতে গিয়া উচ্চৈঃস্বরে ডাকিতেন, "ওরে ভক্তেরা, তোরা কে কোথায় আছিস, শীঘ্র আয়।"

মাতা চন্দ্রমণিদেবীকে ঠাকুর জগজ্জননীর রূপান্তর জ্ঞান করিতেন ও সেই-ভাবে পূজা করিতেন। জ্যেষ্ঠভ্রাতা রামকুমারের স্বর্গলাভের পর মাতা পুত্র-শোকে কাতরা হইয়াছিলেন; তিন-চারি বৎসরের মধ্যে তাঁহাকে কালীবাড়িতে আনাইয়া নিজের কাছে রাখিয়া দিয়াছিলেন ও প্রত্যহ দর্শন, পদধূলি গ্রহণ ও 'মা কেমন আছ,' জিজ্ঞাসা করিতেন।

ঠাকুর দুইবার তীর্থে গমন করেন। প্রথমবার মাকে সঙ্গে করিয়া লইয়া যান, সঙ্গে শ্রীযুত রাম চাটুয্যে ও মথুরবাবুর কয়েকটি পুত্র। তখন সবে কাশীর রেল খুলিয়াছে। তাঁহার অবস্থান্তরের ৫/৬ বৎসরের মধ্যে। তখন অহর্নিশ প্রায়ই সমাধিস্থ বা ভাবে গর্গর মাতোয়ারা। এবার বৈদ্যনাথ দর্শনান্তর *কাশীধাম ও প্রয়াগ দর্শন হইয়াছিল। ১৮৬৩ খৃষ্টাব্দ।

দ্বিতীয়বার তীর্থ গমন ইহার ৫ বৎসর পরে, ইংরেজী জানুয়ারী ১৮৬৮ খৃষ্টাব্দে। মথুরবাবু ও তাঁহার স্ত্রী জগদম্বা দাসীর সঙ্গে। ভাগিনেয় হৃদয় এবার সঙ্গে ছিলেন। এ যাত্রায় *কাশীধাম, প্রয়াগ, শ্রীবৃন্দাবন দর্শন করেন। কাশীতে মণিকর্ণিকায় সমাধিস্থ হইয়া বিশ্বনাথের গম্ভীর চিন্ময় রূপে দর্শন করেন—মুমূর্ষুদিগের কর্ণে তারকব্রহ্ম নাম দিতেছেন। আর মৌন-

ব্রতধারী ত্রৈলঙ্গস্বামীর সহিত আলাপ করেন। মথুরায় ধ্রুবঘাটে বসুদেবের কোলে শ্রীকৃষ্ণ, শ্রীবৃন্দাবনে সন্ধ্যা সময়ে ফিরতী গোষ্ঠে শ্রীকৃষ্ণ ধেনু লইয়া যমুনা পার হইয়া আসিতেছেন ইত্যাদি লীলা ভাবচক্ষে দর্শন করিয়াছিলেন; নিধুবনে রাধাপ্রেমে বিভোরা গঙ্গামাতার সহিত আলাপ করিয়া বড়ই আনন্দিত হইয়াছিলেন।

শ্রীযুক্ত কেশব সেন যখন বেলঘরের বাগানে ভক্তসঙ্গে ঈশ্বরের ধ্যান চিন্তা করেন, তখন ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ ভাগিনেয় হৃদয়ের সঙ্গে তাঁহাকে দেখিতে যান; ১৮৭৫ খৃষ্টাব্দ। বিশ্বনাথ উপাধ্যায়, নেপালের 'কাপ্তেন' এই সময়ে আসিতে থাকেন। সিঁথির গোপাল ('বুড়ো গোপাল') ও মহেন্দ্র কবিরাজ, কৃষ্ণনগরের কিশোরী ও মহিমাচরণ এই সময়ে ঠাকুরকে দর্শন করিয়াছিলেন।

ঠাকুরের অন্তরঙ্গ ভক্তেরা ইং ১৮৭৯; ১৮৮০ খৃষ্টাব্দ হইতে ঠাকুরের কাছে আসিতে থাকেন। তাঁহারা যখন ঠাকুরকে দেখেন তখন উন্মাদ অবস্থা প্রায় চলিয়া গিয়াছে। তখন শান্ত সদানন্দ বালকের অবস্থা। কিন্তু প্রায় সর্বদা সমাধিস্থ—কখনও জড়সমাধি—কখনও ভাবসমাধি—সমাধি ভঙ্গের পর ভাবরাজ্যে বিচরণ করিতেছেন। যেন পাঁচ বৎসরের ছেলে। সর্বদাই মা! মা!

রাম ও মনোমোহন ১৮৭৯ খৃষ্টাব্দের শেষ ভাগে আসিয়া মিলিত হইলেন; কেদার, সুরেন তার পরে আসিলেন। চুনী, লাটু, নিত্যগোপাল, তারকও পরে আসিলেন। ১৮৮১-র শেষ ভাগে ও ১৮৮২-র প্রারম্ভ, এই সময়ের মধ্যে নরেন্দ্র, রাখাল, ভবনাথ, বাবুরাম, বলরাম, নিরঞ্জন, মাষ্টার, যোগিন আসিয়া পড়িলেন। ১৮৮৩/৮৪ খৃষ্টাব্দের মধ্যে কিশোরী, অধর, নিতাই, ছোটগোপাল, বেলঘরের তারক, শরৎ, শশী; ১৮৮৪ মধ্যে সান্যাল, গঙ্গাধর, কালী, গিরিশ দেবেন্দ্র, শারদা, কালীপদ, উপেন্দ্র, দ্বিজ ও হরি; ১৮৮৫ মধ্যে সুবোধ, ছোট নরেন্দ্র, পল্টু, পূর্ণ, নারায়ণ, তেজচন্দ্র, হরিপদ আসিলেন। এইরূপে হরমোহন যজ্ঞেশ্বর, হাজরা, ক্ষীরোদ, কৃষ্ণনগরের যোগিন, মনীন্দ্র, ভূপতি, অক্ষয় নবগোপাল, বেলঘরের গোবিন্দ, আশু, গিরীন্দ্র, অতুল, দুর্গাচরণ, সুরেশ, প্রাণকৃষ্ণ, নবাই চৈতন্য, হরিপ্রসন্ন, মহেন্দ্র (মুখো), প্রিয় (মুখুয্যে), সাধু প্রিয়নাথ (মন্মথ), বিনোদ, তুলসী, হরিশ মুস্তাফী, বসাখ, কথকঠাকুর, বালির শশী (ব্রহ্মচারী), নিত্যগোপাল (গোস্বামী), কোন্নগরের বিপিন, বিহারী, ধীরেন, রাখাল, (হালদার) ক্রমে আসিয়া পড়িলেন।

ঈশ্বর বিদ্যাসাগর, শশধর পণ্ডিত, ডাক্তার রাজেন্দ্র, ডাক্তার সরকার, বঙ্কিম (চাটুয্যে), আমেরিকার কুক সাহেব, ভক্ত উইলিয়াম্‌স, মিসির সাহেব, মাইকেল মধুসূদন, কৃষ্ণদাস (পাল), পণ্ডিত দীনবন্ধু, পণ্ডিত শ্যামাপদ, রামনারায়ণ ডাক্তার, দুর্গাচরণ ডাক্তার, রাধিকা গোস্বামী, শিশির (ঘোষ), নবীন (মুন্সী), নীলকণ্ঠ ইঁহারাও দর্শন করিয়াছিলেন। ঠাকুরের সঙ্গে ত্রৈলঙ্গ-স্বামীর

কাশীধামে ও গঙ্গামাতার শ্রীবৃন্দাবনে সাক্ষাৎ হয়। গঙ্গামাতা ঠাকুরকে শ্রীমতী রাধা জ্ঞানে বৃন্দাবন হইতে ছাড়িতে চান নাই।

অন্তরঙ্গ ভক্তেরা আসিবার আগে কৃষ্ণকিশোর, মথুর, শম্ভু মল্লিক, নারায়ণ শাস্ত্রী, ইঁদেশের গৌরী পণ্ডিত, চন্দ্র, অচলানন্দ সর্বদা ঠাকুরকে দর্শন করিতেন। বর্ধমানের রাজার সভাপণ্ডিত পদ্মলোচন, আর্যসমাজের দয়ানন্দও দর্শন করিয়াছিলেন। ঠাকুরের জন্মভূমি কামারপুকুর এবং সিওড় শ্যামবাজার ইত্যাদি স্থানের অনেক ভক্তেরা তাঁহাকে দেখিয়াছেন।

ব্রাহ্মসমাজের অনেকে ঠাকুরের কাছে সর্বদা যাইতেন। কেশব, বিজয়, কালী (বসু), প্রতাপ, শিবনাথ, অমৃত, ত্রৈলোক্য, কৃষ্ণবিহারী, মণিলাল, উমেশ, হীরানন্দ, ভবানী, নন্দলাল ও অন্যান্য অনেক ব্রাহ্ম ভক্ত সর্বদা যাইতেন; ঠাকুরও ব্রাহ্মদের দেখিতে আসিতেন। মথুরের জীবদ্দশায় ঠাকুর তাঁহার সহিত দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরকে তাঁহার বাটীতে ও উপাসনাকালে আদি ব্রাহ্মসমাজ দেখিতে গিয়াছিলেন। পরে কেশবের ব্রাহ্মমন্দির ও সাধারণসমাজ—উপাসনা-কালে—দেখিতে গিয়াছিলেন। কেশবের বাড়িতে সর্বদা যাইতেন ও ব্রাহ্মভক্ত সঙ্গে কত আনন্দ করিতেন। কেশবও সর্বদা, কখনও ভক্তসঙ্গে, কখনও বা একাকী আসিতেন।

কালনাতে ভগবান দাস বাবাজীর সঙ্গে দেখা হইয়াছিল। ঠাকুরের সমাধি অবস্থা দেখিয়া বাবাজী বলিয়াছিলেন—আপনি মহাপুরুষ, চৈতন্যদেবের আসনে বসিবার আপনিই উপযুক্ত।

ঠাকুর সর্বধর্মসমন্বয়ার্থ বৈষ্ণব, শাক্ত, শৈব ইত্যাদি ভাব সাধন করিয়া অপর দিকে, আল্লা মন্ত্র জপ ও যীশুখৃষ্টের চিন্তা করিয়াছিলেন। যে ঘরে ঠাকুর থাকিতেন সেখানে ঠাকুরদের ছবি ও বুদ্ধদেবের মূর্তি ছিল। যীশু জলমগ্ন পিতরকে উদ্ধার করিতেছেন, এ ছবিও ছিল। এখনও সে ঘরে গেলে দেখিতে পাওয়া যায়। আজ ঐ ঘরে ইংরেজ ও আমেরিকান্ ভক্তেরা আসিয়া ঠাকুরের ধ্যান চিন্তা করেন, দেখা যায়।

একদিন মাকে ব্যাকুল হইয়া বলিলেন, "মা তোর খৃষ্টান ভক্তেরা তোকে কিরূপে ডাকে দেখবো, আমায় নিয়ে চ।" কিছুদিন পরে কলিকাতায় গিয়া এক গির্জার দ্বারদেশে দাঁড়াইয়া উপাসনা দেখিয়াছিলেন। ঠাকুর ফিরিয়া আসিয়া ভক্তদের বলিলেন, "আমি খাজাঞ্চীর ভয়ে ভিতরে গিয়া বসি নাই—ভাবলাম কি জানি যদি কালীঘরে যেতে না দেয়।"

ঠাকুরের অনেক স্ত্রীলোক ভক্ত আছেন। গোপালের মাকে ঠাকুর মা বলিয়াছিলেন ও 'গোপালের মা' বলিয়া ডাকিতেন। সকল স্ত্রীলোককেই তিনি সাক্ষাৎ ভগবতী দেখিতেন ও মা জ্ঞানে পূজা করিতেন। কেবল যত দিন না স্ত্রীলোককে সাক্ষাৎ মা বোধ হয়, যত দিন না ঈশ্বরে শুদ্ধাভক্তি হয়,

ততদিন স্ত্রীলোক সম্বন্ধে পুরুষদের সাবধান থাকিতে বলিতেন। এমন কি পরম ভক্তিমতী হইলেও তাঁহাদের সম্পর্কে যাইতে বারণ করিতেন। মাকে নিজে বলিয়াছিলেন, “মা, আমার ভিতরে যদি কাম হয় তা হ'লে কিন্তু, মা গলায় ছুরি দিব।”

ঠাকুরের ভক্তেরা অসংখ্য—তাঁহারা কেহ প্রকাশিত আছেন কেহ বা গুপ্ত আছেন—সকলের নাম করা অসম্ভব। শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণকথামৃতে অনেকের নাম পাওয়া যাইবে। বাল্যকালে অনেকে—রামকৃষ্ণ, পতু, তুলসী, শান্তি, শশী, বিপিন, হীরালাল, নগেন্দ্র মিত্র, উপেন্দ্র, সুরেন্দ্র, সুরেন ইত্যাদি; ও ছোট ছোট অনেক মেয়েরা ঠাকুরকে দেখিয়াছিলেন। এক্ষণে তাঁহারাও ঠাকুরের সেবক।

লীলা সংবরণের পর তাঁহার কত ভক্ত হইয়াছেন ও হইতেছেন। মাদ্রাজ, লঙ্কাদ্বীপ, উত্তর-পশ্চিম, রাজপুতনা, কুমাউন, নেপাল, বোম্বাই, পাঞ্জাব, জাপান; আবার আমেরিকা, ইংলণ্ড, সর্বস্থানে ভক্ত পরিবার ছড়াইয়া পড়িয়াছে ও উত্তরোত্তর বাড়িতেছে।

(জন্মাষ্টমী ১৩১০)।

প্রথম খণ্ড

দক্ষিণেশ্বরে ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ

প্রথম পরিচ্ছেদ

কালীবাড়ি ও উদ্যান

[শ্রীরামকৃষ্ণ দক্ষিণেশ্বরে কালীবাড়ি মধ্যে—চাঁদনী ও দ্বাদশ শিবমন্দির—পাকা উঠান ও বিষ্ণুঘর—শ্রীশ্রীভবতারিণী মা-কালী—নাটমন্দির—ভাঁড়ার, ভোগঘর, অতিথিশালা ও বলিদানের স্থান—দপ্তরখানা—ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণের ঘর—নহবৎ, বকুলতলা ও পঞ্চবটী—ঝাউতলা, বেলতলা ও কুঠি—বাসনমাজার ঘাট, গাজীতলা, সদর ফটক ও খিড়কী ফটক—হাঁসপুকুর, আস্তাবল, গোশালা ও পুষ্পোদ্যান—শ্রীরামকৃষ্ণের ঘরের বারান্দা—'আনন্দনিকেতন'।]

আজ রবিবার। ভক্তদের অবসর হইয়াছে, তাই তাঁহারা দলে দলে শ্রীশ্রীপরমহংসদেবকে দর্শন করিতে দক্ষিণেশ্বরের কালীবাড়িতে আসিতেছেন। সকলেরই অবারিত দ্বার। যিনি আসিতেছেন, ঠাকুর তাঁহারই সহিত কথা কহিতেছেন। সাধু, পরমহংস, হিন্দু, খৃষ্টান, ব্রহ্মজ্ঞানী; শাক্ত বৈষ্ণব; পুরুষ, স্ত্রীলোক; সকলেই আসিতেছেন। ধন্য রাণী রাসমণি! তোমারই সুকৃতিবলে এই সুন্দর দেবালয় প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে, আবার এই সচল প্রতিমা—এই মহাপুরুষকে লোকে আসিয়া দর্শন ও পূজা করিতে পাইতেছে।

[চাঁদনী ও দ্বাদশ শিবমন্দির]

কালীবাড়িটি কলিকাতা হইতে আড়াই ক্রোশ উত্তরে হইবে। ঠিক গঙ্গার উপরে। নৌকা হইতে নামিয়া সুবিস্তীর্ণ সোপানাবলী দিয়া পূর্বাস্য হইয়া উঠিয়া কালীবাড়িতে প্রবেশ করিতে হয়। এই ঘাটে পরমহংসদেব স্নান করিতেন। সোপানের পরেই চাঁদনী। সেখানে ঠাকুরবাড়ির চৌকিদারেরা থাকে। তাহাদের খাটিয়া, আমকাঠের সিন্দুক, দুই-একটা লোটা, সেই চাঁদনীতে মাঝে মাঝে পড়িয়া আছে। পাড়ার বাবুরা যখন গঙ্গাস্নান করিতে আসেন, কেহ-কেহ সেই চাঁদনীতে বসিয়া খোসগল্প করিতে করিতে তেল মাখেন। যে সকল সাধু ফকির, বৈষ্ণব, বৈষ্ণবী, অতিথিশালার প্রসাদ পাইবেন বলিয়া আসেন, তাঁহারাও কেহ-কেহ ভোগের ঘণ্টা পর্যন্ত এই চাঁদনীতে অপেক্ষা করেন। কখনও কখনও দেখা যায়, গৈরিকবস্ত্রধারিণী ভৈরবী ত্রিশূলহস্তে এই স্থানে বসিয়া আছেন। তিনিও

সময় হ'লে অতিথশালায় যাইবেন। চাঁদনীটি দ্বাদশ শিবমন্দিরের ঠিক মধ্যবর্তী। তন্মধ্যে ছয়টি মন্দির চাঁদনীর ঠিক উত্তরে আর ছয়টি চাঁদনীর ঠিক দক্ষিণে। নৌকাযাত্রীরা এই দ্বাদশ মন্দির দূর হইতে দেখিয়া বলিয়া থাকে, 'ঐ রাসমণির ঠাকুরবাড়ি'।

[পাকা উঠান ও বিষ্ণুঘর]

চাঁদনী ও দ্বাদশ মন্দিরের পূর্ববর্তী ইষ্টকনির্মিত পাকা উঠান। উঠানের মাঝখানে সারি সারি দুইটি মন্দির। উত্তর দিকে রাধাকান্তের মন্দির। তাহার ঠিক দক্ষিণে মা-কালীর মন্দির। রাধাকান্তের মন্দিরে শ্রীশ্রীরাধাকৃষ্ণ বিগ্রহ, পশ্চিমাস্য। সিঁড়ি দিয়া মন্দিরে উঠিতে হয়। মন্দিরতল মর্মর প্রস্তরাবৃত। মন্দিরের সম্মুখস্থ দালানে ঝাড় টাঙ্গানো আছে—এখন ব্যবহার নাই, তাই রক্তবস্ত্রের আবরণী দ্বারা রক্ষিত। একটি দ্বারবান পাহারা দিতেছে। অপরাহ্নে পশ্চিমের রৌদ্রে পাছে ঠাকুরের কষ্ট হয়। তাই ক্যামবিসের পর্দার বন্দোবস্ত আছে। দালানের সারি সারি খিলানের ফুকর উহাদের দ্বারা আবৃত হয়। দালানের দক্ষিণ-পূর্ব কোণে একটি গঙ্গাজলের জালা। মন্দিরের চৌকাঠের নিকট একটি পাত্রে শ্রীচরণামৃত। ভক্তেরা আসিয়া ঠাকুর প্রণাম করিয়া ঐ চরণামৃত লইবেন। মন্দির মধ্যে সিংহাসনারূঢ় শ্রীশ্রীরাধাকৃষ্ণ-বিগ্রহ। শ্রীরামকৃষ্ণ এই মন্দিরে পূজারীর কার্যে প্রথম ব্রতী হন—১৮৫৭-৫৮ খৃষ্টাব্দ।

[শ্রীশ্রীভবতারিণী মা কালী]

দক্ষিণের মন্দিরে সুন্দর পাষাণময়ী কালী প্রতিমা। মার নাম ভবতারিণী। শ্বেতকৃষ্ণমর্মরপ্রস্তরাবৃত মন্দিরতল ও সোপানযুক্ত উচ্চবেদী। বেদীর উপরে রৌপ্যময় সহস্রদল পদ্ম, তাহার উপর শিব, শিব হইয়া দক্ষিণদিকে মস্তক—উত্তরদিকে পা করিয়া পড়িয়া আছেন। শিবের প্রতিকৃতি শ্বেত প্রস্তরনির্মিত। তাঁহার হৃদয়োপরি বারাণসী-চেলিপরিহিতা নানাভরণালঙ্কৃতা, এই সুন্দর ত্রিনয়নী শ্যামাকালীর প্রস্তরময়ী মূর্তি। শ্রীপাদপদ্মে নূপুর, গুজরী, পঞ্জম, পাঁজেব, চুটকী আর জবা বিল্বপত্র। পাঁজেব পশ্চিমের মেয়েরা পরে। পরমহংস-দেবের ভারী সাধ, তাই মথুরবাবু পরাইয়াছেন। মার হাতে সোনার বাউটি তাবিজ ইত্যাদি। অগ্রহাতে—বালা, নারিকেল-ফুল, পঁইচে, বাউটি; মধ্যহাতে—তাড়, তাবিজ ও বাজু; তাবিজের ঝাঁপা দোদুল্যমান। গলদেশে চিক, মুক্তার সাতনর মালা, সোনার বত্রিশ নর, তারাহার ও সুবর্ণনির্মিত মুণ্ডমালা; মাথায় মুকুট, কাণে কানবালা, কাণপাশ, ফুলঝুমকো, চৌদানী ও মাছ। নাসিকায় নৎ, নোলক দেওয়া। ত্রিনয়নীর বাম হস্ত দ্বয়ে নৃমুণ্ড ও অসি, দক্ষিণ হস্তদ্বয়ে বরাভয়। কটিদেশে নরকর-মালা, নিমফল ও কোমরপাটা। মন্দির-

মধ্যে উত্তর-পূর্ব কোণে বিচিত্র শয্যা—মা বিশ্রাম করেন। দেওয়ালের এক-পার্শ্বে চামর ঝুলিতেছে। ভগবান শ্রীরামকৃষ্ণ ঐ চামর লইয়া কতবার মাকে ব্যজন করিয়াছেন। বেদীর উপর পদ্মাসনে রূপার গেলাসে জল। তলায় সারি সারি ঘটী; তন্মধ্যে শ্যামার পান করিবার জল। পদ্মাসনের উপর পশ্চিমে অষ্টধাতু নির্মিত সিংহ, পূর্বে গোধিকা ও ত্রিশূল। বেদীর অগ্নিকোণে শিবা, দক্ষিণে কাল প্রস্তরের বৃষ ও ঈশান কোণে হংস। বেদী উঠিবার সোপানে রৌপ্যময় ক্ষুদ্র সিংহাসনোপরি নারায়ণশিলা; একপার্শ্বে পরমহংসদেবের সন্ন্যাসী হইতে প্রাপ্ত অষ্টধাতুনির্মিত রামলালা নামধারী শ্রীরামচন্দ্রের বিগ্রহ মূর্তি ও বাণেশ্বর শিব। আরও অন্যান্য দেবতা আছেন। দেবী প্রতিমা দক্ষিণাস্যা। ভবতারিণীর ঠিক সম্মুখে, অর্থাৎ বেদীর ঠিক দক্ষিণে, ঘট-স্থাপনা হইয়াছে। সিন্দূররঞ্জিত, পূজান্তে নানাকুসুমবিভূষিত, পুষ্পমালা-শোভিত, মঙ্গলঘট। দেওয়ালের একপার্শ্বে জলপূর্ণ তামার ঝারি—মা মুখ ধুইবেন। ঊর্ধ্বে মন্দিরে চাঁদোয়া, বিগ্রহের পশ্চাৎ দিকে সুন্দর বারাণসী বস্ত্রখণ্ড লম্বমান। বেদীর চারিকোণে রৌপ্যময় স্তম্ভ। তদুপরি বহুমূল্য চন্দ্রাতপ—উহাতে প্রতিমার শোভা বর্ধন হইয়াছে। মন্দির দুহারা দালানটির কয়েকটি কুকুর সুদৃঢ় কপাট দ্বারা সুরক্ষিত। একটি কপাটের কাছে চৌকিদার বসিয়া আছে। মন্দিরের দ্বারে পঞ্চপাত্রে শ্রীচরণামৃত। মন্দিরশীর্ষ নবরত্ন মণ্ডিত। নীচের থাকে চারিটি চূড়া, মধ্যের থাকে চারিটি ও সর্বোপরি একটি। একটি চূড়া এখন ভাঙ্গিয়া রহিয়াছে। এই মন্দিরে এবং রাধাকান্তের ঘরে পরমহংসদেব পূজা করিয়াছিলেন।

[নাটমন্দির]

কালীমন্দিরের সম্মুখে অর্থাৎ দক্ষিণদিকে সুন্দর সুবিস্তৃত নাটমন্দির। নাটমন্দিরের উপর শ্রীশ্রীমহাদেব ও নন্দী ও ভৃঙ্গী। মার মন্দিরে প্রবেশ করিবার পূর্বে ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ মহাদেবকে হাতজোড় করিয়া প্রণাম করিতেন—যেন তাঁহার আজ্ঞা লইয়া মন্দিরে প্রবেশ করিতেছেন। নাটমন্দিরের উত্তর-দক্ষিণে স্থাপিত দুই সারি অতি উচ্চ স্তম্ভ। তদুপরি ছাদ। স্তম্ভ-শ্রেণীর পূর্বদিকে ও পশ্চিমদিকে নাটমন্দিরের দুই পক্ষ। পূজার সময়, মহোৎসবকালে, বিশেষতঃ কালীপূজার দিন নাটমন্দিরে যাত্রা হয়। এই নাটমন্দিরে রাসমণির জামাতা মথুরবাবু শ্রীরামকৃষ্ণের উপদেশ ধান্যমেরু করিয়াছিলেন। এই নাটমন্দিরেই সর্বসমক্ষে ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ ভৈরবী পূজা করিয়াছিলেন।

[ভাঁড়ার, ভোগঘর, অতিথিশালা, বলিস্থান]

চক্‌মিলান উঠানের পশ্চিমপার্শ্বে দ্বাদশমন্দির, আর তিন পার্শ্বে একতলা ঘর। পূর্ব পার্শ্বের ঘরগুলির মধ্যে ভাঁড়ার, লুচিঘর, বিষ্ণুর ভোগঘর,

নৈবেদ্যের ঘর, মায়ের ভোগঘর, ঠাকুরদের রান্নাঘর ও অতিথিশালা। অতিথি, সাধু, যদি অতিথিশালায় না খান, তাহা হইলে দপ্তরখানায় খাজাঞ্চীর কাছে যাইতে হয়। খাজাঞ্চী ভান্ডারীকে হুকুম দিলে সাধু ভাঁড়ার হইতে সিধা লন। নাটমন্দিরের দক্ষিণে বলিদানের স্থান।

বিষ্ণুঘরের রান্না নিরামিষ। কালীঘরের ভোগের ভিন্ন রন্ধনশালা। রন্ধনশালার সম্মুখে দাসীরা বড় বড় বঁটি লইয়া মাছ কুটিতেছে। অমাবস্যায় একটি ছাগ বলি হয়। ভোগ দুই প্রহর মধ্যে হইয়া যায়। ইতিমধ্যে অতিথি-শালায় এক এক খানা শালপাতা লইয়া সারি সারি কাঙ্গাল, বৈষ্ণব, সাধু অতিথি বসিয়া পড়ে। ব্রাহ্মণদের পৃথক স্থান করিয়া দেওয়া হয়। কর্মচারী ব্রাহ্মণদের পৃথক আসন হয়। খাজাঞ্চীর প্রসাদ তাঁহার ঘরে পোঁছাইয়া দেওয়া হয়। জানবাজারের বাবুরা আসিলে কুঠিতে থাকেন। সেইখানে প্রসাদ পাঠান হয়।

[দপ্তরখানা]

উঠানের দক্ষিণে সারি সারি ঘরগুলিতে দপ্তরখানা ও কর্মচারীদিগের থাকিবার স্থান। এখানে খাজাঞ্চী মুহুরী, সর্বদা থাকেন; আর ভান্ডারী দাস-দাসী, পুজারী, রাঁধুনী, ব্রাহ্মণঠাকুর ইত্যাদির ও দ্বারবানদের সর্বদা যাতায়াত। কোনও কোনও ঘর চাবি দেওয়া; তন্মধ্যে ঠাকুরবাড়ির আসবাব শতরঞ্চ, সামিয়ানা ইত্যাদি থাকে। এই সারির কয়েকটা ঘর পরমহংসদেবের জন্মোৎসব উপলক্ষে, ভাঁড়ার ঘর করা হইত। তাহার দক্ষিণদিকের ভূমিতে মহামহোৎসবের রান্না হইত।

উঠানের উত্তরে একতলা ঘরের শ্রেণী। তাহার ঠিক মাঝখানে দেউড়ী। চাঁদনীর ন্যায় সেখানেও দ্বারবানেরা পাহারা দিতেছে। উভয় স্থানে প্রবেশ করিবার পূর্বে বাহিরে জুতা রাখিয়া যাইতে হইবে।

[ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণের ঘর]

উঠানের ঠিক উত্তর-পশ্চিম কোণে অর্থাৎ দ্বাদশ মন্দিরের ঠিক উত্তরে শ্রীশ্রীপরমহংসদেবের ঘর। ঘরের ঠিক পশ্চিম দিকে অর্ধমন্ডালাকার একটি বারান্দা। সেই বারান্দায় শ্রীরামকৃষ্ণ পশ্চিমাস্য হইয়া গঙ্গা দর্শন করিতেন। এই বারান্দার পরেই পথ। তাহার পশ্চিমে পুষ্পোদ্যান, তৎপরে পোস্তা। তাহার পরেই পূতসলিলা সর্বতীর্থময়ী কলকলনাদিনী গঙ্গা।

[নহবৎ, বকুলতলা ও পঞ্চবটী]

পরমহংসদেবের ঘরের ঠিক উত্তরে একটি চতুষ্কোণ বারান্দা, তাহার উত্তরে উদ্যানপথ। তাহার উত্তরে আবার পুষ্পোদ্যান। তাহার পরেই নহবৎখানা।

নহবতের নীচের ঘরে তাঁহার স্বর্গীয়া পরমারাধ্যা বৃদ্ধা মাতাঠাকুরাণী ও পরে শ্রীশ্রীমা থাকিতেন। নহবতের পরেই বকুলতলা ও বকুলতলার ঘাট। এখানে পাড়ার মেয়েরা স্নান করেন। এই ঘাটে পরমহংসদেবের বৃদ্ধা মাতাঠাকুরাণীর গঙ্গালাভ হয়। ১৮৭৭ খৃষ্টাব্দ।

বকুলতলার আরও কিছু উত্তরে পঞ্চবটী। এই পঞ্চবটীর পাদমূলে বসিয়া পরমহংসদেব অনেক সাধনা করিয়াছিলেন, আর ইদানিং ভক্তসঙ্গে এখানে সর্বদা পাদচারণ করিতেন। গভীর রাত্রে সেখানে কখন কখন উঠিয়া যাইতেন। পঞ্চবটীর বৃক্ষগুলি—বট, অশ্বত্থ, নিম, আমলকী ও বিল্ব—ঠাকুর নিজের তত্ত্বাবধানে রোপণ করিয়াছিলেন। শ্রীবৃন্দাবন হইতে ফিরিয়া আসিয়া এখানে রজঃ ছড়াইয়া দিয়াছিলেন। এই পঞ্চবটীর ঠিক পূর্বগায়ে একখানি কুটীর নির্মাণ করাইয়া ভগবান শ্রীরামকৃষ্ণ তাহাতে আসিয়া অনেক ঈশ্বর চিন্তা, অনেক তপস্যা করিয়াছিলেন। এই কুটীর এক্ষণে পাকা হইয়াছে।

পঞ্চবটী মধ্যে সাবেক একটি বটগাছ আছে। তৎসঙ্গে একটি অশ্বত্থগাছ। দুইটি মিলিয়া যেন একটি হইয়াছে। বৃদ্ধ গাছটি বয়সাধিক্যবশতঃ বহু-কোটরবিশিষ্ট ও নানা পক্ষীসমাকুল ও অন্যান্য জীবেরও আবাসস্থান হইয়াছে। পাদমূলে ইষ্টকনির্মিত, সোপানযুক্ত, মণ্ডলাকারবেদীসুশোভিত। এই বেদীর উত্তর-পশ্চিমাংশে অসীন হইয়া ভগবান শ্রীরামকৃষ্ণ অনেক সাধনা করিয়াছিলেন; আর বৎসের জন্য যেমন গাভী ব্যাকুল হয়, সেইরূপ ব্যাকুল হইয়া ভগবানকে কত ডাকিতেন। আজ সেই পবিত্র আসনোপরি বটবৃক্ষের সখীবৃক্ষ অশ্বত্থের একটি ডাল ভাঙ্গিয়া পড়িয়া আছে। ডালটি একেবারে ভাঙ্গিয়া যায় নাই। মূলতরুর সঙ্গে অর্ধসংলগ্ন হইয়া আছে। বুঝি সে আসনে বসিবার এখনও কোন মহাপুরুষ জন্মেন নাই।

[ঝাউতলা, বেলতলা ও কুঠি]

পঞ্চবটীর আরও উত্তরে খানিকটা গিয়া লোহার তারের রেল আছে। সেই রেলের ওপরে ঝাউতলা। সারি সারি চারিটি ঝাউগাছ। ঝাউতলা দিয়া পূর্বদিকে খানিকটা গিয়া বেলতলা। এখানেও পরমহংসদেব অনেক কঠিন সাধনা করিয়াছিলেন। ঝাউতলা ও বেলতলার পরেই উন্নত প্রাচীর। তাহারই উত্তরে গভর্ণমেণ্টের বারুদঘর।

উঠানের দেউড়ি হইতে উত্তর মুখে বহির্গত হইয়া দেখা যায় সম্মুখে দ্বিতল কুঠি। ঠাকুরবাড়িতে আসিলে রাণী রাসমণি, তাঁহার জামাই মথুরবাবু প্রভৃতি এই কুঠিতে থাকিতেন। তাঁহাদের জীবদ্দশায় পরমহংসদেব এই কুঠির বাড়ির নীচের পশ্চিমের ঘরে থাকিতেন। এই ঘর হইতে বকুলতলার ঘাটে যাওয়া যায় ও বেশ গঙ্গা দর্শন হয়।

[বাসনমাজার ঘাট, গাজীতলা ও দুই ফটক]

উঠানের দেউড়ি ও কুঠির মধ্যবর্তী যে পথ সেই পথ ধরিয়া পূর্বদিকে যাইতে যাইতে ডানদিকে একটি বাঁধা ঘাটবিশিষ্ট সুন্দর পুষ্করিণী। মা-কালীর মন্দিরের ঠিক পূর্বদিকে এই পুকুরের একটি বাসনমাজার ঘাট ও উল্লিখিত পথের অনতিদূরে আর একটি ঘাট। পথপার্শ্বস্থিত ঐ ঘাটের নিকট একটি গাছ আছে, তাহাকে গাজীতলা বলে। ঐ পথ ধরিয়া আর একটু পূর্বমুখে যাইলে আবার একটি দেউড়ি—বাগান হইতে বাহিরে আসিবার সদর ফটক। এই ফটক দিয়া আলমবাজার বা কলিকাতার লোক যাতায়াত করেন। দক্ষিণেশ্বরের লোক খিড়কী ফটক দিয়া আসেন। কলিকাতার লোক প্রায়ই এই সদর ফটক দিয়া কালীবাড়িতে প্রবেশ করেন। সেখানেও দ্বারবান বসিয়া পাহারা দিতেছে। কলিকাতা হইতে পরমহংসদেব যখন গভীর রাত্রে কালীবাড়িতে ফিরিয়া আসিতেন, তখন এই দেউড়ির দ্বারবান চাবি খুলিয়া দিত। পরমহংসদেব দ্বারবানকে ডাকিয়া ঘরে লইয়া যাইতেন ও লুচিমিষ্টান্নাদি ঠাকুরের প্রসাদ তাহাকে দিতেন।

[হাঁসপুকুর, আস্তাবল, গোশালা ও পুষ্পোদ্যান]

পঞ্চবটীর পূর্বদিকে আর একটি পুষ্করিণী—নাম হাঁসপুকুর। ঐ পুষ্করিণীর উত্তর-পূর্ব কোণে আস্তাবল ও গোশালা। গোশালার পূর্বদিকে খিড়কী ফটক। এই ফটক দিয়া দক্ষিণেশ্বরের গ্রামে যাওয়া যায়। যে সকল পূজারী বা অন্য কর্মচারী পরিবার আনিয়া দক্ষিণেশ্বরে রাখিয়াছেন, তাঁহারা বা তাঁহাদের ছেলেমেয়েরা এই পথ দিয়া যাতায়াত করেন।

উদ্যানের দক্ষিণ প্রান্ত হইতে উত্তরে বকুলতলা ও পঞ্চবটী পর্যন্ত গঙ্গার ধার দিয়া পথ গিয়াছে। সেই পথের দুই পার্শ্বে পুষ্পবৃক্ষ। আবার কুঠির দক্ষিণ পার্শ্ব দিয়া পূর্ব-পশ্চিমে যে পথ গিয়াছে তাহারও দুই পার্শ্বে পুষ্পবৃক্ষ। গাজীতলা হইতে গোশালা পর্যন্ত কুঠি ও হাঁসপুকুরের পূর্বদিকে যে ভূমিখণ্ড, তাহার মধ্যেও নানাজাতীয় পুষ্পবৃক্ষ, ফলের বৃক্ষ ও একটি পুষ্করিণী আছে।

অতি প্রত্যূষে পূর্বদিক রক্তিমবর্ণ হইতে না হইতে যখন মঙ্গলারতির সুমধুর শব্দ হইতে থাকে ও সানাইয়ে প্রভাতী রাগরাগিণী বাজিতে থাকে, তখন হইতেই মা কালীর বাগানে পুষ্পচয়ন আরম্ভ হয়। গঙ্গাতীরে পঞ্চবটীর সম্মুখে বিল্ববৃক্ষ ও সৌরভপূর্ণ গুলচী ফুলের গাছ। মল্লিকা, মাধবী ও গুলচী ফুল শ্রীরামকৃষ্ণ বড় ভালবাসিতেন। মাধবীলতা শ্রীবৃন্দাবনধাম হইতে আনিয়া তিনি পুঁতিয়া দিয়াছেন। হাঁসপুকুর ও কুঠির পূর্বদিকে যে ভূমিখণ্ড তন্মধ্যে পুকুরের ধারে চম্পক বৃক্ষ। কিয়দ্দূরে ঝুমকাজবা,

গোলাপ ও কাঞ্চনপুষ্প। বেড়ার উপরে অপরাজিতা—নিকটে জুঁই কোথাও বা শেফালিকা। দ্বাদশ মন্দিরের পশ্চিম গায়ে বরাবর শ্বেতকরবী, রক্তকরবী, গোলাপ, জুঁই, বেল। ক্বচিৎ বা ধুস্তুরপুষ্প—মহাদেবের পূজা হইবে। মাঝে মাঝে তুলসী—উচ্চ ইষ্টক নির্মিত মঞ্চের উপর রোপণ করা হইয়াছে। নহবতের দক্ষিণ দিকে বেল, জুঁই, গন্ধরাজ, গোলাপ। বাঁধাঘাটের অনতিদূরে পদ্মকরবী ও কোকিলাক্ষ। পরমহংসদেবের ঘরের পাশে দুই-একটি কৃষ্ণচূড়ার বৃক্ষ ও আশে-পাশে বেল, জুঁই, গন্ধরাজ, গোলাপ, মল্লিকা, জবা, শ্বেতকরবী, রক্তকরবী, আবার পঞ্চমুখী জবা, চীন জাতীয় জবা।

শ্রীরামকৃষ্ণও এককালে পুষ্পচয়ন করিতেন। একদিন পঞ্চবটীর সম্মুখস্থ একটি বিল্ববৃক্ষ হইতে বিল্বপত্র চয়ন করিতেছিলেন। বিল্বপত্র তুলিতে গিয়া গাছের খানিকটা ছাল উঠিয়া আসিল। তখন তাঁহার এইরূপ অনুভূতি হইলে যে, যিনি সর্বভূতে আছেন তাঁর না জানি কত কষ্ট হইল। অমনি আর বিল্বপত্র তুলিতে পারিলেন না। আর একদিন পুষ্পচয়ন করিবার জন্য বিচরণ করিতেছিলেন, এমন সময় কে যেন দপ করিয়া দেখাইয়া দিল যে, কুসুমিত বৃক্ষগুলি যেন এক একটি ফুলের তোড়া, এই বিরাট শিবমূর্তির উপর শোভা পাইতেছে—যেন তাঁহারই অহর্নিশ পূজা হইতেছে। সেইদিন হইতে আর ফুল তোলা হইল না।

[ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণের ঘরের বারান্দা]

পরমহংসদেবের ঘরের পূর্বদিকে বরাবর বারান্দা। বারান্দার এক ভাগ উঠানের দিকে, অর্থাৎ দক্ষিণমুখো। এ বারান্দায় পরমহংসদেব প্রায় ভক্তসঙ্গে বসিতেন ও ঈশ্বর সম্বন্ধীয় কথা কহিতেন বা সংকীর্তন করিতেন। এই পূর্ব বারান্দার অপরার্ধ উত্তরমুখো। এ বারান্দায় ভক্তেরা তাঁহার কাছে আসিয়া তাঁহার জন্মোৎসব করিতেন, তাঁহার সঙ্গে বসিয়া সংকীর্তন করিতেন; আবার তিনি তাঁহাদের সহিত একসঙ্গে বসিয়া কতবার প্রসাদ গ্রহণ করিতেন। এই বারান্দায় শ্রীযুক্ত কেশবচন্দ্র সেন শিষ্যসমভিব্যাহারে আসিয়া তাঁহার সঙ্গে কত আলাপ করিয়াছেন; আমোদ করিতে করিতে মুড়ি, নারিকেল, লুচি, মিষ্টান্নাদি একসঙ্গে বসিয়া খাইয়া গিয়াছেন। এই বারান্দায় নরেন্দ্রকে দর্শন করিয়া শ্রীরামকৃষ্ণ সমাধিস্থ হইয়াছিলেন।

[আনন্দ নিকেতন]

কালীবাড়ি আনন্দ-নিকেতন হইয়াছে। রাধাকান্ত, ভবতারিণী ও মহাদেবের নিত্যপূজা, ভোগরাগাদি ও অতিথিসেবা। একদিকে ভাগীরথীর বহুদূর পর্যন্ত পবিত্র দর্শন। আবার সৌরভাকুল সুন্দর নানাবর্ণরঞ্জিত কুসুমবিশিষ্ট, মনোহর পুষ্পোদ্যান। তাহাতে আবার একজন চেতনমানুষ

অহর্নিশি ঈশ্বরপ্রেমে মাতোয়ারা হইয়া আছেন। আনন্দময়ীর নিত্য উৎসব। নহবৎ হইতে রাগ-রাগিণী সর্বদা বাজিতেছে। একবার প্রভাতে বাজিতে থাকে মঙ্গলারতির সময়। তারপর বেলা নয়টার সময়—যখন পূজা আরম্ভ হয়। তারপর বেলা দ্বিপ্রহরের সময়—তখন ভোগ আরতির পর ঠাকুর-ঠাকুরাণীরা বিশ্রাম করিতে যান। আবার বেলা চারিটার সময় নহবৎ বাজিতে থাকে—তখন তাঁহারা বিশ্রাম লাভের পর গাত্রোত্থান করিতেছেন ও মুখ ধুইতেছেন। তারপর আবার সন্ধ্যারতির সময়। অবশেষে রাত নয়টার সময় যখন শীতলের পর ঠাকুর শয়ন হয়, তখন আবার নহবৎ বাজিতে থাকে।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

তব কথামৃতং তপ্তজীবনম্, কবিভিরীড়িতং কল্মষাপহম্।
শ্রবণমঙ্গলং শ্রীমদাততম্, ভুবি গৃণন্তি যে ভূরিদা জনাঃ॥
[শ্রীমদ্ভাগবত, গোপীগীতা, রাসপঞ্চাধ্যায়

প্রথম দর্শন—১৮৮২ ফেব্রুয়ারী মাস

গঙ্গাতীরে দক্ষিণেশ্বরে কালীবাড়ি। মা-কালীর মন্দির। বসন্তকাল, ইংরাজী ১৮৮২ খৃষ্টাব্দের ফেব্রুয়ারী মাস। ঠাকুরের জন্মোৎসবের কয়েক দিন পরে। শ্রীযুক্ত কেশব সেন ও শ্রীযুক্ত জোসেফ্ কুক্ সঙ্গে ২৩শে ফেব্রুয়ারী বৃহস্পতিবার ঠাকুর স্টীমারে বেড়াইয়াছিলেন—তাহারই কয়েক দিন পরে। সন্ধ্যা হয় হয়। ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণের ঘরে মাষ্টার আসিয়া উপস্থিত। এই প্রথম দর্শন।* দেখিলেন, একঘর লোক নিস্তব্ধ হইয়া তাঁহার কথামৃত পান করিতেছেন। ঠাকুর তক্তপোশে বসিয়া পূর্বাস্য হইয়া সহাস্যবদনে হরিকথা কহিতেছেন। ভক্তেরা মেঝেয় বসিয়া আছেন।

[কর্মত্যাগ কখন?]

মাষ্টার দাঁড়াইয়া অবাক্ হইয়া দেখিতেছেন। তাঁহার বোধ হইল যেন সাক্ষাৎ শুকদেব ভগবৎ কথা কহিতেছেন, আর সর্বতীর্থের সমাগম হইয়াছে! অথবা যেন শ্রীচৈতন্য পুরীক্ষেত্রে রামানন্দ স্বরূপাদি ভক্তসঙ্গে বসিয়া আছেন ও ভগবানের নাম গুণকীর্তন করিতেছেন। ঠাকুর বলিতেছেন, "যখন একবার হরি বা একবার রাম নাম করলে রোমাঞ্চ হয়, অশ্রুপাত হয়, তখন নিশ্চয়ই জেনো

---

* শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণকথামৃত গ্রন্থকারের প্রথম, দ্বিতীয়, তৃতীয় ও চতুর্থ দর্শনের তারিখ প্রথমভাগে উল্লেখ না থাকিলেও পঞ্চম ভাগ প্রণয়নকালে তাহার সঙ্কেত তিনি দিয়াছেন। ২৩শে ফেব্রুয়ারীর কয়েকদিন পরে রবিবার প্রথম দর্শন। তৃতীয় দর্শন হয় রবিবার—চতুর্থ দর্শন হয় তৃতীয় দর্শনের পরের দিন সোমবার। চতুর্থ দর্শনের দিন শ্রীরামকৃষ্ণ

যে সন্ধ্যাদি কর্ম—আর করতে হবে না। তখন কর্মত্যাগের অধিকার হয়েছে—কর্ম আপনা-আপনি ত্যাগ হ'য়ে যাচ্ছে। তখন কেবল রামনাম, কি হরিনাম কি শুদ্ধ ওঁকার জপলেই হল।" আবার বলিলেন, "সন্ধ্যা গায়ত্রীতে লয় হয়। গায়ত্রী আবার ওঁকারে লয় হয়।"

মাষ্টার সিধুর* সঙ্গে বরাহনগর এ বাগানে ও বাগানে বেড়াইতে বেড়াইতে এখানে আসিয়া পড়িয়াছেন। আজ রবিবার,—২৬শে ফেব্রুয়ারী, ১৫ই ফাল্গুন—অবসর আছে, তাই বেড়াতে এসেছেন; শ্রীযুক্ত প্রসন্ন বাঁড়ুয্যের বাগানে কিয়ৎক্ষণ পূর্বে বেড়াইতেছিলেন। তখন সিধু বলিয়াছিলেন, 'গঙ্গার ধারে একটি চমৎকার বাগান আছে, সে বাগানটি কি দেখতে যাবেন? সেখানে একজন পরমহংস আছেন।'

বাগানে সদর ফটক দিয়া ঢুকিয়াই মাষ্টার ও সিধু বরাবর ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণের ঘরে আসিলেন। মাষ্টার অবাক্ হইয়া দেখিতে দেখিতে ভাবিতেছেন, 'আহা কি সুন্দর স্থান! কি সুন্দর মানুষ! কি সুন্দর কথা! এখান থেকে নড়তে ইচ্ছা করছে না।' কিয়ৎক্ষণ পরে মনে মনে বলিতে লাগিলেন, 'একবার দেখি কোথায় এসেছি। তারপর এখানে এসে বসবো।'

সিধুর সঙ্গে ঘরের বাহিরে আসিতে না আসিতে আরতির মধুর শব্দ হইতে লাগিল। এককালে কাঁসর, ঘণ্টা, খোল, করতাল বাজিয়া উঠিল। বাগানের দক্ষিণ সীমান্ত হইতে নহবতের মধুর শব্দ আসিতে লাগিল। সেই শব্দ ভাগীরথীবক্ষে যেন ভ্রমণ করিতে করিতে অতি দূরে গিয়া কোথায় মিশিয়া যাইতে লাগিল। মন্দ মন্দ কুসুমগন্ধবাহী বসন্তানিল! সবে জ্যোৎস্না উঠিতেছে। ঠাকুরদের আরতির যেন চতুর্দিকে আয়োজন হইতেছে! মাষ্টার দ্বাদশ শিবমন্দিরে, শ্রীশ্রীরাধাকান্তের মন্দিরে ও শ্রীশ্রীভবতারিণীর মন্দিরে আরতি দর্শন করিয়া পরম প্রীতিলাভ করিলেন। সিধু বলিলেন, 'এটি রাসমণির দেবালয়। এখানে নিত্যসেবা। অনেক অতিথি, কাঙ্গাল আসে।'

কথা কহিতে কহিতে ভবতারিণীর মন্দির হইতে বৃহৎ পাকা উঠানের মধ্য দিয়া পাদচারণ করিতে করিতে দুইজনে আবার ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণের ঘরের সম্মুখে আসিয়া পড়িলেন। এবার দেখিলেন, ঘরের দ্বার দেওয়া।

মাষ্টার মহাশয়কে বলরাম বসুর বাটিতে যাইতে আদেশ করেন। বলরাম বসুর বাটিতে শ্রীরামকৃষ্ণের শুভাগমন হয় ১১ই মার্চ শনিবার—(পঞ্চম ভাগ, প্রথম খণ্ড, প্রথম পরিচ্ছেদ)। ২৩শে ফেব্রুয়ারী হইতে ১১ই মার্চ, মধ্যে দুইটি রবিবার—২৬শে ফেব্রুয়ারী ও ৫ই মার্চ। গ্রন্থকারের এই ঘটনাগুলির উপর নির্ভর করিয়া—প্রথম দর্শন—২৬শে ফেব্রুয়ারী, দ্বিতীয় দর্শন—২৭শে ফেব্রুয়ারী হইতে ৪ঠা মার্চের মধ্যে যে কোন দিন, তৃতীয় দর্শন—৫ই মার্চ, চতুর্থ দর্শন—৬ই মার্চ লিপিবদ্ধ করা হইল। —প্রকাশক।

* শ্রীযুক্ত সিদ্ধেশ্বর মজুমদার, উত্তর বরাহনগরে বাড়ি।

এইমাত্র ধুনা দেওয়া হইয়াছে। মাষ্টার ইংরাজী পড়িয়াছেন, ঘরে হঠাৎ প্রবেশ করিতে পারিলেন না। দ্বারদেশে বৃন্দে (ঝি) দাঁড়াইয়াছিল। জিজ্ঞাসা করিলেন, 'হাঁগা, সাধুটি কি এখন এর ভিতর আছেন?'

বৃন্দে—হাঁ, এই ঘরের ভিতর আছেন।

মাষ্টার—ইনি এখানে কতদিন আছেন?

বৃন্দে—তা অনেকদিন আছেন—

মাষ্টার—আচ্ছা, ইনি কি খুব বই-টই পড়েন?

বৃন্দে—আর বাবা বই টই! সব ওঁর মুখে!

মাষ্টার সবে পড়াশুনা ক'রে এসেছেন। ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ বই পড়েন না শুনে আরও অবাক্ হলেন।

মাষ্টার—আচ্ছা, ইনি বুঝি এখন সন্ধ্যা করবেন?—আমরা কি এ ঘরের ভিতর যেতে পারি?—তুমি একবার খবর দিবে?

বৃন্দে—তোমরা যাওনা বাবা। গিয়ে ঘরে বসো।

তখন তাঁহারা ঘরে প্রবেশ করিয়া দেখেন, ঘরে আর অন্য কেহ নাই। ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ ঘরে একাকী তক্তপোশের উপর বসিয়া আছেন। ঘরে ধুনা দেওয়া হইয়াছে ও সমস্ত দরজা বন্ধ। মাষ্টার প্রবেশ করিয়া বদ্ধাঞ্জলি হইয়া প্রণাম করিলেন। ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ বসিতে অনুজ্ঞা করিলে তিনি ও সিধু মেঝেতে বসিলেন। ঠাকুর জিজ্ঞাসা করিলেন, "কোথায় থাকো, কি করো, বরাহনগরে কি করতে এসেছ, ইত্যাদি।" মাষ্টার সমস্ত পরিচয় দিলেন। কিন্তু দেখিতে লাগিলেন যে, ঠাকুর মাঝে মাঝে যেন অন্যমনস্ক হইতেছেন। পরে শুনিলেন, এরই নাম ভাব। যেমন কেহ ছিপ হাতে করিয়া মাছ ধরিতে বসিয়াছে। মাছ আসিয়া টোপ খাইতে থাকিলে ফাতনা যখন নড়ে, সে ব্যক্তি যেমন শশব্যস্ত হইয়া ছিপ হাতে করিয়া ফাতনার দিকে, একদৃষ্টে একমনে চাহিয়া থাকে, কাহারও সহিত কথা কয় না; এ ঠিক সেইরূপ ভাব। পরে শুনিলেন ও দেখিলেন, ঠাকুরের সন্ধ্যার পর এইরূপ ভাবান্তর হয়, কখন কখন তিনি একেবারে বাহ্যশূন্য হন!

মাষ্টার—আপনি এখন সন্ধ্যা করবেন, তবে এখন আমরা আসি।

শ্রীরামকৃষ্ণ (ভাবস্থ)—না—সন্ধ্যা—তা এমন কিছু নয়।

আর কিছু কথাবার্তার পর মাষ্টার প্রণাম করিয়া বিদায় গ্রহণ করিলেন। ঠাকুর বলিলেন, "আবার এসো।"

মাষ্টার ফিরিবার সময় ভাবিতে লাগিলেন, "এ সৌম্য কে?—যাঁহার কাছে ফিরিয়া যাইতে ইচ্ছা করিতেছে—বই না পড়িলে কি মানুষ মহৎ হয়?—কি আশ্চর্য, আবার আসিতে ইচ্ছা হইতেছে। ইনিও বলিয়াছেন, 'আবার এসো!' কাল কি পরশু সকালে আসিব।"

তৃতীয় পরিচ্ছেদ

অখণ্ডমণ্ডলাকারং ব্যাপ্তং যেন চরাচরম্
তৎপদং দর্শিতং যেন তস্মৈ শ্রীগুরবে নমঃ॥

দ্বিতীয় দর্শন ও গুরুশিষ্য-সংবাদ

দ্বিতীয় দর্শন সকাল বেলা, আটটার সময়। ঠাকুর তখন কামাতে যাচ্ছেন। এখনও একটু শীত আছে। তাই তাঁহার গায়ে মোলেস্কিনের র‍্যাপার। র‍্যাপারের কিনারা শালু দিয়ে মোড়া। মাষ্টারকে দেখিয়া বলিলেন, তুমি এসেছ? আচ্ছা, এখানে বসো।

এ কথা দক্ষিণ-পূর্ব বারান্দায় হইতেছিল। নাপিত উপস্থিত। সেই বারান্দায় ঠাকুর কামাইতে বসিলেন ও মাঝে মাঝে মাষ্টারের সহিত কথা কহিতে লাগিলেন। গায়ে ঐরূপ র‍্যাপার, পায়ে চটি জুতা, সহাস্যবদন। কথা কহিবার সময় কেবল একটু তোত্‌লা।

শ্রীরামকৃষ্ণ (মাষ্টারের প্রতি)—হাঁগা, তোমার বাড়ি কোথায়?

মাষ্টার—আজ্ঞা, কলিকাতায়।

শ্রীরামকৃষ্ণ—এখানে কোথায় এসেছ?

মাষ্টার—এখানে বরাহনগরে বড় দিদির বাড়ি আসিয়াছি। ঈশান কবিরাজের বাটী।

শ্রীরামকৃষ্ণ—ওহ্, ঈশেনের বাড়ি।

[কেশবচন্দ্র ও মার কাছে ঠাকুরের ক্রন্দন]

শ্রীরামকৃষ্ণ—হ্যাঁগা কেশব কেমন আছে? বড় অসুখ হয়েছিল।

মাষ্টার—আমিও শুনেছিলাম বটে, এখন বোধ হয় ভাল আছেন।

শ্রীরামকৃষ্ণ—আমি আবার কেশবের জন্যে মার কাছে ডাব চিনি মেনেছিলুম। শেষরাত্রে ঘুম ভেঙ্গে যেতো, আর মার কাছে কাঁদতুম, বলতুম, মা, কেশবের অসুখ ভাল ক'রে দাও; কেশব না থাকলে আমি কলকাতায় গেলে কার সঙ্গে কথা কব? তাই ডাব-চিনি মেনেছিলুম।

"হ্যাঁগা, কুক্ সাহেব নাকি একজন এসেছে? সে নাকি লেকচার দিচ্ছে? আমাকে কেশব জাহাজে তুলে নিয়ে গিছিল। কুক্ সাহেবও ছিল?"

মাষ্টার—আজ্ঞা, এই রকম শুনেছিলুম বটে, কিন্তু আমি তাঁর লেকচার শুনি নাই। আমি তাঁর বিষয় বিশেষ জানি না।

[গৃহস্থ ও পিতার কর্তব্য]

শ্রীরামকৃষ্ণ—প্রতাপের ভাই এসেছিল। এখানে কয়দিন ছিল। কাজ-কর্ম নাই। বলে, আমি এখানে থাকব। শুনলাম, মাগছেলে সব শ্বশুরবাড়িতে

রেখেছে। অনেকগুলি ছেলেপিলে। আমি বকলুম, দেখ দেখি ছেলে-পিলে হয়েছে; তাদের কি আবার ও-পাড়ার লোক এসে খাওয়াবে-দাওয়াবে, মানুষ করবে? লজ্জা করে না যে, মাগ-ছেলেদের আর একজন খাওয়াচ্ছে, আর তাদের শ্বশুরবাড়ি ফেলে রেখেছে। আমরা অনেক বকলুম, আর কর্মকাজ খুঁজে নিতে বললুম। তবে এখান থেকে যেতে চায়।

চতুর্থ পরিচ্ছেদ

অজ্ঞানতিমিরান্ধস্য জ্ঞানাঞ্জনশলাকয়া।
চক্ষুরুন্মীলিতং যেন তস্মৈ শ্রীগুরবে নমঃ॥

মাষ্টারকে তিরস্কার ও তাঁহার অহঙ্কার চূর্ণকরণ

শ্রীরামকৃষ্ণ (মাষ্টারের প্রতি)—তোমার কি বিবাহ হ'য়েছে?

মাষ্টার—আজ্ঞে হাঁ।

শ্রীরামকৃষ্ণ (শিহরিয়া)—ওরে রামলাল*! যাঃ বিয়ে ক'রে ফেলেছে।

মাষ্টার ঘোরতর অপরাধীর ন্যায় অবাক হইয়া অবনত মস্তকে চুপ করিয়া বসিয়া রহিলেন। ভাবিতে লাগিলেন, বিয়ে করা কি এত দোষ?

ঠাকুর আবার জিজ্ঞাসা করিলেন, তোমার কি ছেলে হ'য়েছে?

মাষ্টারের বুক ঢিপ্ ঢিপ্ করিতেছে। ভয়ে ভয়ে বলিলেন, আজ্ঞে—ছেলে হ'য়েছে। ঠাকুর আবার আক্ষেপ করিয়া বলিতেছেন, যাঃ ছেলে হয়ে গেছে! তিরস্কৃত হইয়া তিনি স্তব্ধ হইয়া রহিলেন।

তাঁহার অহঙ্কার চূর্ণ হইতে লাগিল। কিয়ৎক্ষণ পরে ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ আবার কৃপাদৃষ্টি করিয়া সস্নেহে বলিতে লাগিলেন, "দেখ, তোমার লক্ষণ ভাল ছিল, আমি কপাল, চোখ এ সব দেখলে বুঝতে পারি। আচ্ছা, তোমার পরিবার কেমন? বিদ্যাশক্তি না অবিদ্যাশক্তি?"

[জ্ঞান কাহাকে বলে? প্রতিমা পূজা]

মাষ্টার—আজ্ঞা ভাল, কিন্তু অজ্ঞান।

শ্রীরামকৃষ্ণ (বিরক্ত হইয়া)—আর তুমি জ্ঞানী?

তিনি জ্ঞান কাহাকে বলে, অজ্ঞান কাহাকে বলে, এখনও জানেন না। এখন এই পর্যন্ত জানিতেন যে, লেখাপড়া শিখিলে ও বই পড়িতে পারিলে জ্ঞান হয়। এই ভ্রম পরে দূর হইয়াছিল। তখন শুনিলেন যে, ঈশ্বরকে জানার নাম জ্ঞান, ঈশ্বরকে না জানার নামই অজ্ঞান। ঠাকুর বলিলেন—"তুমি কি জ্ঞানী?" মাষ্টারের অহঙ্কারে আবার বিশেষ আঘাত লাগিল।

---

* শ্রীযুক্ত রামলাল, ঠাকুরের ভ্রাতুষ্পুত্র ও কালীবাড়ির পূজারী।

শ্রীরামকৃষ্ণ—আচ্ছা, তোমার 'সাকারে বিশ্বাস, না নিরাকারে ?'

মাষ্টার (অবাক হইয়া স্বগতঃ)—'সাকারে' বিশ্বাস থাকলে কি নিরাকারে বিশ্বাস হয়? ঈশ্বর নিরাকার, এ বিশ্বাস থাকিলে ঈশ্বর সাকার এ বিশ্বাস কি হইতে পারে? বিরুদ্ধ অবস্থা দুটাই কি সত্য হইতে পারে? সাদা জিনিস—দুধ, কি আবার কালো হ'তে পারে?

মাষ্টার—আজ্ঞা নিরাকার, আমার এইটি ভাল লাগে।

শ্রীরামকৃষ্ণ—তা বেশ। একটাতে বিশ্বাস থাকলেই হ'ল। নিরাকারে বিশ্বাস, তাতো ভালোই। তবে এ বুদ্ধি ক'রো না যে,—এইটি কেবল সত্য আর সব মিথ্যা। এইটি জেনো যে, নিরাকারও সত্য আবার সাকারও সত্য। তোমার যেটি বিশ্বাস, সেইটিই ধ'রে থাকবে।

মাষ্টার দুই সত্য এই কথা বার বার শুনিয়া অবাক্ হইয়া রহিলেন। একথা তো তাঁহার পুঁথিগত বিদ্যার মধ্যে নাই।

তাঁহার অহঙ্কার তৃতীয়বার চূর্ণ হইতে লাগিল। কিন্তু এখনও সম্পূর্ণ হয় নাই। তাই আবার একটু তর্ক করিতে অগ্রসর হইলেন।

মাষ্টার—আজ্ঞা, তিনি সাকার, এ বিশ্বাস যেন হ'ল! কিন্তু মাটির প্রতিমা তিনি ত ন'ন—

শ্রীরামকৃষ্ণ—মাটি কেন গো। চিন্ময়ী প্রতিমা।

মাষ্টার 'চিন্ময়ী প্রতিমা', বুঝিতে পারিলেন না! বলিলেন আচ্ছা যারা মাটির প্রতিমা পূজা করে, তাদের তো বুঝিয়ে দেওয়া উচিত যে মাটির প্রতিমা ঈশ্বর নয়, আর প্রতিমার সম্মুখে ঈশ্বরকে উদ্দেশ ক'রে পূজা করো; মাটিকে পূজা করা উচিত নয়।

[লেক্‌চার (Lecture) ও ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ]

শ্রীরামকৃষ্ণ (বিরক্ত হইয়া)—তোমাদের কলকাতার লোকের ওই এক। **কেবল লেক্‌চার দেওয়া, আর বুঝিয়ে দেওয়া। আপনাকে কে বোঝায় তার ঠিক নাই।** তুমি বুঝাবার কে? যাঁর জগৎ, তিনি বুঝাবেন। যিনি এই জগৎ ক'রেছেন, চন্দ্র, সূর্য, ঋতু, মানুষ, জীব-জন্তু ক'রেছেন; জীব-জন্তুদের খাবার উপায়, পালন করবার জন্য মা-বাপ ক'রেছেন, মা-বাপের স্নেহ ক'রেছেন তিনিই বুঝাবেন। তিনি এত উপায় ক'রেছেন, আর এ উপায় ক'রবেন না? যদি বুঝাবার দরকার হয় তিনিই বুঝাবেন। তিনি ত অন্তর্যামী। যদি ঐ মাটির প্রতিমা পূজা করাতে কিছু ভুল হ'য়ে থাকে, তিনি কি জানেন না—তাঁকেই ডাকা হচ্ছে? তিনি ঐ পূজাতেই সন্তুষ্ট হন। ওর জন্য তোমার মাথা ব্যথা কেন? তুমি নিজের যাতে জ্ঞান হয়, ভক্তি হয়, তার চেষ্টা কর।

এইবার তাঁহার অহঙ্কার বোধ হয় একেবারে চূর্ণ হইল।

তিনি ভাবিতে লাগিলেন ইনি যা বলেছেন তাতো ঠিক! আমার বুঝাতে যাবার কি দরকার। আমি কি ঈশ্বরকে জেনেছি—না আমার তাঁর উপর ভক্তি হ'য়েছে। 'আপনি শুতে স্থান পায় না, শঙ্করাকে ডাকে।' জানি না, শুনি না, পরকে বুঝাতে যাওয়া বড়ই লজ্জার কথা ও হীনবুদ্ধির কাজ! একি অঙ্কশাস্ত্র, না ইতিহাস, না সাহিত্য যে পরকে বুঝাব? এ যে ঈশ্বরতত্ত্ব! ইনি যা বল্‌ছেন, মনে বেশ লাগছে।

ঠাকুরের সহিত তাঁহার এই প্রথম ও শেষ তর্ক।

শ্রীরামকৃষ্ণ—তুমি মাটির প্রতিমা পূজা বল্‌ছিলে। যদি মাটিরই হয়, সে পূজাতে প্রয়োজন আছে। নানা রকম পূজা ঈশ্বরই আয়োজন ক'রেছেন। যার জগৎ তিনিই এ সব ক'রেছেন—অধিকারী ভেদে। যার যা পেটে সয়, মা সেইরূপ খাবার বন্দোবস্ত করেন।

"এক মার পাঁচ ছেলে। বাড়িতে মাছ এসেছে। মা মাছের নানা রকম ব্যঞ্জন ক'রেছেন—যার যা পেটে সয়! কারও জন্য মাছের পোলোয়া, কারও জন্য মাছের অম্বল, মাছের চড়্‌চড়ি, মাছ ভাজা, এই সব ক'রেছেন। যেটি যার ভাল লাগে। যেটি যার পেটে সয়—বুঝলে?"

মাষ্টার—আজ্ঞে হাঁ।

পঞ্চম পরিচ্ছেদ

সংসারার্ণবঘোরে যঃ কর্ণধারস্বরূপকঃ।
নমোঽস্তু রামকৃষ্ণায় তস্মৈ শ্রীগুরবে নমঃ॥

ভক্তির উপায়

মাষ্টার (বিনীতভাবে)—ঈশ্বরে কি ক'রে মন হয়?

শ্রীরামকৃষ্ণ—ঈশ্বরের নাম গুণ গান সর্বদা ক'রতে হয়। আর সৎসঙ্গ—ঈশ্বরের ভক্ত বা সাধু, এঁদের কাছে মাঝে মাঝে যেতে হয়। সংসারের ভিতর ও বিষয় কাজের ভিতর রাতদিন থাকলে ঈশ্বরে মন হয় না! মাঝে মাঝে নির্জনে গিয়ে তাঁর চিন্তা করা বড় দরকার। প্রথম অবস্থায় মাঝে মাঝে নির্জন না হ'লে ঈশ্বরে মন রাখা বড়ই কঠিন।

"যখন চারাগাছ থাকে, তখন তার চারিদিকে বেড়া দিতে হয়। বেড়া না দিলে ছাগল-গরুতে খেয়ে ফেলে!

"ধ্যান ক'রবে মনে, কোণে ও বনে। আর সর্বদা সদসৎ বিচার ক'রবে। ঈশ্বরই সৎ, কিনা নিত্যবস্তু, আর সব অসৎ, কিনা অনিত্য। এই বিচার ক'রতে ক'রতে অনিত্য বস্তু মন থেকে ত্যাগ ক'রবে।"

মাষ্টার (বিনীতভাবে)—সংসারে কি রকম ক'রে থাকতে হবে?

[গৃহস্থ সন্ন্যাস—উপায়—নির্জনে সাধন]

শ্রীরামকৃষ্ণ—সব কাজ করবে কিন্তু মন ঈশ্বরেতে রাখবে। স্ত্রী, পুত্র, বাপ, মা, সকলকে নিয়ে থাকবে ও সেবা করবে। যেন কত আপনার লোক। কিন্তু মনে জানবে যে তারা তোমার কেউ নয়।

"বড় মানুষের বাড়ির দাসী সব কাজ ক'চ্ছে, কিন্তু দেশে নিজের বাড়ির দিকে মন প'ড়ে আছে। আবার সে মনিবের ছেলেদের আপনার ছেলের মত মানুষ করে। বলে 'আমার রাম' 'আমার হরি' কিন্তু মনে বেশ জানে—এরা আমার কেউ নয়।

কচ্ছপ জলে চ'রে বেড়ায় কিন্তু তার মন কোথায় পড়ে আছে জান?—আড়ায় পড়ে আছে। যেখানে তার ডিমগুলি আছে। সংসারের সব কর্ম ক'রবে কিন্তু ঈশ্বরে মন ফেলে রাখবে।

ঈশ্বরে ভক্তি লাভ না ক'রে যদি সংসার করতে যাও তা'হলে আরও জড়িয়ে পড়বে। বিপদ, শোক, তাপ এ সবে অধৈর্য হ'য়ে যাবে। আর যত বিষয় চিন্তা করবে ততই আসক্তি বাড়বে।

"তেল হাতে মেখে তবে কাঁঠাল ভাঙতে হয়! তা না হ'লে হাতে আটা জড়িয়ে যায়। ঈশ্বরে ভক্তিরূপ তেল লাভ ক'রে তবে সংসারের কাজে হাত দিতে হয়।

"কিন্তু এই ভক্তি লাভ করতে হলে নির্জন হওয়া চাই। মাখন তুলতে গেলে নির্জনে দই পাততে হয়। দইকে নাড়ানাড়ি করলে দই বসে না। তারপর নির্জনে ব'সে সব কাজ ফেলে দই মন্থন করতে হয়। তবে মাখন তোলা যায়।

"আবার দেখ, এই মনে নির্জনে ঈশ্বরের চিন্তা করলে জ্ঞান বৈরাগ্য ভক্তি লাভ হয়। কিন্তু সংসারে ফেলে রাখলে ঐ মন নীচ হ'য়ে যায়। সংসারে কেবল কামিনী-কাঞ্চন চিন্তা।

"সংসার জল, আর মনটি যেন দুধ। যদি জলে ফেলে রাখ, তা'হলে দুধে-জলে মিশে এক হ'য়ে যায়, খাঁটি দুধ খুঁজে পাওয়া যায় না। দুধকে দই পেতে মাখন তুলে যদি জলে রাখা যায়, তাহলে ভাসে। তাই নির্জনে সাধনা দ্বারা আগে জ্ঞানভক্তিরূপ মাখন লাভ করবে। সেই মাখন সংসার জলে ফেলে রাখলেও মিশবে না; ভেসে থাকবে।

"সঙ্গে সঙ্গে বিচার করা খুব দরকার। কামিনী-কাঞ্চন অনিত্য। ঈশ্বরই একমাত্র বস্তু। টাকায় কি হয়? ভাত হয়, ডাল হয়, কাপড় হয়, থাকবার জায়গা হয়, এই পর্যন্ত। কিন্তু এতে ভগবান লাভ হয় না। তাই টাকা জীবনের উদ্দেশ্য হ'তে পারে না—এর নাম বিচার; বুঝেছ?"

মাষ্টার—আজ্ঞে হাঁ; প্রবোধচন্দ্রোদয় নাটক আমি সম্প্রতি পড়েছি, তাতে আছে 'বস্তুবিচার।'

শ্রীরামকৃষ্ণ—হাঁ, বস্তুবিচার! এই দেখ, টাকাতেই বা কি আছে, আর সুন্দর দেহেই বা কি আছে! বিচার কর, সুন্দরীর দেহেতেও কেবল হাড়, মাংস, চর্বি, মল, মূত্র এই সব আছে। এই সব বস্তুতে মানুষ ঈশ্বরকে ছেড়ে কেন মন দেয়? কেন ঈশ্বরকে ভুলে যায়?

[ঈশ্বর দর্শনের উপায়]

মাস্টার—ঈশ্বরকে কি দর্শন করা যায়?

শ্রীরামকৃষ্ণ—হাঁ, অবশ্য করা যায়। মাঝে মাঝে নির্জনে বাস; তাঁর নাম গুণগান, বস্তু-বিচার; এইসব উপায় অবলম্বন করতে হয়।

মাস্টার—কি অবস্থাতে তাঁকে দর্শন হয়?

শ্রীরামকৃষ্ণ—খুব ব্যাকুল হ'য়ে কাঁদলে তাঁকে দেখা যায়। মাগছেলের জন্য লোকে এক ঘটি কাঁদে; টাকার জন্য লোকে কেঁদে ভাসিয়ে দেয়; কিন্তু ঈশ্বরের জন্য কে কাঁদছে? ডাকার মত ডাকতে হয়।

এই বলিয়া ঠাকুর গান ধরিলেন—

"ডাক দেখি মন ডাকার মত কেমন শ্যামা থাক্‌তে পারে।
কেমন শ্যামা থাক্‌তে পারে, কেমন কালী থাক্‌তে পারে॥
মন যদি একান্ত হও, জবা বিল্বদল লও,
ভক্তি চন্দন মিশাইয়ে (মার), পদে পুষ্পাঞ্জলি দাও॥

"ব্যাকুলতা হ'লেই অরুণ উদয় হ'ল। তারপর সূর্য দেখা দিবেন। ব্যাকুলতার পরই ঈশ্বর দর্শন।

"তিন টান একত্র হ'লে তবে তিনি দেখা দেন—বিষয়ীর বিষয়ের উপর, মায়ের সন্তানের উপর, আর সতীর পতির উপর, টান। এই তিন টান যদি কারও একসঙ্গে হয়, সেই টানের জোরে ঈশ্বরকে লাভ করতে পারে!

"কথাটা এই, ঈশ্বরকে ভালবাসতে হবে। মা যেমন ছেলেকে ভালবাসে, সতী যেমন পতিকে ভালবাসে, বিষয়ী যেমন বিষয় ভালবাসে। এই তিনজনের ভালবাসা, এই তিন টান, একত্র করলে যতখানি হয়, ততখানি ঈশ্বরকে দিতে পারলে তাঁর দর্শন লাভ হয়।

"ব্যাকুল হ'য়ে তাঁকে ডাকা চাই। বিড়ালের ছানা কেবল মিউ মিউ ক'রে মাকে ডাকতে জানে। মা তাকে যেখানে রাখে, সেইখানেই থাকে—কখনও হেঁশেলে, কখনও মাটির উপর, কখনও বা বিছানার উপর রেখে দেয়। তার কষ্ট হ'লে সে কেবল মিউ মিউ করে ডাকে, আর কিছু জানে না। মা যেখানেই থাকুক, এই মিউ মিউ শব্দ শুনে এসে পড়ে।"

ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ

সর্বভূতস্থমাত্মানং সর্বভূতানি চাত্মনি।
ঈক্ষতে যোগযুক্তাত্মা সর্বত্র সমদর্শনঃ॥

[গীতা—৬, ২৯

তৃতীয় দর্শন—নরেন্দ্র, ভবনাথ, মাষ্টার

মাষ্টার তখন বরাহনগরে ভগিনীর বাড়িতে ছিলেন। ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণকে দর্শন করা অবধি সর্বক্ষণ তাঁহারই চিন্তা। সর্বদাই যেন সেই আনন্দময় মূর্তি দেখিতেছেন ও তাঁহার সেই অমৃতময়ী কথা শুনিতেছেন। ভাবিতে লাগিলেন, এই দরিদ্র ব্রাহ্মণ কিরূপে এই সব গভীর তত্ত্ব অনুসন্ধান করিলেন ও জানিলেন? আর এত সহজে এই সকল কথা বুঝাইতে তিনি এ পর্যন্ত কাহাকেও কখনও দেখেন নাই। কখন তাঁহার কাছে যাইবেন ও আবার তাঁহাকে দর্শন করিবেন এই কথা রাত্র-দিন ভাবিতেছেন।

দেখিতে দেখিতে রবিবার, ৫ই মার্চ, আসিয়া পড়িল। বরাহনগরের নেপালবাবুর সঙ্গে বেলা ৩টা ৪টার সময় তিনি দক্ষিণেশ্বরের বাগানে আসিয়া পেঁৗছিলেন। দেখিলেন, সেই পূর্ব-পরিচিত ঘরের মধ্যে ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ ছোট তক্তপোষের উপর বসিয়া আছেন। ঘরে এক ঘর লোক। রবিবার অবসর হইয়াছে তাই ভক্তেরা দর্শন করিতে আসিয়াছেন। এখনও মাষ্টারের সঙ্গে কাহারও আলাপ হয় নাই, তিনি সভামধ্যে এক পার্শ্বে আসন গ্রহণ করিলেন। দেখিলেন, ভক্তসঙ্গে সহাস্য বদনে ঠাকুর কথা কহিতেছেন।

একটি ঊনবিংশতিবর্ষ বয়স্ক ছোকরাকে উদ্দেশ করিয়া ও তাঁহার দিকে তাকাইয়া ঠাকুর যেন কত আনন্দিত হইয়া অনেক কথা বলিতেছিলেন। ছেলেটির নাম নরেন্দ্র, কলেজে পড়েন ও সাধারণ ব্রাহ্মসমাজে যাতায়াত করেন। কথাগুলি তেজঃপরিপূর্ণ। চক্ষু দুটি উজ্জ্বল। ভক্তের চেহারা।

মাষ্টার অনুমানে বুঝিলেন যে, কথাটি বিষয়াসক্ত সংসারী ব্যক্তির সম্বন্ধে হইতেছিল। যারা কেবল ঈশ্বর ঈশ্বর করে, ধর্ম ধর্ম করে তাদের ঐ সকল ব্যক্তিরা নিন্দা করে। আর সংসারে কত দুষ্ট লোক আছে, তাদের সঙ্গে কিরূপ ব্যবহার করা উচিত, এসব কথা হইতেছে।

শ্রীরামকৃষ্ণ (নরেন্দ্রের প্রতি)—নরেন্দ্র! তুই কি বলিস? সংসারী লোকেরা কত কি বলে! কিন্তু দেখ্, হাতী যখন চলে যায়, পেছনে কত জানোয়ার কত রকম চীৎকার করে। কিন্তু হাতী ফিরেও চায় না। তোকে যদি কেউ নিন্দা করে, তুই কি মনে করবি?

নরেন্দ্র—আমি মনে করব, কুকুর ঘেউ ঘেউ করছে।

শ্রীরামকৃষ্ণ (সহাস্যে)—না রে, অতো দূর নয়। (সকলের হাস্য)। ঈশ্বর সর্বভূতে আছেন। তবে ভাল লোকের সঙ্গে মাখামাখি চলে; মন্দ লোকের কাছ থেকে তফাত থাক্তে হয়। বাঘের ভিতরেও নারায়ণ আছেন; তা বলে বাঘকে আলিঙ্গন করা চলে না। (সকলের হাস্য)। যদি বল বাঘ তো নারায়ণ, তবে কেন পালাবো। তার উত্তর—যারা বল্‌ছে 'পালিয়ে এসো' তারাও নারায়ণ, তাদের কথা কেন না শুনি?

"একটা গল্প শোন। কোন এক বনে একটি সাধু থাকেন। তাঁর অনেকগুলি শিষ্য। তিনি একদিন শিষ্যদের উপদেশ দিলেন যে, সর্বভূতে নারায়ণ আছেন, এইটি জেনে সকলকে নমস্কার কর্‌বে। একদিন একটি শিষ্য হোমের জন্য কাঠ আনতে বনে গিছলো। এমন সময়ে একটা রব উঠ্‌লো, 'কে কোথায় আছ পালাও—একটা পাগলা হাতী যাচ্ছে।' সবাই পালিয়ে গেল, কিন্তু শিষ্য পালাল না! সে জানে যে, হাতীও যে নারায়ণ, তবে কেন পালাব? এই বলে দাঁড়িয়ে রইল। নমস্কার ক'রে স্তব-স্তুতি করতে লাগলো। এদিকে মাহুত চেঁচিয়ে বলছে 'পালাও, পালাও'; শিষ্যটি তবুও নড়লো না। শেষে হাতীটা শুঁড়ে ক'রে তুলে নিয়ে তাকে একধারে ছুঁড়ে ফেলে দিয়ে চলে গেল। শিষ্য ক্ষতবিক্ষত হ'য়ে ও অচৈতন্য হয়ে পড়ে রইল।

"এই সংবাদ পেয়ে গুরু ও অন্যান্য শিষ্যেরা তাকে আশ্রমে ধরাধরি ক'রে নিয়ে গেলো। আর ঔষধ দিতে লাগলো। খানিকক্ষণ পরে চেতনা হ'লে ওকে কেউ জিজ্ঞাসা করলে 'তুমি কেন হাতী আসছে শুনে চলে গেলে না? সে বললে, 'গুরুদেব যে আমায় বলে দিয়েছিলেন যে, নারায়ণই মানুষ, জীব-জন্তু সব হয়েছেন। তাই আমি হাতী নারায়ণ আসছে দেখে সেখান থেকে সরে যাই নাই।' গুরু তখন বললেন, বাবা, হাতী নারায়ণ আসছিলেন বটে, তা সত্য; কিন্তু বাবা, মাহুত নারায়ণ তো তোমায় বারণ করেছিলেন। যদি সবই নারায়ণ তবে তার কথা বিশ্বাস করলে না কেন? মাহুত নারায়ণের কথাও শুনতে হয়। (সকলের হাস্য)।

"শাস্ত্রে আছে 'আপো নারায়ণঃ'—জল নারায়ণ। কিন্তু কোনও জল ঠাকুরসেবায় চলে; আবার কোন জলে আঁচানো, বাসন মাজা, কাপড় কাচা কেবল চলে; কিন্তু খাওয়া বা ঠাকুরসেবা চলে না। তেমনি সাধু, অসাধু, ভক্ত, অভক্ত, সকলেরি হৃদয়ে নারায়ণ আছেন। কিন্তু অসাধু, অভক্ত, দুষ্ট লোকের সঙ্গে ব্যবহার চলে না। মাখামাখি চলে না। কারও সঙ্গে কেবল মুখের আলাপ পর্যন্ত চলে, আবার কারও সঙ্গে তাও চলে না। ঐরূপ লোকের কাছ থেকে তফাতে থাকতে হয়।"

একজন ভক্ত—মহাশয়, যদি দুষ্ট লোকে অনিষ্ট করতে আসে বা অনিষ্ট করে, তা হ'লে কি চুপ ক'রে থাকা উচিত?

[গৃহস্থ ও তমোগুণ]

শ্রীরামকৃষ্ণ—লোকের সঙ্গে বাস করতে গেলেই দুষ্ট লোকের হাত থেকে আপনাকে রক্ষা করবার জন্য একটু তমোগুণ দেখান দরকার! কিন্তু সে অনিষ্ট করবে বলে, উল্টে তার অনিষ্ট করা উচিত নয়।

"এক মাঠে এক রাখাল গরু চরাতো। সেই মাঠে একটা ভয়ানক বিষাক্ত সাপ ছিল। সকলেই সেই সাপের ভয়ে অত্যন্ত সাবধানে থাক্‌তো। একদিন একটি ব্রহ্মচারী সেই মাঠের পথ দিয়ে আস্‌ছিল। রাখালেরা দৌড়ে এসে বললে, ঠাকুর মহাশয়! ওদিক দিয়ে যাবেন না। ওদিকে একটা ভয়ানক বিষাক্ত সাপ আছে। ব্রহ্মচারী বললে, 'বাবা তা হোক; আমার তাতে ভয় নাই, আমি মন্ত্র জানি।' এই কথা বলে ব্রহ্মচারী সেইদিকে চলে গেল। রাখালেরা ভয়ে কেউ সঙ্গে গেল না। এদিকে সাপটা ফণা তুলে দৌড়ে আসছে, কিন্তু কাছে না আস্‌তে আস্‌তে ব্রহ্মচারী যেই একটি মন্ত্র পড়লে. অমনি সাপটা কেঁচোর মতন পায়ের কাছে পড়ে রইল। ব্রহ্মচারী বললে, 'ওরে, তুই কেন পরের হিংসা করে বেড়াস; আয় তোকে মন্ত্র দিব। এই মন্ত্র জপ্‌লে তোর ভগবানে ভক্তি হবে, ভগবান লাভ হবে, আর হিংসা প্রবৃত্তি থাকবে না।' এই বলে সে সাপকে মন্ত্র দিল। সাপটা মন্ত্র পেয়ে গুরুকে প্রণাম করলে আর জিজ্ঞাসা করলে, 'ঠাকুর! কি করে সাধনা করব বলুন।' গুরু বললেন, 'এই মন্ত্র জপ কর, আর কারও হিংসা ক'রো না।' ব্রহ্মচারী যাবার সময় বললে, 'আমি আবার আসবো।'

"এই রকমে কিছুদিন যায়। রাখালেরা দেখে যে সাপটা আর কামড়াতে আসে না! ঢ্যালা মারে তবুও রাগ হয় না, যেন কেঁচোর মতন হ'য়ে গেছে। একদিন একজন রাখাল কাছে গিয়ে ল্যাজ ধরে খুব ঘুরপাক দিয়ে তাকে আছড়ে আছড়ে ফেলে দিলে। সাপটার মুখ দিয়ে রক্ত উঠতে লাগলো আর সে অচেতন হ'য়ে পড়লো। নড়ে না, চড়ে না। রাখালেরা মনে করলে যে সাপটা মরে গেছে। এই মনে ক'রে তারা সব চলে গেল।

"অনেক রাত্রে সাপের চেতনা হলো। সে আস্তে আস্তে অতি কষ্টে তার গর্তের ভিতর চলে গেল। শরীর চূর্ণ—নড়বার শক্তি নেই। অনেকদিন পরে যখন অস্থিচর্মসার তখন বাহিরে আহারের চেষ্টায় রাত্রে একবার চরতে আসতো; ভয়ে দিনের বেলা আসতো না, মন্ত্র লওয়া অবধি আর হিংসা করে না। মাটি পাতা, গাছ থেকে পড়ে গেছে এমন ফল খেয়ে প্রাণধারণ করতো।

"প্রায় এক বৎসর পরে ব্রহ্মচারী সেই পথে আবার এলো। এসেই সাপের সন্ধান করলে। রাখালেরা বললে, 'সে সাপটা মরে গেছে।' ব্রহ্মচারীর কিন্তু ওকথা বিশ্বাস হলো না! সে জানে, যে মন্ত্র ও নিয়েছে তা সাধন না হ'লে দেহত্যাগ হবে না। খুঁজে খুঁজে সেই দিকে তার দেওয়া নাম ধ'রে

ডাক্‌তে লাগলো। সে গুরুদেবের আওয়াজ শুনে গর্ত থেকে বেরিয়ে এলো ও খুব ভক্তিভাবে প্রণাম করলে। ব্রহ্মচারী জিজ্ঞাসা করলে, 'তুই কেমন আছিস?' সে বললে, 'আজ্ঞে ভাল আছি।' ব্রহ্মচারী বললে, 'তবে তুই এত রোগা হয়ে গিছিস কেন?' সাপ বললে, 'ঠাকুর আপনি আদেশ করেছেন—কারও হিংসা ক'রো না। তাই পাতাটা ফলটা খাই বলে বোধ হয় রোগা হয়ে গিছি!' ওর সত্ত্বগুণ হয়েছে কি না, তাই কারু উপর ক্রোধ নাই। সে ভুলেই গিছলো যে রাখালেরা মেরে ফেলবার যোগাড় করেছিল! ব্রহ্মচারী বললে, শুধু না খাওয়ার দরুন এরূপ অবস্থা হয় না, অবশ্য আরো কারণ আছে, ভেবে দেখ। সাপটার মনে পড়লো যে রাখালেরা আছাড় মেরেছিল। তখন সে বললে, 'ঠাকুর মনে পড়েছে বটে, রাখালেরা একদিন আছাড় মেরেছিল। তারা অজ্ঞান জানে না যে আমার মনের কি অবস্থা; আমি যে কাহাকেও কামড়াব না বা কোনরূপ অনিষ্ট করবো না, কেমন ক'রে জানবে?' ব্রহ্মচারী বললে, ছি! তুই এতো বোকা আপনাকে রক্ষা করতে জানিস্ না; আমি কামড়াতেই বারণ করেছি, ফোঁস করতে নয়! ফোঁস ক'রে তাদের ভয় দেখাস নাই কেন?'

"দুষ্ট লোকের কাছে ফোঁস করে তাদের ভয় দেখাতে হয়, পাছে অনিষ্ট করে; তাদের গায়ে বিষ ঢালতে নাই, অনিষ্ট করতে নাই।

[ভিন্ন প্রকৃতি—Are all men equal?]

"ঈশ্বরের সৃষ্টিতে নানা রকম জীব, জন্তু, গাছপালা আছে। জানোয়ারের মধ্যে ভাল আছে, মন্দ আছে। বাঘের মত হিংস্র জন্তু আছে। গাছের মধ্যে অমৃতের ন্যায় ফল হয় এমন আছে; আবার বিষফলও আছে। তেমনি মানুষের মধ্যে ভাল আছে, মন্দও আছে; সাধু আছে, অসাধুও আছে; সংসারী জীব আছে আবার ভক্ত আছে।

"জীব চার প্রকারঃ—বদ্ধজীব, মুমুক্ষুজীব, মুক্তজীব ও নিত্যজীব।

"নিত্যজীবঃ—যেমন নারদাদি। এরা সংসারে থাকে জীবের মঙ্গলের জন্য—জীবদিগকে শিক্ষা দিবার জন্য।

"বদ্ধজীবঃ—বিষয়ে আসক্ত হ'য়ে থাকে, আর ভগবানকে ভুলে থাকে—ভুলেও ভগবানের চিন্তা করে না।

"মুমুক্ষুজীবঃ—যারা মুক্ত হবার ইচ্ছা করে। কিন্তু তাদের মধ্যে কেউ মুক্ত হ'তে পারে, কেউ পারে না।

"মুক্তজীবঃ—যারা সংসারে কামিনী-কাঞ্চনে আবদ্ধ নয়—যেমন সাধু মহাত্মারা; যাদের মনে বিষয়বুদ্ধি নাই, আর যারা সর্বদা হরি পাদপদ্ম চিন্তা করে।

"যেমন জাল ফেলা হয়েছে পুকুরে। দুচারটা মাছ এমন সেয়ানা যে

কখনও জালে পড়ে না—এরা নিত্যজীবের উপমাস্থল। কিন্তু অনেক মাছই জালে পড়ে। এদের মধ্যে কতকগুলি পালাবার চেষ্টা করে; এরা মুমুক্ষু-জীবের উপমাস্থল। কিন্তু সব মাছই পালাতে পারে না। দু'চারটে ধপাঙ ধপাঙ করে জাল থেকে পালিয়ে যায়,—তখন জেলেরা বলে—ঐ একটা মস্ত মাছ পালিয়ে গেল। কিন্তু যারা জালে পড়েছে, অধিকাংশই পালাতেও পারে না; আর পালাবার চেষ্টাও করে না। বরং জাল মুখে ক'রে পুকুরের পাঁকের ভিতরে গিয়ে চুপ ক'রে মুখ গুঁজড়ে শুয়ে থাকে—মনে করে, আর কোন ভয় নাই, আমরা বেশ আছি। কিন্তু জানে না যে, জেলে হড়্‌হড়্‌ ক'রে টেনে আড়ায় তুলবে। এরাই বদ্ধজীবের উপমাস্থল।

[সংসারী লোক—বদ্ধজীব]

"বদ্ধজীবেরা সংসারের কামিনী-কাঞ্চনে বদ্ধ হয়েছে, হাত-পা বাঁধা। আবার মনে করে যে, সংসারের ঐ কামিনী ও কাঞ্চনেতেই সুখ হবে, আর নির্ভয়ে থাক্‌বে। জানে না যে ওতেই মৃত্যু হবে। বদ্ধজীব যখন মরে তার পরিবার বলে, 'তুমি তো চল্লে, আমার কি করে গেলে?' আবার এমনি মায়া যে, প্রদীপটাতে বেশী সল্‌তে জ্বল্‌লে বদ্ধজীব বলে, 'তেল পুড়ে যাবে সল্‌তে কমিয়ে দাও।' এদিকে মৃত্যুশয্যায় শুয়ে রয়েছে!

"বদ্ধজীবেরা ঈশ্বরচিন্তা করে না। যদি অবসর হয় তা হ'লে হয় আবোল-তাবোল ফালতো গল্প করে, নয় মিছে কাজ করে। জিজ্ঞাসা করলে বলে, আমি চুপ ক'রে থাক্‌তে পারি না, তাই বেড়া বাঁধছি। হয় তো সময় কাটে না দেখে তাস খেলতে আরম্ভ করে।" (সকলে স্তব্ধ)।

সপ্তম পরিচ্ছেদ

যো মামজমনাদিঞ্চ বেত্তি লোকমহেশ্বরম্‌।
অসংমূঢ় স মর্তোষু সর্ব্বপাপৈঃ প্রমুচ্যতে॥

[গীতা—১০, ৩

উপায়—বিশ্বাস

একজন ভক্ত—মহাশয়, এরূপ সংসারী জীবের কি কোন উপায় নাই?

শ্রীরামকৃষ্ণ—অবশ্য উপায় আছে। মাঝে মাঝে সাধুসঙ্গ আর মাঝে মাঝে নির্জনে থেকে ঈশ্বর চিন্তা কর্‌তে হয়। আর বিচার করতে হয়। তাঁর কাছে প্রার্থনা করতে হয়, আমাকে ভক্তি বিশ্বাস দাও।

"বিশ্বাস হ'য়ে গেলেই হল। বিশ্বাসের চেয়ে আর জিনিস নাই।

(কেদারের প্রতি)—"বিশ্বাসের কত জোর তা তো শুনেছ? পুরাণে আছে,

রামচন্দ্র যিনি সাক্ষাৎ পূর্ণব্রহ্ম নারায়ণ, তাঁর লঙ্কায় যেতে সেতু বাঁধ্‌তে হ'ল। কিন্তু হনুমান রাম নামে বিশ্বাস ক'রে লাফ দিয়ে সমুদ্রের পারে গিয়ে প'ড়ল। তার আর সেতুর দরকার হয় নাই। (সকলের হাস্য)।

"বিভীষণ একটি পাতায় রাম নাম লিখে, ঐ পাতাটি একটি লোকের কাপড়ের খোঁটে বেঁধে দিছ্‌ল। সে লোকটি সমুদ্রের পারে যাবে। বিভীষণ তাকে বললে, তোমার ভয় নাই, তুমি বিশ্বাস ক'রে জলের উপর দিয়ে চলে যাও, কিন্তু দেখো যাই অবিশ্বাস করবে, অমনি জলে ডুবে যাবে। লোকটি বেশ সমুদ্রের উপর দিয়ে চলে যাচ্ছিল; এমন সময়ে তার ভারী ইচ্ছা হল যে, কাপড়ের খোঁটে কি বাঁধা আছে একবার দেখে! খুলে দেখে যে কেবল 'রাম-নাম' লেখা রয়েছে! তখন সে ভাব্‌লে, 'এ কি! শুদ্ধ রাম নাম একটি লেখা র'য়েছে।' যাই অবিশ্বাস, অমনি ডুবে গেল।

"যার ঈশ্বরে বিশ্বাস আছে, সে যদি মহাপাতক করে—গো, ব্রাহ্মণ, স্ত্রী হত্যা করে, তবুও ভগবানে এই বিশ্বাসের বলে ভারী ভারী পাপ থেকে উদ্ধার হ'তে পারে। সে যদি বলে আর আমি এমন কাজ করবো না, তার কিছুতেই ভয় হয় না।

এই বলিয়া ঠাকুর গান ধরিলেন—

[মহাপাতক ও নামমাহাত্ম্য]

"আমি দুর্গা দুর্গা বলে মা যদি মরি।"
আখেরে এ দীনে, না তারো কেমনে, জানা যাবে গো শঙ্করী।
নাশি গো ব্রাহ্মণ, হত্যা করি ভ্রূণ, সুরাপান আদি বিনাশি নারী।
এ সব পাতক, না ভাবি তিলেক, ব্রহ্মপদ নিতে পারি॥

[নরেন্দ্র—হোমাপাখি]

"এই ছেলেটিকে দেখছ, এখানে এক রকম। দুরন্ত ছেলে বাবার কাছে যখন বসে, যেমন জুজুটি, আবার চাঁদনিতে যখন খেলে, তখন আর এক মূর্ত্তি। এরা নিত্য সিদ্ধের থাক। এরা সংসারে কখন বদ্ধ হয় না। একটু বয়স হ'লেই চৈতন্য হয়, আর ভগবানের দিকে চলে যায়। এরা সংসারে আসে জীবশিক্ষার জন্য। এদের সংসারের বস্তু কিছু ভাল লাগে না—এরা কামিনী-কাঞ্চনে কখন আসক্ত হয় না।

"বেদে আছে হোমাপাখির কথা। খুব উঁচু আকাশে সে পাখি থাকে। সেই আকাশেই ডিম পাড়ে। ডিম পাড়লে ডিমটা পড়্‌তে থাকে—কিন্তু এত উঁচু যে, অনেকদিন থেকে ডিমটা পড়তে থাকে। ডিম পড়্‌তে পড়্‌তে ফুটে যায়। তখন ছানাটা পড়্‌তে থাকে। পড়্‌তে পড়্‌তে তার চোখ ফোটে

ও ডানা বেরোয়। চোখ ফুটলেই দেখতে পায় যে, সে পড়ে যাচ্ছে, আর মাটিতে লাগলে একেবারে চুরমার হ'য়ে যাবে। তখন সে পাখি মার দিকে একেবারে চোঁচা দৌড় দেয়, আর উঁচুতে উঠে যায়।"

নরেন্দ্র উঠিয়া গেলেন।

সভামধ্যে কেদার, প্রাণকৃষ্ণ, মাষ্টার ইত্যাদি অনেকে আছেন।

শ্রীরামকৃষ্ণ—দেখ, নরেন্দ্র গাইতে, বাজাতে, পড়া-শুনায়, সব তাতেই ভাল। সেদিন কেদারের সঙ্গে তর্ক ক'রছিল। কেদারের কথাগুলো কচ্ কচ্ ক'রে কেটে দিতে লাগল। (ঠাকুর ও সকলের হাস্য)। (মাষ্টারের প্রতি)—ইংরাজীতে কি কোন তর্কের বই আছে গা?

মাষ্টার—আজ্ঞে হাঁ, ইংরাজীতে ন্যায়শাস্ত্র (Logic) আছে।

শ্রীরামকৃষ্ণ—আচ্ছা, কি রকম একটু বল দেখি।

মাষ্টার এইবার মুস্কিলে পড়িলেন। বলিলেন—এক রকম আছে সাধারণ সিদ্ধান্ত থেকে বিশেষ সিদ্ধান্তে পোঁছান, যেমন—

সব মানুষ মরে যাবে,
পণ্ডিতেরা মানুষ,
অতএব পণ্ডিতেরা মরে যাবে।

"আর এক রকম আছে, বিশেষ দৃষ্টান্ত বা ঘটনা দেখে সাধারণ সিদ্ধান্তে পোঁছান। যেমন—

এ কাকটা কালো,
ও কাকটা কালো
(আবার) যত কাক দেখছি সবই কালো,
অতএব সব কাকই কালো।

"কিন্তু এ রকম সিদ্ধান্ত করলে ভুল হতে পারে, কেন না হয় তো খুঁজতে খুঁজতে আর এক দেশে সাদা কাক দেখা গেল। আর এক দৃষ্টান্ত—যেখানে বৃষ্টি সেইখানে মেঘ ছিল বা আছে; অতএব এই সাধারণ সিদ্ধান্ত হ'ল যে মেঘ থেকে বৃষ্টি হয়। আরো এক দৃষ্টান্ত—এ মানুষটির বত্রিশ দাঁত আছে, ও মানুষটির বত্রিশ দাঁত, আবার যে কোন মানুষ দেখছি তারই বত্রিশ দাঁত আছে। অতএব সব মানুষেরই বত্রিশ দাঁত আছে।

"এরূপ সাধারণ সিদ্ধান্তের কথা ইংরাজী ন্যায়শাস্ত্রে আছে।"

শ্রীরামকৃষ্ণ কথাগুলি শুনিলেন মাত্র। শুনিতে শুনিতেই অন্যমনস্ক হইলেন। কাজে কাজেই আর এ বিষয়ে বেশী প্রসঙ্গ হইল না।

অষ্টম পরিচ্ছেদ

শ্রুতিবিপ্রতিপন্না তে যদা স্থাস্যতি নিশ্চলা।
সমাধাবচলা, বুদ্ধিস্তদা যোগমবাপ্স্যসি॥

[গীতা—২, ৫৩

সমাধি মন্দিরে

সভা ভঙ্গ হইল। ভক্তেরা এদিক্ ওদিক্ পায়চারি করিতেছেন। মাষ্টারও পঞ্চবটী ইত্যাদি স্থানে বেড়াইতেছেন, বেলা আন্দাজ পাঁচটা। কিয়ৎক্ষণ পরে তিনি শ্রীরামকৃষ্ণের ঘরের দিকে আসিয়া দেখিলেন, ঘরের উত্তর দিকের ছোট বারান্দার মধ্যে অদ্ভূত ব্যাপার হইতেছে!

শ্রীরামকৃষ্ণ স্থির হইয়া দাঁড়াইয়া রহিয়াছেন। নরেন্দ্র গান করিতেছেন, দুই চারিজন ভক্ত দাঁড়াইয়া আছেন। মাষ্টার আসিয়া গান শুনিতেছেন। গান শুনিয়া আকৃষ্ট হইয়া রহিলেন। **ঠাকুরের গান ছাড়া এমন মধুর গান তিনি কখনও কোথাও শুনেন নাই।** হঠাৎ ঠাকুরের দিকে দৃষ্টিপাত করিয়া অবাক্ হইয়া রহিলেন। ঠাকুর দাঁড়াইয়া নিস্পন্দ, চক্ষুর পাতা পড়িতেছে না; নিঃশ্বাস-প্রশ্বাস বহিছে কিনা বহিছে! জিজ্ঞাসা করাতে একজন ভক্ত বলিলেন, এর নাম **সমাধি!** মাষ্টার এরূপ কখনও দেখেন নাই, শুনেন নাই। অবাক হইয়া তিনি ভাবিতেছেন, ভগবানকে চিন্তা করিয়া মানুষ কি এতো বাহ্যজ্ঞান-শূন্য হয়? না জানি কতদূর বিশ্বাস ভক্তি থাকলে এরূপ হয়। গানটি এই—

চিন্তয় মম মানস হরি চিদ্ঘন নিরঞ্জন।

কিবা, অনুপমভাতি, মোহনমূরতি ভকত-হৃদয়-রঞ্জন।
নবরাগে রঞ্জিত, কোটি শশী-বিনিন্দিত;
কিবা বিজলি চমকে সে রূপ আলোকে, পুলকে, শিহরে জীবন।

গানের এই চরণটি গাহিবার সময় ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ শিহরিতে লাগিলেন। দেহ রোমাঞ্চিত! চক্ষু হইতে আনন্দাশ্রু বিগলিত হইতেছে। মাঝে মাঝে যেন কি দেখিয়া হাসিতেছেন। না জানি 'কোটি শশী বিনিন্দিত' কি অনুপম রূপ দর্শন করিতেছেন! এরই নাম কি ভগবানের চিন্ময়-রূপ-দর্শন? কত সাধন করিলে, কত তপস্যার ফলে, কতখানি ভক্তি-বিশ্বাসের বলে, এরূপ ঈশ্বর দর্শন হয়? আবার গান চলিতেছে—

হৃদি কমলাসনে, ভজ তাঁর চরণ,
দেখ শান্ত মনে, প্রেম নয়নে, অপরূপ প্রিয়-দর্শন।

আবার সেই ভুবনমোহন হাস্য! শরীর সেইরূপ নিস্পন্দ! স্তিমিত লোচন! কিন্তু কি যেন অপরূপ রূপ দর্শন করিতেছেন! আর সেই অপরূপ রূপ দর্শন করিয়া যেন মহানন্দে ভাসিতেছেন!

এইবার গানের শেষ হইল। নরেন্দ্র গাইলেন—

"চিদানন্দরসে ভক্তিযোগাবেশে, হও রে চিরমগন।
(চিদানন্দরসে, হায় রে) (প্রেমানন্দরসে)॥"

সমাধির ও প্রেমানন্দের এই অদ্ভুত ছবি হৃদয়মধ্যে গ্রহণ করিয়া মাষ্টার গৃহে প্রত্যাবর্তন করিতে লাগিলেন। মাঝে মাঝে হৃদয়মধ্যে হৃদয়োন্মত্তকারী মধুর সংগীতের ফুট উঠিতে লাগিল—

'প্রেমানন্দরসে হও রে চিরমগন।' (হরি প্রেমে মত্ত হয়ে)।

নবম পরিচ্ছেদ

যং লব্ধা চাপরং লাভং মন্যতে নাধিকং ততঃ।
যস্মিন্ স্থিতো ন দুঃখেন গুরুণাপি বিচাল্যতে॥
[গীতা—৩, ২২

চতুর্থ দর্শন—নরেন্দ্র, ভবনাথ প্রভৃতির সঙ্গে আনন্দ

তাহার পরদিনও (৬ই মার্চ) ছুটি ছিল। বেলা তিনটার সময় মাণ্টার আবার আসিয়া উপস্থিত। ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ সেই পূর্বপরিচিত ঘরে বসিয়া আছেন। মেঝেতে মাদুর পাতা। সেখানে নরেন্দ্র, ভবনাথ, আরও দুই-একজন বসিয়া আছেন। কয়েকটি ছোকরা, উনিশ-কুড়ি বৎসর বয়স। ঠাকুর সহাস্যবদন, ছোট তক্তপোশের উপর বসিয়া আছেন, আর ছোকরাদের সহিত আনন্দে কথাবার্তা কহিতেছেন।

মাষ্টার ঘরে প্রবেশ করিতেছেন দেখিয়া ঠাকুর উচ্চহাস্য করিয়া ছোকরাদের বলিয়া উঠিলেন, "ঐ রে আবার এসেছে!"—বলিয়াই হাস্য। সকলে হাসিতে লাগিল। মাষ্টার আসিয়া ভূমিষ্ঠ হইয়া প্রণাম করিয়া বসিলেন। —আগে হাতজোড় করিয়া দাঁড়াইয়া প্রণাম করিতেন—ইংরেজী পড়া লোকেরা যেমন করে। কিন্তু আজ তিনি ভূমিষ্ঠ হইয়া প্রণাম করিতে শিখিয়াছেন। তিনি আসন গ্রহণ করিলে, শ্রীরামকৃষ্ণ কেন হাসিতেছিলেন, তাহাই নরেন্দ্রাদি ভক্তদের বুঝাইয়া দিতেছেন।

"দেখ্, একটা ময়ূরকে বেলা চারটার সময় আফিম খাইয়ে দিছিল। তার পরদিন ঠিক চারটার সময় ময়ূরটা উপস্থিত—আফিমের মৌতাত ধরেছিল—ঠিক সময়ে আফিম খেতে এসেছে!" (সকলের হাস্য)।

মাষ্টার মনে মনে ভাবিতেছেন, ইনি ঠিক কথাই বলিতেছেন। বাড়িতে যাই কিন্তু দিবানিশি ইঁহার দিকে মন পড়িয়া থাকে—কখন দেখিব, কখন দেখিব। এখানে কে যেন টেনে আনলে! মনে করলে অন্য জায়গায় যাবার যো নাই, এখানে আসতেই হবে! এইরূপ ভাবিতেছেন, ঠাকুর এদিকে ছোকরাগুলির সহিত অনেক ফষ্টিনাষ্টি করিতে লাগিলেন যেন তারা সমবয়স্ক। হাসির লহরী উঠিতে লাগিল। যেন আনন্দের হাট বসিয়াছে!

মাষ্টার অবাক হইয়া এই অদ্ভুত চরিত্র দেখিতেছেন। ভাবিতেছেন, ইঁহারই কি পূর্বদিনে সমাধি ও অদৃষ্টপূর্ব প্রেমানন্দ দেখিয়াছিলাম? সেই ব্যক্তি কি আজ প্রাকৃত লোকের ন্যায় ব্যবহার করিতেছেন? ইনিই কি আমায় প্রথম দিনে উপদেশ দিবার সময় তিরস্কার করেছিলেন? ইনিই কি আমায় 'তুমি কি জ্ঞানী' বলেছিলেন? ইনিই কি সাকার-নিরাকার দুই সত্য বলেছিলেন? ইনিই কি আমায় বলেছিলেন যে ঈশ্বরই সত্য আর সংসারের সমস্তই অনিত্য? ইনিই কি আমায় সংসারে দাসীর মত থাকতে বলেছিলেন?

ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ আনন্দ করিতেছেন ও মাস্টারকে এক-একবার দেখিতেছেন। দেখিলেন, তিনি অবাক হইয়া বসিয়া আছেন। তখন রামলালকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন, "দেখ্, এর একটু উমের বেশী কিনা, তাই একটু গম্ভীর। এরা এত হাসিখুশী করছে, কিন্তু এ চুপ ক'রে বসে আছে।" মাষ্টারের বয়স তখন সাতাশ বৎসর হইবে।

কথা কহিতে কহিতে পরম ভক্ত হনুমানের কথা উঠিল। হনুমানের পট একখানি ঠাকুরের ঘরের দেওয়ালে ছিল। ঠাকুর বলিলেন, "দেখ, হনুমানের কি ভাব! ধন, মান, দেহসুখ কিছুই চায় না; কেবল ভগবানকে চায়! যখন স্ফটিকস্তম্ভ থেকে ব্রহ্মাস্ত্র নিয়ে পালাচ্ছে তখন মন্দোদরী অনেক রকম ফল নিয়ে লোভ দেখাতে লাগলো। ভাব্‌লে ফলের লোভে নেমে এসে অস্ত্রটা যদি ফেলে দেয়; কিন্তু হনুমান ভুলবার ছেলে নয়; সে বললে—

[গীত—'শ্রীরাম কল্পতরু']

"আমার কি ফলের অভাব।
পেয়েছি যে ফল, জনম সফল,
মোক্ষ-ফলের বৃক্ষ রাম হৃদয়ে॥
শ্রীরামকল্পতরুমূলে ব'সে রই—
যখন যে ফল বাঞ্ছা সেই ফল প্রাপ্ত হই।
ফলের কথা কই, (ধনি গো) ও ফল গ্রাহক নই;
যাব তোদের প্রতিফল যে দিয়ে॥

[সমাধি-মন্দিরে]

ঠাকুর এই গান গাহিতেছেন। আবার সেই 'সমাধি!' আবার নিস্পন্দ দেহ, স্তিমিত লোচন, দেহ স্থির! বসিয়া আছেন—ফটোগ্রাফে যেরূপ ছবি দেখা যায়। ভক্তেরা এইমাত্র এত হাসিখুশী করিতেছিলেন, এখন সকলেই একদৃষ্টি হইয়া ঠাকুরের সেই অদ্ভুত অবস্থা নিরীক্ষণ করিতেছেন। সমাধি অবস্থা মাষ্টার এই দ্বিতীয়বার দর্শন করিলেন। অনেকক্ষণ পরে ঐ অবস্থার পরিবর্তন হইতেছে। দেহ শিথিল হইল। মুখ সহাস্য হইল। ইন্দ্রিয়গণ আবার নিজের নিজের কার্য করিতেছে। চক্ষের কোণ দিয়া আনন্দাশ্রু বিসর্জন করিতে করিতে ঠাকুর 'রাম', 'রাম', এই নাম উচ্চারণ করিতেছেন!

মাষ্টার ভাবিতে লাগিলেন, এই মহাপুরুষই কি ছেলেদের সঙ্গে ফচ্‌কিমি করিতেছিলেন? তখন ঠিক যেন পাঁচ বছরের বালক!

ঠাকুর পূর্ববৎ প্রকৃতিস্থ হইয়া আবার প্রাকৃত লোকের ন্যায় ব্যবহার করিতেছেন। মাষ্টারকে ও নরেন্দ্রকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন,—"তোমরা দুজনে ইংরাজীতে কথা কও ও বিচার করো, আমি শুনবো।"

মাষ্টার ও নরেন্দ্র উভয়ে এই কথা শুনিয়া হাসিতেছেন। দুজনে কিছু কিছু আলাপ করিতে লাগিলেন, কিন্তু বাংলাতে। ঠাকুরের সামনে মাষ্টারের বিচার আর সম্ভব নয়। তাঁহার তর্কের ঘর ঠাকুরের কৃপায় এক রকম বন্ধ। আর কিরূপে তর্ক বিচার করিবেন? ঠাকুর আর একবার জিদ করিলেন, কিন্তু ইংরাজীতে তর্ক করা হইল না।

দশম পরিচ্ছেদ

ত্বমক্ষরং পরমং বেদিতব্যং, ত্বমস্য বিশ্বস্য পরং নিধানম্।
ত্বমব্যয়ঃ শাশ্বতধর্মগোপ্তা সনাতনস্তং পুরুষো মতো মে॥

[গীতা—১১, ১৮

অন্তরঙ্গ সঙ্গে—'আমি কে'?

পাঁচটা বাজিয়াছে। ভক্ত কয়টি যে যার বাড়িতে চলিয়া গেলেন। কেবল মাষ্টার ও নরেন্দ্র রহিলেন। নরেন্দ্র গাড়ু লইয়া হাঁসপুকুরের ও ঝাউতলার দিকে মুখ ধুইতে গেলেন। মাষ্টার ঠাকুরবাড়ির এদিক-ওদিক পায়চারি করিতেছেন। কিয়ৎক্ষণ পরে কুঠির কাছ দিয়া হাঁসপুকুরের দিকে আসিতে লাগিলেন। দেখিলেন, পুকুরের দক্ষিণ দিকের সিঁড়ির চাতালের উপর শ্রীরামকৃষ্ণ দাঁড়াইয়া; নরেন্দ্র গাড়ু হাতে করিয়া মুখ ধুইয়া দাঁড়াইয়া আছেন। ঠাকুর বলিতেছেন, "দেখ্, আর একটু বেশী বেশী আস্‌বি। সবে নূতন আসছিস্ কিনা! প্রথম

আলাপের পর নূতন সকলেই ঘন ঘন আসে, যেমন নূতন—পতি (নরেন্দ্র ও মাষ্টারের হাস্য)। কেমন আসবি তো?" নরেন্দ্র ব্রাহ্মসমাজের ছেলে, হাসিতে হাসিতে বলিলেন, "হাঁ, চেষ্টা করবো।"

সকলে কুঠির পথ দিয়া ঠাকুরের ঘরে আসিতেছেন। কুঠির কাছে মাষ্টারকে ঠাকুর বলিলেন, "দেখ, চাষারা হাটে গরু কিনতে যায়; তারা ভাল গরু, মন্দ গরু বেশ চেনে। ল্যাজের নীচে হাত দিয়ে দেখে। কোনও গরু ল্যাজে হাত দিলে শুয়ে পড়ে, সে গরু কেনে না। যে গরু ল্যাজে হাত দিলে তিড়িং-মিড়িং ক'রে লাফিয়ে উঠে সেই গরুকেই পছন্দ করে। নরেন্দ্র সেই গরুর জাত; ভিতরে খুব তেজ!" এই বলিয়া ঠাকুর হাসিতেছেন। "আবার কেউ কেউ লোক আছে, যেন চিঁড়ের ফলার, আঁট নাই, জোর নাই, ভ্যাৎ ভ্যাৎ করছে।"

সন্ধ্যা হইল। ঠাকুর ঈশ্বর চিন্তা করিতেছেন; মাষ্টারকে বলিলেন, "তুমি নরেন্দ্রের সঙ্গে আলাপ করগে, আমায় ব'লবে কি রকম ছেলে।"

আরতি হইয়া গেল। মাষ্টার অনেকক্ষণ পরে চাঁদনীর পশ্চিম ধারে নরেন্দ্রকে দেখিতে পাইলেন। পরস্পর আলাপ হইতে লাগিল। নরেন্দ্র বলিলেন, আমি সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের। কলেজে পড়িতেছি ইত্যাদি।

রাত হইয়াছে—মাষ্টার এইবার বিদায় গ্রহণ করিবেন। কিন্তু যাইতে আর পারিতেছেন না। তাই নরেন্দ্রের নিকট হইতে আসিয়া ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণকে খুঁজিতে লাগিলেন। তাঁহার গান শুনিয়া হৃদয়, মন মুগ্ধ হইয়াছে; বড় সাধ যে আবার তাঁর শ্রীমুখে গান শুনিতে পান। খুঁজিতে খুঁজিতে দেখিলেন, মা-কালীর মন্দিরের সম্মুখে নাটমন্দিরের মধ্যে একাকী ঠাকুর পাদচারণ করিতেছেন। মার মন্দিরে মার দুই পার্শ্বে আলো জ্বলিতেছিল। বৃহৎ নাট-মন্দিরে একটি আলো জ্বলিতেছে, ক্ষীণ আলোক। আলো ও অন্ধকার মিশ্রিত হইলে যেরূপ হয়, সেইরূপ নাটমন্দিরে দেখাইতেছিল।

মাষ্টার ঠাকুরের গান শুনিয়া আত্মহারা হইয়াছেন। যেন মন্ত্রমুগ্ধ সর্প। এক্ষণে সঙ্কুচিতভাবে ঠাকুরকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "আজ আর কি গান হবে?" ঠাকুর চিন্তা করিয়া বলিলেন, "না, আজ আর গান হবে না।" এই বলিয়া কি যেন মনে পড়িল, অমনি বলিলেন, "তবে এক কর্ম কোরো। আমি বলরামের বাড়ি কলিকাতায় যাবো, তুমি যেও, সেখানে গান হবে।"

মাষ্টার—যে আজ্ঞা।

শ্রীরামকৃষ্ণ—তুমি জান? বলরাম বসু?

মাষ্টার—আজ্ঞা না।

শ্রীরামকৃষ্ণ—বলরাম বসু। বোসপাড়ায় বাড়ি।

মাষ্টার—যে আজ্ঞা, আমি জিজ্ঞাসা ক'রবো।

শ্রীরামকৃষ্ণ (মাষ্টারের সঙ্গে নাটমন্দিরে বেড়াইতে বেড়াইতে)—আচ্ছা, তোমায় একটা কথা জিজ্ঞাসা করি, আমাকে তোমার কি বোধ হয়?

মাষ্টার চুপ করিয়া আছেন। ঠাকুর আবার বলিতেছেন,—

"তোমার কি বোধ হয়? আমার কয় আনা জ্ঞান হ'য়েছে?"

মাষ্টার—'আনা' একথা বুঝতে পারছি না; **তবে এরূপ জ্ঞান বা প্রেমভক্তি বা বিশ্বাস বা বৈরাগ্য বা উদার ভাব** কখনও কোথাও দেখি নাই।

ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ হাসিতে লাগিলেন।

এরূপ কথাবার্তার পর মাষ্টার প্রণাম করিয়া বিদায় গ্রহণ করিলেন।

সদর ফটক পর্যন্ত আসিয়া আবার কি মনে পড়িল, অমনি ফিরিলেন। আবার নাটমন্দিরে ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণের কাছে আসিয়া উপস্থিত।

ঠাকুর সেই ক্ষীণালোক মধ্যে একাকী পাদচারণ করিতেছেন। একাকী,—নিঃসঙ্গ। পশুরাজ যেন অরণ্যমধ্যে আপন মনে একাকী বিচরণ করিতেছেন। **আত্মারাম**; সিংহ একলা থাকতে, একলা বেড়াতে ভালবাসে! **অনপেক্ষ!**

অবাক হইয়া মাষ্টার আবার সেই মহাপুরুষ দর্শন করিতেছেন।

শ্রীরামকৃষ্ণ (মাষ্টারের প্রতি)—আবার যে ফিরে এলে?

মাষ্টার—আজ্ঞা, বোধ হয় বড়-মানুষের বাড়ি—যেতে দিবে কি না; তাই যাব না ভাবছি। এইখানে এসেই আপনার সঙ্গে দেখা ক'রব।

শ্রীরামকৃষ্ণ—না গো, তা কেন? তুমি আমার নাম করবে। ব'লবে তাঁর কাছে যাব, তা হ'লেই—কেউ আমার কাছে নিয়ে আসবে।

মাষ্টার 'যে আজ্ঞা' বলিয়া আবার প্রণাম করিয়া বিদায় লইলেন।

দ্বিতীয় খণ্ড

শ্রীযুক্ত কেশবচন্দ্র সেনের সহিত ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণের নৌকাবিহার, আনন্দ ও কথোপকথন

প্রথম পরিচ্ছেদ

ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ—'সমাধি-মন্দিরে'

আজ কোজাগর লক্ষ্মী পূজা। শুক্রবার ২৭শে অক্টোবর, ১৮৮২ খৃষ্টাব্দ। ঠাকুর দক্ষিণেশ্বর কালীবাড়ির সেই পূর্ব-পরিচিত ঘরে বসিয়া আছেন। বিজয় (গোস্বামী) ও হরলালের সহিত কথাবার্তা কহিতেছেন। একজন আসিয়া বলিলেন, কেশব সেন জাহাজে করিয়া ঘাটে উপস্থিত। কেশবের শিষ্যেরা প্রণাম করিয়া বলিলেন, "মহাশয় জাহাজ এসেছে, আপনাকে যেতে হবে, চলুন একটু বেড়িয়ে আসবেন; কেশববাবু জাহাজে আছেন, আমাদের পাঠালেন।"

বেলা ৪টা বাজিয়া গিয়াছে। ঠাকুর নৌকা করিয়া জাহাজে উঠিতেছেন। সঙ্গে বিজয়। নৌকায় উঠিয়াই বাহ্যশূন্য! সমাধিস্থ!

মাষ্টার জাহাজে দাঁড়াইয়া এই সমাধি-চিত্র দেখিতেছেন! তিনি বেলা তিনটার সময় কেশবের জাহাজে চড়িয়া কলিকাতা হইতে আসিয়াছেন। বড় সাধ, দেখিবেন ঠাকুর ও কেশবের মিলন ও তাঁহাদের আনন্দ, শুনিবেন তাঁহাদের কথাবার্তা। কেশব তাঁহার সাধু চরিত্রে ও বক্তৃতাবলে মাষ্টারের ন্যায় অনেক বঙ্গীয় যুবকের মন হরণ করিয়াছেন। অনেকেই তাঁহাকে পরম আত্মীয়বোধে হৃদয়ের ভালবাসা দিয়াছেন। কেশব ইংরেজী পড়া লোক, ইংরেজী দর্শন সাহিত্য পড়িয়াছেন। তিনি আবার দেব-দেবী পূজাকে অনেকবার পৌত্তলিকতা বলিয়াছেন। এইরূপ লোক শ্রীরামকৃষ্ণকে ভক্তি শ্রদ্ধা করেন, আবার মাঝে মাঝে দর্শন করিতে আসেন; এটি বিস্ময়কর ব্যাপার বটে। তাঁহাদের মনের মিল কোন্‌খানে বা কেমন করিয়া হইল, এ রহস্য ভেদ করিতে মাষ্টারাদি অনেকেই কৌতূহলাক্রান্ত হইয়াছেন। ঠাকুর নিরাকারবাদী বটেন কিন্তু আবার সাকারবাদী। ব্রহ্মের চিন্তা করেন, আবার দেব-দেবী প্রতিমার সম্মুখে ফুল-চন্দন দিয়া পূজা ও প্রেমে মাতোয়ারা হইয়া নৃত্যগীত করেন! খাট-বিছানায় বসেন, লাল পেড়ে কাপড়, জামা, মোজা, জুতা পরেন। কিন্তু সংসার করেন না। ভাব সমস্ত সন্ন্যাসীর; তাই লোকে পরমহংস বলে। এদিকে কেশব নিরাকারবাদী স্ত্রী-পুত্র লইয়া সংসার করেন, ইংরাজীতে লেক্‌চার দেন, সংবাদপত্র লেখেন, বিষয় কর্ম করেন।

সমবেত কেশব-প্রমুখ ব্রাহ্ম ভক্তগণ জাহাজ হইতে ঠাকুরবাড়ির শোভা সন্দর্শন করিতেছেন। জাহাজের পূর্বদিকে অনতিদূরে বাঁধা ঘাট ও ঠাকুর-বাড়ির চাঁদনী। আরোহীদের বাম পার্শ্বে চাঁদনীর উত্তরে দ্বাদশ শিবমন্দিরের ক্রমান্বয়ে ছয় মন্দির, দক্ষিণ পার্শ্বেও ছয় শিবমন্দির। শরতের নীল আকাশ চিত্রপটে ভবতারিণীর মন্দিরের চূড়া ও উত্তর দিকে পঞ্চবটী ও ঝাউ গাছের মাথাগুলি দেখা যাইতেছে। বকুলতলার নিকট একটি ও কালীবাড়ির দক্ষিণ প্রান্তভাগে আর একটি নহবৎখানা। দুই নহবৎখানার মধ্যবর্তী উদ্যানপথ, ধারে ধারে সারি সারি পুষ্পবৃক্ষ। শরতের নীলাকাশের নীলিমা জাহ্নবীজলে প্রতিভাসিত হইতেছে। বহির্জগতে কোমলভাব, ব্রাহ্ম ভক্তদের হৃদয়মধ্যে কোমলভাব। ঊর্ধ্বে সুন্দর সুনীল অনন্ত আকাশ, সম্মুখে সুন্দর ঠাকুরবাড়ি, নিম্নে পবিত্রসলিলা গঙ্গা, যাঁহার তীরে আর্য ঋষিগণ ভগবানের চিন্তা করিয়াছেন। আবার আসিতেছেন একটি মহাপুরুষ, সাক্ষাৎ সনাতন ধর্ম। এরূপ দর্শন মানুষের কপালে সর্বদা ঘটে না। এরূপ স্থলে, সমাধিস্থ মহাপুরুষে কাহার ভক্তির না উদ্রেক হয়, কোন্ পাষাণ হৃদয় না বিগলিত হয়!

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

বাসাংসি জীর্ণানি যথা বিহায়, নবানি গৃহ্ণাতি নরোঽপরাণি;
তথা শরীরাণি বিহায় জীর্ণান্যন্যানি সংযাতি নবানি দেহী॥
[গীতা—২, ২২

সমাধি মন্দিরে—আত্মা অবিনশ্বর—পওহারী বাবা

নৌকা আসিয়া লাগিল। সকলেই ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণকে দেখিবার জন্য ব্যস্ত। ভিড় হইয়াছে। ঠাকুরকে নিরাপদে নামাইবার জন্য কেশব শশব্যস্ত হইলেন। অনেক কষ্টে হুঁশ করাইয়া ঘরের ভিতর লইয়া যাওয়া হইতেছে। এখনও ভাবস্থ—একজন ভক্তের উপর ভর দিয়া আসিতেছেন। পা নড়িতেছে মাত্র। ক্যাবিন ঘরে প্রবেশ করিলেন। কেশবাদি ভক্তেরা প্রণাম করিলেন, কিন্তু কোন হুঁশ নাই। ঘরের মধ্যে একটি টেবিল, খানকতক চেয়ার। একখানি চেয়ারে ঠাকুরকে বসান হইল, কেশব একখানিতে বসিলেন। বিজয় বসিলেন। অন্যান্য ভক্তেরা যে যেমন পাইলেন, মেঝেতে বসিলেন। অনেক লোকের স্থান হইল না। তাঁহারা বাহির হইতে উঁকি মারিয়া দেখিতেছেন। ঠাকুর বসিয়া আবার সমাধিস্থ! সম্পূর্ণ বাহ্যশূন্য! সকলে একদৃষ্টে দেখিতেছেন।

কেশব দেখিলেন ঘরের মধ্যে অনেক লোক, ঠাকুরের কষ্ট হইতেছে। বিজয় তাঁহাকে ত্যাগ করিয়া গিয়া সাধারণ ব্রাহ্মসমাজভুক্ত হইয়াছেন ও কন্যার বিবাহ

ইত্যাদি কার্যের বিরুদ্ধে অনেক বক্তৃতা দিয়াছেন, তাই বিজয়কে দেখিয়া কেশব একটু অপ্রস্তুত। কেশব আসন ত্যাগ করিয়া উঠিলেন, ঘরের জানালা খুলিয়া দিবেন।

ব্রাহ্ম ভক্তেরা একদৃষ্টে চাহিয়া আছেন। ঠাকুরের সমাধি ভঙ্গ হইল। এখনও ভাব পূর্ণমাত্রায় রহিয়াছে! ঠাকুর আপনাআপনি অস্ফুটস্বরে বলিতেছেন, "মা, আমায় এখানে আন্‌লি কেন? আমি কি এদের বেড়ার ভিতর থেকে রক্ষা করতে পারবো?"

ঠাকুর কি দেখিতেছেন যে সংসারী ব্যক্তিরা বেড়ার ভেতরে বন্ধ, বাহিরে আসিতে পারিতেছে না, বাহিরের আলোকও দেখিতে পাইতেছে না, সকলের বিষয়কর্মে হাত-পা বাঁধা? কেবল বাড়ির ভিতরের জিনিসগুলি দেখিতে পাইতেছে আর মনে করিতেছে যে, জীবনের উদ্দেশ্য কেবল দেহ-সুখ ও বিষয়-কর্ম, 'কামিনী ও কাঞ্চন?' তাই কি ঠাকুর এমন কথা বলিলেন, "মা আমায় এখানে আনলি কেন? আমি কি এদের বেড়ার ভিতর থেকে রক্ষা করতে পারব?"

ঠাকুরের ক্রমে বাহ্যজ্ঞান হইতেছে। গাজীপুরের নীলমাধববাবু ও একজন ব্রাহ্মভক্ত পওহারী বাবার কথা পাড়িলেন।

একজন ব্রাহ্মভক্ত (ঠাকুরের প্রতি)—মহাশয়, এঁরা সব পওহারী বাবাকে দেখেছেন। তিনি গাজীপুরে থাকেন। আপনার মত আর একজন।

ঠাকুর এখনও কথা কহিতে পারিতেছেন না। ঈষৎ হাস্য করিলেন।

ব্রাহ্মভক্ত (ঠাকুরের প্রতি)—মহাশয়, পওহারী বাবা নিজের ঘরে আপনার ফটোগ্রাফ রেখে দিয়েছেন।

ঠাকুর ঈষৎ হাস্য করিয়া নিজের দেহের দিকে অঙ্গুলি নির্দেশ করিয়া বলিলেন—"খোলটা!"

তৃতীয় পরিচ্ছেদ

যৎ সাংখ্যৈঃ প্রাপ্যতে স্থানং তদ্‌যোগৈরপি গম্যতে।
একং সাংখ্যঞ্চ যোগঞ্চ যঃ পশ্যতি স পশ্যতি॥

[গীতা—৫, ৫

জ্ঞানযোগ, ভক্তিযোগ ও কর্মযোগের সমন্বয়

'বালিশ ও তার খোলটা'—দেহী ও দেহ। ঠাকুর কি বলিতেছেন যে দেহ বিনশ্বর, থাকিবে না? দেহের ভিতর যিনি দেহী তিনিই অবিনাশী, অতএব দেহের ফটোগ্রাফ লইয়া কি হইবে? দেহ অনিত্য জিনিস, এর আদর করে কি

হবে? বরং যে ভগবান অন্তর্যামী মানুষের হৃদয়মধ্যে বিরাজ করিতেছেন তাঁহারই পূজা করা উচিত?

ঠাকুর একটু প্রকৃতিস্থ হইয়াছেন। তিনি বলিতেছেন—

"তবে একটি কথা আছে। ভক্তের হৃদয় তাঁর আবাসস্থান। তিনি সর্বভূতে আছেন বটে, কিন্তু ভক্তহৃদয়ে বিশেষরূপে আছেন। যেমন কোন জমিদার তার জমিদারির সকল স্থানেই থাকিতে পারে। কিন্তু তিনি তাঁর অমুক বৈঠকখানায় প্রায়ই থাকেন, এই লোকে বলে। **ভক্তের হৃদয় ভগবানের বৈঠকখানা।** (সকলের আনন্দ)।

[এক ঈশ্বর—তাঁর ভিন্ন নাম—জ্ঞানী, যোগী ও ভক্ত]

"জ্ঞানীরা যাকে **ব্রহ্ম** বলে, যোগীরা তাঁকেই **আত্মা** বলে, আর ভক্তেরা তাঁকেই ভগবান বলে।

"একই ব্রাহ্মণ। যখন পূজা করে, তার নাম পূজারী; যখন রাঁধে তখন রাঁধুনি বামুন। যে জ্ঞানী, জ্ঞানযোগ ধরে আছে, সে নেতি নেতি এই বিচার করে। ব্রহ্ম এ নয়, ও নয়; জীব নয়, জগৎ নয়। এইরূপ বিচার করতে করতে যখন মন স্থির হয়, মনের লয় হয়, সমাধি হয়, তখন ব্রহ্মজ্ঞান। ব্রহ্মজ্ঞানীর ঠিক ধারণা **ব্রহ্ম সত্য, জগৎ মিথ্যা;** নামরূপ এ সব স্বপ্নবৎ; ব্রহ্ম কি যে, তা মুখে বলা যায় না; তিনি যে ব্যক্তি (Personal God) তাও বলবার যো নাই।

"জ্ঞানীরা ঐরূপ বলে—যেমন বেদান্তবাদীরা। ভক্তেরা কিন্তু সব অবস্থাই লয়। জাগ্রত অবস্থাও সত্য বলে—জগৎকে স্বপ্নবৎ বলে না। ভক্তেরা বলে এই জগৎ ভগবানের ঐশ্বর্য। আকাশ, নক্ষত্র, চন্দ্র, সূর্য, পর্বত, সমুদ্র, জীব, জন্তু এ সব ঈশ্বর করেছেন। তাঁরই ঐশ্বর্য। তিনি অন্তরে হৃদয়মধ্যে আবার বাহিরে। উত্তম ভক্ত বলে, তিনি নিজে এই চতুর্বিংশতি তত্ত্ব—জীব জগৎ হয়েছেন। **ভক্তের সাধ যে চিনি খায়, চিনি হ'তে ভালবাসে না।** (সকলের হাস্য)।

"ভক্তের ভাব কিরূপ জান? হে ভগবন্ 'তুমি প্রভু, আমি তোমার দাস', 'তুমি মা, আমি তোমার সন্তান' আবার 'তুমি আমার পিতা বা মাতা।' তুমি পূর্ণ, আমি তোমার অংশ। **ভক্ত এমন কথা বলতে ইচ্ছা করে না যে 'আমি ব্রহ্ম।'**

"যোগীও পরমাত্মাকে সাক্ষাৎকার করতে চেষ্টা করে। উদ্দেশ্য—জীবাত্মা ও পরমাত্মার যোগ। যোগী বিষয় থেকে মন কুড়িয়ে লয় ও পরমাত্মাতে মন স্থির ক'রতে চেষ্টা করে। তাই প্রথম অবস্থায় নির্জনে স্থির আসনে অনন্যমন হ'য়ে ধ্যান চিন্তা করে।

"কিন্তু একই বস্তু। নাম-ভেদমাত্র। যিনিই ব্রহ্ম, তিনিই আত্মা, তিনিই ভগবান। ব্রহ্মজ্ঞানীর **ব্রহ্ম**, যোগীর পরমাত্মা, ভক্তের ভগবান।"

চতুর্থ পরিচ্ছেদ

ত্বমেব সূক্ষ্মা ত্বং স্থূলা ব্যক্তাব্যক্ত স্বরূপিনী।
নিরাকারাপি সাকারা কস্ত্বাং বেদিতুমর্হতি॥

[মহানির্বানতন্ত্র, চতুর্থোল্লাস, ১৫

বেদ ও তন্ত্রের সমন্বয়—আদ্যাশক্তির ঐশ্বর্য

এদিকে আগ্নেয়পোত কলিকাতার অভিমুখে চলিতেছে। ঘরের মধ্যে শ্রীরামকৃষ্ণকে যাঁহারা দর্শন ও তাঁহার অমৃতময়ী কথা শ্রবণ করিতেছেন তাঁহারা জাহাজ চলিতেছে কি না, একথা জানিতেও পারিলেন না। ভ্রমর পুষ্পে বসিলে আর কি ভন্ ভন্ করে।

ক্রমে পোত দক্ষিণেশ্বর ছাড়াইল। সুন্দর দেবালয়ের ছবি দৃশ্যপটের বহির্ভূত হইল। পোতচক্রবিক্ষুব্ধ নীলাভ গঙ্গাবারি তরঙ্গায়িত ফেনিল কল্লোলপূর্ণ হইতে লাগিল। ভক্তদের কর্ণে সে কল্লোল আর পৌঁছিল না। তাঁহারা মুগ্ধ হইয়া দেখিতেছেন,—সহাস্যবদন, আনন্দময়, প্রেমানুরঞ্জিত নয়ন প্রিয়দর্শন অদ্ভুত এক যোগী! তাঁহারা মুগ্ধ হইয়া দেখিতেছেন, সর্বত্যাগী একজন প্রেমিক বৈরাগী! ঈশ্বর বই আর কিছু জানেন না! এদিকে ঠাকুরের কথা চলিতেছে।

শ্রীরামকৃষ্ণ—বেদান্তবাদী ব্রহ্মজ্ঞানীরা বলে, সৃষ্টি, স্থিতি, প্রলয়, জীব-জগৎ; এ সব শক্তির খেলা। বিচার করতে গেলে, এ সব স্বপ্নবৎ; ব্রহ্মই বস্তু আর সব অবস্তু; শক্তিও স্বপ্নবৎ, অবস্তু।

"কিন্তু হাজার বিচার কর, সমাধিস্থ না হ'লে শক্তির এলাকা ছাড়িয়ে যাবার যো নাই। 'আমি ধ্যান করছি', 'আমি চিন্তা করছি' এ সব শক্তির এলাকার মধ্যে, শক্তির ঐশ্বর্যের মধ্যে।

"তাই ব্রহ্ম আর শক্তি অভেদ। এককে মান্‌লেই আর একটিকে মান্‌তে হয়। যেমন অগ্নি আর তার দাহিকাশক্তি;—অগ্নি মানলেই দাহিকাশক্তি মানতে হয়, দাহিকাশক্তি ছাড়া অগ্নি ভাবা যায় না; আবার অগ্নিকে বাদ দিয়ে দাহিকাশক্তি ভাবা যায় না। সূর্যকে বাদ দিয়ে সূর্যের রশ্মি ভাবা যায় না; সূর্যের রশ্মিকে ছেড়ে সূর্যকে ভাবা যায় না।

"দুধ কেমন? না, ধোবো ধোবো। দুধকে ছেড়ে দুধের ধবলত্ব ভাবা যায় না। আবার দুধের ধবলত্ব ছেড়ে দুধকে ভাবা যায় না।

"তাই ব্রহ্মকে ছেড়ে শক্তিকে, শক্তিকে ছেড়ে ব্রহ্মকে ভাবা যায় না। নিত্যকে* ছেড়ে লীলা, লীলাকে† ছেড়ে নিত্য ভাবা যায় না।

---

* The Absolute.

† The Relative Phenomenal World.

"আদ্যাশক্তি লীলাময়ী; সৃষ্টি-স্থিতি-প্রলয় কর্ছেন। তাঁরই নাম কালী। কালীই ব্রহ্ম, ব্রহ্মই কালী! একই বস্তু, যখন তিনি নিষ্ক্রিয়—সৃষ্টি, স্থিতি, প্রলয়, কোন কাজ করছেন না—এই কথা যখন ভাবি, তখন তাঁকে ব্রহ্ম ব'লে কই। যখন তিনি এই সব কার্য করেন, তখন তাঁকে কালী বলি, শক্তি বলি। একই ব্যক্তি নাম রূপ ভেদ।

"যেমন 'জল' 'ওয়াটার' 'পানি'। এক পুকুরে তিন-চার ঘাট; এক ঘাটে হিন্দুরা জল খায়, তারা বলে 'জল'। এক ঘাটে মুসলমানেরা জল খায়, তারা বলে 'পানি'। আর এক ঘাটে ইংরাজেরা জল খায়, তারা বলে 'ওয়াটার'। তিন-ই এক, কেবল নামে তফাৎ! তাঁকে কেউ বলছে 'আল্লা'; কেউ 'গড্'; কেউ বলছে 'ব্রহ্ম'; কেউ 'কালী'; কেউ বলছে রাম, হরি, যীশু, দুর্গা।"

কেশব (সহাস্যে)—কালী কত ভাবে লীলা করছেন, সেই কথাগুলি একবার বলুন।

[কেশবের সহিত কথা—মহাকালী ও সৃষ্টি প্রকরণ]

শ্রীরামকৃষ্ণ (সহাস্যে)—তিনি নানাভাবে লীলা করছেন। তিনিই **মহাকালী, নিত্যকালী, শ্মশানকালী, রক্ষাকালী, শ্যামাকালী**। মহাকালী, নিত্যকালীর কথা তন্ত্রে আছে। যখন সৃষ্টি হয় নাই; চন্দ্র, সূর্য, গ্রহ, পৃথিবী ছিল না; নিবিড় আঁধার; তখন কেবল মা নিরাকারা মহাকালী—মহাকালের সঙ্গে বিরাজ ক'রছিলেন।

"শ্যামাকালীর অনেকটা কোমল ভাব—বরাভয়দায়িনী। গৃহস্থ—বাড়িতে তাঁরই পূজা হয়। যখন মহামারী, দুর্ভিক্ষ, ভূমিকম্প, অনাবৃষ্টি, অতিবৃষ্টি হয়; রক্ষাকালী পূজা করতে হয়। শ্মশানকালীর সংহার মূর্তি। শব, শিবা, ডাকিনী, যোগিনী মধ্যে, শ্মশানের উপর থাকেন। রুধিরধারা, গলায় মুণ্ডমালা, কোটীতে নরহস্তের কোমর বন্ধ। যখন জগৎ নাশ হয়, মহাপ্রলয় হয়, তখন মা সৃষ্টির বীজ সকল কুড়িয়ে রাখেন। গিন্নীর কাছে যেমন একটা ন্যাতা-ক্যাতার হাঁড়ি থাকে, আর সেই হাঁড়িতে গিন্নী পাঁচ রকম জিনিস তুলে রাখে। (কেশবের ও সকলের হাস্য)।

(সহাস্যে)—"হ্যা গো! গিন্নীদের ঐরকম একটা হাঁড়ি থাকে। ভিতরে সমুদ্রের ফেনা, নীল বড়ি, ছোট ছোট পুঁটলি বাঁধা শশা বীচি, কুমড়া বীচি, লাউ বীচি এই সব রাখে, দরকার হ'লে বার করে। মা ব্রহ্মময়ী সৃষ্টি নাশের পর ঐ রকম সব বীজ কুড়িয়ে রাখেন। সৃষ্টির পর আদ্যাশক্তি জগতের ভিতরেই থাকেন! জগৎ প্রসব করেন, আবার জগতের মধ্যে থাকেন। বেদে আছে 'ঊর্ণনাভির' কথা; মাকড়সা আর তার জাল। মাকড়সা, ভিতর থেকে জাল বা'র ক'রে, আবার নিজে সেই জালের উপর থাকে। ঈশ্বর জগতের আধার আধেয় দুই।

[কালীব্রহ্ম—কালী নির্গুণা ও সগুণা]

"কালী কি কালো? দূরে তাই কালো, জানতে পারলে আর কালো নয়।

"আকাশ দূর থেকে নীলবর্ণ। কাছে দেখ, কোনো রঙ নাই। সমুদ্রের জল দূর থেকে নীল, কাছে গিয়ে হাতে তুলে দেখ, কোন রঙ নাই।

এই কথা বলিয়া প্রেমোন্মত্ত হইয়া শ্রীরামকৃষ্ণ গান ধরিলেন—

মা কি আমার কালো রে।
কালরূপ দিগম্বরী, হৃদপদ্ম করে আলো রে॥

পঞ্চম পরিচ্ছেদ

ত্রিভির্গুণময়ৈর্ভাবৈরেভিঃ সর্বমিদং জগৎ।
মোহিতং নাভিজানাতি মামেভ্যঃ পরমব্যয়ম্॥

[গীতা—৭, ১৩

এ সংসার কেন?

শ্রীরামকৃষ্ণ (কেশবাদির প্রতি)—বন্ধন আর মুক্তি; দু'য়ের কর্ত্তাই তিনি। তাঁর মায়াতে সংসারী জীব, কামিনী-কাঞ্চনে বন্ধ, আবার তাঁর দয়া হ'লেই মুক্ত। তিনি 'ভববন্ধনের বন্ধনহারিণী তারিণী।'

এই বলিয়া গন্ধর্বনিন্দিতকণ্ঠে রামপ্রসাদের গান গাহিতেছেন—

শ্যামা মা উড়াচ্ছো ঘুড়ি (ভব সংসার বাজার মাঝে)।
(ঐ যে) আশা বায়ু ভরে উড়ে, বাঁধা তাহে মায়া দড়ি॥
কাক গন্ডি মন্ডি গাঁথা, পঞ্জরাদি নানা নাড়ী।
ঘুড়ি স্বগুণে নির্মাণ করা, কারিগরি বাড়াবাড়ি॥
বিষয়ে মেজেছে মাঞ্জা, কর্কশা হয়েছে দড়ি॥
ঘুড়ি লক্ষের দুটা একটা কাটে, হেসে দাও মা হাত চাপড়ি॥
প্রসাদ বলে দক্ষিণা বাতাসে ঘুড়ি যাবে উড়ি।
ভব সংসার সমুদ্রপারে পড়বে গিয়ে তাড়াতাড়ি॥

"তিনি লীলাময়ী! এ সংসার তাঁর লীলা। তিনি ইচ্ছাময়ী, আনন্দময়ী। লক্ষের মধ্যে একজনকে মুক্তি দেন।"

ব্রাহ্মভক্ত—মহাশয়, তিনি তো মনে করলে সকলকে মুক্ত করতে পারেন। কেন তবে আমাদের সংসারে বদ্ধ ক'রে রেখেছেন?

শ্রীরামকৃষ্ণ—তাঁর ইচ্ছা। তাঁর ইচ্ছা যে, তিনি এই সব নিয়ে খেলা করেন। বুড়ীকে আগে থাকতে ছুঁলে দৌড়াদৌড়ি করতে হয় না। সকলেই যদি ছুঁয়ে ফেলে, খেলা কেমন ক'রে হয়? সকলেই ছুঁয়ে ফেললে বুড়ী অসন্তুষ্ট হয়।

খেলা চললে বুড়ীর আহ্লাদ হয়। তাই 'লক্ষের দুটো একটা কাটে, হেসে দাও মা হাতচাপড়ি।'। (সকলের আনন্দ)।

"তিনি মনকে আঁখি ঠেরে ইসারা ক'রে ব'লে দিয়েছেন, 'যা, এখন সংসার করগে যা।' মনের কি দোষ? তিনি যদি আবার দয়া ক'রে মনকে ফিরিয়ে দেন, তা'হলে বিষয়-বুদ্ধির হাত থেকে মুক্তি হয়। তখন আবার তাঁর পাদপদ্মে মন হয়।

ঠাকুর সংসারীর ভাবে মার কাছে অভিমান করে গান গাইতেছেন—

আমি ঐ খেদে খেদ করি।
তুমি মাতা থাক্‌তে আমার জাগা ঘরে চুরি॥
মনে করি তোমার নাম করি, কিন্তু সময়ে পাসরি।
আমি বুঝেছি জেনেছি, আশয় পেয়েছি এ সব তোমারি চাতুরি॥
কিছু দিলে না পেলে না, নিলে না খেলে না, সে দোষ কি আমারি।
যদি দিতে পেতে, নিতে খেতে, দিতাম খাওয়াতাম তোমারি॥
যশ, অপযশ, সুরস, কুরস সকল রস তোমারি॥
(ওগো) রসে থেকে রসভঙ্গ, কেন কর রসেশ্বরী॥
প্রসাদ বলে মন দিয়েছ, মনেরে আঁখি ঠারি।
(ওমা) তোমার সৃষ্টি দৃষ্টি পোড়া মিষ্টি বলে ঘুরি॥

"তাঁরই মায়াতে ভুলে মানুষ সংসারী হয়েছে। প্রসাদ বলে 'মন দিয়েছ মনেরে আঁখি ঠারি'।"

[কর্মযোগ সম্বন্ধে শিক্ষা—সংসার ও নিষ্কাম কর্ম]

ব্রাহ্মভক্ত—মহাশয়, সব ত্যাগ না করলে ঈশ্বরকে পাওয়া যাবে না?

শ্রীরামকৃষ্ণ (সহাস্যে)—নাগো! তোমাদের সব ত্যাগ করতে হবে কেন? তোমরা রসে বসে বেশ আছো। সা-রে-মা-তে। (সকলের হাস্য)। তোমরা বেশ আছো। নক্স খেলা জান? আমি বেশী কাটিয়ে জ্বলে গেছি। তোমরা খুব সেয়ানা। কেউ দশে আছো; কেউ ছয়ে আছো; কেউ পাঁচে আছো। বেশী কাটাও নাই; তাই আমার মত জ্বলে যাও নাই। খেলা চল্‌ছে—এতো বেশ। (সকলের হাস্য)।

"সত্য বল্‌ছি, তোমরা সংসার করছো এতে দোষ নাই। তবে ঈশ্বরের দিকে মন রাখতে হবে। তা না হ'লে হবে না। এক হাতে কর্ম করো, আর এক হাতে ঈশ্বরকে ধ'রে থাকো। কর্ম শেষ হ'লে দুই হাতে ঈশ্বরকে ধ'রবে।

"মন নিয়ে কথা। মনেতেই বদ্ধ, মনেতেই মুক্ত। মন যে রঙে ছোপাবে সেই রঙে ছুপ্‌বে। যেমন ধোপাঘরের কাপড়। লালে ছোপাও লাল, নীলে ছোপাও নীল, সবুজ রঙে ছোপাও সবুজ। যে রঙে ছোপাও সেই রঙেই

ছুপ্‌বে। দেখ না, যদি একটু ইংরাজী পড়, তো অমনি মুখে ইংরাজী কথা এসে পড়ে। ফুট-ফাট, ইট-মিট (সকলের হাস্য)। আবার পায়ে বুটজুতা, শিস্‌ দিয়ে গান করা; এই সব এসে জুট্‌বে। আবার যদি পণ্ডিত সংস্কৃত পড়ে অমনি শ্লোক ঝাড়বে। মনকে যদি কুসঙ্গে রাখো, তো সেই রকম কথাবার্তা, চিন্তা হ'য়ে যাবে। যদি ভক্তের সঙ্গে রাখো, তা'হলে ঈশ্বরচিন্তা, হরিকথা, এই সব হবে।

"মন নিয়েই সব। একপাশে পরিবার, একপাশে সন্তান! একজনকে এক ভাবে, সন্তানকে আর এক ভাবে, আদর করে। কিন্তু একই মন।"

ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ

সর্বধর্মান্‌ পরিত্যজ্য মামেকং শরণং ব্রজ।
অহং ত্বাং সর্বপাপেভ্যঃ মোক্ষয়িষ্যামি মা শুচঃ॥

[গীতা—১৮।৬৬

ব্রাহ্মদিগকে উপদেশ—খৃষ্টধর্ম, ব্রাহ্মসমাজ ও পাপবাদ

শ্রীরামকৃষ্ণ (ব্রাহ্মভক্তদের প্রতি)—মনেতেই বদ্ধ, মনেতেই মুক্ত। আমি মুক্ত পুরুষ; সংসারেই থাকি বা অরণ্যেই থাকি, আমার বন্ধন কি? আমি ঈশ্বরের সন্তান; রাজাধিরাজের ছেলে; আমায় আবার বাঁধে কে? যদি সাপে কামড়ায়, 'বিষ নাই' জোর ক'রে বললে বিষ ছেড়ে যায়! তেমনি 'আমি বদ্ধ নই, আমি মুক্ত' এই কথাটি রোক ক'রে বল্‌তে বল্‌তে তাই হয়ে যায়। **মুক্তই হয়ে যায়।**

[পূর্বকথা—শ্রীরামকৃষ্ণের বাইবেল শ্রবণ—কৃষ্ণকিশোরের বিশ্বাস]

"খৃষ্টানদের একখানা বই একজন দিলে, আমি পড়ে শুনাতে বললুম। তাতে কেবল 'পাপ আর পাপ'। (কেশবের প্রতি) তোমাদের ব্রাহ্মসমাজেও কেবল 'পাপ'। যে ব্যক্তি 'আমি বদ্ধ' 'আমি বদ্ধ' বার বার বলে, সে শালা বদ্ধই হয়ে যায়! যে রাত-দিন 'আমি পাপী' 'আমি পাপী' এই করে, সে তাই হয়ে যায়।

ঈশ্বরের নামে এমন বিশ্বাস হওয়া চাই-'কি আমি তাঁর নাম করেছি, আমার এখনও পাপ থাকবে! আমার আবার পাপ কি? আমার আবার বন্ধন কি?' কৃষ্ণকিশোর পরম হিন্দু, সদাচারনিষ্ঠ ব্রাহ্মণ, সে বৃন্দাবনে গিছল। একদিন ভ্রমণ কর্‌তে কর্‌তে জলতৃষ্ণা পেয়েছিল। একটা কুয়ার কাছে গিয়ে দেখ্‌লে, একজন লোক দাঁড়িয়ে রয়েছে। তাকে বললে, ওরে তুই এক ঘটি জল আমায় দিতে পারিস? তুই কি জাত? সে বললে, ঠাকুর মহাশয়, আমি হীন জাত; মুচি। **কৃষ্ণকিশোর বললে, তুই বল, শিব।** নে, এখন জল তুলে দে।

"ভগবানের নাম করলে মানুষের দেহ মন সব শুদ্ধ হ'য়ে যায়।

"কেবল 'পাপ' আর 'নরক' এই সব কথা কেন? একবার বল যে অন্যায় কর্ম যা করেছি আর করবো না। আর তাঁর নামে বিশ্বাস কর।"

ঠাকুর প্রেমোন্মত্ত হইয়া নামমাহাত্ম্য গাইতেছেন—

"আমি দুর্গা দুর্গা বলে মা যদি মরি।
আখেরে এ দীনে, না তারো কেমনে, জানা যাবে গো শঙ্করী॥

[২৯ পৃষ্ঠা

"আমি মার কাছে কেবল ভক্তি চেয়েছিলাম। ফুল হাতে করে মার পাদপদ্মে দিয়েছিলাম; বলেছিলাম 'মা, এই নাও তোমার পাপ, এই নাও তোমার পুণ্য, আমায় শুদ্ধাভক্তি দাও; এই নাও তোমার জ্ঞান, এই নাও তোমার অজ্ঞান, আমায় শুদ্ধা ভক্তি দাও; এই নাও তোমার শুচি, এই নাও তোমার অশুচি, আমায় শুদ্ধা ভক্তি দাও; এই নাও তোমার ধর্ম, এই নাও তোমার অধর্ম, আমায় শুদ্ধা ভক্তি দাও।'

(ব্রাহ্মভক্তদের প্রতি)—"একটি রামপ্রসাদের গান শোন—

"আয় মন বেড়াতে যাবি।
কালীকল্পতরুমূলে রে (মন) চারি ফল কুড়ায়ে পাবি।
প্রবৃত্তি নিবৃত্তি জায়া, (তার) নিবৃত্তিরে সঙ্গে লবি।
ওরে বিবেক নামে তার বেটা, তত্ত্ব কথা তায় সুধাবি॥
শুচি অশুচিরে লয়ে দিব্য ঘরে কবে শুবি।
যখন দুই সতীনে পীরিত হবে, তখন শ্যামা মাকে পাবি॥
অহঙ্কার অবিদ্যা তোর, পিতা মাতায় তাড়িয়ে দিবি।
যদি মোহ গর্তে টেনে লয়, ধৈর্য খোঁটা ধ'রে র'বি॥
ধর্মাধর্ম দুটো অজা, তুচ্ছ খোঁটায় বেঁধে থুবি।
যদি না মানে নিষেধ, তবে জ্ঞান খড়্গে বলি দিবি॥
প্রথম ভার্যার সন্তানেরে দূর হতে বুঝাইবি।
যদি না মানে প্রবোধ, জ্ঞানসিন্ধু মাঝে ডুবাইবি॥
প্রসাদ বলে এমন হ'লে কালের কাছে জবাব দিবি।
তবে বাপু বাছা বাপের ঠাকুর, মনের মত মন হবি॥

"সংসারে ঈশ্বর লাভ হবে না কেন? জনক রাজার হয়েছিল। এ সংসার 'ধোঁকার টাটি' প্রসাদ বলেছিল। তাঁর পাদপদ্মে ভক্তি লাভ করলে—

'এই সংসারই মজার কুটি, আমি খাই-দাই আর মজা লুটি।
জনক রাজা মহাতেজা তার বা কিসের ছিল ত্রুটি।
সে যে এদিক্ ওদিক্ দুদিক রেখে, খেয়েছিল দুধের বাটি।

(সকলের হাস্য)

[ব্রাহ্মসমাজ ও জনক রাজা—গৃহস্থের উপায়—নির্জনে বাস ও বিবেক]

“কিন্তু ফস ক'রে জনক রাজা হওয়া যায় না। জনক রাজা নির্জনে অনেক তপস্যা করেছিলেন। সংসারে থেকেও এক-একবার নির্জনে বাস ক'রতে হয়। সংসারের বাহিরে একলা গিয়ে যদি ভগবানের জন্য তিন দিনও কাঁদা যায় সেও ভাল। এমন কি অবসর পেয়ে একদিন নির্জনে তাঁর চিন্তা যদি করা যায়, সেও ভাল। **লোকে মাগ-ছেলের জন্য এক ঘটি কাঁদে, ঈশ্বরের জন্য কে কাঁদছে বল?** নির্জনে থেকে মাঝে মাঝে ভগবানের জন্য সাধন করতে হয়! সংসারের ভিতর, বিশেষ কর্মের মধ্যে থেকে, প্রথমাবস্থায় মন স্থির করতে অনেক ব্যাঘাত হয়। যেমন ফুটপাতের গাছ; যখন চারা থাকে, বেড়া না দিলে ছাগল-গরুতে খেয়ে ফেলে। প্রথমাবস্থায় বেড়া দিতে হয়; গুঁড়ি হ'লে আর বেড়ার দরকার থাকে না। তখন গুঁড়িতে হাতী বেঁধে দিলেও কিছু হয় না।

“রোগটি হচ্ছে বিকার। আবার যে ঘরে বিকারের রোগী, সেই ঘরে জলের জালা আর আচার তেঁতুল। যদি বিকারের রোগী আরাম করতে চাও, ঘর থেকে ঠাঁই নাড়া করতে হবে। সংসারী জীব বিকারের রোগী; বিষয় জলের জালা; বিষয়ভোগতৃষ্ণা, জলতৃষ্ণা। আচার তেঁতুল মনে করলেই মুখে জল সরে, কাছে আন্‌তে হয় না; এরূপ জিনিসও ঘরে রয়েছে; যোষিৎসঙ্গ। তাই নির্জনে চিকিৎসা দরকার।

“**বিবেক বৈরাগ্য লাভ ক'রে সংসার করতে হয়।** সংসার সমুদ্রে কাম-ক্রোধাদি কুমীর আছে। হলুদ গায়ে মেখে জলে নামলে কুমীরের ভয় থাকে না। বিবেক বৈরাগ্য হলুদ সদসৎ বিচারের নাম বিবেক। ঈশ্বরই সৎ, নিত্যবস্তু। আর সব অসৎ, অনিত্য; দুই দিনের জন্য। এইটি বোধ আর ঈশ্বরে অনুরাগ। তাঁর উপর টান—ভালবাসা। গোপীদের কৃষ্ণের উপর যেরূপ টান ছিল। একটা গান শোন—

[আর উপায়—ঈশ্বরে অনুরাগ—গোপীদের মত টান বা স্নেহ]

বংশী বাজিল ঐ বিপিনে।
(আমার তো না গেলে নয়) (শ্যাম পথে দাঁড়ায়ে আছে)
তোরা যাবি কি না যাবি বল গো॥
তোদের শ্যাম কথার কথা।
আমার শ্যাম অন্তরের ব্যথা (সই)॥
তোদের বাজে বাঁশী কানের কাছে।
বাঁশী আমার বাজে হৃদয় মাঝে॥
শ্যামের বাঁশী বাজে, বেরাও রাই।
তোমা বিনা কুঞ্জের শোভা নাই॥

ঠাকুর অশ্রুপূর্ণ নয়নে এই গান গাইতে গাইতে কেশবাদি ভক্তদের বললেন, "রাধাকৃষ্ণ মানো আর নাই মানো, এই টানটুকু নাও; ভগবানের জন্য কিসে এইরূপ ব্যাকুলতা হয়, চেষ্টা করো। ব্যাকুলতা থাক্‌লেই তাঁকে লাভ করা যায়।"

সপ্তম পরিচ্ছেদ

সংনিয়ম্যেন্দ্রিয়গ্রামং সর্বত্র সমবুদ্ধয়ঃ।
তে প্রাপ্নুবন্তি মামেব সর্বভূতহিতে রতাঃ॥

[গীতা—১২, ৪

শ্রীযুক্ত কেশব সেনের সহিত নৌকাবিহার—'সর্বভূতহিতেরত'

ভাঁটা পড়িয়াছে। আগ্নেয়পোত কলিকাতাভিমুখে দ্রুতগতিতে চলিতেছে। তাই পোল পার হইয়া কোম্পানীর বাগানের দিকে আরো খানিকটা বেড়াইয়া আসিতে কাপ্তেনকে হুকুম হইয়াছে। কতদূর পর্যন্ত জাহাজ গিয়াছিল, অনেকেরই জ্ঞান নাই—তাঁহারা মগ্ন হইয়া শ্রীরামকৃষ্ণের কথা শুনিতেছেন। কোন্‌ দিক্‌ দিয়া সময় যাইতেছে, হুঁশ নাই।

এইবার মুড়ি নারিকেল খাওয়া হইতেছে। সকলেই কিছু কিছু কোঁচড়ে লইলেন ও খাইতেছেন। আনন্দের হাট। কেশব মুড়ির আয়োজন ক'রে এনেছেন। এই অবসরে ঠাকুর দেখিলেন বিজয় ও কেশব দুইজনেই সঙ্কুচিত-ভাবে বসিয়া আছেন। তখন ঠাকুর যেন দুইজন অবোধ ছেলেকে ভাব করিয়ে দিবেন। 'সর্বভূতহিতেরত।'

শ্রীরামকৃষ্ণ (কেশবের প্রতি)—ওগো! এই বিজয় এসেছেন। তোমাদের ঝগড়া-বিবাদ—যেমন শিব ও রামের যুদ্ধ (হাস্য)। রামের গুরু শিব। যুদ্ধও হোলো, দুজনে ভাবও হোলো। কিন্তু শিবের ভূতপ্রেতগুলো আর রামের বানরগুলো ওদের ঝগড়া কিচিমিচি আর মেটে না! (উচ্চহাস্য)

"আপনার লোক তা এরূপ হ'য়ে থাকে। লব কুশ যে রামের সঙ্গে যুদ্ধ করেছিলেন। আবার জানো মায়ে-ঝিয়ে আলাদা মঙ্গলবার করে। যেন মার মঙ্গল, মেয়ের মঙ্গল দুটো আলাদা। কিন্তু এর মঙ্গলে ওর মঙ্গল হয়, ওর মঙ্গলে এর মঙ্গল হয়। তেমনি তোমাদের এর একটি সমাজ আছে; আবার ওর একটি দরকার। (সকলের হাস্য)। তবে এ সব চাই। যদি বলো ভগবান নিজে লীলা করেছেন, সেখানে জটীলে-কুটীলের কি দরকার? জটীলে-কুটীলে না থাকলে লীলা পোষ্টাই হয় না। (সকলের হাস্য)। জটীলে-কুটীলে না থাকলে রগড় হয় না। (উচ্চহাস্য)।

"রামানুজ বিশিষ্টাদ্বৈতবাদী। তাঁর গুরু ছিলেন অদ্বৈতবাদী। শেষে দুজনে অমিল। গুরু-শিষ্য পরস্পর মত খণ্ডন করতে লাগল। এরূপ হয়েই থাকে। যাই হোক, তবু আপনার লোক।"

অষ্টম পরিচ্ছেদ

পিতাঽসি লোকস্য চরাচরস্য ত্বমস্য পূজ্যশ্চ গুরুর্গরীয়ান।
ন ত্বৎসমোঽস্ত্যভ্যধিকঃ কুতোঽন্যো, লোকত্রয়েঽপ্যপ্রতিমপ্রভাব ॥
[গীতা—১১, ৪৩

কেশবকে শিক্ষা—গুরুগিরি ও ব্রাহ্মসমাজ—গুরু এক সচ্চিদানন্দ

সকলে আনন্দ করিতেছেন। ঠাকুর কেশবকে বলিতেছেন, "তুমি প্রকৃতি দেখে শিষ্য করো না, তাই এইরূপ ভেঙেগ ভেঙেগ যায়।

"মানুষগুলি দেখতে সব একরকম, কিন্তু ভিন্ন প্রকৃতি। কারু ভিতর সত্ত্বগুণ বেশী, কারু রজোগুণ বেশী, কারু তমোগুণ। পুলিগুলি দেখতে সব একরকম। কিন্তু কারু ভিতর ক্ষীরের পোর, কারু ভিতর নারিকেল ছাঁই, কারু ভিতর কলায়ের পোর। (সকলের হাস্য)।

"আমার কি ভাব জানো? আমি খাই-দাই থাকি, আর সব মা জানে। আমার তিন কথাতে গায়ে কাঁটা বেঁধে। গুরু, কর্ত্তা আর বাবা।

"**গুরু এক সচ্চিদানন্দ। তিনিই শিক্ষা দিবেন।** আমার সন্তান ভাব। **মানুষ গুরু মেলে লাখ লাখ। সকলেই গুরু হতে চায়। শিষ্য কে হ'তে চায়?**

"লোক শিক্ষা দেওয়া বড় কঠিন। যদি তিনি সাক্ষাৎকার হন আর আদেশ দেন, তাহলে হ'তে পারে। নারদ শুকদেবাদির আদেশ হয়েছিল। শঙ্করের আদেশ হয়েছিল। আদেশ না হ'লে কে তোমার কথা শুনবে? কলকাতার হুজুগ তো জানো! যতক্ষণ কাঠে জ্বাল, দুধ ফোঁস ক'রে ফোলে। কাঠ টেনে নিলে কোথাও কিছু নাই। কলকাতার লোক হুজুগে। এই এখানটায় কুয়া খুঁড়ছে।—বলে জল চাই। সেখানে পাথর হো'ল তো ছেড়ে দিলে! আবার এক জায়গায় খুঁড়তে আরম্ভ ক'রলে। সেখানে বালি মিলে গেল; ছেড়ে দিলে! আর এক জায়গায় খুঁড়তে আরম্ভ হলো! এই রকম!

"আবার মনে মনে আদেশ হ'লে হয় না। তিনি সত্য-সত্যই সাক্ষাৎকার হন, আর কথা কন। তখন আদেশ হ'তে পারে। সে কথার জোর কত? পর্বত টলে যায়। শুধু লেক্‌চার? দিন কতক লোক শুনবে, তারপর ভুলে যাবে। সে কথার অনুসারে কাজ করবে না।

[পূর্বকথা—ভাবচক্ষে হালদার পুকুর দর্শন]

"ও-দেশে হালদার পুকুর ব'লে একটা পুকুর আছে। পাড়ে রোজ সকাল-বেলা লোকে বাহ্যে ক'রে রাখতো। যারা সকালবেলা আসে তারা খুব গালাগাল দেয়। আবার তারপর দিন সেইরূপ। বাহ্যে আর থামে না। (সকলের হাস্য)। তখন লোকে কোম্পানীকে জানালে। তারা একটা চাপরাসী পাঠিয়ে দিলে। সেই চাপরাসী যখন একটা কাগজ মেরে দিলে, 'বাহ্যে করিও না' তখন সব বন্ধ হ'লো। (সকলের হাস্য)।

"লোক শিক্ষা দেবে তার চাপরাস চাই। না হ'লে হাসির কথা হ'য়ে পড়ে। আপনারই হয় না, আবার অন্যলোক। **কাণা কাণাকে পথ দেখিয়ে ল'য়ে যাচ্ছে।** (হাস্য)। হিতে-বিপরীত। ভগবান লাভ হ'লে অন্তর্দৃষ্টি হয়, কার কি রোগ বোঝা যায়। উপদেশ দেওয়া যায়।

[অহঙ্কারবিমূঢ়াত্মা কর্ত্তাহং ইতি মন্যতে]

"আদেশ না থাক্‌লে 'আমি লোক শিক্ষা দিচ্ছি' এই অহঙ্কার হয়। অহঙ্কার হয় অজ্ঞানে। অজ্ঞানে বোধ হয়, আমি কর্ত্তা। ঈশ্বর কর্ত্তা, ঈশ্বরই সব ক'রছেন, আমি কিছু কর্‌ছি না, এ বোধ হলে তো সে **জীবন্মুক্ত।** 'আমি কর্ত্তা', 'আমি কর্ত্তা', এই বোধ থেকেই যত দুঃখ, অশান্তি।"

নবম পরিচ্ছেদ

তস্মাদসক্তঃ সততং কার্যং কর্ম্ম সমাচর।
অসক্তো হ্যাচরন্‌ কর্ম পরমাপ্নোতি পূরুষঃ॥

[গীতা—৩, ১৯

কেশবাদি ব্রাহ্মদিগকে কর্মযোগ সম্বন্ধে উপদেশ

শ্রীরামকৃষ্ণ (কেশবাদি ভক্তের প্রতি)—তোমরা বলো 'জগতের উপকার করা।' জগৎ কি এতটুকু গা! আর তুমি কে, যে জগতের উপকার করবে? তাঁকে সাধনের দ্বারা সাক্ষাৎকার করো। তাঁকে লাভ করো। তিনি শক্তি দিলে তবে সকলের হিত করতে পারো। নচেৎ নয়।

একজন ভক্ত—যতদিন না লাভ হয়, ততদিন সব কর্ম ত্যাগ করবো?

শ্রীরামকৃষ্ণ—না; কর্ম ত্যাগ করবে কেন? ঈশ্বরের চিন্তা, তাঁর নাম গুণ গান, নিত্যকর্ম, এ সব করতে হবে।

ব্রাহ্মভক্ত—সংসারের কর্ম? বিষয়-কর্ম?

শ্রীরামকৃষ্ণ—হাঁ, তাও ক'রবে, সংসারযাত্রার জন্য যেটুকু দরকার। কিন্তু কেঁদে নির্জনে তাঁর কাছে প্রার্থনা ক'রতে হবে, যাতে ঐ কর্মগুলি নিষ্কামভাবে করা যায়। আর বলবে, হে ঈশ্বর, আমার বিষয়-কর্ম কমিয়ে দাও, কেন না ঠাকুর দেখ্‌ছি যে বেশী কর্ম জুটলে তোমায় ভুলে যাই। মনে কর্‌ছি, নিষ্কাম কর্ম করছি, কিন্তু সকাম হ'য়ে পড়ে। হয়তো দান সদাব্রত বেশী ক'রতে গিয়ে লোকমান্য হ'য়ে পড়ে।

[পূর্বকথা—শম্ভু মল্লিকের সহিত দানাদি কর্মকাণ্ডের কথা]

"শম্ভু মল্লিক হাসপাতাল, ডাক্তারখানা, স্কুল, রাস্তা, পুষ্করিণীর কথা বলেছিল। আমি বললাম, সম্মুখে যেটা পড়লো, না করলে নয়, সেইটাই নিষ্কাম হ'য়ে করতে হয়। ইচ্ছা ক'রে বেশী কাজ জড়ানো ভালো নয়,—ঈশ্বরকে ভুলে যেতে হয়। কালীঘাটে দানই করতে লাগলো; কালীদর্শন আর হ'লো না। (হাস্য)। আগে যো সো করে ধাক্কাধুক্কি খেয়েও কালীদর্শন করতে হয়, তারপর দান যত করো আর না করো। ইচ্ছা হয় খুব করো। ঈশ্বর লাভের জন্যই কর্ম। শম্ভুকে তাই বললুম যদি ঈশ্বর সাক্ষাৎকার হন, তাঁকে কি বল্‌বে কতকগুলো হাসপাতাল, ডিস্পেনসারি করে দাও? (হাস্য)। ভক্ত কখনও তা বলে না। বরং বলবে, 'ঠাকুর! আমায় পাদপদ্মে স্থান দাও, নিজের সঙ্গে সর্বদা রাখো, পাদপদ্মে শুদ্ধাভক্তি দাও।

"কর্মযোগ বড় কঠিন। শাস্ত্রে যে কর্ম করতে বলেছে, কলিকালে করা বড় কঠিন। অন্নগত প্রাণ। বেশী কর্ম চলে না। জ্বর হ'লে কবিরাজী চিকিৎসা করতে গেলে এদিকে রোগীর হ'য়ে যায়। বেশী দেরী সয় না। এখন ডি, গুপ্ত। কলিযুগে ভক্তিযোগ, ভগবানের নাম গুণ গান আর প্রার্থনা। ভক্তি-যোগই-যুগধর্ম। (ব্রাহ্ম ভক্তদের প্রতি) তোমাদেরও ভক্তিযোগ, তোমরা হরিনাম কর, মায়ের নাম গুণ গান কর, তোমরা ধন্য! তোমাদের ভাবটি বেশ। বেদান্তবাদীদের মত তোমরা জগৎকে স্বপ্নবৎ বলো না। ওরূপ ব্রহ্মজ্ঞানী তোমরা নও, তোমরা ভক্ত। তোমরা ঈশ্বরকে ব্যক্তি (Person) বলো, এও বেশ। তোমরা ভক্ত। ব্যাকুল হ'য়ে ডাক্‌লে তাঁকে অবশ্য পাবে।"

দশম পরিচ্ছেদ

সুরেন্দ্রের বাড়ি নরেন্দ্র প্রভৃতি সঙ্গে

জাহাজ কয়লাঘাটে এইবার ফিরিয়া আসিল। সকলে নামিবার উদ্যোগ করিতে লাগিলেন। ঘরের বাহিরে আসিয়া দেখেন, কোজাগরের পূর্ণচন্দ্র হাসিতেছে, ভাগীরথী-বক্ষ কৌমুদীর লীলাভূমি হইয়াছে। ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণের জন্য গাড়ী আনিতে দেওয়া হইল। কিয়ৎক্ষণ পরে মাস্টার ও দু-একটি ভক্তের সহিত ঠাকুর গাড়িতে উঠিলেন। কেশবের ভ্রাতুষ্পুত্র নন্দলালও গাড়িতে উঠিলেন, ঠাকুরের সঙ্গে খানিকটা যাবেন।

গাড়িতে সকলে বসিলে পর জিজ্ঞাসা করিলেন, কৈ তিনি কৈ— অর্থাৎ কেশব কৈ? দেখিতে দেখিতে কেশব একাকী আসিয়া উপস্থিত। মুখে হাসি! আসিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন কে কে এঁর সঙ্গে যাবে? সকলে গাড়িতে বসিলে পর, কেশব ভূমিষ্ঠ হইয়া ঠাকুরের পদধূলি গ্রহণ করিলেন। ঠাকুরও সস্নেহে সম্ভাষণ করিয়া বিদায় দিলেন।

গাড়ী চলিতে লাগিল। ইংরেজটোলা। সুন্দর রাজপথ। পথের দুই দিকে সুন্দর সুন্দর অট্টালিকা। পূর্ণচন্দ্র উঠিয়াছে, অট্টালিকাগুলি যেন বিমল শীতল চন্দ্রকিরণে বিশ্রাম করিতেছে। দ্বারদেশে বাষ্পীয় দীপ, কক্ষমধ্যে দীপমালা, স্থানে স্থানে হার্মোনিয়াম, পিয়ানো সংযোগে ইংরেজ মহিলারা গান করিতেছে। ঠাকুর আনন্দে হাস্য করিতে করিতে যাইতেছেন। হঠাৎ বললেন, "আমার জলতৃষ্ণা পাচ্ছে; কি হবে?" কি করা যায়! নন্দলাল ইণ্ডিয়া ক্লাবের নিকট গাড়ি থামাইয়া উপরে জল আনিতে গেলেন, কাঁচের গ্লাসে করিয়া জল আনিলেন। ঠাকুর সহাস্যে জিজ্ঞাসা করিলেন, "গ্লাসটি ধোয়া তো?" নন্দলাল বললেন, হাঁ। ঠাকুর সেই গ্লাসে জল পান করিলেন।

বালকের স্বভাব। গাড়ি চালাইয়া দিলে ঠাকুর মুখ বাড়াইয়া লোকজন গাড়ি-ঘোড়া চাঁদের আলো দেখিতেছেন। সকল তাতেই আনন্দ।

নন্দলাল কলুটোলায় নামিলেন। ঠাকুরের গাড়ি সিমুলিয়া ষ্ট্রীটে শ্রীযুক্ত সুরেশ মিত্রের বাড়িতে আসিয়া লাগিল। ঠাকুর তাঁহাকে সুরেন্দ্র বলিতেন। সুরেন্দ্র ঠাকুরের পরম ভক্ত।

কিন্তু সুরেন্দ্র বাড়িতে নাই। তাঁহাদের নূতন বাগানে গিয়াছেন। বাড়ির লোকেরা বসিতে নীচের ঘর খুলিয়া দিলেন। গাড়ি ভাড়া দিতে হবে। কে দিবে? সুরেন্দ্র থাকিলে সেই দিত। ঠাকুর একজন ভক্তকে বললেন, "ভাড়াটা মেয়েদের কাছ থেকে চেয়ে নে না। ওরা কি জানে না, ওদের ভাতাররা যায় আসে।" (সকলের হাস্য)।

নরেন্দ্র পাড়াতেই থাকেন। ঠাকুর নরেন্দ্রকে ডাকিতে পাঠাইলেন। এদিকে বাড়ির লোকেরা দোতলার ঘরে ঠাকুরকে বসাইলেন। ঘরের মেঝেতে চাদর পাতা, দু-চারটে তাকিয়া তার উপর; কক্ষ-প্রাচীরে সুরেন্দ্রের বিশেষ যত্নে প্রস্তুত ছবি (Oil painting) যাহাতে কেশবকে ঠাকুর দেখাইতেছেন হিন্দু, মুসলমান, খৃষ্টান, বৌদ্ধ সকল ধর্মের সমন্বয়। আর বৈষ্ণব, শাক্ত, শৈব ইত্যাদি সকল সম্প্রদায়ের সমন্বয়।

ঠাকুর বসিয়া সহাস্যে গল্প করিতেছেন, এমন সময় নরেন্দ্র আসিয়া পোঁছিলেন, তখন ঠাকুরের আনন্দ যেন দ্বিগুণ হইল। তিনি বলিলেন, "আজ কেশব সেনের সঙ্গে কেমন জাহাজে ক'রে বেড়াতে গিছিলাম। বিজয় ছিল, এরা সব ছিল।" মাষ্টারকে নির্দেশ করিয়া বলিলেন, "একে জিজ্ঞাসা কর, কেমন বিজয় আর কেশবকে বললুম, মায়ে-ঝিয়ে মঙ্গলবার, আর জটীলে-কুটীলে না থাক্‌লে লীলা পোষ্টাই হয় না, এই সব কথা। (মাষ্টারের প্রতি) কেমন গা?

মাষ্টার—আজ্ঞা হাঁ।

রাত্রি হইল, তবু সুরেন্দ্র ফিরিলেন না। ঠাকুর দক্ষিণেশ্বরে যাইবেন, আর দেরী করা যায় না, রাত সাড়ে দশটা। রাস্তায় চাঁদের আলো।

গাড়ি আসিল। ঠাকুর উঠিলেন। নরেন্দ্র ও মাষ্টার প্রণাম করিয়া কলিকাতাস্থিত স্ব স্ব বাটীতে প্রত্যাগমন করিলেন।

তৃতীয় খণ্ড

সিঁথি ব্রাহ্মসমাজ দর্শন ও শ্রীযুক্ত শিবনাথ প্রভৃতি ব্রাহ্ম ভক্তদিগের সহিত কথোপকথন ও আনন্দ

প্রথম পরিচ্ছেদ

উৎসব মন্দিরে শ্রীরামকৃষ্ণ

শ্রীশ্রীপরমহংসদেব সিঁথির ব্রাহ্মসমাজ দর্শন করিতে আসিয়াছেন। ২৮শে অক্টোবর ইং ১৮৮২ খৃষ্টাব্দ, শনিবার। আশ্বিন মাসের কৃষ্ণা দ্বিতীয়া তিথি।

আজ এখানে মহোৎসব। ব্রাহ্মসমাজের ষাণ্মাষিক। তাই ভগবান শ্রীরামকৃষ্ণের এখানে নিমন্ত্রণ। বেলা ৩টা-৪টার সময় তিনি কয়েকজন ভক্তসঙ্গে গাড়ি করিয়া দক্ষিণেশ্বরের কালীবাটী হইতে শ্রীযুক্ত বেণীমাধব পালের মনোহর উদ্যান-বাটীতে উপস্থিত হইলেন। এই উদ্যানবাটীতে ব্রাহ্মসমাজের অধিবেশন হইয়া থাকে। ব্রাহ্মসমাজকে তিনি বড় ভালবাসেন। ব্রাহ্মভক্তগণও তাঁহাকে সাতিশয় ভক্তি-শ্রদ্ধা করেন। ইহার পূর্বদিন অর্থাৎ শুক্রবার বৈকালে কত আনন্দ করিতে করিতে সশিষ্য শ্রীযুক্ত কেশবচন্দ্র সেনের সহিত ভাগীরথী-বক্ষে কালীবাড়ী হইতে কলিকাতা পর্যন্ত ভক্তসঙ্গে স্টীমার করিয়া বেড়াইতে আসিয়াছিলেন।

সিঁথি পাইকপাড়ার নিকট। কলিকাতা হইতে দেড় ক্রোশ উত্তরে। উদ্যান-বাটীটি মনোহর বলিয়াছি। স্থানটি অতি নিভৃত, ভগবানের উপাসনার পক্ষে বিশেষ উপযোগী। উদ্যানস্বামী বৎসরে দুইবার মহোৎসব করিয়া থাকেন। একবার শরৎকালে আর একবার বসন্তে। এই মহোৎসব উপলক্ষে তিনি কলিকাতার ও সিঁথির নিকটবর্তী গ্রামের অনেক ভক্তদিগকে নিমন্ত্রণ করিয়া থাকেন। তাই আজ কলিকাতা হইতে শিবনাথ প্রভৃতি ভক্তগণ আসিয়াছেন। তাঁহাদের মধ্যে অনেকেই প্রাতঃকালে উপাসনায় যোগদান করিয়াছেন, আবার সন্ধ্যাকালীন উপাসনা হইবে, তাই প্রতীক্ষা করিতেছেন। বিশেষতঃ তাঁহারা শুনিয়াছেন যে, অপরাহ্নে মহাপুরুষের আগমন হইবে ও তাঁহারা তাঁহার আনন্দমূর্তি দেখিতে পাইবেন, তাঁহার হৃদয়মুগ্ধকারী কথামৃত পান করিতে পাইবেন, তাঁহার সেই মধুর সংকীর্ত্তন শুনিতে ও দেবদুর্লভ হরিপ্রেমময় নৃত্য দেখিতে পাইবেন।

অপরাহ্নে বাগানটি বহুলোক সমাকীর্ণ হইয়াছে। কেহ লতামণ্ডপচ্ছায়ায় কাষ্ঠাসনে উপবিষ্ট। কেহ বা সুন্দর বাপীতটে বন্ধু সমভিব্যাহারে বিচরণ করিতেছেন। অনেকেই সমাজগৃহে শ্রীরামকৃষ্ণের আগমন প্রতীক্ষায় পূর্ব হইতেই আসন অধিকার করিয়া বসিয়া আছেন। উদ্যানের প্রবেশদ্বারে পানের

দোকান। প্রবেশ করিয়া বোধ হয় যেন পূজাবাড়ি—রাত্রিকালে যাত্রা হইবে। চতুর্দিক আনন্দে পরিপূর্ণ। শরতের নীল আকাশে আনন্দ প্রতিভাসিত হইতেছে। উদ্যানের বৃক্ষলতাগুল্ম মধ্যে প্রভাত হইতে আনন্দের সমীরণ বহিতেছে। আকাশ, জীবজন্তু, বৃক্ষলতা, যেন একতানে গান করিতেছে—

'আজি কি হরষ সমীর বহে প্রাণে—ভগবৎ মঙ্গল কিরণে!'

সকলেই যেন ভগবদ্দর্শন-পিপাসু। এমন সময়ে শ্রীশ্রীপরমহংসদেবের গাড়ি সমাজগৃহের সম্মুখে উপস্থিত হইল।

সকলেই গাত্রোত্থান করিয়া মহাপুরুষের অভ্যর্থনা করিতেছেন। তিনি আসিয়াছেন। চারিদিকের লোক তাঁহাকে মণ্ডলাকারে ঘেরিতেছে।

সমাজগৃহের প্রধান প্রকোষ্ঠ মধ্যে বেদী রচনা হইয়াছে। সে স্থান লোকে পরিপূর্ণ। সম্মুখে দালান, সেখানে পরমহংসদেব সমাসীন, সেখানেও লোক। আর দালানের দুই পার্শ্বস্থিত দুই ঘর,—সে ঘরেও লোক,—ঘরের দ্বারদেশে উদ্‌গ্রীব হইয়া লোকে দণ্ডায়মান। দালানে উঠিবার সোপানপরম্পরা এক প্রান্ত হইতে অপর প্রান্ত পর্যন্ত বিস্তৃত। সেই সোপানও লোকে লোকাকীর্ণ; সোপানের অনতিদূরে ২/৩টি বৃক্ষ, পার্শ্বে লতামণ্ডপ,—সেখানে কয়েকখানি কাষ্ঠাসন। তথা হইতেও লোকে উদ্‌গ্রীব ও উৎকর্ণ হইয়া মহাপুরুষের দিকে দৃষ্টিপাত করিতেছে। সারি সারি ফল ও পুষ্পের বৃক্ষ, মধ্যে পথ। বৃক্ষ সকল সমীরণে ঈষৎ হেলিতেছে দুলিতেছে, যেন আনন্দভরে মস্তক অবনত করিয়া তাঁহাকে অভ্যর্থনা করিতেছে।

ঠাকুর পরমহংসদেব হাসিতে হাসিতে আসন গ্রহণ করিলেন। এখন সব চক্ষু এককালে তাঁহার আনন্দমূর্তির উপর পতিত হইল। যেমন, যতক্ষণ নাট্যশালায় অভিনয় আরম্ভ না হয়, ততক্ষণ দর্শকবৃন্দের মধ্যে কেহ হাসিতেছে, কেহ বিষয়-কর্মের কথা কহিতেছে, কেহ একাকী অথবা বন্ধুসঙ্গে পাদচারণ করিতেছে, কেহ পান খাইতেছে, কেহ বা তামাক খাইতেছে; কিন্তু যাই ড্রপসিন উঠিয়া গেল, অমনি সকলে সব কথাবার্তা বন্ধ করিয়া অনন্যমন হইয়া একদৃষ্টে নাট্যরঙ্গ দেখিতে থাকে! অথবা যেমন, নানা পুষ্প-পরিভ্রমণকারী ষট্‌পদবৃন্দ পদ্মের সন্ধান পাইলে অন্য কুসুম ত্যাগ করিয়া পদ্মমধু পান করিতে ছুটিয়া আসে।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

মাঞ্চ যোঽব্যভিচারেণ ভক্তিযোগেন সেবতে।
স গুণান সমতীত্যৈতান্ ব্রহ্মভূয়ায় কল্পতে ॥

[গীতা—১৪, ২৬

ভক্ত-সম্ভাষণে

সহাস্য বদনে ঠাকুর শ্রীযুক্ত শিবনাথ আদি ভক্তগণের দিকে দৃষ্টি নিক্ষেপ করিতে লাগিলেন। বলিতেছেন, "এই যে শিবনাথ! দেখ, তোমরা ভক্ত, তোমাদের দেখে বড় আনন্দ হয়। গাঁজাখোরের স্বভাব, আর একজন গাঁজাখোরকে দেখ্‌লে ভারী খুশি হয়। হয় তো তার সঙ্গে কোলাকুলিই করে। (শিবনাথ ও সকলের হাস্য)।

[সংসারী লোকের স্বভাব—নাম মাহাত্ম্য]

"যাদের দেখি ঈশ্বরে মন নাই, তাদের আমি বলি, 'তোমরা একটু ঐখানে গিয়ে বস। অথবা বলি, যাও বেশ বিল্ডিং (রাসমণির কালীবাটীর মন্দির সকল) দেখ গে।' (সকলের হাস্য)।

"আবার দেখছি যে ভক্তদের সঙ্গে হাবাতে লোক এসেছে। তাদের ভারী বিষয়-বুদ্ধি! তাদের ঈশ্বরীয় কথা ভাল লাগে না। ওরা হয়ত আমার সঙ্গে অনেকক্ষণ ধ'রে ঈশ্বরীয় কথা বল্‌ছে। এদিকে এরা আর ব'সে থাকতে পারে না, ছট্‌ফট্ করছে। বার বার তাদের কানে কানে ফিস্ ফিস্ ক'রে বলছে, 'কখন যাবে—কখন যাবে।' তারা হয়ত বললে, 'দাঁড়াও না হে, আর একটু পরে যাব।' তখন এরা বিরক্ত হ'য়ে বলে, 'তবে তোমরা কথা কও, আমরা নৌকায় গিয়ে বসি।' (সকলের হাস্য)।

"সংসারী লোকদের যদি বল যে সব ত্যাগ ক'রে ঈশ্বরের পাদপদ্মে মগ্ন হও, তা তারা কখনও শুনবে না। তাই বিষয়ী লোকদের টানবার জন্য গৌর-নিতাই দুই ভাই মিলে পরামর্শ ক'রে এই ব্যবস্থা করেছিলেন—'মাগুর মাছের ঝোল, যুবতী মেয়ের কোল, বোল হরি বোল।' প্রথম দুইটির লোভে অনেকে হরিবোল ব'লতে যেতো। হরিনাম-সুধার একটু আস্বাদ পেলে বুঝতে পারতো যে 'মাগুর মাছের ঝোল, আর কিছুই নয়, হরিপ্রেমে যে অশ্রু পড়ে তাই'; 'যুবতী মেয়ে কিনা'—পৃথিবী। 'যুবতী মেয়ের কোল কিনা'—ধূলায় হরিপ্রেমে গড়াগড়ি।

"নিতাই কোন রকমে হরিনাম করিয়ে নিতেন। চৈতন্যদেব বলেছিলেন ঈশ্বরের নামের ভারী মাহাত্ম্য। শীঘ্র ফল না হ'তে পারে কিন্তু কখনও না কখনও এর ফল হবেই হবে। যেমন কেউ বাড়ির কার্ণিসের উপর বীজ রেখে গিয়েছিল; অনেকদিন পরে বাড়ি ভূমিসাৎ হ'য়ে গেল, তখনও সেই বীজ মাটিতে পড়ে গাছ হ'ল ও তার ফলও হ'ল।

[মনুষ্যপ্রকৃতি ও গুণত্রয়—ভক্তির সত্ত্ব, রজঃ, তমঃ]

"যেমন সংসারীদের মধ্যে সত্ত্ব, রজঃ, তমঃ তিন গুণ আছে; তেমনি ভক্তিরও সত্ত্ব, রজঃ, তমঃ তিন গুণ আছে।

"সংসারীর সত্ত্বগুণ কি রকম জান? বাড়িটি এখানে ভাংগা, ওখানে ভাংগা—মেরামত করে না। ঠাকুরদালানে পায়রাগুলো হাগ্‌ছে, উঠানে শেওলা প'ড়ছে হুঁশ নাই। আসবাবগুলো পুরানো, ফিট-ফাট করবার চেষ্টা নাই। কাপড় যা তাই একখানা হ'লেই হলো। লোকটি খুব শান্ত, শিষ্ট, দয়ালু, অমায়িক; কারু কোনও অনিষ্ট করে না।

"সংসারীর রজোগুণের লক্ষণ আবার আছে। ঘড়ি, ঘড়ির চেন, হাতে দুই-তিনটা আংটি। বাড়ির আসবাব খুব ফিটফাট। দেওয়ালে কুইনের ছবি, রাজপুত্রের ছবি, কোন বড় মানুষের ছবি। বাড়িটি চুনকাম করা, যেন কোনখানে একটু দাগ নাই। নানা রকমের ভাল পোষাক। চাকরদেরও পোষাক। এমনি এমনি সব।

"সংসারীর তমোগুণের লক্ষণ—নিদ্রা, কাম, ক্রোধ, অহঙ্কার এই সব।

"আর ভক্তির সত্ত্ব আছে। যে ভক্তের সত্ত্বগুণ আছে, সে ধ্যান করে অতি গোপনে। সে হয়ত মশারির ভিতর ধ্যান করে,—সবাই জানছে, ইনি শুয়ে আছেন, বুঝি রাত্রে ঘুম হয় নাই, তাই উঠতে দেরী হচ্ছে। এদিকে শরীরের উপর আদর কেবল পেটচলা পর্যন্ত; শাকান্ন পেলেই হ'ল। খাবার ঘটা নাই। পোষাকের আড়ম্বর নাই। বাড়ির আসবাবের জাঁকজমক নাই। আর সত্ত্বগুণী ভক্ত কখনও তোষামোদ ক'রে ধন লয় না।

"ভক্তির রজঃ থাক্‌লে সে ভক্তের হয়তো তিলক আছে, রুদ্রাক্ষের মালা আছে। সেই মালার মধ্যে মধ্যে আবার একটি সোনার দানা! (সকলের হাস্য)। যখন পূজা করে, গরদের কাপড় প'রে পূজা করে।"

তৃতীয় পরিচ্ছেদ

ক্লৈব্যং মাস্ম গমঃ পার্থ নৈতৎ ত্বয্যুপপদ্যতে।
ক্ষুদ্রং হৃদয়দৌর্বল্যং ত্যক্ত্বোত্তিষ্ঠ পরন্তপ॥

[গীতা—২, ৩

নামমাহাত্ম্য ও পাপ—তিন প্রকার আচার্য

শ্রীরামকৃষ্ণ—ভক্তির তমঃ যার হয়, তার বিশ্বাস জ্বলন্ত। ঈশ্বরের কাছে সেরূপ ভক্ত জোর করে। যেন ডাকাতি ক'রে ধন কেড়ে লওয়া। 'মারো কাটো বাঁধো।' এইরূপ ডাকাত-পড়া ভাব।

ঠাকুর ঊর্ধ্বদৃষ্টি, তাঁহার প্রেমরসাভিসিক্ত কণ্ঠে গাহিতেছেন—

গয়া গঙ্গা প্রভাসাদি কাশী কাঞ্চী কেবা চায়।
কালী কালী কালী বলে আমার অজপা যদি ফুরায়॥
ত্রিসন্ধ্যা যে বলে কালী, পূজা সন্ধ্যা সে কি চায়।
সন্ধ্যা তার সন্ধানে ফেরে, কভু সন্ধি নাহি পায়॥
দয়া ব্রত দান আদি, আর কিছু না মনে লয়।
মদনের যাগযজ্ঞ, ব্রহ্মময়ীর রাঙ্গা পায়॥
কালী নামের এত গুণ, কেবা জান্‌তে পারে তায়।
দেবাদিদেব মহাদেব, যাঁর পঞ্চমুখে গুণ গায়॥

ঠাকুর ভাবোন্মত্ত, যেন অগ্নিমন্ত্রে দীক্ষিত হইয়া গাইতেছেন—

আমি দুর্গা দুর্গা বলে মা যদি মরি।
আখেরে এ দীনে, না তারো কেমনে, জানা যাবে গো শঙ্করী।

"কি! আমি তাঁর নাম ক'রেছি—আমার আবার পাপ! আমি তাঁর ছেলে! তাঁর ঐশ্বর্যের অধিকারী! এমন রোক হওয়া চাই!

"তমোগুণকে মোড় ফিরিয়ে দিলে ঈশ্বর লাভ হয়। তাঁর কাছে জোর কর; তিনি তো পর নন, তিনি তো আপনার লোক। আবার দেখ, এই তমোগুণকে পরের মঙ্গলের জন্য ব্যবহার করা যায়। বৈদ্য তিন প্রকার—উত্তম বৈদ্য, মধ্যম বৈদ্য অধম বৈদ্য। যে বৈদ্য এসে নাড়ী টিপে 'ঔষধ খেও হে' এই কথা ব'লে চলে যায়, সে অধম বৈদ্য—রোগী খেলে কিনা এ খবর সে লয় না। যে বৈদ্য রোগীকে ঔষধ খেতে অনেক ক'রে বুঝায়—যে মিষ্ট কথাতে বলে, 'ওহে ঔষধ না খেলে কেমন ক'রে ভাল হবে। লক্ষ্মীটি খাও, আমি নিজে ঔষধ মেড়ে দিচ্ছি খাও'—সে মধ্যম বৈদ্য। আর যে বৈদ্য, রোগী কোনও মতে খেলে না দেখে বুকে হাঁটু দিয়ে, জোর করে ঔষধ খাইয়ে দেয় সে উত্তম বৈদ্য। এইটি বৈদ্যের তমোগুণ, এ গুণে রোগীর মঙ্গল হয়, অপকার হয় না।

"বৈদ্যের মত আচার্যও তিন প্রকার। যিনি ধর্মোপদেশ দিয়ে শিষ্যদের আর কোন খবর লন না—সে আচার্য অধম। যিনি শিষ্যদের মঙ্গলের জন্য তাদের বার বার বুঝান, যাতে তারা উপদেশগুলি ধারণা করতে পারে, অনেক অনুনয়-বিনয় করেন, ভালবাসা দেখান—তিনি মধ্যম থাকের আচার্য। আর যখন শিষ্যেরা কোনও মতে শুনছে না দেখে কোনও আচার্য জোর পর্যন্ত করেন, তাঁরে বলি উত্তম আচার্য।"

চতুর্থ পরিচ্ছেদ

"যতোবাচো নিবর্ত্তন্তে অপ্রাপ্য মনসা সহ।"

[তৈত্তিরীয় উপনিষদ

ব্রহ্মের স্বরূপ মুখে বলা যায় না

একজন ব্রাহ্মভক্ত জিজ্ঞাসা করিলেন, ঈশ্বর সাকার না নিরাকার?

শ্রীরামকৃষ্ণ—তাঁর ইতি করা যায় না। তিনি নিরাকার আবার সাকার। ভক্তের জন্য তিনি সাকার। যারা জ্ঞানী অর্থাৎ জগৎকে যাদের স্বপ্নবৎ মনে হ'য়েছে, তাদের পক্ষে তিনি নিরাকার। ভক্ত জানে আমি একটি জিনিস, জগৎ একটি জিনিস। তাই ভক্তের ঈশ্বর 'ব্যক্তি' (Personal God) হ'য়ে দেখা দেন। জ্ঞানী—যেমন বেদান্তবাদী—কেবল নেতি নেতি বিচার করে। বিচার ক'রে জ্ঞানীর বোধে বোধ হয় যে, 'আমি মিথ্যা জগৎও মিথ্যা—স্বপ্নবৎ।' জ্ঞানী ব্রহ্মকে বোধে বোধ করে। তিনি যে কি, মুখে বলতে পারে না।

"কি রকম জান? যেন সচ্চিদানন্দ সমুদ্র—কূল-কিনারা নাই—ভক্তিহিমে স্থানে স্থানে জল বরফ হ'য়ে যায়—বরফ আকারে জমাট বাঁধে। অর্থাৎ ভক্তের কাছে তিনি ব্যক্তভাবে, কখন কখন সাকার রূপ ধ'রে থাকেন। জ্ঞান-সূর্য উঠলে সে বরফ গলে যায়, তখন আর ঈশ্বরকে ব্যক্তি বলে বোধ হয় না।—তাঁর রূপও দর্শন হয় না। কি তিনি মুখে বলা যায় না। কে বলবে? যিনি বল্‌বেন, তিনিই নাই। তাঁর 'আমি' আর খুঁজে পান না।

"বিচার কর্‌তে কর্‌তে আমি-টামি আর কিছুই থাকে না। পেঁয়াজের প্রথমে লাল খোসা তুমি ছাড়ালে, তারপর সাদা পুরু খোসা। এইরূপ বরাবর ছাড়াতে ছাড়াতে ভিতরে কিছু খুঁজে পাওয়া যায় না।

"যেখানে নিজের আমি খুঁজে পাওয়া যায় না—আর খুঁজেই বা কে?—সেখানে ব্রহ্মের স্বরূপ বোধে বোধ কিরূপ হয় সে কথা কে বলবে!

"একটা লুণের পুতুল সমুদ্র মাপ্‌তে গিছিল। সমুদ্রে যাই নেমেছে অমনি গ'লে মিশে গেল। তখন খবর কে দিবে?

"পূর্ণ জ্ঞানের লক্ষণ,—পূর্ণ জ্ঞান হ'লে মানুষ চুপ হ'য়ে যায়। তখন আমি-রূপ লুণের পুতুল সচ্চিদানন্দরূপ সাগরে গ'লে এক হ'য়ে যায়, আর একটুও ভেদবুদ্ধি থাকে না।

"বিচার করা যতক্ষণ না শেষ হয়, লোকে ফড়্‌ ফড়্‌ ক'রে তর্ক করে। শেষ হ'লে চুপ হ'য়ে যায়। কলসী পূর্ণ হ'লে, কলসীর জল পুকুরের জল এক হ'লে আর শব্দ থাকে না। যতক্ষণ না কলসী পূর্ণ হয় ততক্ষণ শব্দ।

"আগেকার লোকে বলতো, কালাপানিতে জাহাজ গেলে ফেরে না।

['আমি' কিন্তু যায় না]

"আমি ম'লে ঘুচিবে জঞ্জাল (হাস্য)। হাজার বিচার কর, 'আমি' যায় না। তোমার আমার পক্ষে 'ভক্ত আমি' এ অভিমান ভাল।

"ভক্তের পক্ষে সগুণ ব্রহ্ম। অর্থাৎ তিনি সগুণ—একজন ব্যক্তি হ'য়ে, রূপ হ'য়ে দেখা দেন। তিনিই প্রার্থনা শুনেন। তোমরা যে প্রার্থনা করো, তাঁকেই করো। তোমরা বেদান্তবাদী নও, জ্ঞানী নও, তোমরা ভক্ত। সাকার রূপ মানো আর না মানো এসে যায় না। ঈশ্বর একজন ব্যক্তি ব'লে বোধ থাকলেই হলো —যে ব্যক্তি প্রার্থনা শুনেন, সৃষ্টি-স্থিতি প্রলয় করেন, যে ব্যক্তি অনন্তশক্তি।

"ভক্তিপথেই তাঁকে সহজে পাওয়া যায়।"

পঞ্চম পরিচ্ছেদ

ভক্ত্যা ত্বনন্যয়া শক্য অহমেবংবিধোঽর্জুন।
জ্ঞাতুং দ্রষ্টুং চ তত্ত্বেন প্রবেষ্টুং চ পরন্তপ॥

[গীতা—১১, ৫৪

ঈশ্বর দর্শন—সাকার না নিরাকার ?

একজন ব্রাহ্মভক্ত জিজ্ঞাসা করিলেন, মহাশয় ঈশ্বরকে কি দেখা যায় ? যদি দেখা যায়, দেখতে পাই না কেন ?

শ্রীরামকৃষ্ণ—হাঁ, অবশ্য দেখা যায়—সাকার রূপ দেখা যায়, আবার অরূপও দেখা যায়। তা তোমায় বুঝাব কেমন করে ?

ব্রাহ্মভক্ত—কি উপায়ে দেখা যেতে পারে ?

শ্রীরামকৃষ্ণ—ব্যাকুল হ'য়ে তাঁর জন্য কাঁদতে পার ?

"লোকে ছেলের জন্য, স্ত্রীর জন্য, টাকার জন্য, এক ঘটি কাঁদে। কিন্তু ঈশ্বরের জন্য কে কাঁদ্‌ছে ? যতক্ষণ ছেলে চুষি নিয়ে ভুলে থাকে, মা রান্না-বান্না বাড়ির সব কাজ করে। ছেলের যখন চুষি আর ভাল লাগে না—চুষি ফেলে চীৎকার ক'রে কাঁদে, তখন মা ভাতের হাঁড়ি নামিয়ে দুড়্ দুড়্ ক'রে এসে ছেলেকে কোলে লয়।"

ব্রাহ্মভক্ত—মহাশয়! ঈশ্বরের স্বরূপ নিয়ে এত নানা মত কেন ? কেউ বলে সাকার—কেউ বলে নিরাকার—আবার সাকারবাদীদের নিকট নানা রূপের কথা শুনতে পাই। এত গণ্ডগোল কেন ?

শ্রীরামকৃষ্ণ—যে ভক্ত যেরূপ দেখে, সে সেইরূপ মনে করে। বাস্তবিক কোনও গণ্ডগোল নাই। তাঁকে কোন রকমে যদি একবার লাভ করতে পারা যায়, তা হ'লে তিনি সব বুঝিয়ে দেন। সে পাড়াতেই গেলে না—সব খবর পাবে কেমন করে ?

"একটা গল্প শোন—

"একজন বাহ্যে গিছিল। সে দেখ্‌লে যে গাছের উপর একটি জানোয়ার রয়েছে। সে এসে আর একজনকে বললে—দেখ, অমুক গাছে একটি সুন্দর লাল রঙের জানোয়ার দেখে এলাম। লোকটি উত্তর কর্‌লে, 'আমি যখন বাহ্যে গিছিলাম আমিও দেখেছি—তা সে লাল রঙ হ'তে যাবে কেন? সে যে সবুজ রঙ!' আর একজন বললে, 'না না—আমি দেখেছি, হল্‌দে!' এইরূপে আরও কেউ কেউ বল্‌লে 'না সাদা, বেগুনী, নীল' ইত্যাদি। শেষে ঝগড়া। তখন তারা গাছতলায় গিয়ে দেখে, একজন লোক বসে আছে। তাকে জিজ্ঞাসা করাতে সে বল্‌লে, 'আমি এই গাছতলায় থাকি, আমি সে জানোয়ারটিকে বেশ জানি—তোমরা যা যা বল্‌ছ, সব সত্য—সে কখন লাল, কখন সবুজ, কখন হল্‌দে, কখন নীল আরও সব কত কি হয়! বহুরূপী। আবার কখনও দেখি, কোনও রঙই নাই। কখনও সগুণ, কখনও নির্গুণ।'

"অর্থাৎ যে ব্যক্তি সদা-সর্বদা ঈশ্বর-চিন্তা করে সেই জানতে পারে তাঁর স্বরূপ কি? সে ব্যক্তিই জানে যে তিনি নানারূপে দেখা দেন, নানাভাবে দেখা দেন—তিনি সগুণ, আবার তিনি নির্গুণ। যে গাছতলায় থাকে, সেই জানে বহুরূপীর নানা রঙ—আবার কখন কখন কোন রঙই থাকে না। অন্য লোকে কেবল তর্ক ঝগড়া করে কষ্ট পায়।

"কবীর ব'লতো, 'নিরাকার আমার বাপ, সাকার আমার মা।'

"ভক্ত যে রূপটি ভালবাসে, সেইরূপে তিনি দেখা দেন—তিনি যে ভক্তবৎসল!

"পুরাণে আছে, বীরভক্ত হনুমানের জন্য তিনি রামরূপ ধ'রেছিলেন।

[কালীরূপ ও শ্যামরূপের ব্যাখ্যা—'অনন্ত'কে জানা যায় না]

"বেদান্ত বিচারের কাছে রূপ-টুপ উড়ে যায়। সে বিচারের শেষ সিদ্ধান্ত এই—ব্রহ্ম সত্য, আর নামরূপযুক্ত জগৎ মিথ্যা। যতক্ষণ 'আমি ভক্ত' এই অভিমান থাকে, ততক্ষণই ঈশ্বরের রূপ দর্শন আর ঈশ্বরকে ব্যক্তি (Person) ব'লে বোধ সম্ভব হয়। বিচারের চক্ষে দেখলে, ভক্তের 'আমি' অভিমান, ভক্তকে একটু দূরে রেখেছে।

কালীরূপ কি শ্যামরূপ চৌদ্দ পোয়া কেন? দূরে ব'লে। দূরে ব'লে সূর্য ছোট দেখায়। কাছে যাও তখন এত বৃহৎ দেখাবে যে, ধারণা করতে পারবে না। আবার কালীরূপ কি শ্যামরূপ শ্যামবর্ণ কেন? সেও দূর ব'লে। যেমন দীঘির জল দূরে থেকে সবুজ, নীল বা কালবর্ণ দেখায়, কাছে গিয়ে হাতে ক'রে জল তুলে দেখ, কোন রঙই নাই। আকাশ দূরে দেখলে নীল বর্ণ, কাছে দেখ, কোন রঙ নাই।

"তাই বলছি, বেদান্ত দর্শনের বিচারে ব্রহ্ম নির্গুণ। তাঁর কি স্বরূপ, তা

মুখে বলা যায় না। কিন্তু যতক্ষণ তুমি নিজে সত্য, ততক্ষণ জগৎও সত্য। ঈশ্বরের নানারূপও সত্য, ঈশ্বরকে ব্যক্তিবোধও সত্য।

"ভক্তিপথ তোমাদের পথ। এ খুব ভাল—এ সহজ পথ। অনন্ত ঈশ্বরকে কি জানা যায়? আর তাঁকে জানবারই বা কি দরকার? এই দুর্লভ মানুষ জনম পেয়ে আমার দরকার তাঁর পাদপদ্মে যেন ভক্তি হয়।

"যদি আমার একঘটি জলে তৃষ্ণা যায়, পুকুরে কত জল আছে, এ মাপবার আমার কি দরকার? আমি আধ বোতল মদে মাতাল হ'য়ে যাই—শুঁড়ির দোকানে কত মণ মদ আছে, এ হিসাবে আমার কি দরকার? অনন্তকে জানার দরকারই বা কি?"

ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ

যস্ত্বাত্মরতিরেব স্যাদাত্মতৃপ্তশ্চ মানবঃ।
আত্মন্যেব চ সন্তুষ্টস্তস্য কার্যং ন বিদ্যতে॥
[গীতা—৩, ১৭

ঈশ্বর লাভের লক্ষণ—সপ্তভূমি ও ব্রহ্মজ্ঞান

শ্রীরামকৃষ্ণ—বেদে ব্রহ্মজ্ঞানীর নানারকম অবস্থা বর্ণনা আছে। সে পথ, জ্ঞানপথ —বড় কঠিন পথ। বিষয়বুদ্ধির—কামিনী-কাঞ্চনে আসক্তির লেশমাত্র থাকলে—জ্ঞান হয় না। এ পথ কলিযুগের পক্ষে নয়।

এই সম্বন্ধে বেদে সপ্তভূমির (Seven Planes) কথা আছে। এই সাত ভূমি মনের স্থান। যখন সংসারে মন থাকে, তখন লিঙ্গ, গুহ্য, নাভি মনের বাসস্থান। মনের তখন ঊর্ধ্বদৃষ্টি থাকে না—কেবল কামিনী-কাঞ্চনে মন থাকে। মনের চতুর্থ ভূমি—হৃদয়। তখন প্রথম চৈতন্য হয়েছে। আর চারিদিকে জ্যোতিঃ দর্শন হয়। তখন সে ব্যক্তি ঐশ্বরিক জ্যোতিঃ দেখে অবাক্ হ'য়ে বলে, 'একি!' 'একি!' তখন আর নীচের দিকে (সংসারের দিকে) মন যায় না।

"মনের পঞ্চম ভূমি—কণ্ঠ। মন যার কণ্ঠে উঠেছে, তার অবিদ্যা অজ্ঞান সব গিয়ে, ঈশ্বরীয় কথা বই অন্য কোন কথা শুন্‌তে বা বল্‌তে ভাল লাগে না। যদি কেউ অন্য কথা বলে, সেখান থেকে উঠে যায়।

"মনের ষষ্ঠ ভূমি—কপাল। মন সেখানে গেলে অহর্নিশি ঈশ্বরীয় রূপ দর্শন হয়। তখনও একটু 'আমি' থাকে। সে ব্যক্তি সেই নিরুপম রূপ দর্শন ক'রে উন্মত্ত হ'য়ে, সেই রূপকে স্পর্শ আর আলিঙ্গন কর্‌তে যায় কিন্তু পারে না। যেমন লণ্ঠনের ভিতর আলো আছে, মনে হয়, এই আলো ছুঁলুম ছুঁলুম; কিন্তু কাঁচ ব্যবধান আছে বলে ছুঁতে পারা যায় না।

"শিরোদেশ—সপ্তম ভূমি—সেখানে মন গেলে সমাধি হয় ও ব্রহ্মজ্ঞানীর ব্রহ্মের প্রত্যক্ষ দর্শন হয়। কিন্তু সে অবস্থায় শরীর অধিক দিন থাকে না। সর্বদা বেহুঁশ, কিছু খেতে পারে না, মুখে দুধ দিলে গড়িয়ে যায়। এই ভূমিতে একুশ দিনে মৃত্যু। এই ব্রহ্মজ্ঞানীর অবস্থা। তোমাদের ভক্তিপথ। খুব ভাল আর সহজ।

[সমাধি হ'লে কর্মত্যাগ—পূর্বকথা—ঠাকুরের তর্পণাদি কর্মত্যাগ]

"আমায় একজন বলেছিল, 'মহাশয়! আমাকে সমাধিটা শিখিয়ে দিতে পারেন?'" (সকলের হাস্য)।

"সমাধি হ'লে সব কর্ম ত্যাগ হ'য়ে যায়। পূজা-জপাদি কর্ম, বিষয়-কর্ম সব ত্যাগ হয়। প্রথমে কর্মের বড় হৈ চৈ থাকে। যত ঈশ্বরের দিকে এগুবে ততই কর্মের আড়ম্বর কমে। এমন কি তাঁর নাম গুণ গান পর্যন্ত বন্ধ হ'য়ে যায়। (শিবনাথের প্রতি) যতক্ষণ তুমি সভায় আসনি তোমার নাম, গুণ কথা অনেক হয়েছে। যাই তুমি এসে প'ড়েছ, অমনি সে সব কথা বন্ধ হ'য়ে গেল। তখন তোমার দর্শনেতেই আনন্দ। তখন লোকে বলে, 'এই যে শিবনাথবাবু এসেছেন। তোমার বিষয়ে অন্য সব কথা বন্ধ হ'য়ে যায়।

"আমার এই অবস্থার পর গঙ্গাজলে তর্পণ করতে গিয়ে দেখি যে হাতের আঙুলের ভিতর দিয়ে জল গ'লে প'ড়ে যাচ্ছে। তখন হলধারীকে কাঁদ্‌তে কাঁদ্‌তে জিজ্ঞাসা করলাম দাদা, একি হ'ল। হলধারী বল্‌লে একে গলিতহস্ত বলে। ঈশ্বর দর্শনের পর তর্পণাদি কর্ম থাকে না।

"সঙ্কীর্ত্তনে প্রথমে বলে 'নিতাই আমার মাতা হাতী!'—'নিতাই আমার মাতা হাতী!' ভাব গাঢ় হ'লে শুধু বলে 'হাতী! হাতী!' তারপর কেবল 'হাতী' এই কথাটি মুখে থাকে। শেষে 'হা' বল্‌তে বল্‌তে ভাব সমাধি হয়। তখন সে ব্যক্তি, এতক্ষণ কীর্ত্তন ক'রছিল চুপ হ'য়ে যায়।

"যেমন ব্রাহ্মণভোজনে—প্রথমে খুব হৈ চৈ। যখন সকলে পাতা সম্মুখে ক'রে বস্‌লো, তখন অনেক হৈ চৈ কমে গেল, কেবল 'লুচি আন' 'লুচি আন' শব্দ হতে থাকে। তারপর যখন লুচি তরকারী খেতে আরম্ভ করে, তখন বার আনা শব্দ কমে গেছে। যখন দই এল তখন সুপ্‌ সুপ্‌ (সকলের হাস্য) —শব্দ নাই বললেও হয়। খাবার পর নিদ্রা। তখন সব চুপ।

"তাই বলছি, প্রথম প্রথম কর্মের খুব হৈ চৈ থাকে। ঈশ্বরের পথে যত এগুবে ততই কর্ম কমবে। শেষে কর্ম ত্যাগ আর সমাধি।

"গৃহস্থের বৌ অন্তসত্ত্বা হ'লে শাশুড়ী কর্ম কমিয়ে দেয়, দশমাসে কর্ম প্রায় কর্‌তে হয় না। ছেলে হ'লে একেবারে কর্মত্যাগ। মা ছেলেটি নিয়ে কেবল নাড়াচাড়া করে। ঘরকন্নার কাজ শাশুড়ী, ননদ, জা, এরা করে।

[অবতারাদির শরীর সমাধির পর—লোকশিক্ষার জন্য]

"সমাধিস্থ হবার পর প্রায় শরীর থাকে না। কারু কারু লোকশিক্ষার জন্য শরীর থাকে—যেমন নারদাদির। আর চৈতন্যদেবের মত অবতারদের। কূপ খোঁড়া হয়ে গেলে, কেহ কেহ ঝুড়ি কোদাল বিদায় ক'রে দেয়। কেউ কেউ রেখে দেয়।—ভাবে, যদি পাড়ার কারুর দরকার হয়। এরূপ মহাপুরুষ জীবের দুঃখে কাতর। এরা স্বার্থপর নয় যে, আপনাদের জ্ঞান হ'লেই হল। স্বার্থপর লোকের কথা তো জান। এখানে মোত্ বললে মুত্‌বে না, পাছে তোমার উপকার হয়। (সকলের হাস্য)। এক পয়সার সন্দেশ দোকান থেকে আন্‌তে দিলে চুষে চুষে এনে দেয়। (সকলের হাস্য)।

"কিন্তু শক্তিবিশেষ। সামান্য আধার লোকশিক্ষা দিতে ভয় করে। হাবাতে কাঠ নিজে একরকম করে ভেসে যায়, কিন্তু একটা পাখি এসে বসলে ডুবে যায়। কিন্তু নারদাদি বাহাদুরী কাঠ। এ কাঠ নিজেও ভেসে যায়, আবার উপরে কত মানুষ, গরু, হাতী পর্যন্ত নিয়ে যেতে পারে।"

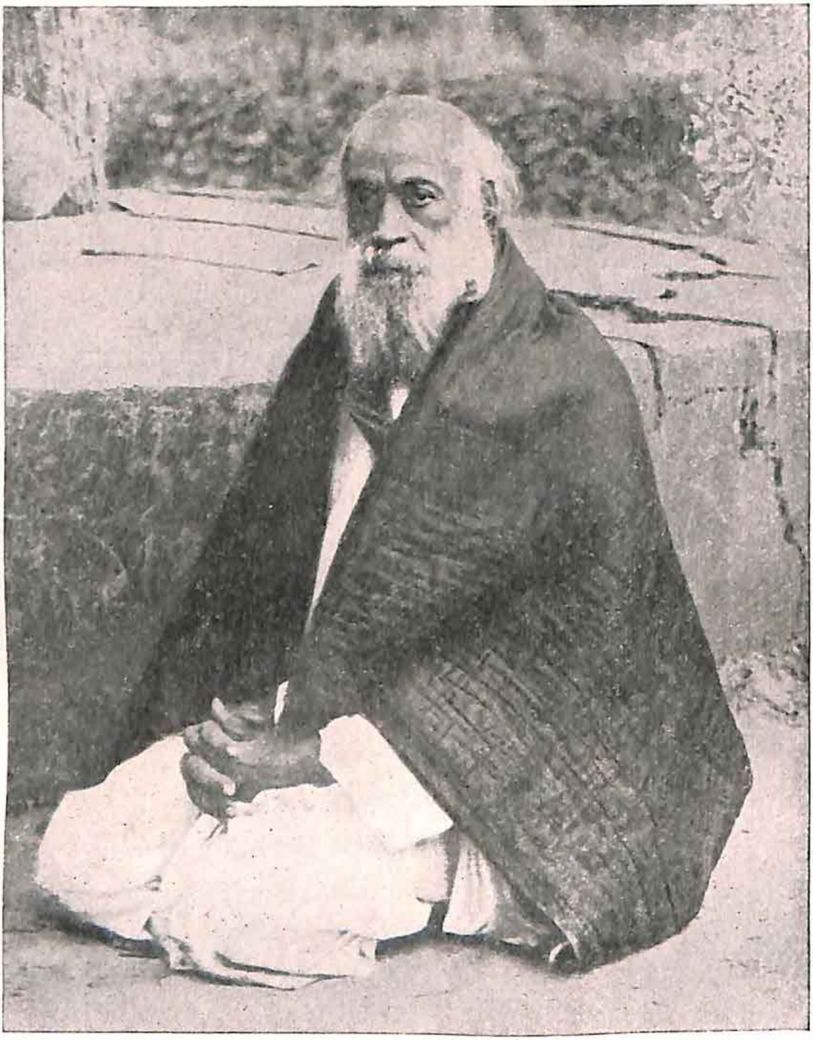
সপ্তম পরিচ্ছেদ

অদৃষ্টপূর্বং হৃষিতোঽস্মি দৃষ্ট্বা,
ভয়েন চ প্রব্যথিতং মনো মে।
তাদেব মে দর্শয় দেব রূপং,
প্রসীদ দেবেশ জগন্নিবাস ॥ [গীতা—১১, ৪৫

ব্রাহ্মসমাজের প্রার্থনাপদ্ধতি ও ঈশ্বরের ঐশ্বর্য-বর্ণনা

[পূর্বকথা—দক্ষিণেশ্বরে 'রাধাকান্তের ঘরে গয়না চুরি—১৮৬৯]

শ্রীরামকৃষ্ণ (শিবনাথের প্রতি)—হাঁগা, তোমরা ঈশ্বরের ঐশ্বর্য অত বর্ণনা কর কেন? আমি কেশব সেনকে ঐ কথা বলেছিলাম। একদিন তারা সব ওখানে (কালীবাড়ীতে) গিছিল। আমি বললুম তোমরা কি রকম লেকচার দাও, আমি শুনবো। তা গঙ্গার ঘাটের চাঁদনীতে সভা হল, আর কেশব বল্‌তে লাগল। বেশ বল্‌লে, আমার ভাব হ'য়ে গিছিল। পরে কেশবকে আমি বললুম, তুমি এগুলো এত বল কেন?—"হে ঈশ্বর, তুমি কি সুন্দর ফুল করিয়াছ, তুমি আকাশ করিয়াছ, তুমি তারা করিয়াছ, তুমি সমুদ্র করিয়াছ, এই সব? যারা নিজে ঐশ্বর্য ভালবাসে তারা ঈশ্বরের ঐশ্বর্য বর্ণনা করতে ভালবাসে। যখন রাধাকান্তের গয়না চুরি গেল, সেজোবাবু (রাসমণির জামাই) রাধাকান্তের মন্দিরে গিয়ে ঠাকুরকে বল্‌তে লাগল, 'ছি ঠাকুর! তুমি তোমার গয়না রক্ষা কর'তে পার্‌লে না!' আমি সেজোবাবুকে বল্‌লাম, ও তোমার কি বুদ্ধি! স্বয়ং লক্ষ্মী যাঁর দাসী, পদসেবা করেন,



শ্রীমহেন্দ্রনাথ গুপ্ত

(শ্রীম)

জন্ম ১২৬১, ৩১শে আষাঢ় শুক্রবার। শ্রীঠাকুরকে প্রথম দর্শন—১৮৮২ ফেব্রুয়ারী। শ্রীঠাকুরের সঙ্গে—১৮৮২ হইতে ১৮৮৬ আগষ্ট। শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ কথামৃত পাঁচ ভাগ ও গস্‌পেল অভ্ শ্রীরামকৃষ্ণ-এর লেখক। দেহত্যাগ ১৯৩২, ৪ঠা জুন। ১৩৩৯, ২১শে জ্যৈষ্ঠ শনিবার, ফলহারিণী অমাবস্যা তিথি।

তাঁর কি ঐশ্বর্যের অভাব! এ গয়না তোমার পক্ষেই ভারী একটা জিনিস, কিন্তু ঈশ্বরের পক্ষে কতকগুলো মাটির ঢ্যালা! ছি! অমন হীনবুদ্ধির কথা বলতে নাই; কি ঐশ্বর্য তুমি তাঁকে দিতে পার?' তাই বলি, যাঁকে নিয়ে আনন্দ হয়, তাঁকেই লোকে চায়; তার বাড়ি কোথায়, ক'খানা বাড়ি, ক'টা বাগান কত ধন-জন, দাস-দাসী এ খবরে কাজ কি? নরেন্দ্রকে যখন দেখি, তখন আমি সব ভুলে যাই। তার কোথা বাড়ি, তার বাবা কি করে, ক'টি ভাই এসব কথা একদিন ভুলেও জিজ্ঞাসা করি নাই। ঈশ্বরের মাধুর্যরসে ডুবে যাও! তাঁর অনন্ত সৃষ্টি, অনন্ত ঐশ্বর্য! অত খবরে আমাদের কাজ কি!

আবার সেই গন্ধর্বনিন্দিত কণ্ঠে সেই মধুরিমাপূর্ণ গান—

ডুব্ ডুব্ ডুব্ রূপসাগরে আমার মন।
তলাতল পাতাল খুঁজ্‌লে পাবি, রে প্রেম রত্নধন॥
খুঁজ্ খুঁজ্ খুঁজ্ খুঁজ্‌লে পাবি হৃদয় মাঝে বৃন্দাবন।
দীপ্ দীপ্ দীপ্ জ্ঞানের বাতি, জ্বলবে হৃদে অনুক্ষণ॥
ড্যাং ড্যাং ড্যাং ডাঙ্গায় ডিঙে, চালায় আবার সে কোন্ জন।
কুবীর বলে শোন্ শোন্ শোন্ ভাব গুরুর শ্রীচরণ॥

"স্তবে দর্শনের পর ভক্তের সাধ হয় তাঁর লীলা কি, দেখি। রামচন্দ্র রাবণ বধের পর রাক্ষসপুরী প্রবেশ ক'রলেন; বুড়ী নিকষা দৌড়ে পালাতে লাগল। লক্ষ্মণ বললেন, 'রাম! একি বলুন দেখি, এই নিকষা এত বুড়ী, কত পুত্র-শোক পেয়েছে—তার এত প্রাণের ভয়, পালাচ্ছে!' রামচন্দ্র নিকষাকে অভয় দান করে সম্মুখে আনিয়ে জিজ্ঞাসা করাতে নিকষা বললে, 'রাম, এতদিন বেঁচে আছি ব'লে তোমার এত লীলা দেখলাম, তাই আরও বাঁচবার সাধ আছে! তোমার আরও কত লীলা দেখবো।' (সকলের হাস্য)।

(শিবনাথের প্রতি)—"তোমাকে দেখতে ইচ্ছা করে। শুদ্ধাত্মাদের না দেখলে কি নিয়ে থাক্‌ব? শুদ্ধাত্মাদের পূর্বজন্মের বন্ধু ব'লে বোধ হয়।"

একজন ব্রাহ্মভক্ত জিজ্ঞাসা করলেন, মহাশয়! আপনি জন্মান্তর মানেন?

[জন্মান্তর—'বহূনি মে ব্যতীতানি জন্মানি তব চার্জুন']

শ্রীরামকৃষ্ণ—হ্যাঁ, আমি শুনেছি জন্মান্তর আছে। ঈশ্বরের কার্য আমরা ক্ষুদ্রবুদ্ধিতে কি বুঝবো? অনেকে ব'লে গেছে, তাই অবিশ্বাস করতে পারি না। ভীষ্মদেব দেহত্যাগ ক'রবেন, শরশয্যায় শুয়ে আছেন, পাণ্ডবেরা শ্রীকৃষ্ণের সঙ্গে সব দাঁড়িয়ে। তাঁরা দেখলেন যে, ভীষ্মদেবের চক্ষু দিয়ে জল প'ড়ছে। অর্জুন শ্রীকৃষ্ণকে বললেন, ভাই, কি আশ্চর্য! পিতামহ, যিনি স্বয়ং ভীষ্মদেব, সত্যবাদী, জিতেন্দ্রিয়, জ্ঞানী, অষ্টবসুর এক বসু, তিনিও দেহত্যাগের সময় মায়াতে কাঁদছেন! শ্রীকৃষ্ণ ভীষ্মদেবকে এ কথা বলাতে তিনি বললেন, কৃষ্ণ!

তুমি বেশ জান, আমি সেজন্য কাঁদছি না! যখন ভাবছি যে, যে পান্ডবদের স্বয়ং ভগবান নিজে সারথী, তাঁদেরও দুঃখ-বিপদের শেষ নাই, তখন এই মনে ক'রে কাঁদছি যে, ভগবানের কার্য কিছুই বুঝতে পারলাম না।"

[কীর্তনানন্দে—ভক্তসঙ্গে]

সমাজগৃহে এইবার সন্ধ্যাকালীন উপাসনা হইল। রাত্রি প্রায় সাড়ে আটটা। সন্ধ্যার চার-পাঁচ দণ্ডের পর রাত্রি জ্যোৎস্নাময়ী হইল। উদ্যানের বৃক্ষরাজি লতাপল্লব শরচ্চন্দ্রের বিমল কিরণে যেন ভাসিতে লাগিল। এদিকে সমাজগৃহে সংকীর্তন আরম্ভ হইয়াছে। ভগবান শ্রীরামকৃষ্ণ হরিপ্রেমে মাতোয়ারা হইয়া নাচিতেছেন, ব্রাহ্মভক্তেরা খোল-করতাল লইয়া তাঁহাকে বেড়িয়া বেড়িয়া নাচিতেছেন। সকলেই ভাবে মত্ত, যেন শ্রীভগবানের সাক্ষাৎকার লাভ করিয়াছেন! হরিনামের রোল উত্তরোত্তর উঠিতেছে। চারিদিকে গ্রামবাসীরা হরিনাম শুনিতেছেন, আর মনে মনে উদ্যানস্বামী ভক্ত বেণীমাধবকে কতই ধন্যবাদ দিতেছেন!

কীর্তনান্তে শ্রীরামকৃষ্ণ ভূমিষ্ঠ হইয়া জগন্মাতাকে প্রণাম করিতেছেন। প্রণাম করিতে করিতে বলিতেছেন, "ভাগবত-ভক্ত-ভগবান, জ্ঞানীর চরণে প্রণাম, ভক্তের চরণে প্রণাম, সাকারবাদী ভক্তের চরণে, নিরাকারবাদী ভক্তের চরণে প্রণাম; আগেকার ব্রহ্মজ্ঞানীদের চরণে, ব্রাহ্মসমাজের ইদানীং ব্রহ্মজ্ঞানীদের চরণে প্রণাম।"

বেণীমাধব নানাবিধ উপাদেয় খাদ্য আয়োজন করিয়াছিলেন ও সমবেত সকল ভক্তকে পরিতোষ করিয়া খাওয়াইলেন। শ্রীরামকৃষ্ণও ভক্তসঙ্গে বসিয়া আনন্দ করিতে করিতে প্রসাদ গ্রহণ করিলেন।

চতুর্থ খণ্ড

শ্রীযুক্ত বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামী ও অন্যান্য ব্রাহ্ম ভক্তের প্রতি ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণের উপদেশ

প্রথম পরিচ্ছেদ

ন জায়তে ম্রিয়তে বা কদাচিন্নায়ং ভূত্বা ভবিতা বা ন ভূয়ঃ।
অজো নিত্যঃ শাশ্বতোঽয়ং পুরাণো ন হন্যতে হন্যমানে শরীরে॥
[গীতা ২, ২০

মুক্ত পুরুষের শরীর ত্যাগ কি আত্মহত্যা?

দক্ষিণেশ্বর কালীবাড়িতে শ্রীযুক্ত বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামী ভগবান শ্রীরামকৃষ্ণকে দর্শন করিতে আসিয়াছেন। সঙ্গে তিন-চারটি ব্রাহ্ম ভক্ত। অগ্রহায়ণ, শুক্লা চতুর্থী তিথি। বৃহস্পতিবার, ইংরাজী ১৪ই ডিসেম্বর ১৮৮২ খৃষ্টাব্দ। পরমহংসদেবের পরম ভক্ত শ্রীযুক্ত বলরামের সহিত ইঁহারা নৌকা করিয়া কলিকাতা হইতে আসিয়াছেন। শ্রীরামকৃষ্ণ মধ্যাহ্নকালে সবে মাত্র একটু বিশ্রাম করিতেছেন। রবিবারেই বেশী লোক সমাগম হয়। যে সকল ভক্তেরা একান্তে তাঁহার সহিত কথোপকথন করিতে চান, তাঁহারা প্রায় অন্য দিনেই আসেন।

পরমহংসদেব তক্তপোষের উপর উপবিষ্ট। বিজয়, বলরাম, মাষ্টার ও অন্যান্য ভক্তেরা, পশ্চিমাস্য হইয়া তাঁহার দিকে মুখ করিয়া কেহ মাদুরের উপর, কেহ শুধু মেঝের উপর বসিয়া আছেন। ঘরের পশ্চিম দিকের দ্বারমধ্য দিয়া ভাগীরথী দেখা যাইতেছিল। শীতকালের স্থিরা স্বচ্ছসলিলা ভাগীরথী। দ্বারের পরই পশ্চিমের অর্ধমণ্ডলাকার বারান্দা, তৎপরেই পুষ্পোদ্যান, তার-পর পোস্তা। পোস্তার পশ্চিম গায়ে পুণ্যসলিলা কলুষহারিণী গঙ্গা, যেন ঈশ্বর মন্দিরের পাদমূল আনন্দে ধৌত করিতে করিতে যাইতেছিলেন।

শীতকাল, তাই সকলের গায়ে গরম কাপড়। বিজয় শূলবেদনায় দারুণ যন্ত্রণা পান; তাই সঙ্গে শিশি করিয়া ঔষধ আনিয়াছেন—ঔষধ সেবনের সময় হইলে খাইবেন। বিজয় এখন সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের একজন বেতনভোগী আচার্য। সমাজের বেদীর উপর বসিয়া তাহাকে উপদেশ দিতে হয়। তবে এখন সমাজের সহিত নানা বিষয়ে মতভেদ হইতেছে। কর্ম স্বীকার করিয়া-ছেন, কি করেন—স্বাধীনভাবে কথাবার্ত্তা বা কার্য করিতে পারেন না। বিজয় অতি পবিত্র বংশে—অদ্বৈত গোস্বামীর বংশে জন্মগ্রহণ করিয়াছেন। অদ্বৈত গোস্বামী জ্ঞানী ছিলেন—নিরাকার পরব্রহ্মের চিন্তা করিতেন আবার ভক্তির পরাকাষ্ঠা দেখাইয়া গিয়াছেন!! তিনি ভগবান চৈতন্যদেবের একজন প্রধান

পার্ষদ—হরিপ্রেমে মাতোয়ারা হইয়া নৃত্য করিতেন—এত আত্মহারা হইতেন যে, নৃত্য করিতে করিতে পরিধানবস্ত্র খসিয়া যাইত। বিজয়ও ব্রাহ্মসমাজে আসিয়াছেন—নিরাকার পরব্রহ্মের চিন্তা করেন; কিন্তু মহাভক্ত পূর্বপুরুষ শ্রীঅদ্বৈতের শোণিত ধমনী মধ্যে প্রবাহিত হইতেছিল, শরীর মধ্যস্থিত হরিপ্রেমের বীজ এখন প্রকাশোন্মুখ—কেবল কাল প্রতীক্ষা করিতেছে। তাই তিনি ভগবান শ্রীরামকৃষ্ণের দেবদুর্লভ হরিপ্রেমে 'গরগর মাতোয়ারা' অবস্থা দেখিয়া মুগ্ধ হইয়াছেন। মন্ত্রমুগ্ধ সর্প যেমন ফণা ধরিয়া সাপুড়ের কাছে বসিয়া থাকে, বিজয়ও পরমহংসদেবের শ্রীমুখনিঃসৃত ভাগবত শুনিতে শুনিতে মুগ্ধ হইয়া তাঁহার নিকটে বসিয়া থাকেন। আবার যখন তিনি হরিপ্রেমে বালকের ন্যায় নৃত্য করিতে থাকেন, বিজয়ও তাঁহার সঙ্গে নৃত্য করিতে থাকেন।

বিষ্ণুর এঁড়েদয়ে বাড়ি, তিনি গলায় ক্ষুর দিয়া শরীর ত্যাগ করিয়াছেন। আজ প্রথমে তাঁহারই কথা হইতেছে।

শ্রীরামকৃষ্ণ (বিজয়, মাষ্টার ও ভক্তদের প্রতি)—দেখ, এই ছেলেটি শরীর ত্যাগ ক'রেছে শুনলুম, মনটা খারাপ হয়ে রয়েছে। এখানে আস্‌তো, স্কুলে পড়্‌তো, কিন্তু বলতো—সংসার ভাল লাগে না। পশ্চিমে গিয়ে কোন আত্মীয়ের কাছে কিছুদিন ছিল—সেখানে নির্জনে মাঠে, বনে, পাহাড়ে সর্বদা বসে ধ্যান ক'রতো। বলেছিল যে, কত কি ঈশ্বরীয় রূপ দর্শন করি।

"বোধ হয়—শেষ জন্ম। পূর্বজন্মে অনেক কাজ করা ছিল। একটু বাকী ছিল, সেইটুকু বুঝি এবার হ'য়ে গেল।

"পূর্বজন্মের সংস্কার মানতে হয়। শুনেছি একজন শব সাধন ক'রছিল, গভীর বনে ভগবতীর আরাধনা ক'রছিল। কিন্তু সে অনেক বিভীষিকা দেখতে লাগলো; শেষে তাকে বাঘে নিয়ে গেল। আর একজন বাঘের ভয়ে নিকটে একটা গাছের উপর উঠেছিল। সে, শব আর অন্যান্য পূজার উপকরণ তৈয়ার দেখে, নেমে এসে আচমন ক'রে শবের উপর ব'সে গেল। একটু জপ ক'রতে ক'রতে মা সাক্ষাৎকার হ'লেন ও বললেন—আমি তোমার উপর প্রসন্ন হয়েছি, তুমি বর নাও। মার পাদপদ্মে প্রণত হ'য়ে সে বললে—মা, একটা কথা জিজ্ঞাসা করি, তোমার কাণ্ড দেখে অবাক্‌ হ'য়েছি। সে ব্যক্তি এত খেটে, এত আয়োজন ক'রে, এতদিন ধ'রে তোমার সাধনা করছিল, তাকে তোমার দয়া হল না! আর আমি কিছু জানি না, শুনি না, ভজনহীন, সাধনহীন, জ্ঞানহীন, ভক্তিহীন, আমার উপর এত কৃপা হ'ল! ভগবতী হাস্‌তে হাস্‌তে বললেন, বাছা! তোমার জন্মান্তরের কথা স্মরণ নাই, তুমি জন্ম জন্ম আমার তপস্যা করেছিলে, সেই সাধনবলে তোমার এরূপ জোটপাট হয়েছে, তাই আমার দর্শন পেলে। এখন বল কি বর চাও?

একজন ভক্ত বলিলেন, আত্মহত্যা ক'রেছে শুনে ভয় হয়।

শ্রীরামকৃষ্ণ—আত্মহত্যা করা মহাপাপ, ফিরে ফিরে সংসারে আসতে হবে, আর এই সংসার যন্ত্রণা ভোগ করতে হবে।

"তবে যদি ঈশ্বরের দর্শন হ'য়ে কেউ শরীর ত্যাগ করে, তাকে আত্মহত্যা বলে না। সে শরীর ত্যাগে দোষ নাই। জ্ঞানলাভের পর কেউ কেউ শরীর ত্যাগ করে। যখন সোনার প্রতিমা একবার মাটির ছাঁচে ঢালাই হয়, তখন মাটির ছাঁচ রাখতেও পারে, ভেঙ্গে ফেলতেও পারে।

"অনেক বছর আগে বরাহনগর থেকে একটি ছোকরা আসতো, উমের কুড়ি বছর হবে। গোপাল সেন। যখন এখানে আস্‌তো তখন এত ভাব হ'তো যে হৃদয়কে ধরতে হ'তো—পাছে পড়ে গিয়ে হাত-পা ভেঙ্গে যায়। সে ছোক্‌রা একদিন হঠাৎ আমার পায়ে হাত দিয়ে বললে—আর আমি আসতে পারবো না—তবে আমি চললুম। কিছুদিন পরে শুনলুম যে, সে শরীর ত্যাগ করেছে।"

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

অনিত্যমসুখং লোকমিমং প্রাপ্য ভজস্ব মাম্‌।

[গীতা—৯, ৩৩

জীব চার থাক—বদ্ধজীবের লক্ষণ কামিনী-কাঞ্চন

শ্রীরামকৃষ্ণ—জীব চার থাক ব'লেছে—বদ্ধ, মুমুক্ষু, মুক্ত, নিত্য। সংসার যেন জালের স্বরূপ, জীব যেন মাছ, ঈশ্বর (যাঁর মায়া এই সংসার) তিনি জেলে। জেলের জালে যখন মাছ পড়ে, কতকগুলো মাছ জাল ছিঁড়ে পালাবার অর্থাৎ মুক্ত হবার চেষ্টা করে। এদের মুমুক্ষু জীব বলা যায়। যারা পালাবার চেষ্টা করছে, তাদের সকলেই পালাতে পারে না। দু-চারটা মাছ ধপাঙ্‌ শব্দ ক'রে পালায়; তখন লোকেরা বলে, 'ঐ মাছটা বড়, পালিয়ে গেল!' এই দু-চারটা লোক মুক্ত জীব। কতকগুলি মাছ স্বভাবতঃ এত সাবধান যে, কখনও জালে পড়ে না। নারদাদি নিত্যজীব কখনও সংসার জালে পড়ে না। কিন্তু অধিকাংশ মাছ জালে পড়ে; অথচ এ বোধ নাই যে, জালে প'ড়েছে ম'রতে হবে। তারা জালে পড়েই জালশুদ্ধ চোঁ-চা দৌড় মারে ও একেবারে পাঁকে গিয়ে শরীর লুকোবার চেষ্টা করে। পালাবার কোন চেষ্টা নাই বরং আরও পাঁকে গিয়ে পড়ে। এরাই বদ্ধজীব। জালে এরা রয়েছে, কিন্তু মনে করে হেথায় বেশ আছি। বদ্ধজীব, সংসারে—অর্থাৎ কামিনী-কাঞ্চনে—আসক্ত হয়ে আছে। কলঙ্ক সাগরে মগ্ন হ'য়ে র'য়েছে; কিন্তু মনে করে বেশ আছি! যারা মুমুক্ষু বা মুক্ত, সংসার তাদের পাতকুয়া বোধ হয়; ভাল লাগে না। তাই কেউ কেউ জ্ঞান লাভের পর, ভগবান লাভের পর, শরীর ত্যাগ করে। কিন্তু সে রকম শরীর ত্যাগ অনেক দূরের কথা।

"বদ্ধজীবের—সংসারী জীবের—কোন মতে হুঁশ আর হয় না। এত দুঃখ, এত দাগা পায়, এত বিপদে পড়ে, তবুও চৈতন্য হয় না।

"উট কাঁটা ঘাস বড় ভালোবাসে। কিন্তু যত খায় মুখ দিয়ে রক্ত দর্ দর্ ক'রে পড়ে; তবুও সেই কাঁটা ঘাসই খাবে, ছাড়বে না। সংসারী লোক এত শোক-তাপ পায়, তবু কিছুদিনের পর যেমন তেমনি। স্ত্রী মরে গেল, কি অসতী হলো, তবু আবার বিয়ে ক'রবে। ছেলে মরে গেল কত শোক পেলে, কিছুদিন পরেই সব ভুলে গেল। সেই ছেলের মা, যে শোকে অধীর হ'য়েছিল, আবার কিছুদিন পরে চুল বাঁধলো, গয়না পরলো। এ রকম লোক মেয়ের বিয়েতে সর্বস্বান্ত হয়, আবার বছরে বছরে তাদের মেয়ে ছেলেও হয়। মোকদ্দমা ক'রে সর্বস্বান্ত হয়, আবার মোকদ্দমা করে! যা ছেলে হ'য়েছে তাদেরই খাওয়াতে পারে না, পড়াতে পারে না, ভাল ঘরে রাখ্‌তে পারে না, আবার বছরে বছরে ছেলে হয়!

"আবার কখনও কখনও যেন সাপে ছুঁচো গেলা হয়। গিলতেও পারে না, আবার উগরাতেও পারে না। বদ্ধজীব হয়তো বুঝেছে যে, সংসারে কিছুই সার নাই; আমড়ার কেবল আঁটি আর চামড়া। তবু ছাড়তে পারে না। তবুও ঈশ্বরের দিকে মন দিতে পারে না।

"কেশব সেনের একজন আত্মীয়, পঞ্চাশ বছর বয়স, দেখি তাস্ খেলছে। যেন ঈশ্বরের নাম করবার সময় হয় নাই!

"বদ্ধজীবের আর একটি লক্ষণ আছে। তাকে যদি সংসার থেকে সরিয়ে ভাল জায়গায় রাখা যায়, তাহ'লে হেদিয়ে হেদিয়ে মারা যাবে। বিষ্ঠার পোকা বিষ্ঠাতেই বেশ আনন্দ। ঐতেই বেশ হৃষ্টপুষ্ট হয়। যদি সেই পোকাকে ভাতের হাঁড়িতে রাখ, তাহ'লে মরে যাবে।" (সকলে স্তব্ধ)।

তৃতীয় পরিচ্ছেদ

অসংশয়ং মহাবাহো মনো দুর্নিগ্রহং চলম্।
অভ্যাসেন তু কৌন্তেয় বৈরাগ্যেন চ গৃহ্যতে॥

[গীতা—৬. ৩৫

তীব্র বৈরাগ্য ও বদ্ধজীব

বিজয়—বদ্ধজীবের মনের কি অবস্থা হ'লে মুক্তি হ'তে পারে?

শ্রীরামকৃষ্ণ—ঈশ্বরের কৃপায় তীব্র বৈরাগ্য হ'লে, এই কামিনী-কাঞ্চনে আসক্তি থেকে নিস্তার হ'তে পারে। তীব্র বৈরাগ্য কাকে বলে? হচ্ছে হবে, ঈশ্বরের নাম করা যাক, এ সব মন্দ বৈরাগ্য। যার তীব্র বৈরাগ্য, তার প্রাণ ভগবানের জন্য ব্যাকুল; মার প্রাণ যেমন পেটের ছেলের জন্য ব্যাকুল। যার তীব্র বৈরাগ্য, সে ভগবান ভিন্ন আর কিছু চায় না। সংসারকে পাতকুয়া দেখে; তার মনে হয়, বুঝি ডুবে গেলুম। আত্মীয়দের কাল সাপ দেখে, তাদের কাছ থেকে পালাতে ইচ্ছা হয়; আর পালায়ও। বাড়ির বন্দোবস্ত করি, তারপর ঈশ্বর চিন্তা ক'রবো, এ কথা ভাবেই না। ভিতরে খুব রোক।

"তীব্র বৈরাগ্য কাকে বলে, একটি গল্প শোন। এক দেশে অনাবৃষ্টি হ'য়েছে। চাষীরা সব খানা কেটে দূর থেকে জল আনছে। একজন চাষার খুব রোক আছে; সে একদিন প্রতিজ্ঞা ক'রলে যতক্ষণ না জল আসে, খানার সঙ্গে আর নদীর সঙ্গে এক হয়, ততক্ষণ খানা খুঁড়ে যাবে। এদিকে স্নান করবার বেলা হ'লো। গৃহিণী মেয়ের হাতে তেল পাঠিয়ে দিল। মেয়ে বলল—'বাবা! বেলা হয়েছে, তেল মেখে নেয়ে ফেল।' সে বললে, 'তুই যা আমার এখন কাজ আছে।' বেলা দুই প্রহর একটা হ'লো, তখনও চাষা মাঠে কাজ করছে। স্নান করার নামটি নাই। তার স্ত্রী তখন মাঠে এসে বললে, 'এখনও নাও নাই কেন? ভাত জুড়িয়ে গেল, তোমার যে সবই বাড়াবাড়ি! না হয় কাল ক'রবে, কি খেয়ে-দেয়েই ক'রবে।' গালাগালি দিয়ে চাষা কোদাল হাতে ক'রে তাড়া করলে; আর বল্লে, 'তোর আক্কেল নেই? বৃষ্টি হয় নাই। চাষ-বাস কিছুই হ'লো না, এবার ছেলে-পুলে কি খাবে? না খেয়ে সব মারা যাবি! আমি প্রতিজ্ঞা করেছি, মাঠে আজ জল আনবো তবে নাওয়া-খাওয়ার কথা কবো।' স্ত্রী গতিক দেখে দৌড়ে পালিয়ে গেল। চাষা সমস্ত দিন হাড়ভাঙ্গা পরিশ্রম করে সন্ধ্যার সময় খানার সঙ্গে নদীর যোগ ক'রে দিলে। তখন একবারে বসে দেখতে লাগলো যে, নদীর জল মাঠে কুলকুল ক'রে আস্‌ছে। তার মন তখন শান্ত আর আনন্দে পূর্ণ হলো। বাড়ি গিয়ে স্ত্রীকে ডেকে বল্‌লে, 'নে এখন তেল দে আর একটু তামাক সাজ।' তারপর নিশ্চিন্ত হয়ে নেয়ে খেয়ে সুখে ভোঁস ভোঁস ক'রে নিদ্রা যেতে লাগলো। এই রোক, তীব্র বৈরাগ্যের উপমা।

"আর একজন চাষা—সেও মাঠে জল আন্‌ছিল। তার স্ত্রী যখন গেল আর বল্‌লে, 'অনেক বেলা হয়েছে এখন এস, এত বাড়াবাড়িতে কাজ নাই; তখন সে বেশী উচ্চবাচ্য না ক'রে কোদাল রেখে স্ত্রীকে বল্‌লে—'তুই যখন বল্‌ছিস্ তো চল! (সকলের হাস্য)। সে চাষার আর মাঠে জল আনা হলো না। এটি মন্দ বৈরাগ্যের উপমা।

"খুব রোক্ না হ'লে, চাষার যেমন মাঠে জল আসে না, সেইরূপ মানুষের ঈশ্বরলাভ হয় না।"

চতুর্থ পরিচ্ছেদ

আপূর্যমাণমচলপ্রতিষ্ঠং
সমুদ্রমাপঃ প্রবিশন্তি যদ্বৎ।
তদ্বৎ কামা যং প্রবিশন্তি সর্বে
স শান্তিমাপ্নোতি ন কামকামী॥

[গীতা—২, ৭০

কামিনী-কাঞ্চন জন্য দাসত্ব

শ্রীরামকৃষ্ণ (বিজয়ের প্রতি)—আগে অত আস্‌তে; এখন আস না কেন?

বিজয়—এখানে আস্‌বার খুব ইচ্ছা; কিন্তু আমি স্বাধীন নই। ব্রাহ্ম-সমাজের কাজ স্বীকার করেছি।

শ্রীরামকৃষ্ণ (বিজয়ের প্রতি)—কামিনী-কাঞ্চনে জীবকে বদ্ধ করে। জীবের স্বাধীনতা যায়। কামিনী থেকেই কাঞ্চনের দরকার। তার জন্য পরের দাসত্ব। স্বাধীনতা চ'লে যায়। তোমার মনের মত কাজ ক'রতে পার না।

"জয়পুরে গোবিন্‌জীর পূজারীরা প্রথম প্রথম বিবাহ করে নাই। তখন খুব তেজস্বী ছিল। রাজা একবার ডেকে পাঠিয়েছিলেন, তা তারা যায় নাই। বলেছিল 'রাজাকে আস্‌তে বল।' তারপর রাজা ও পাঁচজনে তাদের বিয়ে দিয়ে দিলেন। তখন রাজার সঙ্গে দেখা করবার জন্য, আর কাহারও ডাক্‌তে হ'লো না। নিজে নিজেই গিয়ে উপস্থিত। 'মহারাজ আশীর্বাদ করতে এসেছি, এই নির্মাল্য এনেছি, ধারণ করুন।' কাজে কাজেই আস্‌তে হয়; আজ ঘর তুল্‌তে হবে, আজ ছেলের অন্নপ্রাশন, আজ—হাতেখড়ি, এই সব।

"বারশো ন্যাড়া আর তেরশো নেড়ী তার সাক্ষী উদম সাড়ী—এ গল্প তো জান। নিত্যানন্দ গোস্বামীর ছেলে বীরভদ্রের তেরশো ন্যাড়া শিষ্য ছিল। তারা যখন সিদ্ধ হ'য়ে গেল, তখন বীরভদ্রের ভয় হ'লো। তিনি ভাব্‌তে লাগ্‌লেন, 'এরা সিদ্ধ হলো, লোককে যা বল্‌বে তাই ফলবে; যে দিক দিয়ে যাবে, সেই দিকেই ভয়; কেন না, লোক না জেনে যদি অপরাধ করে, তাদের অনিষ্ট হবে।'

এই ভেবে বীরভদ্র তাদের বললেন—তোমরা গঙ্গার গিয়ে সন্ধ্যা-আহ্নিক ক'রে এস। ন্যাড়াদের এত তেজ যে, ধ্যান ক'রতে করতে সমাধি হলো। কখন জোয়ার মাথার উপর দিয়ে চলে গেছে হুঁশ নাই। আবার ভাঁটা পড়েছে তবু ধ্যান ভাঙে না। তেরোশোর মধ্যে একশো বুঝেছিল—বীরভদ্র কি বল্‌বেন। গুরুর বাক্য লঙ্ঘন ক'রতে নাই, তাই তারা সরে পড়লো, আর বীরভদ্রের সঙ্গে দেখা করলে না। বাকী বারশো দেখা ক'রলে। বীরভদ্র বললেন, 'এই তেরোশো নেড়ী তোমাদের সেবা ক'রবে। তোমরা এদের বিয়ে কর।' ওরা বল্‌লে, 'যে আজ্ঞা, কিন্তু আমাদের মধ্যে একশোজন কোথায় চলে গেছে।' ঐ বারশোর এখন প্রত্যেকের সেবাদাসী সঙ্গে থাক্‌তে লাগলো। তখন আর সে তেজ নাই, সে তপস্যার বল নাই। মেয়েমানুষ সঙ্গে থাকাতে আর সে বল রইল না; কেন না, সে সঙ্গে স্বাধীনতা লোপ হয়ে যায়। (বিজয়ের প্রতি) তোমরা নিজে নিজে তো দেখছো, পরের কর্ম স্বীকার ক'রে কি হয়ে রয়েছো। আর দেখ, অত পাশ করা, কত ইংরাজী পড়া পণ্ডিত, মনিবের চাকরী স্বীকার করে তাদের বুট জুতার গোঁজা দু'বেলা খায়। এর কারণ কেবল 'কামিনী'। বিয়ে করে নদের হাট বসিয়ে আর হাট তোলবার বো নাই। তাই এত অপমানবোধ, অত দাসত্বের যন্ত্রণা।

[ঈশ্বর লাভের পর কামিনীকে মাতৃভাবে পূজা]

"যদি একবার এইরূপ তীব্র বৈরাগ্য হ'য়ে ঈশ্বর লাভ হয়, তা হ'লে আর মেয়েমানুষে আসক্তি থাকে না। ঘরে থাকলেও, মেয়েমানুষে আসক্তি থাকে না, তাদের ভয় থাকে না। যদি একটা চুম্বক পাথর খুব বড় হয়, আর একটা সামান্য হয়, তাহ'লে লোহাকে কোন্‌টা টেনে লবে? বড়টাই টেনে লবে। ঈশ্বর বড় চুম্বক পাথর, তাঁর কাছে কামিনী ছোট চুম্বক পাথর। কামিনী কি করবে?"

একজন ভক্ত—মহাশয়। মেয়েমানুষকে কি ঘৃণা করবো?

শ্রীরামকৃষ্ণ—যিনি ঈশ্বর লাভ করেছেন, তিনি কামিনীকে আর অন্য চক্ষে দেখেন না যে ভয় হবে। তিনি ঠিক দেখেন যে মেয়েরা মা ব্রহ্মময়ীর অংশ আর মা ব'লে তাই সকলকে পূজা করেন। (বিজয়ের প্রতি)—তুমি মাঝে মাঝে আস্‌বে, তোমাকে দেখতে বড় ইচ্ছা করে।

পঞ্চম পরিচ্ছেদ

ঈশ্বরের আদেশ প্রাপ্ত হ'লে তবে ঠিক আচার্য

বিজয়—ব্রাহ্মসমাজের কাজ করতে হয়, তাই সদা-সর্বদা আস্‌তে পারি না; সুবিধা হ'লে আসবো।

শ্রীরামকৃষ্ণ (বিজয়ের প্রতি)—দেখ, আচার্যের কাজ বড় কঠিন, ঈশ্বরের সাক্ষাৎ আদেশ ব্যতিরেকে লোকশিক্ষা দেওয়া যায় না।

"যদি আদেশ না পেয়ে উপদেশ দাও, লোকে শুন্‌বে না। সে উপদেশের কোন শক্তি নাই। আগে সাধন ক'রে, বা যে কোনরূপে হোক ঈশ্বরকে লাভ ক'রতে হয়। তাঁর আদেশ পেয়ে লেক্‌চার দিতে হয়। ও-দেশে একটি পুকুর আছে, নাম হালদার পুকুর। তার পাড়ে রোজ লোক বাহ্যে ক'রে রাখতো। সকালে যারা ঘাটে আস্‌তো তারা তাদের গালাগালি দিয়ে খুব গোলমাল ক'রতো। গালাগালে কোন কাজ হ'তো না—আবার তার পরদিন পাড়েতেই বাহ্যে। শেষে কোম্পানীর চাপরাসী এসে নোটিশ টাঙ্গিয়ে দিলে যে, 'এখানে কেউ ওরূপ কাজ ক'রতে পার্‌বে না। যদি করে, শাস্তি হবে।' এই নোটিশের পর আর কেউ পাড়ে বাহ্যে কর্‌ত না।

"তাঁর আদেশের পর যেখানে সেখানে আচার্য হওয়া যায় ও লেক্‌চার দেওয়া যায়। যে তাঁর আদেশ পায়, সে তাঁর কাছ থেকে শক্তি পায়। তখন এই কঠিন আচার্যের কর্ম করতে পারে।

"এক বড় জমিদারের সঙ্গে একজন সামান্য প্রজা বড় আদালতে মোকদ্দমা ক'রেছিল। তখন লোকে বুঝেছিল যে, ঐ প্রজার পেছনে একজন বলবান লোক আছে। হয়তো আর একজন বড় জমিদার তার পেছনে থেকে মোকদ্দমা চালাচ্ছে। মানুষ সামান্য জীব, ঈশ্বরের সাক্ষাৎ শক্তি না পেলে আচার্যের এমন কঠিন কাজ কর্‌তে পারে না।"

বিজয়—মহাশয়! ব্রাহ্মসমাজে যে উপদেশাদি হয়, তাতে কি লোকের পরিত্রাণ হয় না?

[সচ্চিদানন্দই গুরু—মুক্তি তিনিই দেন]

শ্রীরামকৃষ্ণ—মানুষের কি সাধ্য অপরকে সংসার বন্ধন থেকে মুক্ত করে। যাঁর এই ভুবনমোহিনী মায়া, তিনিই সেই মায়া থেকে মুক্ত করতে পারেন। সচ্চিদানন্দগুরু বই আর গতি নাই। যারা ঈশ্বর লাভ করে নাই, যারা তাঁর আদেশ পায় নাই, যারা ঈশ্বরের শক্তিতে শক্তিমান হয় নাই, তাদের কি সাধ্য জীবের ভববন্ধন মোচন করে।

"আমি একদিন পঞ্চবটীর কাছ দিয়ে ঝাউতলায় বাহ্যে যাচ্ছিলাম। শুনতে পেলুম যে, একটা কোলা ব্যাঙ খুব ডাক্‌ছে। বোধ হলো সাপে ধরেছে।

অনেকক্ষণ পরে যখন ফিরে আস্‌ছি, তখনও দেখি, ব্যাঙটা খুব ডাক্‌ছে। একবার উঁকি মেরে দেখলুম কি হ'য়েছে। দেখি একটা ঢোঁড়ায় ব্যাঙটাকে ধ'রেছে—ছাড়তেও পাচ্ছে না—গিলতেও পাচ্ছে না—ব্যাঙটার যন্ত্রণা ঘুচছে না। তখন ভাবলাম, ওরে! যদি জাতসাপ ধ'রতো, তিন ডাকের পর ব্যাঙটা চুপ হয়ে যেতো। এ একটা ঢোঁড়ায় ধ'রেছে কি না, তাই সাপটারও যন্ত্রণা ব্যাঙটারও যন্ত্রণা!

"যদি সদগুরু হয়, তাহলে জীবের অহঙ্কার তিন ডাকে ঘুচে। গুরু কাঁচা হ'লে গুরুরও যন্ত্রণা, শিষ্যেরও যন্ত্রণা! শিষ্যের অহঙ্কার আর ঘুচে না, সংসার বন্ধন আর কাটে না। কাঁচা গুরুর পাল্লায় পড়্‌লে শিষ্য মুক্ত হয় না।"

ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ

অহংকারবিমূঢ়াত্মা কর্ত্তাহমিতি মন্যতে। [গীতা—৩, ২৭

মায়া বা অহং-আবরণ গেলেই মুক্তি বা ঈশ্বরলাভ

বিজয়—মহাশয়! কেন আমরা এরূপ বদ্ধ হ'য়ে আছি? কেন ঈশ্বরকে দেখ্‌তে পাই না।

শ্রীরামকৃষ্ণ—জীবের অহঙ্কারই মায়া। এই অহঙ্কার সব আবরণ ক'রে রেখেছে। 'আমি মলে ঘুচিবে জঞ্জাল।' যদি ঈশ্বরের কৃপায় 'আমি অকর্ত্তা' এই বোধ হ'য়ে গেল, তা হলে সে ব্যক্তি তো জীবন্মুক্ত হ'য়ে গেল। তার আর ভয় নাই।

"এই মায়া বা অহং যেন মেঘের স্বরূপ। সামান্য মেঘের জন্য সূর্যকে দেখা যায় না—মেঘ স'রে গেলেই সূর্যকে দেখা যায়। যদি গুরুর কৃপায় একবার অহং বুদ্ধি যায় তাহ'লে ঈশ্বর দর্শন হয়।

"আড়াই হাত দূরে শ্রীরামচন্দ্র, যিনি সাক্ষাৎ ঈশ্বর; মধ্যে সীতারূপিণী মায়া ব্যবধান আছে ব'লে লক্ষ্মণরূপ জীব সেই ঈশ্বরকে দেখ্‌তে পান নাই। এই দেখ, আমি এই গামছাখানা দিয়ে মুখের সামনে আড়াল কর্‌ছি আর আমায় দেখতে পাচ্ছ না। তবু আমি এত কাছে। সেইরূপ ভগবান সকলের চেয়ে কাছে তবু এই মায়া আবরণের দরুণ তাঁকে দেখতে পারছ না।

"জীব তো সচ্চিদানন্দ স্বরূপ। কিন্তু এই মায়া বা অহঙ্কারে তাদের সব নানা উপাধি হয়ে প'ড়েছে, আর তারা আপনার স্বরূপ ভুলে গেছে।

"এক একটি উপাধি হয়, আর জীবের স্বভাব বদলে যায়। যে কালাপেড়ে কাপড় প'রে আছে, অমনি দেখবে, তার নিধুর টপ্পার তান এসে জোটে; আর তাস খেলা, বেড়াতে যাবার সময় হাতে ছড়ি (stick) এই সব এসে জোটে। রোগা

লোকও যদি বুট জুতা পরে সে অমনি শিস দিতে আরম্ভ করে, সিঁড়ি উঠবার সময় সাহেবদের মত লাফিয়ে উঠতে থাকে। মানুষের হাতে যদি কলম থাকে, এমনি কলমের গুণ যে, সে অমনি একটা কাগজ-টাগজ পেলেই তার উপর ফ্যাস্ ফ্যাস্ ক'রে টান দিতে থাকবে।

"টাকাও একটি বিলক্ষণ উপাধি। টাকা হ'লেই মানুষ আর এক রকম হ'য়ে যায়, সে মানুষ থাকে না।

"এখানে একজন ব্রাহ্মণ আসা-যাওয়া করতো। সে বাহিরে বেশ বিনয়ী ছিল। কিছুদিন পরে আমরা কোন্নগরে গেছলুম। হৃদে সঙ্গে ছিল। নৌকা থেকে যাই নাম্‌ছি, দেখি সেই ব্রাহ্মণ গঙ্গার ধারে ব'সে আছে। বোধ হয়, হাওয়া খাচ্ছিল। আমাদের দেখে বল্‌ছে, কি ঠাকুর! বলি—আছ কেমন? তার কথার স্বর শুনে আমি হৃদেকে বললুম, 'ওরে হৃদে! এ লোকটার টাকা হয়েছে, তাই এই রকম কথা।' হৃদে হাস্‌তে লাগ্‌লো।

"একটা ব্যাঙের একটা টাকা ছিল। গর্তে তার টাকাটা ছিল। একটা হাতী সেই গর্ত ডিঙ্গিয়ে গিছিল। তখন ব্যাঙটা বেরিয়ে এসে খুব রাগ ক'রে হাতীকে লাথি দেখাতে লাগল। আর বললে, তোর এত বড় সাধ্য যে আমায় ডিঙ্গিয়ে যাস্! টাকার এত অহঙ্কার।

[সপ্তভূমি—অহঙ্কার কখন যায়—ব্রহ্মজ্ঞানের অবস্থা]

"জ্ঞানলাভ হ'লে অহঙ্কার যেতে পারে। জ্ঞানলাভ হ'লে সমাধিস্থ হয়। সমাধিস্থ হ'লে তবে অহং যায়। সে জ্ঞানলাভ বড় কঠিন।

"বেদে আছে যে, সপ্তমভূমিতে মন গেলে তবে সমাধি হয়। সমাধি হ'লেই তবে অহং চলে যেতে পারে। মনের সচরাচর বাস কোথায়? প্রথম তিন ভূমিতে। লিঙ্গ, গুহ্য, নাভি—সেই তিন ভূমি, তখন মনের আসক্তি কেবল সংসারে—কামিনী-কাঞ্চনে। হৃদয়ে যখন মনের বাস হয় তখন ঈশ্বরীয় জ্যোতিঃ দর্শন হয়। সে ব্যক্তি জ্যোতিঃ দর্শন ক'রে বলে 'একি!' 'একি!' তারপর কণ্ঠ। সেখানে যখন মনের বাস হয়, তখন কেবল ঈশ্বরীয় কথা কহিতে ও শুনিতে ইচ্ছা হয়। কপালে—ভ্রূমধ্যে—মন গেলে তখন সচ্চিদানন্দ-রূপ দর্শন হয়, সেই রূপের সঙ্গে আলিঙ্গন স্পর্শন করতে ইচ্ছা হয়; কিন্তু পারে না। লণ্ঠনের ভিতর আলো দর্শন হয় কিন্তু স্পর্শ হয় না; ছুঁই ছুঁই বোধ হয়, কিন্তু ছোঁয়া যায় না। সপ্তম ভূমিতে মন যখন যায় তখন অহং আর থাকে না, সমাধি হয়।"

বিজয়—সেখানে পৌঁছিবার পর ব্রহ্মজ্ঞান হয়, মানুষ কি দেখে?

শ্রীরামকৃষ্ণ—সপ্তম ভূমিতে মন পৌঁছিলে কি হয় মুখে বলা যায় না।

"জাহাজ একবার কালাপানীতে গেলে আর ফিরে না। জাহাজের খপর আর পাওয়া যায় না। সমুদ্রের খপরও জাহাজের কাছে পাওয়া যায় না।

"নুনের ছবি সমুদ্র মাপ্‌তে গিছিল। কিন্তু যাই নেমেছে, অমনি গলে গেছে। সমুদ্র কত গভীর কে খপর দিবেক? যে দিবে, সে মিশে গেছে। সপ্তম ভূমিতে মনের নাশ হয়, সমাধি হয়। কি বোধ হয়, মুখে বলা যায় না।

[অহং কিন্তু যায় না—'বজ্জাৎ আমি'—'দাস আমি']

"যে 'আমি'তে সংসারী করে, কামিনী-কাঞ্চনে আসক্ত করে, সেই 'আমি' খারাপ। জীব ও আত্মার প্রভেদ হয়েছে, এই আমি মাঝখানে আছে বলে। জলের উপর যদি একটা লাঠি ফেলে দেওয়া যায়, তাহ'লে দুটো ভাগ দেখায়। বস্তুতঃ, এক জল ; লাঠিটার দরুন দুটো দেখাচ্ছে।

"অহং-ই এই লাঠি। লাঠি তুলে লও, সেই এক জলই থাকবে।

"বজ্জাৎ 'আমি' কে? যে 'আমি' বলে—'আমায়' জানে না? আমার এত টাকা, আমার চেয়ে কে বড়লোক আছে? যদি চোরে দশ টাকা চুরি ক'রে থাকে, প্রথমে টাকা কেড়ে লয়, তারপর চোরকে খুব মারে; তাতেও ছাড়ে না, পাহারাওয়ালা ডেকে পুলিশে দেয় ও ম্যাদ খাটায়, 'বজ্জাৎ আমি' বলে, জানে না—আমার দশ টাকা নিয়েছে। এত বড় আস্পর্ধা!"

বিজয়—যদি অহং না গেলে সংসারে আসক্তি যাবে না, সমাধি হবে না, তাহ'লে ব্রহ্মজ্ঞানের পথ অবলম্বন করাই ভাল, যাতে সমাধি হয়। আর ভক্তি-যোগে যদি অহং থাকে তবে জ্ঞানযোগই ভাল।

শ্রীরামকৃষ্ণ—দুই একটি লোকের সমাধি হ'য়ে 'অহং' যায় বটে, কিন্তু প্রায় যায় না। হাজার বিচার কর, 'অহং' ফিরে ঘুরে এসে উপস্থিত। আজ অশ্বত্থ গাছ কেটে দাও, কাল আবার সকালে দেখো ফেঁক্‌ড়ী বেরিয়েছে। একান্ত যদি 'আমি' যাবে না, তবে থাক্ শালা 'দাস আমি' হয়ে। 'হে ঈশ্বর! তুমি প্রভু আমি দাস', এইভাবে থাকো। 'আমি দাস', 'আমি ভক্ত' এরূপ 'আমিতে' দোষ নাই; মিষ্ট খেলে অম্বল হয়, কিন্তু মিছরি মিষ্টির মধ্যে নয়।

"জ্ঞানযোগ ভারী কঠিন। দেহাত্মবুদ্ধি না গেলে জ্ঞান হয় না। কলিযুগে অন্নগতপ্রাণ—দেহাত্মবুদ্ধি, অহংবুদ্ধি যায় না। তাই কলিযুগের পক্ষে ভক্তি-যোগ। ভক্তিপথ সহজ পথ। আন্তরিক ব্যাকুল হ'য়ে তাঁর নাম গুণগান কর, প্রার্থনা কর ভগবানকে লাভ করবে, কোন সন্দেহ নাই।

"যেমন জলরাশির উপর বাঁশ না রেখে একটি রেখা কাটা হ'য়েছে। যেন দুই ভাগ জল। আর রেখা অনেকক্ষণ থাকে না। 'দাস আমি' কি 'ভক্তের আমি' কি 'বালকের আমি' এরা যেন 'আমির রেখা মাত্র।'

ক্লেশোঽধিকতরস্তেষামব্যক্তাসক্তচেতসাম্।
অব্যক্তা হি গতির্দুঃখং দেহবদ্ভিরবাপ্যতে॥
[গীতা—১২, ৫

ভক্তিযোগ যুগধর্ম—জ্ঞানযোগ বড় কঠিন—
'দাস আমি'—'ভক্তের আমি'—'বালকের আমি'

বিজয় (শ্রীরামকৃষ্ণের প্রতি)—মহাশয়। আপনি 'বজ্জাৎ আমি' ত্যাগ করতে ব'ল্‌ছেন। 'দাস আমি'তে দোষ নাই?

শ্রীরামকৃষ্ণ—হাঁ, 'দাস আমি অর্থাৎ আমি ঈশ্বরের দাস', আমি তাঁর ভক্ত, এই অভিমান। এতে দোষ নাই, বরং এতে ঈশ্বর লাভ হয়।

বিজয়—আচ্ছা, যার 'দাস আমি' তার কাম-ক্রোধাদি কিরূপ?

শ্রীরামকৃষ্ণ—ঠিক ভাব যদি হয়, তা হ'লে কাম-ক্রোধের কেবল আকার মাত্র থাকে। যদি ঈশ্বর লাভের পর 'দাস আমি' বা 'ভক্তের আমি' থাকে, সে ব্যক্তি কারো অনিষ্ট কর্‌তে পারে না। পরশমণি ছোঁয়ার পর তরবার সোনা হ'য়ে যায়, তরবারের আকার থাকে কিন্তু কারো হিংসা করে না।

"নারিকেল গাছের বেল্লো শুকিয়ে ঝ'রে পড়ে গেলে, কেবল দাগ মাত্র থাকে। সেই দাগে এইটি টের পাওয়া যায় যে, এককালে ঐখানে নারিকেলের বেল্লো ছিল। সেই রকম যার ঈশ্বর লাভ হ'য়েছে, তার অহঙ্কারের দাগমাত্র থাকে, কাম-ক্রোধের আকার মাত্র থাকে ; বালকের অবস্থা হয়। বালকের যেমন সত্ত্ব, রজঃ, তমো গুণের মধ্যে কোন গুণের আঁট নাই। বালকের কোন জিনিসের উপর টান করতেও যতক্ষণ—তাকে ছাড়তেও ততক্ষণ। একখানা পাঁচ টাকার কাপড় তুমি আধ পয়সার পুতুল দিয়ে ভুলিয়ে নিতে পারো। কিন্তু প্রথমে খুব আঁট ক'রে বলবে এখন—'না আমি দেবো না, আমার বাবা কিনে দিয়েছে।' বালকের আবার সব্বাই সমান—ইনি বড়, উনি ছোট, এরূপ বোধ নাই। তাই জাতি বিচার নাই। মা বলে দিয়েছে, 'ও তোর দাদা হয়', সে ছুতোর হ'লেও একপাতে ব'সে ভাত খাবে। বালকের ঘৃণা নাই, শুচি-অশুচি বোধ নাই। পায়খানায় গিয়ে হাতে মাটি দেয় না।

"কেউ কেউ সমাধির পরও 'ভক্তের আমি', 'দাস আমি' নিয়ে থাকে। 'আমি দাস, তুমি প্রভু', 'আমি ভক্ত, তুমি ভগবান' এই অভিমান ভক্তের থাকে। ঈশ্বর লাভের পরও থাকে, সব 'আমি' যায় না। আবার এই অভিমান অভ্যাস কর্‌তে কর্‌তে ঈশ্বর লাভ হয়। এরই নাম ভক্তিযোগ।

"ভক্তির পথ ধ'রে গেলে ব্রহ্মজ্ঞান হয়। ভগবান সর্বশক্তিমান, মনে করলে ব্রহ্মজ্ঞানও দিতে পারেন। ভক্তেরা প্রায় ব্রহ্মজ্ঞান চায় না। 'আমি দাস, তুমি প্রভু', 'আমি ছেলে, তুমি মা' এই অভিমান রাখতে চায়।"

বিজয়—যাঁরা বেদান্ত বিচার করেন, তাঁরাও তো তাঁকে পান?

শ্রীরামকৃষ্ণ—হাঁ, বিচার পথেও তাঁকে পাওয়া যায়। একেই জ্ঞানযোগ বলে। বিচার পথ বড় কঠিন। তোমায় ত সপ্তভূমির কথা বলেছি। সপ্তম ভূমিতে মন পৌঁছিলে সমাধি হয়। ব্রহ্ম সত্য, জগৎ মিথ্যা, এই বোধ ঠিক হলে মনের লয় হয়, সমাধি হয়। কিন্তু কলিতে জীব অন্নগত প্রাণ, 'ব্রহ্ম সত্য, জগৎ মিথ্যা' কেমন করে বোধ হবে? সে বোধ দেহবুদ্ধি না গেলে হয় না। 'আমি দেহ নই, আমি মন নই, চতুর্বিংশতি তত্ত্ব নই, আমি সুখ-দুঃখের অতীত, আমার আবার রোগ, শোক, জরা, মৃত্যু কৈ?'—এ সব বোধ কলিতে হওয়া কঠিন। যতই বিচার করো, কোন্‌খান থেকে দেহাত্মবুদ্ধি এসে দেখা দেয়। অশ্বত্থ গাছ এই কেটে দাও, মনে করলে মূলশুদ্ধ উঠে গেল, কিন্তু তার পরদিন সকালে দেখো, গাছের একটি ফেকড়ী দেখা দিয়েছে! দেহাভিমান যায় না। তাই ভক্তিযোগ কলির পক্ষে ভাল, সহজ।

"আর চিনি হ'তে চাই না, চিনি খেতে ভালবাসি।' আমার এমন কখন ইচ্ছা হয় না, যে বলি 'আমি ব্রহ্ম'। আমি বলি 'তুমি ভগবান, আমি তোমার দাস'। পঞ্চম ভূমি আর ষষ্ঠ ভূমির মাঝখানে বাচ খেলান ভাল। ষষ্ঠভূমি পার হয়ে সপ্তম ভূমিতে অনেকক্ষণ থাকতে আমার সাধ হয় না। আমি তাঁর নাম গুণগান ক'রবো, এই আমার সাধ। সেব্য-সেবক ভাব খুব ভাল। আর দেখো গঙ্গারই ঢেউ, ঢেউয়ের গঙ্গা কেউ বলে না। 'আমিই সেই', এ অভিমান ভাল নয়। দেহাত্মবুদ্ধি থাকতে যে এ অভিমান করে, তার বিশেষ হানি হয়; এগুতে পারে না, ক্রমে অধঃপতন হয়। পরকে ঠকায় আবার নিজেকে ঠকায়, নিজের অবস্থা বুঝতে পারে না।

[দ্বিবিধা ভক্তি—উত্তম অধিকারী—ঈশ্বর দর্শনের উপায়]

"কিন্তু ভক্তি অম্‌নি ক'রলেই ঈশ্বরকে পাওয়া যায় না। প্রেমাভক্তি না হ'লে ঈশ্বর লাভ হয় না। প্রেমাভক্তির আর একটি নাম রাগভক্তি। প্রেম, অনুরাগ, না হ'লে ভগবান লাভ হয় না। ঈশ্বরের উপর ভালবাসা না এলে তাঁকে লাভ করা যায় না।

"আর এক রকম ভক্তি আছে। তার নাম বৈধী ভক্তি। এত জপ করতে হবে, উপোস করতে হবে, তীর্থে যেতে হবে; এত উপচারে পূজা ক'তে হবে, এতোগুলি বলিদান দিতে হবে—এ সব বৈধী ভক্তি। এ সব অনেক কর্‌তে কর্‌তে ক্রমে রাগভক্তি আসে। কিন্তু রাগভক্তি যতক্ষণ না হবে, ততক্ষণ ঈশ্বর লাভ হবে না। তাঁর উপর ভালবাসা চাই। সংসারবুদ্ধি একেবারে চলে যাবে, আর তাঁর উপর ষোল আনা মন হবে, তবে তাঁকে পাবে।

"কিন্তু কারু কারু রাগভক্তি আপনা-আপনি হয়। স্বতঃসিদ্ধ। ছেলে-

বেলা থেকেই আছে। ছেলেবেলা থেকেই ঈশ্বরের জন্য কাঁদে। যেমন প্রহ্লাদ। 'বিধিবাদীয়' ভক্তি—যেমন, হাওয়া পাবে বলে পাখা করা। হাওয়ার জন্য পাখার দরকার হয়। ঈশ্বরের উপর ভালবাসা আস্‌বে বলে জপ, তপ, উপবাস। কিন্তু যদি দক্ষিণে হাওয়া আপনি বয়, পাখাখানা লোকে ফেলে দেয়। ঈশ্বরের উপর অনুরাগ, প্রেম, আপনি এলে, জপাদি কর্ম ত্যাগ হ'য়ে যায়। হরিপ্রেমে মাতোয়ারা হ'লে বৈধীকর্ম কে করবে?

"যতক্ষণ না তাঁর উপর ভালবাসা জন্মায় ততক্ষণ ভক্তি কাঁচাভক্তি। তাঁর উপর ভালবাসা এলে, তখন সেই ভক্তির নাম পাকাভক্তি।

"যার কাঁচা ভক্তি, সে ঈশ্বরের কথা, উপদেশ, ধারণা করতে পারে না। পাকা-ভক্তি হ'লে ধারণা করতে পারে। ফটোগ্রাফের কাচে যদি কালি (Silver Nitrate) মাখানো থাকে, তা হ'লে যা ছবি পড়ে তা রয়ে যায়। কিন্তু শুধু কাচের উপর হাজার ছবি পড়ুক একটাও থাকে না—একটু স'রে গেলেই, যেমন কাচ তেমনি কাচ। ঈশ্বরের উপর ভালবাসা না থাকলে উপদেশ ধারণা হয় না।"

বিজয়—মহাশয়, ঈশ্বরকে লাভ করতে গেলে, তাঁকে দর্শন করতে গেলে, ভক্তি হ'লেই হয়।

শ্রীরামকৃষ্ণ—হাঁ, ভক্তি দ্বারাই তাঁকে দর্শন হয়; কিন্তু পাকা ভক্তি প্রেমাভক্তি, রাগভক্তি চাই। সেই ভক্তি এলেই তাঁর উপর ভালবাসা আসে। যেমন ছেলের মার উপর ভালবাসা, মার ছেলের উপর ভালবাসা, স্ত্রীর স্বামীর উপর ভালবাসা।

"এ ভালবাসা, এ রাগভক্তি এলে স্ত্রী-পুত্র, আত্মীয়-কুটুম্বের উপর সে মায়ার টান থাকে না। দয়া থাকে। সংসার বিদেশ বোধ হয়, একটি কর্মভূমি মাত্র বোধ হয়। যেমন পাড়াগাঁয়ে বাড়ি কিন্তু কলকাতা কর্মভূমি; কলকাতায় বাসা ক'রে থাক্‌তে হয়, কর্ম করবার জন্য। ঈশ্বরে ভালবাসা এলে সংসারাসক্তি—বিষয়বুদ্ধি—একেবারে যাবে।

"বিষয়বুদ্ধির লেশমাত্র থাক্‌লে তাঁকে দর্শন হয় না। দেশলাইয়ের কাঠি যদি ভিজে থাকে হাজার ঘসো, কোন রকমেই জ্বলবে না—কেবল একরাশ কাঠি লোকসান হয়। বিষয়াসক্ত মন ভিজে দেশলাই।

"শ্রীমতী (রাধিকা) যখন বললেন, কৃষ্ণময় দেখছি, সখীরা বললে, কৈ আমরা তো তাঁকে দেখতে পাচ্ছি না। তুমি কি প্রলাপ বোক্‌চো? শ্রীমতী বললেন, সখি! অনুরাগ-অঞ্জন চক্ষে মাখো, তাঁকে দেখতে পাবে। (বিজয়ের প্রতি) তোমাদের ব্রাহ্মসমাজের গানে আছে—

"প্রভু বিনে অনুরাগ, ক'রে যজ্ঞ যাগ, তোমারে কি যায় জানা।

"এই অনুরাগ, এই প্রেম, এই পাকাভক্তি, এই ভালবাসা যদি একবার হয়, তা হ'লে সাকার-নিরাকার দুই সাক্ষাৎকার হয়।"

[ঈশ্বর দর্শন—তাঁর কৃপা না হ'লে হয় না]

বিজয়—ঈশ্বর দর্শন কেমন ক'রে হয়?

শ্রীরামকৃষ্ণ—চিত্তশুদ্ধি না হ'লে হয় না। কামিনী-কাঞ্চনে মন মলিন হ'য়ে আছে, মনে ময়লা প'ড়ে আছে। ছুঁচ কাদা দিয়ে ঢাকা থাক্‌লে আর চুম্বক টানে না। মাটি কাদা ধুয়ে ফেললে তখন চুম্বকে টানে। মনের ময়লা তেমনি চোখের জলে ধুয়ে ফেলা যায়। 'হে ঈশ্বর, আর অমন করবো না' বলে যদি কেউ অনুতাপে কাঁদে, তা'হলে ময়লাটা ধুয়ে যায়। তখন ঈশ্বররূপ চুম্বক পাথর মনরূপ ছুঁচকে টেনে লন। তখন সমাধি হয়, ঈশ্বর দর্শন হয়।

"কিন্তু হাজার চেষ্টা কর, তাঁর কৃপা না হ'লে কিছু হয় না। তাঁর কৃপা না হ'লে তাঁর দর্শন হয় না। কৃপা কি সহজে হয়? অহঙ্কার একেবারে ত্যাগ করতে হবে। 'আমি কর্ত্তা' এ বোধ থাকলে ঈশ্বর দর্শন হয় না। ভাঁড়ারে একজন আছে, তখন বাড়ির কর্ত্তাকে যদি কেউ বলে, মহাশয়, আপনি এসে জিনিস বার ক'রে দিন। তখন কর্ত্তাটি বলে, ভাঁড়াড়ে একজন রয়েছে, আমি আর গিয়ে কি ক'রব! যে নিজে কর্ত্তা হ'য়ে বসেছে তার হৃদয়মধ্যে ঈশ্বর সহজে আসেন না।

"কৃপা হ'লেই দর্শন হয়। তিনি জ্ঞানসূর্য। তাঁর একটি কিরণে এই জগতে জ্ঞানের আলো পড়েছে, তবেই আমরা পরস্পরকে জানতে পারছি, আর জগতে কত রকম বিদ্যা উপার্জন করছি। তাঁর আলো যদি একবার তিনি নিজে তাঁর মুখের উপর ধরেন, তা হ'লে দর্শন লাভ হয়। সার্জন সাহেব রাত্রে আঁধারে লণ্ঠন হাতে ক'রে বেড়ায়; তার মুখ কেউ দেখতে পায় না। কিন্তু ঐ আলোতে সে সকলের মুখ দেখতে পায়; আর সকলে পরস্পরের মুখ দেখতে পায়।

"যদি কেউ সার্জনকে দেখ্‌তে চায়, তা হলে তাকে প্রার্থনা করতে হয়। বল্‌তে হয়,—সাহেব, কৃপা ক'রে একবার আলোটি নিজের মুখের উপর ফিরাও, তোমাকে একবার দেখি।

"ঈশ্বরকে প্রার্থনা ক'রতে হয়, ঠাকুর কৃপা ক'রে জ্ঞানের আলো তোমার নিজের উপর একবার ধর, আমি তোমায় দর্শন করি।

"ঘরে যদি আলো না জ্বলে, সেটি দারিদ্র্যের চিহ্ন। তাই হৃদয় মধ্যে জ্ঞানের আলো জ্বালতে হয়। 'জ্ঞানদীপ জেলে ঘরে, ব্রহ্মময়ীর মুখ দেখ না।"

বিজয় সঙ্গে ঔষধ আনিয়াছেন। ঠাকুরের সম্মুখে সেবন করিবেন। ঔষধ জল দিয়া খাইতে হয়। ঠাকুর জল আনাইয়া দিলেন। ঠাকুর অহেতুক কৃপাসিন্ধু, বিজয় গাড়ীভাড়া, নৌকাভাড়া দিয়ে আসিতে পারেন না। ঠাকুর মাঝে মাঝে লোক পাঠাইয়া দেন, আসতে বলেন। এবার বলরামকে পাঠাইয়াছিলেন। বলরাম ভাড়া দিবেন। বলরামের সঙ্গে বিজয় আসিয়াছেন। সন্ধ্যার সময় বিজয়, নবকুমার ও বিজয়ের অন্যান্য সঙ্গীগণ বলরামের নৌকাতে

আবার উঠিলেন। বলরাম তাঁহাদিগকে বাগবাজারের ঘাটে পোঁছাইয়া দিবেন। মাষ্টারও ঐ নৌকায় উঠিলেন।

নৌকা বাগবাজারের অন্নপূর্ণার ঘাটে আসিয়া পোঁছিল। যখন বলরামের বাগবাজারের বাড়ির কাছে তাঁহারা পোঁছিলেন, তখন জ্যোৎস্না একটু উঠিয়াছে। আজ শুক্লপক্ষের চতুর্থী তিথি, শীতকাল, অল্প শীত করিতেছে। ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণের অমৃতোপম উপদেশ স্মরণ করিতে করিতে ও তাঁহার আনন্দমূর্তি হৃদয়ে ধারণ করিয়া বিজয়, বলরাম, মাষ্টার প্রভৃতি গৃহে প্রত্যাবর্ত্তন করিলেন।

পঞ্চম খণ্ড

দক্ষিণেশ্বর কালীবাড়িতে শ্রীযুক্ত অমৃত, শ্রীযুক্ত ত্রৈলোক্য প্রভৃতি ব্রাহ্ম ভক্তের সঙ্গে কথোপকথন

প্রথম পরিচ্ছেদ

সমাধি মন্দিরে

ফাল্গুনের কৃষ্ণাপঞ্চমী তিথি, বৃহস্পতিবার ১৬ই চৈত্র, ইংরাজী ২৯শে মার্চ ১৮৮৩ খৃষ্টাব্দ। মধ্যাহ্ন ভোজনের পর ভগবান শ্রীরামকৃষ্ণ কিঞ্চিৎ বিশ্রাম করিতেছেন। দক্ষিণেশ্বর কালীবাড়িতে সেই পূর্বপরিচিত ঘর। সম্মুখে পশ্চিম দিকে গঙ্গা। চৈত্র মাসের গঙ্গা। বেলা দুইটার সময় জোয়ার আসিতে আরম্ভ হইয়াছে। ভক্তেরা কেহ কেহ আসিয়াছেন। তন্মধ্যে ব্রাহ্মভক্ত শ্রীযুক্ত অমৃত ও মধুরকন্ঠ শ্রীযুক্ত ত্রৈলোক্য, যিনি কেশবের ব্রাহ্মসমাজে ভগবত-লীলা-গুণগান করিয়া আবালবৃদ্ধের কতবার মন হরণ করিয়াছেন।

রাখালের অসুখ। এই কথা শ্রীরামকৃষ্ণ ভক্তদের বলিতেছেন।

শ্রীরামকৃষ্ণ—এই দেখ, রাখালের অসুখ। সোডা খেলে কি ভাল হয় গা? কি হবে বাপু! রাখাল তুই জগন্নাথের প্রসাদ খা।

এই কথা বলিতে বলিতে ঠাকুর অদ্ভুত ভাবে ভাবিত হইলেন। বুঝি দেখিতে লাগিলেন সাক্ষাৎ নারায়ণ সম্মুখে রাখালরূপে বালকের দেহ ধারণ ক'রে এসেছেন! একদিকে কামিনী-কাঞ্চন ত্যাগী শুদ্ধাত্মা বালকভক্ত রাখাল—অপরদিকে ঈশ্বরপ্রেমে অহরহঃ মাতোয়ারা শ্রীরামকৃষ্ণের সেই প্রেমের চক্ষু—সহজেই বাৎসল্য ভাবের উদয় হইল। তিনি সেই বালক রাখালকে বাৎসল্যভাবে দেখিতে লাগিলেন ও 'গোবিন্দ' 'গোবিন্দ' এই নাম প্রেমভরে উচ্চারণ করিতে লাগিলেন। শ্রীকৃষ্ণকে দেখিয়া যশোদার যে ভাবের উদয় হইত এ বুঝি সেই ভাব! ভক্তেরা এই অদ্ভুত ব্যাপার দর্শন করিতেছেন, এমন সময় সব স্থির! 'গোবিন্দ' নাম করিতে করিতে ভক্তাবতার ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণের সমাধি হইয়াছে। শরীর চিত্রার্পিতের ন্যায় স্থির! ইন্দ্রিয়গণ কাজে জবাব দিয়া যেন চলিয়া গিয়াছে! নাসিকাগ্রে দৃষ্টি স্থির। নিশ্বাস বহিছে, কি না বহিছে। শরীরমাত্র ইহলোকে পড়িয়া আছে! আত্মাপক্ষী বুঝি চিদাকাশে বিচরণ করিতেছে। এতক্ষণ যিনি সাক্ষাৎ মায়ের ন্যায় সন্তানের জন্য ব্যস্ত হইয়াছিলেন, তিনি এখন কোথায়? এই অদ্ভুত ভাবান্তরের নাম কি সমাধি?

এই সময় গেরুয়া কাপড়-পরা অপরিচিত একটি বাঙালী আসিয়া উপস্থিত হইলেন ও আসন গ্রহণ করিলেন।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

কর্মেন্দ্রিয়াণি সংযম্য য আস্তে মনসা স্মরন্।
ইন্দ্রিয়ার্থান্ বিমূঢ়াত্মা মিথ্যাচারঃ স উচ্যতে॥

[গীতা—৩, ৬

গেরুয়াবসন ও সন্ন্যাসী—অভিনয়েও মিথ্যা ভাল নয়

পরমহংসদেবের সমাধি ক্রমে ভঙ্গ হইতে লাগিল। ভাবস্থ হইয়াই কথা কহিতেছেন। আপনা আপনি বলিতেছেন—

শ্রীরামকৃষ্ণ (গেরুয়াদৃষ্টে)—আবার গেরুয়া কেন? একটা কি পরলেই হ'লো? (হাস্য)। একজন বলেছিল, 'চণ্ডী ছেড়ে হলুম ঢাকী।'—আগে চণ্ডীর গান গাইতো, এখন ঢাক বাজায়। (সকলের হাস্য)।

"বৈরাগ্য তিন-চার প্রকার। সংসারের জ্বালায় জ্বলে গেরুয়াবসন পরেছে—সে বৈরাগ্য বেশী দিন থাকে না। হয় ত কর্ম নাই, গেরুয়া প'রে কাশী চ'লে গেল। তিন মাস পরে ঘরে পত্র এলো, 'আমার একটি কর্ম হইয়াছে, কিছুদিন পরে বাড়ি যাইব, তোমরা ভাবিত হইও না।' আবার সব আছে, কোন অভাব নাই, কিন্তু কিছু ভাল লাগে না। ভগবানের জন্য এক্‌লা এক্‌লা কাঁদে। সে বৈরাগ্য যথার্থ বৈরাগ্য।

"মিথ্যা কিছুই ভাল নয়। মিথ্যা ভেক্ ভাল নয়। ভেকের মত যদি মনটা না হয়, ক্রমে সর্বনাশ হয়। মিথ্যা বলতে বা করতে ক্রমে ভয় ভেঙ্গে যায়। তার চেয়ে সাদা কাপড় ভাল। মনে আসক্তি, মাঝে মাঝে পতনও হচ্ছে, আর বাহিরে গেরুয়া। বড় ভয়ঙ্কর।

[কেশবের বাড়ি গমন ও নববৃন্দাবন দর্শন]

"এমন কি, যারা সৎ, অভিনয়েও তাদের মিথ্যা কথা বা কাজ ভাল নয়। কেশব সেনের ওখানে নববৃন্দাবন নাটক দেখতে গিছলাম। কি একটা আনলে ক্রস (Cross); আবার জল ছড়াতে লাগলো, বলে শান্তিজল। একজন দেখি মাতাল সেজে মাতলামি ক'রছে!"

ব্রাহ্মভক্ত—কু—বাবু।

শ্রীরামকৃষ্ণ—ভক্তের পক্ষে ওরূপ সাজাও ভাল নয়। ওসব বিষয়ে মন অনেকক্ষণ ফেলে রাখায় দোষ হয়। মন ধোপা ঘরের কাপড়, যে রঙে ছোপাবে সেই রঙ হ'য়ে যায়। মিথ্যাতে অনেকক্ষণ ফেলে রাখলে মিথ্যার রঙ ধরে যাবে।

"আর একদিন নিমাই সন্ন্যাস, কেশবের বাড়িতে দেখ্‌তে গিছলাম। যাত্রাটি কেশবের কতকগুলো খোসামুদে শিষ্য জুটে খারাপ করেছিল। একজন কেশবকে বললে, 'কলির চৈতন্য হচ্ছেন আপনি!' কেশব আবার আমার দিকে

চেয়ে হাসতে হাসতে বললে, 'তা হলে ইনি কি হলেন?' আমি বললুম, 'আমি তোমাদের দাসের দাস। রেণুর রেণু।' কেশবের লোকমান্য হবার ইচ্ছা ছিল।

[নরেন্দ্র প্রভৃতি নিত্যসিদ্ধ—তাদের ভক্তি আজন্ম]

(অমৃত ও ত্রৈলোক্যের প্রতি)—"নরেন্দ্র, রাখাল-টাখাল এই সব ছোকরা, এরা নিত্যসিদ্ধ, এরা জন্মে জন্মে ঈশ্বরের ভক্ত। অনেকের সাধ্যসাধনা ক'রে একটু ভক্তি হয়, এদের কিন্তু আজন্ম ঈশ্বরে ভালবাসা। যেন পাতাল ফোঁড়া শিব—বসানো শিব নয়।

"নিত্যসিদ্ধ একটি থাক আলাদা। সব পাখির ঠোঁট বাঁকা নয়। এরা কখনও সংসারে আসক্ত হয় না। যেমন প্রহ্লাদ।

"সাধারণ লোক সাধন করে, ঈশ্বরে ভক্তিও করে। আবার সংসারেও আসক্ত হয়, কামিনী-কাঞ্চনে মুগ্ধ হয়। মাছি যেমন ফুলে বসে, সন্দেশে বসে, আবার বিষ্ঠাতেও বসে। (সকলে স্তব্ধ)।

"নিত্যসিদ্ধ যেমন মৌমাছি, কেবল ফুলের উপর ব'সে মধু পান করে। নিত্যসিদ্ধ হরি রস পান করে, বিষয় রসের দিকে যায় না।

"সাধ্যসাধনা ক'রে যে ভক্তি, এদের সে ভক্তি নয়। এত জপ, এত ধ্যান করতে হবে, এইরূপ পূজা করতে হবে, এ সব 'বিধিবাদীয়' ভক্তি। যেমন ধান হ'লে মাঠ পার হ'তে গেলে আল দিয়ে ঘুরে ঘুরে যেতে হবে। আবার যেমন সম্মুখের গাঁয়ে যাবে, কিন্তু বাঁকা নদী দিয়ে ঘুরে ঘুরে যেতে হবে।

"রাগভক্তি প্রেমাভক্তি ঈশ্বরে আত্মীয়ের ন্যায় ভালবাসা, এলে আর কোন বিধিনিয়ম থাকে না। তখন ধানকাটা মাঠ যেমন পার হওয়া। আল দিয়ে যেতে হয় না। সোজা এক দিক্ দিয়ে গেলেই হ'লো।

"বন্যে এলে আর বাঁকা নদী দিয়ে ঘুরে ঘুরে যেতে হয় না। তখন মাঠের উপর এক বাঁশ জল! সোজা নৌকা চালিয়ে দিলেই হ'লো।

"এই রাগভক্তি, অনুরাগ, ভালবাসা না এলে ঈশ্বর লাভ হয় না।"

[সমাধিতত্ত্ব—সবিকল্প ও নির্বিকল্প]

অমৃত—মহাশয়। আপনার এই সমাধি অবস্থায় কি বোধ হয়?

শ্রীরামকৃষ্ণ—শুনেছো, কুমুরে পোকা চিন্তা করে আরশুলা কুমুরে পোকা হ'য়ে যায়; কি রকম জানো? যেমন হাঁড়ির মাছ গঙ্গায় ছেড়ে দিলে হয়।

অমৃত—একটুও কি অহং থাকে না?

শ্রীরামকৃষ্ণ—হাঁ, আমার প্রায় একটু অহং থাকে। সোনার একটু কণা, সোনার চাপে যত ঘসো না কেন, তবু একটু কণা থেকে যায়। আর যেমন বড়

আগুন আর তার একটি ফুল্‌কি। বাহ্যজ্ঞান চলে যায়, কিন্তু প্রায় তিনি একটু 'অহং' রেখে দেন—বিলাসের **জন্য! আমি তুমি** থাকলে তবে আস্বাদন হয়। কখন কখন সে আমিটুকুও তিনি পুঁছে ফেলেন। এর নাম 'জড় সমাধি—**নির্বিকল্প সমাধি**। তখন কি অবস্থা হয় মুখে বলা যায় না। নুনের পুতুল সমুদ্র মাপ্‌তে গিছিল, একটু নেমেই গলে গেল। 'তদাকারকারিত'। তখন কে আর উপরে এসে সংবাদ দেবে, সমুদ্র কত গভীর!

ষষ্ঠ খণ্ড

দক্ষিণেশ্বর কালীবাটীতে ভক্তসঙ্গে ব্রহ্মতত্ত্ব ও আদ্যাশক্তির বিষয়ে কথোপকথন—বিদ্যাসাগর ও কেশব সেনের কথা

প্রথম পরিচ্ছেদ

জ্ঞানযোগ ও নির্বাণমত—পণ্ডিত পদ্মলোচন ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর

আষাঢ়ের কৃষ্ণা তৃতীয়া তিথি। ইংরাজী ২২শে জুলাই, ১৮৮৩ খৃষ্টাব্দ। আজ রবিবার, ভক্তেরা শ্রীশ্রীপরমহংসদেবকে দর্শন করিতে আবার আসিয়াছেন। অন্য অন্য বারে তাঁহারা প্রায় আসিতে পারেন না। রবিবারে তাঁহারা অবসর পান। অধর, রাখাল, মাষ্টার কলিকাতা হইতে একখানি গাড়ী করিয়া বেলা একটা-দুইটার সময় কালীবাটীতে পৌঁছিলেন। ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ আহারান্তে একটু বিশ্রাম করিয়াছেন। ঘরে মণি মল্লিকাদি আরও কয়েকজন ভক্ত বসিয়া আছেন।

রাসমণির কালীবাড়ির বৃহৎ প্রাঙ্গণের পূর্বাংশে শ্রীশ্রীরাধাকান্তের মন্দির ও শ্রীশ্রীভবতারিণীর মন্দির। পশ্চিমাংশে দ্বাদশ শিবমন্দির। সারি সারি শিবমন্দিরের ঠিক উত্তরে শ্রীশ্রীপরমহংসদেবের ঘর। ঘরের পশ্চিমে অর্ধমণ্ডলাকার বারান্দা। সেখানে তিনি দাঁড়াইয়া পশ্চিমাস্য হইয়া গঙ্গা দর্শন করিতেন। গঙ্গার পোস্তা ও বারান্দার মধ্যবর্তী ভূমিখণ্ডে ঠাকুরবাড়ির পুষ্পোদ্যান। এই পুষ্পোদ্যান বহুদূরব্যাপী। দক্ষিণে বাগানের সীমা পর্যন্ত। উত্তরে পঞ্চবটী পর্যন্ত—যেখানে ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ তপস্যা করিয়াছিলেন—ও পূর্বে উদ্যানের দুই প্রবেশদ্বার পর্যন্ত। পরমহংসদেবের ঘরের কোলে দুই-একটি কৃষ্ণচূড়ার গাছ। নিকটেই গন্ধরাজ, কোকিলাক্ষ, শ্বেত ও রক্তকরবী। ঘরের দেওয়ালে ঠাকুরদের ছবি, তন্মধ্যে 'পিটার জলমধ্যে ডুবিতেছেন ও যীশু তাঁর হাত ধরিয়া তুলিতেছেন', সে ছবিখানিও আছে। আর একটি বুদ্ধদেবের প্রস্তরময় মূর্তিও আছে। তক্তপোশের উপর তিনি উত্তরাস্য হইয়া বসিয়া আছেন। ভক্তেরা মেঝের উপর কেহ মাদুরে, কেহ আসনে উপবিষ্ট। সকলেই মহাপুরুষের আনন্দমূর্তি একদৃষ্টে দেখিতেছেন। ঘরের অনতিদূরে পোস্তার পশ্চিম গা দিয়া পূতসলিলা গঙ্গা দক্ষিণবাহিনী হইয়া প্রবাহিত হইতেছিলেন। বর্ষাকালে খরস্রোতা, যেন সাগরসঙ্গমে পৌঁছিবার জন্য কত ব্যস্ত! পথে কেবল একবার মহাপুরুষের ধ্যানমন্দির দর্শন স্পর্শন করিয়া চলিয়া যাইতেছেন।

শ্রীযুক্ত মণি মল্লিক পুরাতন ব্রাহ্ম ভক্ত। বয়স ষাট-পঁয়ষট্টী। তিনি কিছুদিন পূর্বে কাশীধাম দর্শন করিতে গিয়াছিলেন। আজ ঠাকুরকে দর্শন করিতে আসিয়াছেন ও তাঁহাকে কাশী পর্যটন বৃত্তান্ত বলিতেছেন।

মণি মল্লিক—আর একটি সাধুকে দেখলাম। তিনি বলেন, ইন্দ্রিয় সংযম না হ'লে কিছু হবে না। শুধু ঈশ্বর ঈশ্বর করলে কি হবে?

শ্রীরামকৃষ্ণ—এদের মত কি জান? আগে সাধন চাই। শম, দম, তিতিক্ষা চাই। এরা নির্বাণের চেষ্টা ক'রছে। এরা বেদান্তবাদী, কেবল বিচার ক'রে ব্রহ্ম সত্য, জগৎ মিথ্যা—বড় কঠিন পথ। জগৎ মিথ্যা হ'লে তুমিও মিথ্যা, যিনি ব'লছেন তিনিও মিথ্যা, তাঁর কথাও স্বপ্নবৎ। বড় দূরের কথা।

"কি রকম জান? যেমন কর্পূর পোড়ালে কিছু বাকী থাকে না। কাঠ পোড়ালে তবু ছাই বাকী থাকে। শেষ বিচারের পর সমাধি হয়। তখন 'আমি' 'তুমি' 'জগৎ' এ সবের খবর থাকে না।

[পণ্ডিত পদ্মলোচন ও বিদ্যাসাগরের সঙ্গে দেখা]

"পদ্মলোচন ভারী জ্ঞানী ছিলেন, কিন্তু আমি মা, মা, করতুম, তবু আমায় খুব মান্‌তো। পদ্মলোচন বর্ধমানের রাজার সভা-পণ্ডিত ছিল। কলকাতায় এসেছিল, এসে কামারহাটির কাছে একটি বাগানে ছিল। আমার পণ্ডিত দেখবার ইচ্ছা হ'লো। হৃদেকে পাঠিয়ে দিলুম জান্‌তে, অভিমান আছে কি না? শুনলাম, পণ্ডিতের অভিমান নাই। আমার সঙ্গে দেখা হ'লো। এতো জ্ঞানী আর পণ্ডিত, তবু আমার মুখে রামপ্রসাদের গান শুনে কান্না! কথা ক'য়ে এমন সুখ কোথাও পাই নাই। আমায় বললে, 'ভক্তের সঙ্গ করবো এ কামনা ত্যাগ করো, নচেৎ নানারকমের লোক তোমায় পতিত ক'রবে।' বৈষ্ণবচরণের গুরু উৎসবানন্দের সঙ্গে লিখে বিচার করেছিল, আমায় আবার বল্‌লে, আপনি একটু শুনুন। একটা সভায় বিচার হয়েছিল—শিব বড়, না, ব্রহ্মা বড়! শেষে ব্রাহ্মণ পণ্ডিতেরা পদ্মলোচনকে জিজ্ঞাসা ক'র্‌লে। পদ্মলোচন এমনি সরল, সে বল্‌লে, 'আমার চৌদ্দপুরুষ শিবও দেখে নাই, ব্রহ্মাও দেখে নাই।' কামিনী-কাঞ্চন ত্যাগ শুনে আমায় একদিন বল্‌লে, 'ওসব ত্যাগ করেছো কেন? 'এটা টাকা, এটা মাটি, এ ভেদবুদ্ধি তো অজ্ঞান থেকে হয়।' আমি কি বল্‌বো, বল্‌লাম—কে জানে বাপু, আমার টাকাকড়ি ও সব ভাল লাগে না।

[বিদ্যাসাগরের দয়া—কিন্তু অন্তরে সোনা চাপা]

"একজন পণ্ডিতের ভারী অভিমান ছিল। ঈশ্বরের রূপ মান্‌তো না। কিন্তু ঈশ্বরের কার্য কে বুঝবে? তিনি আদ্যাশক্তিরূপে দেখা দিলেন। পণ্ডিত অনেকক্ষণ বেহুঁশ হ'য়ে রইল। একটু হুঁশ হবার পর, কা! কা! কা! (অর্থাৎ কালী) এই শব্দ কেবল করতে লাগলো।"

ভক্ত—মহাশয়, বিদ্যাসাগরকে দেখেছেন, কি রকম বোধ হ'লো?

শ্রীরামকৃষ্ণ—বিদ্যাসাগরের পাণ্ডিত্য আছে, দয়া আছে; কিন্তু অন্তর্দৃষ্টি নাই। অন্তরে সোনা চাপা আছে, যদি সেই সোনার সন্ধান পেতো, এত বাহিরের কাজ যা ক'চ্ছে সে সব কম প'ড়ে যেতো; শেষে একেবারে ত্যাগ হ'য়ে যেতো। অন্তরে হৃদয়মধ্যে ঈশ্বর আছেন, এ কথা জান্‌তে পার্‌লে তাঁরই ধ্যান চিন্তায় মন যেতো। কারু কারু নিষ্কাম কর্ম অনেক দিন ক'র্‌তে ক'রতে শেষে বৈরাগ্য হয়, আর ঐ দিকে মন যায়; ঈশ্বরে মন লিপ্ত হয়।

"ঈশ্বর বিদ্যাসাগর যেরূপ কাজ করছে সে খুব ভাল। দয়া খুব ভাল। দয়া আর মায়া অনেক তফাত। দয়া ভাল, মায়া ভাল নয়। মায়া আত্মীয়ের উপর ভালবাসা, স্ত্রী, পুত্র, ভাই, ভগিনী, ভাইপো, ভাগনে, বাপ, মা এদেরই উপর ভালবাসা। দয়া সর্বভূতে সমান ভালবাসা।"

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

'গুণত্রয়ব্যতিরিক্তং সচ্চিদানন্দস্বরূপঃ।'
ব্রহ্ম ত্রিগুণাতীত—মুখে বলা যায় না।'

মাস্টার—দয়াও কি একটা বন্ধন?

শ্রীরামকৃষ্ণ—সে অনেক দূরের কথা। দয়া সত্ত্বগুণ থেকে হয়। সত্ত্বগুণে পালন রজোগুণে সৃষ্টি, তমোগুণে সংহার। কিন্তু ব্রহ্ম সত্ত্বরজস্তমঃ তিন গুণের পার। প্রকৃতির পার।

"যেখানে ঠিক ঠিক সেখানে গুণ পোঁছিতে পারে না। চোর যেমন ঠিক জায়গায় যেতে পারে না, ভয় হয় পাছে ধরা পড়ে। সত্ত্বরজস্তমঃ তিন গুণই চোর। একটা গল্প বলি শুন—

"একটি লোক বনের পথ দিয়ে যাচ্ছিল। এমন সময়ে তাকে তিনজন ডাকাত এসে ধরলে। তারা তার সর্বস্ব কেড়ে নিলে। একজন চোর বললে, আর এ লোকটাকে রেখে কি হবে? এই কথা বলে খাঁড়া দিয়ে কাট্‌তে এলো। তখন আর একজন চোর বল্‌লে, না হে কেটে কি হবে? একে হাত-পা বেঁধে এখানে ফেলে যাও। তখন তাকে হাত-পা বেঁধে ঐখানে রেখে চোরেরা চ'লে গেল। কিছুক্ষণ পরে তাদের মধ্যে একজন ফিরে এসে বল্‌লে, 'আহা, তোমার কি লেগেছে? এসো আমি তোমার বন্ধন খুলে দিই।' তার বন্ধন খুলে দিয়ে চোরটি বললে, 'আমার সঙ্গে সঙ্গে এসো, তোমায় সদর রাস্তায় তুলে দিচ্ছি।' অনেকক্ষণ পরে সদর রাস্তায় এসে বল্‌লে, 'এই রাস্তা ধ'রে যাও, ঐ তোমার বাড়ি দেখা যাচ্ছে।' তখন লোকটি চোরকে বল্‌লে, মশাই আমার অনেক

উপকার করলেন, এখন আপনিও আসুন, আমার বাড়ি পর্যন্ত যাবেন।' চোর বললে, 'না, আমার ওখানে যাবার যো নাই, পুলিসে টের পাবে।'

"সংসারই অরণ্য। এই বনে সত্ত্বরজস্তমঃ তিন গুণ ডাকাত, জীবের তত্ত্বজ্ঞান কেড়ে লয়। তমোগুণ জীবের বিনাশ করতে যায়। রজোগুণ সংসারে বদ্ধ করে। কিন্তু সত্ত্বগুণ, রজস্তমঃ থেকে বাঁচায়। সত্ত্বগুণের আশ্রয় পেলে কাম-ক্রোধ এই সব তমোগুণ থেকে রক্ষা হয়। সত্ত্বগুণ আবার জীবের সংসার বন্ধন মোচন করে। কিন্তু সত্ত্বগুণও চোর, তত্ত্বজ্ঞান দিতে পারে না। কিন্তু সেই পরম ধামে যাবার পথে তুলে দেয়। দিয়ে বলে, ঐ দেখ তোমার বাড়ি ঐ দেখা যায়! যেখানে ব্রহ্মজ্ঞান সেখান থেকে সত্ত্বগুণ অনেক দূরে।

"ব্রহ্ম কি, তা মুখে বলা যায় না। যার হয় সে খবর দিতে পারে না। একটা কথা আছে, কালাপানিতে জাহাজ গেলে আর ফিরে না।

"চার বন্ধু ভ্রমণ ক'রতে ক'রতে পাঁচীলে ঘেরা একটা জায়গা দেখতে পেলে। খুব উঁচু পাঁচীল। ভিতরে কি আছে দেখবার জন্য সকলে বড় উৎসুক হ'ল। পাঁচীল বেয়ে একজন উঠলো। উঁকি মেরে যা দেখলে, তাতে অবাক হ'য়ে 'হা হা হা হা' বলে ভিতরে পড়ে গেল। আর কোন খবর দিল না। যে'ই উঠে সে'ই 'হা হা হা হা' ক'রে পড়ে যায়। তখন খবর আর কে দেবে?

[জড়ভরত, দত্তাত্রেয়, শুকদেব—এ'দের ব্রহ্মজ্ঞান]

"জড়-ভরত, দত্তাত্রেয় এ'রা ব্রহ্ম দর্শন ক'রে আর খবর দিতে পারেন নাই। ব্রহ্মজ্ঞান হ'য়ে সমাধি হলে আর 'আমি' থাকে না। তাই রামপ্রসাদ বলেছে, "আপনি যদি না পারিস্ মন তবে রামপ্রসাদকে সঙ্গে নেনা।' মনের লয় হওয়া চাই, আবার 'রামপ্রসাদের লয়' অর্থাৎ অহংতত্ত্বের লয় হওয়া চাই। তবে সেই ব্রহ্মজ্ঞান হয়।"

একজন ভক্ত—মহাশয়, শুকদেবের কি জ্ঞান হয় নাই?

শ্রীরামকৃষ্ণ— কেউ কেউ বলে, শুকদেব ব্রহ্মসমুদ্রের দর্শন স্পর্শন মাত্র করেছিলেন, নেমে ডুব দেন নাই। তাই ফিরে এসে অত উপদেশ দিয়েছিলেন। কেউ বলে তিনি ব্রহ্মজ্ঞানের পর ফিরে এসেছিলেন—লোকশিক্ষার জন্য। পরীক্ষিৎকে ভাগবত বলবেন আরো কত লোকশিক্ষা দিবেন, তাই ঈশ্বর তাঁর সব 'আমি'র লয় করেন নাই। বিদ্যার 'আমি' এক রেখে দিয়েছিলেন।

[কেশবকে শিক্ষা—দল (সাম্প্রদায়িকতা) ভাল নয়]

একজন ভক্ত—ব্রহ্মজ্ঞান হ'লে কি দলটল থাকে?

শ্রীরামকৃষ্ণ—কেশব সেনের সঙ্গে ব্রহ্মজ্ঞানের কথা হচ্ছিল। কেশব বললে, আরও বলুন। আমি বললুম, আর বললে দলটল থাকে না। তখন কেশব

বললে, তবে আর থাক, মশাই। (সকলের হাস্য)। তবু কেশবকে বললুম, 'আমি' 'আমার' এটি অজ্ঞান। 'আমি কর্তা' আর আমার এই সব স্ত্রী, পুত্র, বিষয়, মান, সম্ভ্রম, এ ভাব অজ্ঞান না হলে হয় না। তখন কেশব বললে, মহাশয় 'আমি' ত্যাগ করলে যে আর কিছুই থাকে না। আমি বল্লুম কেশব তোমাকে সব 'আমি' ত্যাগ কর্‌তে বলছি না, তুমি 'কাঁচা আমি' ত্যাগ কর। 'আমি কর্তা' 'আমার স্ত্রী-পুত্র' 'আমি গুরু', এ সব অভিমান, 'কাঁচা আমি'—এইটি ত্যাগ কর। এইটি ত্যাগ করে 'পাকা আমি' হয়ে থাকো। আমি তাঁর দাস, আমি তাঁর ভক্ত, আমি অকর্তা, তিনি কর্তা।

[ঈশ্বরের আদেশ পেয়ে তবে ধর্মপ্রচার করা উচিত]

একজন ভক্ত—'পাকা আমি' কি দল করতে পারে?

শ্রীরামকৃষ্ণ—কেশব সেনকে বললুম, আমি দলপতি দল করেছি, আমি লোকশিক্ষা দিচ্ছি, এ 'আমি' 'কাঁচা আমি।' মত প্রচার বড় কঠিন। ঈশ্বরের আজ্ঞা ব্যতিরেকে হয় না। তাঁর আদেশ চাই। যেমন শুকদেব ভাগবত কথা বলতে আদেশ পেয়েছিলেন। যদি ঈশ্বরের সাক্ষাৎকার ক'রে কেউ আদেশ পায়, সে যদি প্রচার করে, লোকশিক্ষা দেয়, দোষ নাই। তার 'আমি' 'কাঁচা আমি' নয়, 'পাকা আমি।'

"কেশবকে বলেছিলাম 'কাঁচা আমি' ত্যাগ কর। 'দাস আমি'. 'ভক্তের আমি' এতে কোন দোষ নাই।

"তুমি দল দল করছো। তোমার দল থেকে লোক ভেঙ্গে ভেঙ্গে যাচ্ছে। কেশব বললে, মহাশয়, তিন বৎসর এ দলে থেকে আবার ওদলে গেল। যাবার সময় আবার গালাগালি দিয়ে গেলো। আমি বললাম, তুমি লক্ষণ দেখ না কেন, যাকে তাকে চেলা করলে কি হয়?

[কেশবকে শিক্ষা—আদ্যাশক্তিকে মানো]

"আর কেশবকে বলেছিলাম, তুমি আদ্যাশক্তিকে মানো। ব্রহ্ম আর শক্তি অভেদ—যিনিই ব্রহ্ম তিনিই শক্তি। যতক্ষণ দেহবুদ্ধি, ততক্ষণ দুটো ব'লে বোধ হয়। বলতে গেলেই দুটো। কেশব কালী (শক্তি) মেনেছিল।

"একদিন কেশব শিষ্যদের সঙ্গে এখানে এসেছিল। আমি বললাম তোমার লেক্‌চার শুনবো। চাঁদনীতে ব'সে লেক্‌চার দিলে। তারপর ঘাটে এসে বসে অনেক কথাবার্তা হ'ল। আমি বললাম, যিনিই ভগবান তিনিই একরূপে ভক্ত। তিনিই একরূপে ভাগবত। তোমরা বলো **ভাগবত-ভক্ত-ভগবান**। কেশব বললে, আর শিষ্যেরাও সব একসঙ্গে বললে, ভাগবত-ভক্ত-ভগবান। যখন বললাম, 'বলো গুরু-কৃষ্ণ-বৈষ্ণব', তখন কেশব বললে, মহাশয়, এখন অত দূর নয়; তা হ'লে লোকে গোঁড়া ব'ল্‌বে।

[পূর্বকথা—শ্রীরামকৃষ্ণের মূর্চ্ছা—মায়ার কাণ্ড দেখে]

"ত্রিগুণাতীত হওয়া বড় কঠিন। ঈশ্বর লাভ না ক'র্‌লে হয় না। জীব মায়ার রাজ্যে বাস করে। এই মায়া ঈশ্বরকে জান্‌তে দেয় না। এই মায়া মানুষকে অজ্ঞান ক'রে রেখেছে। হৃদে একটা এ'ড়ে বাছুর এনেছিল। একদিন দেখি সেটিকে বাগানে বে'ধে দিয়েছে, ঘাস খাওয়াবার জন্য। আমি জিজ্ঞাসা করলাম, হৃদে, ওটাকে রোজ ওখানে বে'ধে রাখিস্ কেন? হৃদে বললে, 'মামা, এ'ড়েটিকে দেশে পাঠিয়ে দিব। বড় হ'লে লাঙ্গল টানবে।' যাই এ কথা বলেছে আমি মূর্ছিত হ'য়ে প'ড়ে গেলাম! মনে হয়েছিল কি মায়ার খেলা! কোথায় কামারপুকুর সিওড়, কোথায় কল্‌কাতা। এই বাছুরটি যাবে, ওই পথ! সেখানে বড় হবে। তারপর কতদিন পরে লাঙ্গল টান্‌বে—এরই নাম সংসার,—এরই নাম মায়া।

"অনেকক্ষণ পরে মূর্চ্ছা ভেঙ্গেছিল।"

তৃতীয় পরিচ্ছেদ

সমাধি মন্দিরে

শ্রীরামকৃষ্ণ অহর্নিশি সমাধিস্থ! দিনরাত কোথা দিয়া যাইতেছে। কেবল ভক্তদের সঙ্গে এক-একবার ঈশ্বরীয় কথা বা কীর্ত্তন করেন। তিনটা-চারিটার সময় মাষ্টার দেখিলেন, ঠাকুর ছোট তক্তপোশে বসিয়া আছেন, ভাবাবিষ্ট। কিয়ৎক্ষণ পরে মার সঙ্গে কথা কহিতেছেন।

মার সঙ্গে কথা কহিতে কহিতে একবার বলিলেন, "মা, ওকে এক কলা দিলি কেন?" ঠাকুর খানিকক্ষণ নিস্তব্ধ হইয়া রহিলেন। আবার বলিতেছেন, "মা, বুঝেছি, এক কলাতেই যথেষ্ট হবে। এক কলাতেই তোর কাজ হবে, জীবশিক্ষা হবে।"

ঠাকুর কি সাঙ্গোপাঙ্গোদের ভিতর এইরূপে শক্তিসঞ্চার করিতেছেন? এ সব কি আয়োজন হইতেছে যে, পরে তাঁহারা জীবশিক্ষা দিবেন? মাষ্টার ছাড়া ঘরে রাখালও বসিয়া আছেন। ঠাকুর এখনও আবিষ্ট। রাখালকে বলিতেছেন, "তুই রাগ করেছিলি? তোকে রাগালুম কেন, এর মানে আছে। ঔষধ ঠিক পড়বে বলে? পিলে মুখ তুললে পর মনসার পাতা-টাতা দিতে হয়।

কিয়ৎক্ষণ পরে বলিতেছেন, "হাজরাকে দেখলাম শুষ্ক কাঠ! তবে এখানে থাকে কেন? তার মানে আছে, জটিলে-কুটিলে থাকলে লীলা পোষ্টাই হয়।

) (মাষ্টারের প্রতি)—ঈশ্বরীয় রূপ মান্‌তে হয়! জগদ্ধাত্রীরূপের, মানে জান? যিনি জগৎকে ধারণ ক'রে আছেন। তিনি না ধ'রলে, তিনি না পালন

ক'রলে জগৎ পড়ে যায়, নষ্ট হয়ে যায়। মনকরীকে যে বশ ক'রতে পারে, তারই হৃদয়ে জগদ্ধাত্রী উদয় হন।"

রাখাল—'মন-মত্ত-করী!'

শ্রীরামকৃষ্ণ—সিংহবাহিনীর সিংহ তাই হাতীকে জব্দ ক'রে রয়েছে।

সন্ধ্যার পর ঠাকুরবাড়িতে আরতি হইতেছে। সন্ধ্যা সমাগমে ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ নিজের ঘরে ঠাকুরদের নাম করিতেছেন। ঘরে ধুনা দেওয়া হইল। ঠাকুর বদ্ধাঞ্জলি হইয়া ছোট তক্তপোশটির উপর বসিয়া আছেন। মার চিন্তা করিতেছেন। বেলঘরের শ্রীযুক্ত গোবিন্দ মুখুয্যে ও তাহার বন্ধুগণ আসিয়া প্রণাম করিয়া মেঝেতে বসিলেন। মাস্টারও বসিয়া আছেন। রাখালও বসিয়া আছেন।

বাহিরে চাঁদ উঠিয়াছে। জগৎ নিঃশব্দে হাসিতেছে। ঘরের ভিতর সকলে নিঃশব্দে বসিয়া ঠাকুরের শান্ত মূর্ত্তি দেখিতেছেন। ঠাকুর ভাবাবিষ্ট। কিয়ৎক্ষণ পরে কথা কহিলেন। এখনও ভাবাবস্থা।

[শ্যামারূপ—পুরুষ-প্রকৃতি—যোগমায়া—শিবকালী ও রাধাকৃষ্ণ রূপের ব্যাখ্যা—উত্তম ভক্ত—বিচার পথ]

শ্রীরামকৃষ্ণ (ভাবস্থ)—বল, তোমাদের যা সংশয়। আমি সব বলছি।

গোবিন্দ ও অন্যান্য ভক্তেরা ভাবিতে লাগিলেন।

গোবিন্দ—আজ্ঞা, শ্যামা এ রূপটি হ'ল কেন?

শ্রীরামকৃষ্ণ—সে দূর ব'লে। কাছে গেলে কোন রঙ নাই। দীঘির জল দূরে থেকে কাল দেখায়, কাছে গিয়ে হাতে ক'রে তোল, কোন রঙ নাই। ঈশ্বরের যত কাছে যাবে ততই ধারণা হবে, তাঁর নাম, রূপ নাই। পেছিয়ে একটু দূরে এলে আবার 'আমার শ্যামা মা!' যেন ঘাসফুলের রঙ। শ্যামা পুরুষ না প্রকৃতি? একজন ভক্ত পূজা করেছিল। একজন দর্শন করতে এসে দেখে ঠাকুরের গলায় পৈতে! সে বললে, তুমি মার গলায় পৈতে পরিয়ে রেখেছ? ভক্তটি বললে, ভাই, তুমিই মাকে চিনেছ। আমি এখনও চিনতে পারি নাই, তিনি পুরুষ কি প্রকৃতি! তাই পৈতে পরিয়েছি।'

"যিনি শ্যামা, তিনিই ব্রহ্ম। যাঁরই রূপ, তিনিই অরূপ। যিনি সগুণ, তিনিই নির্গুণ। ব্রহ্ম শক্তি—শক্তি ব্রহ্ম। অভেদ। সচ্চিদানন্দময় আর সচ্চিদানন্দময়ী।"

গোবিন্দ—যোগমায়া কেন বলে?

শ্রীরামকৃষ্ণ—যোগমায়া অর্থাৎ পুরুষ প্রকৃতির যোগ। যা কিছু দেখ্ছ সবই পুরুষ-প্রকৃতির যোগ। শিবকালীর মূর্ত্তি, শিবের উপর কালী দাঁড়িয়ে আছেন। শিব শব হ'য়ে প'ড়ে আছেন। কালী শিবের দিকে চেয়ে আছেন।

এই সমস্তই পুরুষ-প্রকৃতির যোগ। পুরুষ নিষ্ক্রিয়, তাই শিব শব হ'য়ে আছেন। পুরুষের যোগে প্রকৃতি সমস্ত কাজ করছেন। সৃষ্টি-স্থিতি-প্রলয় করছেন!

"রাধাকৃষ্ণের যুগল মূর্ত্তিরও মানে ঐ। ঐ যোগের জন্য বঙ্কিম ভাব। সেই যোগ দেখাবার জন্যই শ্রীকৃষ্ণের নাকে মুক্তা, শ্রীমতীর নাকে নীল পাথর। শ্রীমতীর গৌর বরণ মুক্তার ন্যায় উজ্জ্বল। শ্রীকৃষ্ণের শ্যামবর্ণ, তাই শ্রীমতীর নীল পাথর। আবার শ্রীকৃষ্ণ পীতবসন ও শ্রীমতী নীলবসন পরেছেন।

"উত্তম ভক্ত কে? যে ব্রহ্মজ্ঞানের পর দেখে, তিনিই জীবজগৎ, চতুর্বিংশতি তত্ত্ব হয়েছেন। প্রথমে 'নেতি' 'নেতি' বিচার করে ছাদে পোঁছিতে হয়। তারপর সে দেখে, ছাদও যে জিনিসে তৈয়ারি—ইট, চূণ, শুরকী—সিঁড়িও সেই জিনিসে তৈয়ারি। তখন দেখে ব্রহ্মই জীব-জগৎ সমস্ত হয়েছেন।

"শুধু বিচার! থু! থু!—কাজ নাই।

ঠাকুর মুখামৃত ফেলিলেন।

"কেন বিচার ক'রে শুষ্ক হ'য়ে থাক্‌ব? যতক্ষণ 'আমি তুমি' আছে ততক্ষণ যেন তাঁর পাদপদ্মে শুদ্ধা-ভক্তি থাকে।

(গোবিন্দের প্রতি)—"কখনও বলি—তুমিই আমি, আমিই তুমি। আবার কখনও 'তুমিই তুমি' হয়ে যায়! তখন আমি খুঁজে পাই না।

"শক্তিরই অবতার। এক মতে রাম ও কৃষ্ণ চিদানন্দসাগরের দুটি ঢেউ।

"অদ্বৈতজ্ঞানের পর চৈতন্য লাভ হয়। তখন দেখে সর্বভূতে চৈতন্যরূপে তিনি আছেন। চৈতন্য লাভের পর আনন্দ। অদ্বৈত, চৈতন্য, নিত্যানন্দ।

[ঈশ্বরের রূপ আছে—ভোগবাসনা গেলে ব্যাকুলতা]

(মাষ্টারের প্রতি)—"আর তোমায় বলছি—রূপ, ঈশ্বরীয় রূপ অবিশ্বাস ক'রো না। রূপ আছে বিশ্বাস ক'রো! তারপর যে রূপটি ভালবাস সেই রূপ ধ্যান ক'রো।

(গোবিন্দের প্রতি)—"কি জান, যতক্ষণ ভোগ-বাসনা থাকে ততক্ষণ ঈশ্বরকে জানতে বা দর্শন করতে প্রাণ ব্যাকুল হয় না। ছেলে খেলা নিয়ে ভুলে থাকে। সন্দেশ দিয়ে ভুলোও খানিক সন্দেশ খাবে। যখন খেলাও ভাল লাগে না, সন্দেশও ভাল লাগে না, তখন বলে, 'মা যাব!' আর সন্দেশ চায় না। যাকে চেনে না, কোনও কালে দেখে নাই, সে যদি বলে, আয় মার কাছে নিয়ে যাই—তারই সঙ্গে যাবে। যে কোলে করে নিয়ে যায় তারই সঙ্গে যাবে।

"সংসারের ভোগ হ'য়ে গেলে ঈশ্বরের জন্য প্রাণ ব্যাকুল হয়। কি করে তাঁকে পাবো, কেবল এই চিন্তা হয়। যে যা বলে তাই শুনে।"

মাষ্টার (স্বগত)—ভোগবাসনা গেলে তবে ঈশ্বরের জন্য প্রাণ ব্যাকুল হয়।

সপ্তম খণ্ড
দক্ষিণেশ্বর-মন্দিরে ভক্তসঙ্গে

প্রথম পরিচ্ছেদ
বেদান্ত সম্বন্ধে কথা

ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ আজ দক্ষিণেশ্বর-মন্দিরে ভক্তসঙ্গে। শ্রাবণ কৃষ্ণা প্রতিপদ, ১৯শে আগষ্ট ১৮৮৩ খৃষ্টাব্দ। আজ রবিবার। এই মাত্র ভোগারতির সময় সানাই বাজিতেছিল। ঠাকুরঘর বন্ধ হইল। ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ প্রসাদপ্রাপ্তির পর কিঞ্চিৎ বিশ্রাম করিতেছেন। বিশ্রামের পর—এখনও মধ্যাহ্নকাল—তিনি তাঁহার ঘরে ছোট তক্তপোশের উপর বসিয়া আছেন। এমন সময় মাষ্টার আসিয়া প্রণাম করিলেন। কিয়ৎক্ষণ পরে তাঁহার সঙ্গে বেদান্ত সম্বন্ধে কথা হইতে লাগিল।

[বেদান্তবাদীদিগের মত—কৃষ্ণকিশোরের কথা]

শ্রীরামকৃষ্ণ (মাষ্টারের প্রতি)—দেখ, অষ্টাবক্রসংহিতায় আত্মজ্ঞানের কথা আছে। আত্মজ্ঞানীরা বলে, 'সোহহম্' অর্থাৎ 'আমিই সেই পরমাত্মা।' এ সব বেদান্তবাদী সন্ন্যাসীর মত, সংসারীর পক্ষে এ মত ঠিক নয়। সবই করা যাচ্ছে, অথচ 'আমিই সেই নিষ্ক্রিয় পরমাত্মা'—এ কিরূপে হতে পারে? বেদান্তবাদীরা বলে, আত্মা নির্লিপ্ত। সুখ-দুঃখ, পাপ-পুণ্য, এ সব আত্মার কোনও অপকার করতে পারে না; তবে দেহাভিমানী লোকদের কষ্ট দিতে পারে। ধোঁয়া দেওয়াল ময়লা করে, আকাশের কিছু করতে পারে না। কৃষ্ণকিশোর জ্ঞানীদের মতো বলতো, আমি 'খ'—অর্থাৎ, আকাশবৎ। তা, সে পরম ভক্ত; তাঁর মুখে ও কথা বরং সাজে, কিন্তু সকলের মুখে নয়।

[পাপ ও পুণ্য—মায়া না দয়া?]

"কিন্তু 'আমি মুক্ত' এ অভিমান খুব ভাল। 'আমি মুক্ত' এ কথা বলতে বলতে সে মুক্ত হয়ে যায়। আবার 'আমি বদ্ধ' 'আমি বদ্ধ' এ কথা বলতে বলতে সে ব্যক্তি বদ্ধই হয়ে যায়। যে কেবল বলে 'আমি পাপী' 'আমি পাপী' সেই শালাই পড়ে যায়! বরং বলতে হয়, আমি তাঁর নাম করেছি, আমার আবার পাপ কি, বন্ধন কি!

(মাস্টারের প্রতি)—"দেখ, আমার মনটা বড় খারাপ হয়েছে। হৃদে* চিঠি লিখেছে, তার বড় অসুখ। একি মায়া, না, দয়া?

মাস্টার কি বলিবেন? চুপ করিয়া রহিলেন।

শ্রীরামকৃষ্ণ—মায়া কাকে বলে জান? বাপ-মা, ভাই-ভগ্নী, স্ত্রী-পুত্র, ভাগিনা-ভাগিনী, ভাইপো-ভাইঝি, এই সব আত্মীয়ের প্রতি ভালবাসা। আর দয়া মানে—সর্বভূতে ভালবাসা। আমার এটা কি হ'লো, মায়া না দয়া? হৃদে কিন্তু আমার অনেক ক'রেছিল—অনেক সেবা ক'রেছিল—হাতে ক'রে গু পরিষ্কার করতো। তেমনি শেষে শাস্তিও দিয়েছিল। এত শাস্তি দিত যে, পোস্তার উপর গিয়ে গঙ্গায় ঝাঁপ দিয়ে দেহত্যাগ করতে গিছলাম। কিন্তু আমার অনেক ক'রেছিল—এখন সে কিছু (টাকা) পেলে মনটা স্থির হয়। কিন্তু কোন্ বাবুকে আবার বলতে যাব! কে ব'লে বেড়ায়?"

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

মৃন্ময় আধারে চিন্ময়ী দেবী—বিষ্ণুপুরে মৃন্ময়ী দর্শন

বেলা দুটো-তিনটার সময় ভক্তবীর শ্রীযুক্ত অধর সেন ও শ্রীযুক্ত বলরাম বসু আসিয়া উপনীত হইলেন ও পরমহংসদেবকে ভূমিষ্ঠ হইয়া প্রণাম করিয়া আসন গ্রহণ করিলেন। তাঁহারা জিজ্ঞাসা করিলেন, আপনি কেমন আছেন? ঠাকুর বলিলেন, "হাঁ, শরীর ভাল আছে, তবে আমার মনে একটু কষ্ট হ'য়ে আছে।"

হৃদয়ের পীড়া সম্বন্ধে কোন কথারই উত্থাপন করিলেন না।

বড়বাজারের মল্লিকদের সিংহবাহিনী দেবীবিগ্রহের কথা পড়িল।

শ্রীরামকৃষ্ণ—সিংহবাহিনী আমি দেখতে গিছলুম। চাষাধোপাপাড়ায় একজন মল্লিকদের বাড়িতে ঠাকুরকে দেখলুম। পোড়া বাড়ি, তারা গরীব হ'য়ে গেছে। এখানে পায়রার গু, ওখানে শেওলা, এখানে ঝুর ঝুর করে বালি-সুরকি পড়ছে। অন্য মল্লিকদের বাড়ির যেমন দেখেছি, এ বাড়ির সে শ্রী নাই। (মাষ্টারের প্রতি)—আচ্ছা, এর মানে কি বল দেখি।

---

*হৃদয় ইং ১৮৮১ স্নানযাত্রার দিন পর্যন্ত কালীবাড়িতে প্রায় তেইশ বৎসর পরমহংসদেবের সেবা করিয়াছিলেন। সম্পর্কে হৃদয় তাঁহার ভাগিনের, তাঁহার জন্মভূমি হুগলী জেলার অন্তঃপাতী সিওড় গ্রাম। ঐ গ্রাম ঠাকুরের জন্মভূমি 'কামারপুকুর' হইতে দুই ক্রোশ। ১৩০৬ সালের বৈশাখ মাসে ছিষট্টি বৎসর বয়ঃক্রমে জন্মভূমিতে তাঁহার পরলোক প্রাপ্তি হইয়াছে।

"কি জান, যার যা কর্মের ভোগ আছে, তা তার করতে হয়। সংস্কার, প্রারব্ধ এ সব মানতে হয়।

(মাষ্টারের প্রতি)—"আর পোড়ো বাড়িতে দেখলুম যে, সেখানেও সিংহ-বাহিনীর মুখের ভাব জ্বল্ জ্বল্ ক'রছে। আবির্ভাব মানতে হয়।

"আমি একবার বিষ্ণুপুরে গিছলুম। রাজার বেশ সব ঠাকুরবাড়ি আছে। সেখানে ভগবতীর মূর্তি আছে, নাম মৃন্ময়ী। ঠাকুরবাড়ির কাছে বড় দীঘি। কৃষ্ণবাঁধ। লালবাঁধ। আচ্ছা, দীঘিতে আবাঠার (মাথা ঘসার) গন্ধ পেলুম কেন বল দেখি? আমি ত জানতুম না যে, মেয়েরা মৃন্ময়ীদর্শনের সময় আবাঠা তাঁকে দেয়। আর দীঘির কাছে আমার ভাব সমাধি হ'ল, তখন বিগ্রহ দেখি নাই। আবেশে সেই দীঘির কাছে মৃণ্ময়ী দর্শন হ'ল—কোমর পর্যন্ত।"

[ভক্তের সুখ-দুঃখ—ভাগবত ও মহাভারতের কথা]

এতক্ষণে আর সব ভক্ত আসিয়া জুটিতেছেন। কাবুলের রাজবিপ্লব ও যুদ্ধের কথা উঠিল। একজন বলিলেন যে, ইয়াকুব খাঁ সিংহাসনচ্যুত হইয়াছেন। তিনি পরমহংসদেবকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন, মহাশয়, ইয়াকুব খাঁ কিন্তু একজন বড় ভক্ত।

শ্রীরামকৃষ্ণ—কি জান, সুখ-দুঃখ দেহধারণের ধর্ম। কবিকঙ্কণ চণ্ডীতে আছে যে, কালুবীর জেলে গিছল; তার বুকে পাষাণ দিয়ে রেখেছিল।—কিন্তু কালুবীর ভগবতীর বরপুত্র। দেহধারণ ক'রলেই সুখ-দুঃখ ভোগ আছে।

"শ্রীমন্ত বড় ভক্ত। আর তার মা খুল্লনাকে ভগবতী কত ভালবাসতেন। সেই শ্রীমন্তের কত বিপদ! মশানে কাটতে নিয়ে গিছল।

"একজন কাঠুরে পরম ভক্ত, ভগবতীর দর্শন পেলে; তিনি কত ভালবাসলেন, কত কৃপা করলেন। কিন্তু তার কাঠুরের কাজ আর ঘুচলো না! সেই কাঠ কেটে আবার খেতে হবে। কারাগারে চতুর্ভুজ শঙ্খচক্রগদাপদ্মধারী ভগবান দেবকীর দর্শন হ'ল। কিন্তু কারাগার ঘুচলো না।"

মাষ্টার—শুধু কারাগার ঘোচা কেন? দেহই ত যত জঞ্জালের গোড়া। দেহটা ঘুচে যাওয়া উচিত ছিল।

শ্রীরামকৃষ্ণ—কি জান, প্রারব্ধ কর্মের ভোগ। যে ক'দিন ভোগ আছে, দেহ ধারণ করতে হয়। একজন কাণা গঙ্গাস্নান ক'রলে। পাপ সব ঘুচে গেল। কিন্তু কাণাচোখ আর ঘুচলো না। (সকলের হাস্য)। পূর্বজন্মের কর্ম ছিল তাই ভোগ।

মণি—যে বাণটা ছোড়া গেল, তার উপর কোনও আয়ত্ত থাকে না।

শ্রীরামকৃষ্ণ—দেহের সুখ-দুঃখ যাই হোক, ভক্তের জ্ঞান, ভক্তির ঐশ্বর্য থাকে, সে ঐশ্বর্য কখনও যাবার নয়। দেখ না—পাণ্ডবদের অত বিপদ! কিন্তু এ বিপদে তারা চৈতন্য একবারও হারায় নাই। তাদের মত জ্ঞানী তাদের মত ভক্ত কোথায়?

তৃতীয় পরিচ্ছেদ

'সমাধি মন্দিরে'—কাপ্তেন ও নরেন্দ্রের আগমন

এমন সময় নরেন্দ্র ও বিশ্বনাথ উপাধ্যায় আসিয়া উপস্থিত হইলেন। বিশ্বনাথ নেপালের রাজার উকিল,—রাজপ্রতিনিধি। ঠাকুর তাঁহাকে কাপ্তেন বলিতেন। নরেন্দ্রের বয়স বছর বাইশ, বি-এ, পড়িতেছেন। মাঝে মাঝে, বিশেষতঃ রবিবারে দর্শন করিতে আসেন।

তাঁহারা প্রণাম করিয়া উপবিষ্ট হইলে, পরমহংসদেব নরেন্দ্রকে গান গাহিতে অনুরোধ করিলেন। ঘরের পশ্চিম ধারে তানপুরাটি ঝুলান ছিল। সকলে একদৃষ্টে গায়কের দিকে চাহিয়া রহিলেন। বাঁয়া ও তবলার সুর বাঁধা হইতে লাগিল—কখন গান হয়।

শ্রীরামকৃষ্ণ (নরেন্দ্রের প্রতি)—দেখ, এ আর তেমন বাজে না।

কাপ্তেন—পূর্ণ হ'য়ে বসে আছে, তাই শব্দ নাই। (সকলের হাস্য)। পূর্ণকুম্ভ।

শ্রীরামকৃষ্ণ (কাপ্তেনের প্রতি)—কিন্তু নারদাদি?

কাপ্তেন—তাঁরা পরের দুঃখে কথা ক'য়েছিলেন।

শ্রীরামকৃষ্ণ—হাঁ, নারদ, শুকদেব, এঁরা সমাধির পর নেমে এসেছিলেন,—দয়ার জন্য পরের হিতের জন্য, তাঁরা কথা ক'য়েছিলেন।

নরেন্দ্র গান আরম্ভ করিলেন—গাইলেন—

> **সত্যং শিব সুন্দর রূপ ভাতি হৃদিমন্দিরে।**
> (সেদিন কবে বা হবে)।
> নিরখি নিরখি অনুদিন মোরা ডুবিব রূপসাগরে॥
> জ্ঞান-অনন্তরূপে পশিবে নাথ মম হৃদে,
> অবাক হইয়ে অধীর মন শরণ লইবে শ্রীপদে।
> শান্তং শিব অদ্বিতীয় রাজ-রাজ-চরণে,
> বিকাইব ওহে প্রাণসখা সফল করিব জীবনে।
> এমন অধিকার কোথা পাব আর স্বর্গভোগ জীবনে (সশরীরে)॥
> শুদ্ধমপাপ বিদ্ধং রূপ হেরিয়ে নাথ তোমার,

আলোক দেখিলে আঁধার যেমন যায় পলাইয়ে সত্বর,
তেমনি নাথ তোমার প্রকাশে পলাইবে পাপ-আঁধার।
আনন্দ অমৃতরূপে উদিবে হৃদয় আকাশে,
চন্দ্র উদিলে চকোর যেমন ক্রীড়য়ে মন হরষে,
আমরাও নাথ তেমনি ক'রে মাতিব তব প্রকাশে॥
ওহে ধ্রুবতারাসম হৃদে জ্বলন্ত বিশ্বাস হে,
জ্বালি দিয়ে দীনবন্ধু পুরাও মনের আশ,
আমি নিশিদিন প্রেমানন্দে মগন হইয়ে হে।
আপনারে ভুলে যাব তোমারে পাইয়ে হে॥
(সেদিন কবে হবে)॥

'আনন্দ অমৃতরূপে' এই কথা বলিতে না বলিতে ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ গভীর সমাধিতে নিমগ্ন হইলেন! আসীন হইয়া করজোড়ে বসিয়া আছেন। পূর্বাস্য। দেহ উন্নত। আনন্দময়ীর রূপসাগরে নিমগ্ন হইয়াছেন! লোকবাহ্য একেবারেই নাই। শ্বাস বহিছে কি না বহিছে! স্পন্দহীন! নিমেষশূন্য। চিত্রার্পিতের ন্যায় বসিয়া আছেন। যেন এ রাজ্য ছাড়িয়া কোথায় গিয়াছেন!

চতুর্থ পরিচ্ছেদ

সচ্চিদানন্দ লাভের উপায়—জ্ঞানী ও ভক্তের প্রভেদ

সমাধি ভঙ্গ হইল। ইতিপূর্বে নরেন্দ্র শ্রীরামকৃষ্ণের সমাধি দৃষ্টে কক্ষ ত্যাগ করিয়া পূর্বদিকের বারান্দায় চলিয়া গিয়াছেন। সেখানে হাজরা মহাশয় কম্বলাসনে হরিনামের মালা হাতে করিয়া বসিয়া আছেন। তাঁহার সঙ্গে নরেন্দ্র আলাপ করিতেছেন। এদিকে ঘরে একঘর লোক। শ্রীরামকৃষ্ণ সমাধি-ভঙ্গের পর ভক্তদের মধ্যে দৃষ্টিপাত করিলেন। দেখেন যে, নরেন্দ্র নাই। শূন্য তানপুরা পড়িয়া রহিয়াছে। আর ভক্তগণ সকলে তাঁর দিকে ঔৎসুক্যের সহিত চাহিয়া রহিয়াছেন।

শ্রীরামকৃষ্ণ—আগুন জ্বেলে গেছে, এখন থাকলো আর গেল! (কাপ্তেন প্রভৃতির প্রতি)—চিদানন্দ আরোপ কর, তোমাদেরও আনন্দ হবে। চিদানন্দ আছেই;—কেবল আবরণ ও **বিক্ষেপ**; বিষয়াসক্তি যত কম্‌বে, ঈশ্বরের প্রতি মতি তত বাড়বে।

কাপ্তেন—কলিকাতার বাড়ির দিকে যত আসবে, কাশী থেকে তত তফাত হবে। আবার কাশীর দিকে যত যাবে, বাড়ি থেকে তত তফাত হবে।

শ্রীরামকৃষ্ণ—শ্রীমতী যত কৃষ্ণের দিকে এগ্‌চ্ছেন ততই কৃষ্ণের দেহগন্ধ পাচ্ছিলেন। ঈশ্বরের নিকট যত যাওয়া যায় ততই তাতে ভাবভক্তি হয়। সাগরের নিকট নদী যতই যায়, ততই জোয়ার-ভাঁটা দেখা যায়।

"জ্ঞানীর ভিতর একটানা গঙ্গা বহিতে থাকে। তার পক্ষে সব স্বপ্নবৎ। সে সর্বদা স্ব-স্বরূপে থাকে। ভক্তের ভিতর একটানা নয়; জোয়ার-ভাঁটা হয়। হাসে-কাঁদে, নাচে গায়। ভক্ত তাঁর সঙ্গে বিলাস করতে ভালবাসে—কখন সাঁতার দেয়, কখন ডুবে, কখন উঠে—যেমন জলের ভিতর বরফ 'টাপুর-টুপুর' 'টাপুর-টুপুর'—করে। (হাস্য)।

[সচ্চিদানন্দ ও সচ্চিদানন্দময়ী—ব্রহ্ম ও আদ্যাশক্তি অভেদ]

"জ্ঞানী ব্রহ্মকে জান্‌তে চায়। ভক্তের ভগবান,—ষড়ৈশ্বর্যপূর্ণ সর্বশক্তিমান ভগবান। কিন্তু বস্তুতঃ ব্রহ্ম আর শক্তি অভেদ—যিনি সচ্চিদানন্দ, তিনিই সচ্চিদানন্দময়ী। যেমন মণির জ্যোতিঃ ও মণি; মণির জ্যোতিঃ বললেই মণি বুঝায়, মণি বললেই জ্যোতিঃ বুঝায়। মণি না ভাবলে মণির জ্যোতিঃ ভাবতে পারা যায় না—মণির জ্যোতিঃ না ভাবলে মণি ভাব্‌তে পারা যায় না।"

"এক সচ্চিদানন্দ শক্তিভেদে উপাধি ভেদ—তাই নানারূপ—'সে তো তুমিই গো তারা! যেখানে কার্য (সৃষ্টি, স্থিতি, প্রলয়) সেইখানেই শক্তি। কিন্তু জল স্থির থাক্‌লেও জল, তরঙ্গ, ভুড়ভুড়ি হলেও জল। সেই সচ্চিদানন্দই আদ্যা-শক্তি—যিনি সৃষ্টি-স্থিতি-প্রলয় করেন। যেমন কাপ্তেন যখন কোন কাজ করেন না তখনও যিনি, আর কাপ্তেন পূজা করছেন, তখনও তিনি; আর কাপ্তেন লাট সাহেবের কাছে যাচ্ছেন, তখনও তিনি; কেবল উপাধি বিশেষ।"

কাপ্তেন—আজ্ঞা হাঁ, মহাশয়।

শ্রীরামকৃষ্ণ—আমি এই কথা কেশব সেনকে ব'লেছিলাম।

কাপ্তেন—কেশব সেন ভ্রষ্টাচার, স্বেচ্ছাচার, তিনি বাবু সাধু নন্‌।

শ্রীরামকৃষ্ণ—(ভক্তদের প্রতি)—কাপ্তেন আমায় বারণ করে, কেশব সেনের ওখানে যেতে।

কাপ্তেন—মহাশয়, আপনি যাবেন, তা আর কি করবো।

শ্রীরামকৃষ্ণ (বিরক্ত ভাবে)—তুমি লাট সাহেবের কাছে যেতে পার টাকার জন্য, আর আমি কেশব সেনের কাছে যেতে পারি না? সে ঈশ্বরচিন্তা করে, হরিনাম করে। তবে না তুমি বল 'ঈশ্বরমায়াজীবজগৎ'—যিনি ঈশ্বর, তিনিই এইসব জীবজগৎ হয়েছেন!

পঞ্চম পরিচ্ছেদ

নরেন্দ্রসঙ্গে—জ্ঞানযোগ ও ভক্তিযোগের সমন্বয়

এই বলিয়া ঠাকুর হঠাৎ ঘর হইতে উত্তর-পূর্বের বারান্দায় চলিয়া গেলেন। কাপ্তেন ও অন্যান্য ভক্তেরা ঘরে বসিয়াই তাঁর প্রত্যাগমন প্রতীক্ষা করিতেছেন। মাষ্টার তাঁহার সঙ্গে ঐ বারান্দায় আসিলেন। উত্তর-পূর্বের বারান্দায় নরেন্দ্র হাজরার সহিত কথোপকথন করিতেছিলেন। ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ জানেন, হাজরা বড় শুষ্ক জ্ঞানবিচার করেন—বলেন, 'জগৎ স্বপ্নবৎ—পূজা নৈবেদ্য এ সব মনের ভুল—কেবল স্ব-স্বরূপকে চিন্তা করাই উদ্দেশ্য; আর 'আমিই সেই'।

শ্রীরামকৃষ্ণ (সহাস্যে)—কি গো! তোমাদের কি সব কথা হচ্ছে?

নরেন্দ্র (সহাস্যে)—আমাদের কত কি কথা হচ্ছে—'লম্বা' 'লম্বা' কথা।

শ্রীরামকৃষ্ণ (সহাস্যে)—কিন্তু শুদ্ধজ্ঞান আর শুদ্ধাভক্তি এক। শুদ্ধজ্ঞান যেখানে শুদ্ধাভক্তিও সেইখানে নিয়ে যায়। ভক্তিপথ বেশ সহজ পথ।

নরেন্দ্র—'আর কাজ নাই জ্ঞানবিচারে, দে মা পাগল ক'রে।' (মাষ্টারের প্রতি) দেখুন, হ্যামিলটন্-এ পড়লুম—লিখেছেন, 'A learned ignorance is the end of Philosophy and the beginning of Religion.'

শ্রীরামকৃষ্ণ (মাষ্টারের প্রতি)—এর মানে কি গো?

নরেন্দ্র—ফিলসফি (দর্শনশাস্ত্র) পড়া শেষ হ'লে মানুষটা পণ্ডিতমূর্খ হয়ে দাঁড়ায়, তখন ধর্ম ধর্ম করে। তখন ধর্মের আরম্ভ হয়।

শ্রীরামকৃষ্ণ (সহাস্যে)— Thank you! Thank you! (হাস্য)।

ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ

সন্ধ্যা সমাগমে হরিধ্বনি—নরেন্দ্রের কত গুণ

কিয়ৎক্ষণ পরে সন্ধ্যা আগতপ্রায় দেখিয়া অধিকাংশ লোক বাটী গমন করিলেন। নরেন্দ্রও বিদায় লইলেন।

বেলা পড়িয়া আসিতে লাগিল। সন্ধ্যা হয় হয়। ঠাকুরবাড়ির ফরাশ চারিদিকে আলোর আয়োজন করিতেছে। কালীঘরের ও বিষ্ণুঘরের দুইজন পূজারী গঙ্গায় অর্ধ নিমগ্ন হইয়া বাহ্য ও অন্তর শুচি করিতেছেন; শীঘ্র গিয়া আরতি ও ঠাকুরদের রাত্রিকালীন শীতল দিতে হইবে। দক্ষিণেশ্বর গ্রামবাসী যুবকবৃন্দ—কাহারও হাতে ছড়ি, কেহ বন্ধু সঙ্গে—বাগানে বেড়াইতে আসিয়াছে। তাঁহারা পোস্তার উপর বিচরণ করিতেছে ও কুসুমগন্ধবাহী

নির্মল সান্ধ্য সমীরণ সেবন করিতে করিতে শ্রাবণ মাসের খরস্রোতা ঈষৎ বীচিবিকম্পিত গঙ্গাপ্রবাহ দেখিতেছি। তন্মধ্যে হয়ত কেহ অপেক্ষাকৃত চিন্তাশীল, পঞ্চবটীর বিজনভূমিতে পাদচারণ করিতেছে। ভগবান শ্রীরামকৃষ্ণও পশ্চিমের বারান্দা হইতে কিয়ৎকাল গঙ্গা দর্শন করিতে লাগিলেন।

সন্ধ্যা হইল। ফরাশ আলোগুলি জ্বালিয়া দিয়া গেল। পরমহংসদেবের ঘরে আসিয়া দাসী প্রদীপ জ্বালিয়া ধুনা দিল। এদিকে দ্বাদশ মন্দিরে শিবের আরতি, তৎপরেই বিষ্ণুঘরের ও কালীঘরের আরতি আরম্ভ হইল। কাঁসর, ঘাঁড় ও ঘণ্টা, মধুর ও গম্ভীর নিনাদ করিতে লাগিত—মধুর ও গম্ভীর —কেন না, মন্দিরের পার্শ্বেই কলকলনিনাদিনী গঙ্গা।

শ্রাবণের কৃষ্ণা-প্রতিপদ, কিয়ৎক্ষণ পরেই চাঁদ উঠিল। বৃহৎ উঠান ও উদ্যানস্থিত বৃক্ষশীর্ষ ক্রমে চন্দ্রকিরণে প্লাবিত হইল। এদিকে জ্যোৎস্নাস্পর্শে ভাগীরথীসলিল কত আনন্দ করিতে করিতে প্রবাহিত হইতেছে।

সন্ধ্যার পরেই শ্রীরামকৃষ্ণ জগন্মাতাকে নমস্কার করিয়া হাততালি দিয়া হরিধ্বনি করিতেছেন। কক্ষমধ্যে অনেকগুলি ঠাকুরদের ছবি,—ধ্রুব-প্রহ্লাদের ছবি, রাম রাজার ছবি, মা কালীর ছবি, রাধাকৃষ্ণের ছবি। তিনি সকল ঠাকুরকে উদ্দেশ করিয়া ও তাঁহাদের নাম করিয়া প্রণাম করিতেছেন। আবার বলিতেছেন, ব্রহ্ম-আত্মা-ভগবান; ভাগবত-ভক্ত-ভগবান; ব্রহ্ম-শক্তি, শক্তি-ব্রহ্ম; বেদ, পুরাণ, তন্ত্র, গীতা গায়ত্রী। শরণাগত; শরণাগত; নাহং; নাহং; তুঁহু, তুঁহু, আমি যন্ত্র, তুমি যন্ত্রী; ইত্যাদি।

নামের পর শ্রীরামকৃষ্ণ করজোড়ে জগন্মাতার চিন্তা করিতেছেন। দুই-চারিজন ভক্ত সন্ধ্যাসমাগমে উদ্যানমধ্যে গঙ্গাতীরে বেড়াইতেছিলেন। তাঁহারা ঠাকুরদের আরতির কিয়ৎক্ষণ পরে পরমহংসদেবের ঘরে ক্রমে ক্রমে আসিয়া জুটিতেছেন। পরমহংসদেব খাটে উপবিষ্ট। মাষ্টার, অধর, কিশোরী ইত্যাদি নীচে সম্মুখে বসিয়া আছেন।

শ্রীরামকৃষ্ণ (ভক্তদের প্রতি)—নরেন্দ্র, ভবনাথ, রাখাল; এরা সব নিত্যসিদ্ধ, ঈশ্বরকোটী। এদের শিক্ষা কেবল বাড়ার ভাগ। দেখ না, নরেন্দ্র কাহাকেও কেয়ার (গ্রাহ্য) করে না। আমার সঙ্গে কাপ্তেনের গাড়ীতে যাচ্ছিল—কাপ্তেন ভাল জায়গায় ব'সতে বললে—তা চেয়েও দেখলে না। আমারই অপেক্ষা রাখে না! আবার যা জানে, তাও বলে না—পাছে আমি লোকের কাছে বলে বেড়াই যে, নরেন্দ্র এত বিদ্বান। মায়ামোহ নাই। —যেন কোন বন্ধন নাই! খুব ভাল আধার। একাধারে অনেক গুণ; গাইতে বাজাতে, লিখতে, পড়তে! এদিকে জিতেন্দ্রিয়,—ব'লেছে বিয়ে কোরবো না। নরেন্দ্র আর ভবনাথ দুজনে ভারী মিল—যেন স্ত্রী-পুরুষ। নরেন্দ্র বেশী আসে না। সে ভাল। বেশী এলে আমি বিহ্বল হই।

অষ্টম খণ্ড

ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণের সিঁদুরিয়াপটী ব্রাহ্মসমাজে আগমন ও শ্রীযুক্ত বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামী প্রভৃতির সহিত কথোপকথন

প্রথম পরিচ্ছেদ

সমাধি মন্দিরে

কার্তিক মাসের কৃষ্ণা একাদশী। ২৬ নভেম্বর, ১৮৮৩ খৃষ্টাব্দ। শ্রীযুক্ত মণিলাল মল্লিকের বাটীতে সিঁদুরিয়াপটী ব্রাহ্মসমাজের অধিবেশন হয়। বাড়িটি চিৎপুর রোডের উপর; দক্ষিণ ধারে হ্যারিসন রোডের চৌমাথা—যেখানে বেদানা, পেস্তা, আপেল এবং অন্যান্য মেওয়ার দোকান—সেখান হইতে কয়েক-খানি দোকানবাড়ির উত্তরে। সমাজের অধিবেশন রাজপথের পার্শ্ববর্ত্তী দুতলার হলঘরে হয়। আজ সমাজের সাংবৎসরিক, তাই মণিলাল মহোৎসব করিয়াছেন।

উপাসনাগৃহ আজ আনন্দপূর্ণ, বাহিরে ও ভিতরে হরিৎ বৃক্ষপল্লবে নানাপুষ্প ও পুষ্পমালায় সুশোভিত। গৃহমধ্যে ভক্তগণ আসন গ্রহণ করিয়া প্রতীক্ষা করিতেছেন, কখন উপাসনা হইবে। গৃহমধ্যে সকলের স্থান হয় নাই, অনেকেই পশ্চিম দিকের ছাদে বিচরণ করিতেছেন, বা যথাস্থানে স্থাপিত সুন্দর বিচিত্র কাষ্ঠাসনে উপবিষ্ট হইয়াছেন। মাঝে মাঝে গৃহস্বামী ও তাঁহার আত্মীয়গণ আসিয়া মিষ্ট সম্ভাষণে অভ্যাগত ভক্তবৃন্দকে আপ্যায়িত করিতেছেন। সন্ধ্যার পূর্ব হইতেই ব্রাহ্ম ভক্তগণ আসিতে আরম্ভ করিতেছেন। তাঁহারা আজ একটি বিশেষ উৎসাহে উৎসাহান্বিত,—আজ শ্রীরামকৃষ্ণ পরমহংসদেবের শুভাগমন হইবে। ব্রাহ্মসমাজের নেতৃগণ কেশব, বিজয়, শিবনাথ প্রভৃতি ভক্তগণকে পরমহংসদেব বড় ভালবাসেন, তাই তিনি ব্রাহ্মভক্তদের এত প্রিয়। তিনি হরিপ্রেমে মাতোয়ারা। তাঁহার প্রেম, তাঁহার জ্বলন্ত বিশ্বাস, তাঁহার বালকের ন্যায় ঈশ্বরের সঙ্গে কথোপকথন, ভগবানের জন্য ব্যাকুল হইয়া ক্রন্দন, তাঁহার মাতৃজ্ঞানে স্ত্রীজাতির পূজা, তাঁহার বিষয়-কথা-বর্জন ও তৈল-ধারা তুল্য নিরবচ্ছিন্ন ঈশ্বরকথা প্রসঙ্গ, তাঁহার সর্বধর্মসমন্বয় ও অপর ধর্মে বিদ্বেষ-ভাবলেশশূন্যতা, তাঁহার ঈশ্বরভক্তের জন্য রোদন,—এই সকল ব্যাপারে ব্রাহ্ম ভক্তদের চিত্তাকর্ষক করিয়াছেন। তাই আজ অনেকে বহুদূর হইতে তাঁহার দর্শন লাভার্থে আসিয়াছেন।

[শিবনাথ ও সত্যকথা]

উপাসনার পূর্বে শ্রীরামকৃষ্ণ, শ্রীযুক্ত বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামী ও অন্যান্য ব্রাহ্ম ভক্তদের সহিত সহাস্যবদনে আলাপ করিতেছেন। সমাজগৃহে আলো জ্বালা হইল, অনতিবিলম্বে উপাসনা আরম্ভ হইবে।

পরমহংসদেব বলিতেছেন, "হ্যাগা, শিবনাথ আসবে না?" একজন ব্রাহ্ম ভক্ত বলিতেছেন, "না, আজ তাঁর অনেক কাজ আছে, আসতে পারবেন না।" পরমহংসদেব বলিলেন, "শিবনাথকে দেখলে আমার বড় আনন্দ হয়, যেন ভক্তিরসে ডুবে আছে; আর যাকে অনেকে গণে-মানে, তাতে নিশ্চয়ই ঈশ্বরের কিছু শক্তি আছে। তবে শিবনাথের একটা ভারী দোষ আছে—কথার ঠিক নাই। আমাকে বলেছিল যে একবার ওখানে (দক্ষিণেশ্বরের কালীবাড়িতে) যাবে কিন্তু যায় নাই, আর কোন খবরও পাঠায় নাই, ওটা ভাল নয়। এই রকম আছে যে, সত্য কথাই কলির তপস্যা। সত্যকে আঁট করে ধরে থাকলে ভগবান লাভ হয়। সত্যে আঁট না থাকলে ক্রমে ক্রমে সব নষ্ট হয়। আমি এই ভেবে যদিও কখন বলে ফেলি যে বাহ্যে যাব, যদি বাহ্যে না'ও পায় তবুও একবার গাড়ুটা সঙ্গে ক'রে ঝাউতলার দিকে যাই। ভয় এই—পাছে সত্যের আঁট যায়। আমার এই অবস্থার পর মাকে ফুল হাতে ক'রে বলেছিলাম, 'মা! এই নাও তোমার জ্ঞান, এই নাও তোমার অজ্ঞান, আমায় শুদ্ধাভক্তি দাও মা; এই নাও তোমার শুচি, এই নাও তোমার অশুচি, আমায় শুদ্ধাভক্তি দাও মা; এই নাও তোমার ভাল, এই নাও তোমার মন্দ, আমায় শুদ্ধাভক্তি দাও মা; এই নাও তোমার পুণ্য, এই নাও তোমার পাপ, আমায় শুদ্ধাভক্তি দাও।' যখন এই সব বলেছিলুম, তখন এ কথা বলিতে পারি নাই, মা! এই নাও তোমার সত্য, এই নাও তোমার অসত্য।' সব মাকে দিতে পারলুম, 'সত্য' মাকে দিতে পারলুম না।"

ব্রাহ্মসমাজের পদ্ধতি অনুসারে উপাসনা আরম্ভ হইল। বেদীর উপর আচার্য, সম্মুখে সেজ। উদ্বোধনের পর আচার্য পরব্রহ্মের উদ্দেশে বেদোক্ত মহামন্ত্র উচ্চারণ করিতে লাগিলেন। ব্রাহ্ম ভক্তগণ সমস্বরে সেই পুরাতন আর্য ঋষির শ্রীমুখ-নিঃসৃত, তাঁহাদের সেই পবিত্র রসনার দ্বারা উচ্চারিত নাম গান করিতে লাগিলেন। বলিতে লাগিলেন—"সত্যং জ্ঞানমনন্তং ব্রহ্ম, আনন্দ-রূপমমৃতম্ যদ্বিভাতি, শান্তম্ শিবমদ্বৈতম্, শুদ্ধমপাপবিদ্ধম।" প্রণবসংযুক্ত এই ধ্বনি ভক্তদের হৃদয়াকাশে প্রতিধ্বনিত হইল। অনেকের অন্তরে বাসনা নির্বাপিতপ্রায় হইল। চিত্ত অনেকটা স্থির ও ধ্যানপ্রবণ হইতে লাগিল। সকলেরই চক্ষু মুদ্রিত! —ক্ষণকালের জন্য বেদোক্ত সগুণ ব্রহ্মের চিন্তা করিতে লাগিলেন।

পরমহংসদেব ভাবে নিমগ্ন। স্পন্দহীন, স্থিরদৃষ্টি, অবাক চিত্রপুত্তলিকার ন্যায় বসিয়া আছেন। আত্মাপক্ষী কোথায় আনন্দে বিচরণ করিতেছেন; আর দেহটি মাত্র শূন্যমন্দিরে পড়িয়া রহিয়াছে।

সমাধির অব্যবহিত পরেই চক্ষু মেলিয়া চারিদিকে চাহিতেছেন। দেখিলেন, সভাস্থ সকলেই নিমীলিত নেত্র। তখন 'ব্রহ্ম' 'ব্রহ্ম' বলিয়া হঠাৎ দণ্ডায়মান

হইলেন। উপাসনান্তে ব্রাহ্ম ভক্তেরা খোলকরতাল লইয়া সংকীর্ত্তন করিতেছেন। শ্রীরামকৃষ্ণ প্রেমানন্দে মত্ত হইয়া তাঁহাদের সঙ্গে যোগ দিলেন আর নৃত্য করিতে লাগিলেন। সকলে মুগ্ধ হইয়া সেই মধুর নৃত্য দেখিতেছেন। শ্রীযুক্ত বিজয়কৃষ্ণ ও অন্যান্য ভক্তেরাও তাঁহাকে বেড়িয়া বেড়িয়া নাচিতেছেন। অনেকে এই অদ্ভুত দৃশ্য দেখিয়া ও কীর্ত্তনানন্দ সম্ভোগ করিয়া এককালে সংসার ভুলিয়া গেলেন—ক্ষণকালের জন্য হরি-রস-মদিরা পান করিয়া বিষয়ানন্দ ভুলিয়া গেলেন। বিষয় সুখের রস তিক্তবোধ হইতে লাগিল।

কীর্ত্তনান্তে সকলে আসন গ্রহণ করিলেন। ঠাকুর কি বলেন, শুনিবার জন্য সকলে তাঁহাকে ঘেরিয়া বসিলেন।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

গৃহস্থের প্রতি উপদেশ

সমবেত ব্রাহ্ম ভক্তগণকে সম্বোধন করিয়া তিনি বলিতেছেন—'নির্লিপ্ত হ'য়ে সংসার করা বড় কঠিন। প্রতাপ বলেছিলেন, 'মহাশয়, আমাদের জনক রাজার মত। জনক নির্লিপ্ত হ'য়ে সংসার ক'রেছিলেন, আমরাও তাই করবো। আমি বললুম, 'মনে করলেই কি জনকরাজা হওয়া যায়! জনক রাজা কত তপস্যা ক'রে জ্ঞানলাভ করেছিলেন, হেঁটমুণ্ড ঊর্ধ্বপদ হ'য়ে অনেক বৎসর ঘোরতর তপস্যা ক'রে তবে সংসারে ফিরে গিছলেন।

"তবে সংসারীর কি উপায় নাই?—হাঁ অবশ্য আছে। দিন কতক নির্জনে সাধন করতে হয়। নির্জনে ক'রলে ভক্তিলাভ হয়, জ্ঞানলাভ হয়; তারপর গিয়ে সংসার কর, দোষ নাই। যখন নির্জনে সাধন ক'রবে, সংসার থেকে একেবারে তফাতে যাবে। তখন যেন স্ত্রী, পুত্র, কন্যা, মাতা, পিতা, ভাই, ভগিনী, আত্মীয়-কুটুম্ব কেহই কাছে না থাকে। নির্জনে সাধনের সময় ভাববে, আমার কেউ নাই; ঈশ্বরই আমার সর্বস্ব। আর কেঁদে কেঁদে তাঁর কাছে জ্ঞানভক্তির জন্য প্রার্থনা ক'রবে।

"যদি বল কত দিন সংসার ছেড়ে নির্জনে থাকবো? তা একদিন যদি এই রকম ক'রে থাক, সেও ভাল; তিন দিন থাকলে আরও ভাল; বা বারোদিন, এক মাস, তিন মাস, এক বৎসর, যে যেমন পারে। জ্ঞান ভক্তি লাভ ক'রে সংসার ক'রলে আর বেশী ভয় নাই।

"হাতে তেল মেখে কাঁঠাল ভাঙলে হাতে আঠা লাগে না। চোর চোর যদি খেল বুড়ি ছুঁয়ে ফেললে আর ভয় নাই। একবার পরশমণিকে ছুঁয়ে সোনা হও, সোনা হবার পর হাজার বৎসর যদি মাটিতে পোঁতা থাক, মাটি থেকে তোলবার সময় সোনাই থাকবে।

"মনটি দুধের মত। সেই মনকে যদি সংসার জলে রাখ, তা হ'লে দুধে-জলে মিশে যাবে। তাই দুধকে নির্জনে দই পেতে মাখন তুল্‌তে হয়। যখন নির্জনে সাধন ক'রে মনরূপ দুধ থেকে জ্ঞান ভক্তি রূপ মাখন তোলা হলো তখন সেই মাখন অনায়াসে সংসার জলে রাখা যায়। সে মাখন কখনও সংসার-জলের সঙ্গে মিশে যাবে না—সংসার-জলের উপর নির্লিপ্ত হ'য়ে ভাস্‌বে।"

তৃতীয় পরিচ্ছেদ

শ্রীযুক্ত বিজয় গোস্বামীর নির্জনে সাধন

শ্রীযুক্ত বিজয় গোস্বামী সবে গয়া হইতে ফিরিয়াছেন। সেখানে অনেকদিন নির্জনে বাস ও সাধুসঙ্গ হইয়াছিল। এক্ষণে তিনি গৈরিকবসন পরিধান করিয়াছেন। অবস্থা ভারী সুন্দর, যেন সর্বদা অন্তর্মুখ। পরমহংসদেবের নিকট হেঁট মুখ হইয়া রহিয়াছেন, যেন মগ্ন হইয়া কি ভাবিতেছেন।

বিজয়কে দেখিতে দেখিতে পরমহংসদেব তাঁহাকে বলিলেন, "বিজয়! তুমি কি বাসা পাক্‌ড়েছ?

"দেখ, দুজন সাধু ভ্রমণ ক'রতে ক'রতে একটি সহরে এসে পড়েছিল। একজন হাঁ ক'রে সহরের বাজার, দোকান, বাড়ি দেখছিল; এমন সময়ে অপরটির সঙ্গে দেখা হ'ল। তখন সে সাধুটি বললে, তুমি হাঁ ক'রে সহর দেখছ—তল্পী-তল্পা কোথায়? প্রথম সাধুটি বললে, আগে আমি বাসা পাকড়ে, তল্পী-তল্পা রেখে ঘরে চাবি দিয়ে নিশ্চিন্ত হ'য়ে বেরিয়েছি। এখন সহরে রং দেখে বেড়াচ্ছি। তাই তোমায় জিজ্ঞাসা করছি, তুমি কি বাসা পাক্‌ড়েছ? (মাষ্টার ইত্যাদির প্রতি) দেখ বিজয়ের এতদিন ফোয়ারা চাপা ছিল, এইবার খুলে গেছে।

[বিজয় ও শিবনাথ—নিষ্কাম কর্ম—সন্ন্যাসির বাসনা ত্যাগ]

(বিজয়ের প্রতি)—"দেখ শিবনাথের ভারী ঝঞ্ঝাট। খবরের কাগজ লিখতে হয়, আর অনেক কর্ম করতে হয়। বিষয়-কর্ম কর্‌লেই অশান্তি হয়, অনেক ভাবনা-চিন্তা জোটে।

শ্রীমদ্ভাগবতে আছে যে, অবধূত চব্বিশ গুরুর মধ্যে চিলকে একটি গুরু করেছিলেন। এক জায়গায় জেলেরা মাছ ধরছিলো, একটি চিল এসে একটা মাছ ছোঁ মেরে নিয়ে গেল। কিন্তু মাছ দেখে পেছনে পেছনে প্রায় এক হাজার কাক চিলকে তাড়া ক'রে গেল; আর সঙ্গে সঙ্গে কা কা ক'রে বড় গোলমাল ক'রতে লাগলো। মাছ নিয়ে চিল যে দিকে যায়, কাকগুলোও তাড়া ক'রে সেই দিকে যেতে লাগলো। দক্ষিণ দিকে চিলটা গেল, কাকগুলোও সেই দিকে গেল; আবার উত্তর দিকে যখন সে গেল, ওরাও সেই দিকে গেল। এইরূপে

পূর্ব দিকে ও পশ্চিম দিকে চিল ঘুরতে লাগলো। শেষে ব্যতিব্যস্ত হ'য়ে ঘুরতে ঘুরতে মাছটা তার কাছ থেকে পড়ে গেল। তখন কাকগুলো চিলকে ছেড়ে মাছের দিকে গেল। চিল তখন নিশ্চিন্ত হ'য়ে একটা গাছের ডালের উপর বসলো। বসে ভাবতে লাগলো—ঐ মাছটা যত গোল করেছিল। এখন মাছ কাছে নাই আমি নিশ্চিন্ত হ'লুম!

"অবধূত চিলের কাছে এই শিক্ষা ক'রলেন যে, যতক্ষণ সঙ্গে মাছ থাকে অর্থাৎ বাসনা থাকে ততক্ষণ কর্ম থাকে আর কর্মের দরুন ভাবনা, চিন্তা অশান্তি। **বাসনা ত্যাগ হ'লেই কর্মক্ষয় হয় আর শান্তি হয়।**

"তবে নিষ্কাম কর্ম ভাল। তাতে অশান্তি হয় না। কিন্তু নিষ্কাম কর্ম করা বড় কঠিন। মনে করছি, নিষ্কাম কর্ম ক'রছি কিন্তু কোথা থেকে কামনা এসে পড়ে, জানতে দেয় না। আগে যদি অনেক সাধন থাকে, সাধনের বলে কেউ কেউ নিষ্কাম কর্ম করতে পারে। ঈশ্বর দর্শনের পর নিষ্কাম কর্ম অনায়াসে করা যায়। ঈশ্বর দর্শনের পর প্রায় কর্ম ত্যাগ হয়; দুই-একজন (নারদাদি) লোকশিক্ষার জন্য কর্ম করে।

[সন্ন্যাসী সঞ্চয় করিবে না—প্রেম হ'লে কর্মত্যাগ হয়]

"অবধূতের আর একটি গুরু ছিল—মৌমাছি! মৌমাছি অনেক কষ্টে অনেক দিন ধরে মধু সঞ্চয় করে। কিন্তু সে মধু নিজের ভোগ হয় না। আর একজন এসে চাক ভেঙ্গে নিয়ে যায়। মৌমাছির কাছে অবধূত এই শিখলেন যে, সঞ্চয় করতে নাই। **সাধুরা ঈশ্বরের উপর ষোল আনা নির্ভর ক'রবেই। তাদের সঞ্চয় ক'রতে নাই।**

"এটি সংসারীর পক্ষে নয়। সংসারীর পক্ষে সংসার প্রতিপালন করতে হয়। তাই সঞ্চয়ের দরকার। পন্ছী (পাখী) আউর দরবেশ (সাধু) সঞ্চয় করে না। কিন্তু পাখীর ছানা হ'লে সঞ্চয় করে;—ছানার জন্যে মুখে করে খাবার আনে।

"দেখ বিজয়, সাধুর সঙ্গে যদি পুটলী-পাটলা থাকে, পনেরটা গাঁটওয়ালা যদি কাপড় বুচ্কি থাকে তাহলে তাদের বিশ্বাস ক'রো না। আমি বটতলায় ঐ রকম সাধু দেখেছিলাম। দু'তিনজন বসে আছে, কেউ ডাল বাছছে, কেউ কেউ কাপড় সেলাই ক'রছে, আর বড় মানুষের বাড়ির ভাণ্ডারার গল্প ক'রছে। বলছে 'আরে ও বাবুনে লাখো রুপেয়া খরচ কিয়া; সাধু লোককো বহুৎ খিলায়া —পুরী, জিলেবী, পেঁড়া, বরফী, মালপুয়া, বহুৎ চিজ তৈরী কিয়াথা।" (সকলের হাস্য)।

বিজয়—আজ্ঞা হাঁ, গয়ায় ঐ রকম সাধু দেখেছি, গয়ায় লোটাওয়ালা সাধু। (সকলের হাস্য)।

শ্রীরামকৃষ্ণ (বিজয়ের প্রতি)—ঈশ্বরের প্রতি প্রেম আস্‌লে কর্মত্যাগ আপনি হ'য়ে যায়। যাদের ঈশ্বর কর্ম করাচ্ছেন, তারা করুক। তোমার এখন সময় হয়েছে।—সব ছেড়ে তুমি বলো, 'মন তুই দেখ আর আমি দেখি, আর যেন কেউ নাহি দেখে।'

এই বলিয়া ভগবান শ্রীরামকৃষ্ণ সেই অতুলনীয় কণ্ঠে মাধুর্য বর্ষণ করিতে করিতে গান গাহিলেন—

যতনে হৃদয়ে রেখো আদরিণী শ্যামা মাকে,
মন তুই দেখ্ আর আমি দেখি, আর যেন কেউ নাহি দেখে;
কামাদিরে দিয়ে ফাঁকি, আয় মন বিরলে দেখি,
রসনারে সঙ্গে রাখি, সে যেন মা বলে ডাকে।
(মাঝে মাঝে সে যেন মা ব'লে ডাকে)॥
কুরুচী কুমন্ত্রী যত, নিকট হ'তে দিও নাক,
জ্ঞান নয়নে প্রহরী রেখ, সে যেন সাবধানে থাকে।
(খুব যেন সাবধানে থাকে)॥

(বিজয়ের প্রতি)—"ভগবানের শরণাগত হ'য়ে এখন লজ্জা, ভয় এ সব ত্যাগ কর। 'আমি হরিনামে যদি নাচি, লোকে আমায় কি বলবে'—এ সব ভাব ত্যাগ কর।

[লজ্জা—ঘৃণা—ভয়]

"লজ্জা, ঘৃণা, ভয় তিন থাকতে নয়। লজ্জা, ঘৃণা, ভয়, জাতি অভিমান, গোপন ইচ্ছা এ সব পাশ। এ সব গেলে জীবের মুক্তি হয়।

"পাশবদ্ধ জীব, পাশমুক্ত শিব! ভগবানের প্রেম—দুর্লভ জিনিস। প্রথমে স্ত্রীর যেমন স্বামীতে নিষ্ঠা, সেইরূপ নিষ্ঠা যদি ঈশ্বরেতে হয় তবেই ভক্তি হয়। শুদ্ধাভক্তি হওয়া বড় কঠিন। ভক্তিতে প্রাণ মন ঈশ্বরেতে লীন হয়।

"তার পর ভাব। ভাবেতে মানুষ অবাক হয়। বায়ু স্থির হ'য়ে যায়। আপনি কুম্ভক হয়। যেমন বন্দুকে গুলি ছোড়বার সময়, যে ব্যক্তি গুলি ছোড়ে সে বাক্যশূন্য হয় ও তার বায়ু স্থির হয়ে যায়।

"প্রেম হওয়া অনেক দূরের কথা। চৈতন্যদেবের প্রেম হ'য়েছিল। ঈশ্বরে প্রেম হ'লে বাহিরের জিনিস ভুল হ'য়ে যায়। জগৎ ভুল হয়ে যায়। নিজের দেহ যে এত প্রিয় জিনিস,—তাও ভুল হয়ে যায়।

এই বলিয়া পরমহংসদেব আবার গান গাহিতেছেন—

সে দিন কবে বা হবে?
হরি বলিতে ধারা বেয়ে পড়বে (সে দিন কবে বা হবে?)
সংসার বাসনা যাবে (সে দিন কবে বা হবে?)
অঙ্গে পুলক হবে (সে দিন কবে বা হবে?)।

চতুর্থ পরিচ্ছেদ

ভাব ও কুম্ভক—মহাবায়ু ভগবান দর্শন

এইরূপ কথাবার্ত্তা চলিতেছে, এমন সময় নিমন্ত্রিত আর কয়েকটি ব্রাহ্ম ভক্ত আসিয়া উপস্থিত হইলেন। তন্মধ্যে কয়েকটি পণ্ডিত ও উচ্চপদস্থ রাজ-কর্মচারী। তাঁহাদের মধ্যে একজন শ্রীরজনীনাথ রায়।

ঠাকুর বলিতেছেন, ভাব হইলে বায়ু স্থির হয়; আর বলিতেছেন, অর্জুন যখন লক্ষ্য বিঁধেছিল, কেবল মাছের চোখের দিকে দৃষ্টি ছিল—আর কোন দিকে দৃষ্টি ছিল না। এমন কি চোখ ছাড়া আর কোন অঙ্গ দেখতে পায় নাই। এরূপ অবস্থায় বায়ু স্থির হয়, কুম্ভক হয়।

"ঈশ্বর দর্শনের একটি লক্ষণ,—ভিতর থেকে মহাবায়ু গর্ গর্ ক'রে উঠে মাথার দিকে যায়। তখন যদি সমাধি হয়, ভগবানের দর্শন হয়।

[শুধু পাণ্ডিত্য মিথ্যা—ঐশ্বর্য, বিভব, মান, পদ, সব মিথ্যা]

(অভ্যাগত ব্রাহ্ম ভক্ত দৃষ্টে—"যারা শুধু পণ্ডিত কিন্তু যাদের ভগবানে ভক্তি নাই, তাদের কথা গোলমেলে। সামাধ্যায়ী বলে এক পণ্ডিত ব'লেছিল 'ঈশ্বর নীরস, তোমরা নিজের প্রেমভক্তি দিয়ে সরস করো।' বেদে যাঁকে 'রসস্বরূপ' বলেছে তাঁকে কিনা নীরস বলে! আর এতে বোধ হচ্ছে, সে ব্যক্তি ঈশ্বর কি বস্তু কখনও জানে নাই। তাই এরূপ গোলমেলে কথা।

"একজন বলেছিল, 'আমার মামার বাড়িতে এক গোয়াল ঘোড়া আছে!' এ কথায় বুঝতে হবে, ঘোড়া আদবেই নাই কেন না গোয়ালে ঘোড়া থাকে না। (সকলের হাস্য)।

"কেউ ঐশ্বর্যের—বিভব, মান, পদ; এই সবের—অহঙ্কার করে। এ সব দুই দিনের জন্য; কিছুই সঙ্গে যাবে না। একটা গানে আছে—

ভেবে দেখ মন কেউ কারু নয়, মিছে ভ্রম ভূমণ্ডলে।
ভুলনা দক্ষিণাকালী বদ্ধ হ'য়ে মায়াজালে॥
যার জন্য মর ভেবে, সে কি তোমার সঙ্গে যাবে।
সেই প্রেয়সী দিবে ছড়া, অমঙ্গল হবে ব'লে॥
দিন দুই-তিনের জন্য ভবে, কর্ত্তা ব'লে সবাই মানে।
সেই কর্ত্তারে দেবে ফেলে, কালাকালের কর্ত্তা এলে॥

[অহঙ্কারের মহৌষধ—তারে বাড়া আছে]

"আর টাকার অহঙ্কার করতে নাই। যদি বলো আমি ধনী,—তো ধনীর আবার তারে বাড়া তারে বাড়া আছে। সন্ধ্যার পর যখন জোনাকি পোকা উঠে, সে মনে করে, আমি এই জগতকে আলো দিচ্ছি! কিন্তু নক্ষত্র যেই উঠলো

অমনি তার অভিমান চলে গেল। তখন নক্ষত্রেরা ভাবতে লাগলো আমরা জগৎকে আলো দিচ্ছি! কিছু পরে চন্দ্র উঠলো, তখন নক্ষত্রেরা লজ্জায় মলিন হয়ে গেল। চন্দ্র মনে করলেন আমার আলোতে জগৎ হাসছে, আমি জগৎকে আলো দিচ্ছি। দেখতে দেখতে অরুণ উদয় হ'লো, সূর্য উঠছেন। চাঁদ মলিন হ'য়ে গেল,—খানিকক্ষণ পরে আর দেখাই গেল না।

"ধনীরা যদি এইগুলি ভাবে, তা হ'লে ধনের অহঙ্কার হয় না।"

উৎসব উপলক্ষে মণিলাল অনেক উপাদেয় খাদ্যসামগ্রীর আয়োজন করিয়াছেন। তিনি অনেক যত্ন করিয়া শ্রীরামকৃষ্ণ ও সমবেত ভক্তগণকে পরিতোষ করিয়া খাওয়াইলেন। যখন সকলে বাড়ি প্রত্যাগমন করিলেন, তখন রাত্রি অনেক, কিন্তু কাহারও কোন কষ্ট হয় নাই।

নবম খণ্ড

শ্রীযুক্ত জয়গোপাল সেনের বাড়িতে শ্রীরামকৃষ্ণ

প্রথম পরিচ্ছেদ

গৃহস্থাশ্রম ও শ্রীরামকৃষ্ণ

ইংরাজী ২৮শে নভেম্বর, ১৮৮৩ খৃষ্টাব্দ। আজ বেলা ৪টা ৫টার সময় শ্রীরামকৃষ্ণ শ্রীযুক্ত কেশবচন্দ্র সেনের কমল কুটীর নামক বাটীতে গিয়াছিলেন। কেশব পীড়িত, শীঘ্রই মর্ত্ত্যধাম ত্যাগ করিয়া যাইবেন। কেশবকে দেখিয়া রাত্রি ৭টার পর মাথাঘসা গলিতে শ্রীযুক্ত জয়গোপালের বাটীতে কয়েকটি ভক্ত সঙ্গে ঠাকুর আগমন করিয়াছেন।

ভক্তেরা কত কি ভাবিতেছেন। ঠাকুর দেখিতেছি, নিশিদিন হরিপ্রেমে বিহ্বল। বিবাহ করিয়াছেন, কিন্তু ধর্মপত্নীর সহিত এইরূপ সংসার করেন নাই। ধর্মপত্নীকে ভক্তি করেন, পূজা করেন, তাঁহার সহিত কেবল ঈশ্বরীয় কথা কহেন, ঈশ্বরের গান করেন, ঈশ্বরের পূজা করেন, ধ্যান করেন, মায়িক কোন সম্বন্ধই নাই ঈশ্বরই বস্তু আর সব অবস্তু, ঠাকুর দেখিতেছেন। টাকা, ধাতুদ্রব্য, ঘটি-বাটি স্পর্শ করিতে পারেন না। স্ত্রীলোককে স্পর্শ করিতে পারেন না। স্পর্শ করিলে সিঙি মাছের কাঁটা ফোটার মত সেইস্থান ঝন্ ঝন্ কন্ কন্ করে! টাকা, সোনা হাতে দিলে হাত তেউড়ে যায়, বিকৃত অবস্থা প্রাপ্ত হয়, নিশ্বাস রুদ্ধ হয়। অবশেষে ফেলিয়া দিলে আবার পূর্বের ন্যায় নিশ্বাস বহিতে থাকে!

ভক্তেরা কত কি ভাবিতেছেন। সংসার কি ত্যাগ করিতে হইবে? পড়া-শুনা আর করিবার প্রয়োজন কি? যদি বিবাহ না করি, চাকরি তো করিতে হইবে না। মা বাপকে কি ত্যাগ করিতে হইবে? আর আমি বিবাহ করিয়াছি, সন্তান হইয়াছে, পরিবার প্রতিপালন করিতে হইবে,—আমার কি হইবে? আমারও ইচ্ছা করে, নিশিদিন হরিপ্রেমে মগ্ন হইয়া থাকি! ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণকে দেখি আর ভাবি, কি করিতেছি! ইনি রাতদিন তৈলধারার ন্যায় নিরবচ্ছিন্ন ঈশ্বর চিন্তা করিতেছেন, আর আমি রাত-দিন বিষয় চিন্তা করিতে ছুটিতেছি! একমাত্র ইঁহারই দর্শন যেন মেঘাচ্ছন্ন আকাশের একস্থানে একটু জ্যোতিঃ। এখন জীবন সমস্যা কিরূপে পূরণ করিতে হইবে?

"ইনি তো নিজে ক'রে দেখালেন। তবে এখনও সন্দেহ?

"ভেঙ্গে বালির বাঁধ পুরাই মনের সাধ! সত্য কি 'বালির বাঁধ?' তবে ছাড়িতে পারিতেছি না কেন? বুঝি শক্তি কম। যদি তাঁর উপর সেরূপ

ভালবাসা আসে, আর হিসাব আসবে না। যদি জোয়ার গাঙ্গে জল ছুটে কে রোধ করিবে। যে প্রেমোদয় হওয়াতে শ্রীগৌরাঙ্গ কৌপীন ধারণ করেছিলেন, যে প্রেমে ঈশা অনন্যচিন্তা হয়ে বনবাসী হয়েছিলেন আর প্রেমময় পিতার মুখ চেয়ে শরীর ত্যাগ করেছিলেন, যে প্রেমে বুদ্ধ রাজভোগ ত্যাগ ক'রে বৈরাগী হ'য়েছিলেন, সেই প্রেমের একবিন্দু যদি উদয় হয়, এই অনিত্য সংসার কোথায় পড়ে থাকে!

"আচ্ছা, যারা দুর্বল যাদের সে প্রেমোদয় হয় না, যারা সংসারী জীব, যাদের পায়ে মায়ার বেড়ী, তাদের কি উপায়? এই প্রেমিক বৈরাগী মহাপুরুষের সঙ্গ ছাড়িব না। দেখি, ইনি কি বলেন।"

ভক্তেরা এইরূপ চিন্তা করিতেছেন। ঠাকুর জয়গোপালের বৈঠকখানায় ভক্তসঙ্গে উপবিষ্ট—সম্মুখে জয়গোপাল, তাঁহার আত্মীয়েরা ও প্রতিবেশীগণ। একজন প্রতিবেশী বিচার করিবেন বলিয়া প্রস্তুত ছিলেন। তিনিই অগ্রণী হইয়া কথারম্ভ করিলেন। জয়গোপালের ভ্রাতা বৈকুণ্ঠও আছেন।

[গৃহস্থাশ্রম ও শ্রীরামকৃষ্ণ]

বৈকুণ্ঠ—আমরা সংসারী লোক, আমাদের কিছু বলুন।

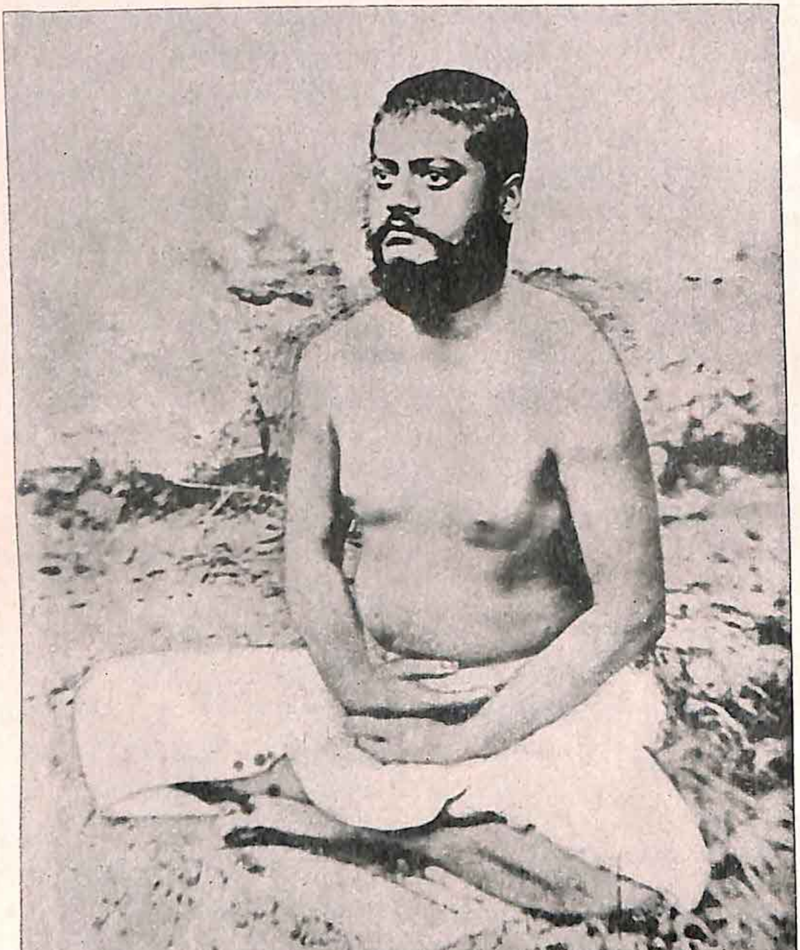
শ্রীরামকৃষ্ণ—তাঁকে জেনে—এক হাত ঈশ্বরের পাদপদ্মে রেখে আর এক হাতে সংসারের কার্য কর।

বৈকুণ্ঠ—মহাশয়, সংসার কি মিথ্যা?

শ্রীরামকৃষ্ণ—যতক্ষণ তাঁকে না জানা যায়, ততক্ষণ মিথ্যা। তখন তাঁকে ভুলে মানুষ 'আমার আমার' করে; মায়ার বদ্ধ হ'য়ে কামিনী কাঞ্চনে মুগ্ধ হয়ে আরও ডোবে! মায়াতে এমনই মানুষ অজ্ঞান হয় যে, পালাবার পথ থাকলেও পালাতে পারে না! একটি গান আছে—

এমনি মহামায়ার মায়া রেখেছে কি কুহক করে।
ব্রহ্মা বিষ্ণু অচৈতন্য জীবে কি জানিতে পারে॥
বিল ক'রে ঘুণী পাতে মীন প্রবেশ করে তাতে।
গতায়াতের পথ আছে তবু মীন পালাতে নারে॥
গুটীপোকায় গুটী করে পালালেও পালাতে পারে।
মহামায়ায় বদ্ধ গুটী, আপনার নালে আপনি মরে॥

"তোমরা তো নিজে নিজে দেখছো সংসার অনিত্য। এই বাড়িই দেখো না কেন? কত লোক এলো গেলো! কত জন্মালো কত দেহত্যাগ করলে! সংসার এই আছে এই নাই। অনিত্য! যাদের এতো 'আমার আমার' করছো চোখ বুজলেই নাই। কেউ নাই, তবু নাতির জন্য কাশী যাওয়া হয় না। 'আমার হারুর কি হবে?' 'গতায়াতের পথ আছে তবু মীন পালাতে নারে! গুটীপোকা আপন নালে আপনি মরে।' এরূপ সংসার মিথ্যা, অনিত্য।"



স্বামীজী

প্রতিবেশী—মহাশয়, এক হাত ঈশ্বরে আর এক হাত সংসারে রাখবো কেন? যদি সংসার অনিত্য, এক হাতই বা সংসারে দিব কেন?

শ্রীরামকৃষ্ণ—তাঁকে জেনে সংসার করলে অনিত্য নয়। গান শোন—

মন রে কৃষি কাজ জান না।
এমন মানব জমিন রইল পতিত আবাদ ক'রলে ফলতো সোনা॥
কালী নামে দাওরে বেড়া ফসলে তছরূপ হবে না।
সে যে মুক্তকেশীর শক্ত বেড়া, তার কাছেতে যম ঘেঁসে না॥
অদ্য কিম্বা শতাব্দান্তে, বাজাপ্ত হবে জান না।
এখন আপন একতারে (মনরে) চুটিয়ে ফসল কেটে নেনা॥
গুরুদত্ত বীজ রোপণ করে, ভক্তিবারি সেঁচে দেনা॥
একা যদি না পারিস মন, রামপ্রসাদকে সঙ্গে নেনা॥

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

গৃহস্থাশ্রমে ঈশ্বর লাভ—উপায়

শ্রীরামকৃষ্ণ—গান শুনলে? 'কালীনামে দাওরে বেড়া ফসলে তছরূপ হবে না?' ঈশ্বরের শরণাগত হও, সব পাবে। 'সে যে মুক্তকেশীর শক্ত বেড়া, তার কাছেতে যম ঘেঁসে না। শক্ত বেড়া। তাঁকে যদি লাভ করতে পারো, সংসার অসার ব'লে বোধ হবে না। যে তাঁকে জেনেছে, সে দেখে যে জীব-জগৎ সে তিনিই হয়েছেন। ছেলেদের খাওয়াবে, যেন গোপালকে খাওয়াচ্ছো। পিতা-মাতাকে ঈশ্বর ঈশ্বরী দেখবে ও সেবা ক'রবে। তাঁকে জেনে সংসার করলে বিবাহিতা স্ত্রী সঙ্গে প্রায় ঐহিক সম্বন্ধ থাকে না। দুজনেই ভক্ত, কেবল ঈশ্বরের কথা কয়, ঈশ্বরের প্রসঙ্গ লয়ে থাকে। ভক্তের সেবা ক'রে। সর্বভূতে তিনি আছেন, তাঁর সেবা দুজনে করে।

প্রতিবেশী—মহাশয়, এরূপ স্ত্রী-পুরুষ তো দেখা যায় না।

শ্রীরামকৃষ্ণ—আছে, অতি বিরল। বিষয়ী লোকেরা তাদের চিনতে পারে না। তবে এরূপটি হ'তে গেলে দুজনেরই ভাল হওয়া চাই। দুজনেই যদি সেই ঈশ্বরানন্দ পেয়ে থাকে, তা হ'লেই এটি সম্ভব হয়। ভগবানের বিশেষ কৃপা চাই। না হ'লে সর্বদা অমিল হয়। একজনকে তফাতে যেতে হয়। যদি না মিল হয়, তা হ'লে বড় যন্ত্রণা। স্ত্রী হয়তো রাতদিন বলে, 'বাবা কেন এখানে বিয়ে দিলে। না খেতে পেলুম, না বাছাদের খাওয়াতে পারলুম; না পরতে পেলুম, না বাছাদের পরাতে পেলুম, না একখানা গয়না। তুমি আমায় কি সুখে রেখেছো! চক্ষু বুজে ঈশ্বর ঈশ্বর করছেন! ওসব পাগলামী ছাড়ো!

ভক্ত—এ সব প্রতিবন্ধক আছে, আবার হয়তো ছেলেরা অবাধ্য। তারপর কত আপদ আছে। তবে, মহাশয় উপায় কি?

শ্রীরামকৃষ্ণ—সংসারে থেকে সাধন করা বড় কঠিন। অনেক ব্যাঘাত। তা আর তোমাদের বল্‌তে হবে না; রোগ শোক, দারিদ্র্য আবার স্ত্রীর সঙ্গে মিল নাই; ছেলে অবাধ্য, মূর্খ, গোঁয়ার।

"তবে উপায় আছে। মাঝে মাঝে নির্জনে গিয়ে তাঁকে প্রার্থনা করতে হয়, তাঁকে লাভ কর্‌বার জন্য চেষ্টা করতে হয়।"

প্রতিবেশী—বাড়ি থেকে বেরিয়ে যেতে হবে?

শ্রীরামকৃষ্ণ—একেবারে নয়। যখন অবসর পাবে, কোন নির্জন স্থানে গিয়ে একদিন-দুদিন থাকবে—যেন সংসারের সঙ্গে সম্বন্ধ না থাকে, যেন কোন বিষয়ী লোকদের সঙ্গে সাংসারিক বিষয় লয়ে আলাপ না ক'রতে হয়। হয় নির্জনে বাস, নয় সাধুসঙ্গ।

প্রতিবেশী—সাধু চিন্‌বো কেমন ক'রে?

শ্রীরামকৃষ্ণ—যাঁর মন প্রাণ অন্তরাত্মা ঈশ্বরে গত হয়েছে, তিনিই সাধু। যিনি কামিনী-কাঞ্চনত্যাগী, তিনিই সাধু। যিনি সাধু তিনি স্ত্রীলোককে ঐহিক চক্ষে দেখেন না, সর্বদাই তাদের অন্তরে থাকেন,—যদি স্ত্রীলোকের কাছে আসেন, তাঁকে মাতৃবৎ দেখেন ও পূজা করেন। সাধু সর্বদা ঈশ্বর চিন্তা করেন, ঈশ্বরীয় কথা বই কথা কন না। আর সর্বভূতে ঈশ্বর আছেন জেনে তাদের সেবা করেন। মোটামুটি এইগুলি সাধুর লক্ষণ।

প্রতিবেশী—নির্জনে বরাবর থাক্‌তে হবে?

শ্রীরামকৃষ্ণ—ফুটপাতের গাছ দেখেছ? যতদিন চারা, ততদিন চারিদিকে বেড়া দিতে হয়। না হ'লে ছাগল-গরুতে খেয়ে ফেলবে। গাছের গুঁড়ি মোটা হ'লে আর বেড়ার দরকার নাই। তখন হাতী বেঁধে দিলেও গাছ ভাঙবে না। গুঁড়ি যদি ক'রে নিতে পারো আর ভাবনা কি, ভয় কি? বিবেক লাভ করবার চেষ্টা আগে কর। তেল মেখে কাঁঠাল ভাঙ, হাতে আঠা জড়াবে না।

প্রতিবেশী—বিবেক কাহাকে বলে?

শ্রীরামকৃষ্ণ—ঈশ্বর সৎ আর সব অসৎ, এই বিচার। সৎ মানে নিত্য। অসৎ—অনিত্য। যার বিবেক হয়েছে, সে জানে ঈশ্বরই বস্তু আর সব অবস্তু। বিবেক উদয় হ'লে ঈশ্বরকে জানবার ইচ্ছা হয়। অসৎকে ভালবাসলে—যেমন দেহসুখ, লোকমান্য, টাকা এই সব ভালবাসলে—ঈশ্বর, যিনি সৎস্বরূপ, তাঁকে জানতে ইচ্ছা হয় না। সদসৎ বিচার এলে তবে ঈশ্বরকে খুঁজতে ইচ্ছা করে।

"শোন একটা গান শোন—

আয় মন বেড়াতে যাবি।
কালীকল্পতরুমূলে রে মন, চারি ফল কুড়ায়ে পাবি॥

প্রবৃত্তি নিবৃত্তি জায়া, নিবৃত্তিরে সঙ্গে লবি।
ওরে বিবেক নামে তার বেটারে, তত্ত্ব কথা তায় শুধাবি॥
প্রথম ভার্যার সন্তানেরে দূর হতে বুঝাইবি।
যদি না মানে প্রবোধ জ্ঞানসিন্ধু মাঝে ডুবাইবি॥
শুচি অশুচিরে লয়ে দিব্য ঘরে কবে শুবি।
তাদের দুই সতীনে পীরিত হ'লে তবে শ্যামা মাকে পাবি॥
ধর্মাধর্ম দুটো অজা, তুচ্ছ খোঁটায় বেঁধে থুবি।
যদি না মানে নিষেধ, তবে জ্ঞান খড়্গে বলি দিবি॥
অহঙ্কার অবিদ্যা তোর পিতামাতায় তাড়িয়ে দিবি।
যদি মোহ গর্তে টেনে লয়, ধৈর্য খোঁটা ধ'রে রবি॥
প্রসাদ বলে এমন হ'লে কালের কাছে জবাব দিবি।
তবে বাপু বাছা বাপের ঠাকুর মনের মত মন হবি॥

"মনে নিবৃত্তি এলে তবে বিবেক হয়, বিবেক হ'লে তত্ত্ব কথা মনে উঠে। তখন মনের বেড়াতে যেতে সাধ হয়, কালীকল্পতরুমূলে। সেই গাছতলায় গেলে, ঈশ্বরের কাছে গেলে, চার ফল কুড়িয়ে পাবে—অনায়াসে পাবে, কুড়িয়ে পাবে—ধর্ম, অর্থ, কাম, মোক্ষ। তাঁকে পেলে ধর্ম, অর্থ, কাম যা সংসারীর দরকার তাও হয়—যদি কেউ চায়।"

প্রতিবেশী—তবে সংসার মায়া বলে কেন?

[বিশিষ্টাদ্বৈতবাদ ও ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ]

শ্রীরামকৃষ্ণ—যতক্ষণ ঈশ্বরকে না পাওয়া যায়, ততক্ষণ 'নেতি নেতি' করে ত্যাগ করতে হয়। তাঁকে যারা পেয়েছে, তারা জানে যে তিনিই সব হয়েছেন—ঈশ্বরমায়াজীবজগৎ। তখন বোধ হয় জীবজগৎশুদ্ধ তিনি। যদি একটা বেলের খোলা, শাঁস, বীচি আলাদা করা যায়, আর একজন যদি বলে, বেলটা কত ওজনে ছিল দেখত, তুমি কি খোলা বীচি ফেলে শাঁসটা কেবল ওজন করবে, না, ওজন ক'রতে হ'লে খোলা বীচি সমস্ত ধরতে হবে। ধরলে তবে বলতে পারবে, বেলটা এতো ওজনে ছিল। খোলাটা যেন জগৎ; জীবগুলি যেন বীচি। বিচারের সময় জীব আর জগৎকে অনাত্মা বলেছিলে, অবস্তু বলেছিলে। বিচার করবার সময় শাঁসকেই সার, খোলা আর বীচিকে অসার ব'লে বোধ হয়। বিচার হ'য়ে গেলে, সমস্ত জড়িয়ে এক বলে বোধ হয়। আর বোধ হয়, যে সত্ত্বাতে শাঁস সেই সত্ত্বা দিয়েই বেলের খোলা আর বীচি হয়েছে। বেল বুঝতে গেলে সব বুঝিয়ে যাবে।

"অনুলোম বিলোম। ঘোলেরই মাখন, মাখনেরই ঘোল। যদি ঘোল

হ'য়ে থাকে তো মাখনও হয়েছে। যদি মাখন হ'য়ে থাকে, তাহলে ঘোলও হয়েছে। আত্মা যদি থাকেন, তো অনাত্মাও আছে।

"যাঁরই নিত্য তাঁরই লীলা, (Phenomenal world) যাঁরই লীলা তাঁরই নিত্য (Absolute); যিনি ঈশ্বর ব'লে গোচর হন, তিনিই জীবজগৎ হ'য়েছেন। যে জেনেছে সে দেখে যে তিনিই সব হয়েছেন—বাপ, মা, ছেলে, প্রতিবেশী, জীব-জন্তু, ভাল মন্দ, শুচি, অশুচি সমস্ত।"

[পাপবোধ—Sense of Sin and Responsibility]

প্রতিবেশী—তবে পাপ-পুণ্য নাই?

শ্রীরামকৃষ্ণ—আছে, আবার নাই। তিনি যদি অহংতত্ত্ব, (Ego) রেখে দেন, তা হ'লে ভেদবুদ্ধিও রেখে দেন, পাপ-পুণ্য জ্ঞানও রেখে দেন। তিনি দু-একজনেতে অহঙ্কার একেবারে পুঁছে ফেলেন—তারা পাপ-পুণ্য ভাল-মন্দের পার হ'য়ে যায়। ঈশ্বর দর্শন যতক্ষণ না হয় ততক্ষণ ভেদবুদ্ধি ভাল-মন্দ জ্ঞান থাক্‌বেই থাক্‌বে। তুমি মুখে বল্‌তে পারো, আমার পাপ-পুণ্য সমান হ'য়ে গেছে; তিনি যেমন করাচ্ছেন, তেমনি করছি। কিন্তু অন্তরে জান যে, ও সব কথা মাত্র; মন্দ কাজটি করলেই মন ধুগ্‌ ধুগ্‌ করবে। ঈশ্বর দর্শনের পরও তাঁর যদি ইচ্ছা হয়, তিনি 'দাস আমি' রেখে দেন। সে অবস্থায় ভক্ত বলে—আমি দাস, তুমি প্রভু। সে ভক্তের ঈশ্বরীয় কথা, ঈশ্বরীয় কাজ ভাল লাগে; ঈশ্বরবিমুখ লোককে ভাল লাগে না; ঈশ্বর ছাড়া কাজ ভাল লাগে না। তবেই হ'লো, এরূপ ভক্তেতেও তিনি ভেদবুদ্ধি রাখেন।

প্রতিবেশী—মহাশয় বল্‌ছেন, ঈশ্বরকে জেনে সংসার কর। তাঁকে কি জানা যায়?

[The 'Unknown and Unknowable']

শ্রীরামকৃষ্ণ—তাঁকে ইন্দ্রিয় দ্বারা বা এ মনের দ্বারা জানা যায় না। যে মনে বিষয় বাসনা নাই সেই শুদ্ধ মনের দ্বারা তাঁকে জানা যায়।

প্রতিবেশী—ঈশ্বরকে কে জানতে পারে?

শ্রীরামকৃষ্ণ—ঠিক কে জানবে? আমাদের যতটুকু দরকার, ততটুকু হ'লেই হ'ল। আমার এক পাতকুয়া জলের কি দরকার? এক ঘটি হ'লেই খুব হ'লো। চিনির পাহাড়ের কাছে একটা পিঁপড়ে গিছল। তার সব পাহাড়টার কি দরকার? একটা, দুটো দানা হ'লেই হেউ ঢেউ হয়।

প্রতিবেশী—আমাদের যে বিকার, এক ঘটি জলে হয় কৈ? ইচ্ছা করে ঈশ্বরকে সব বুঝে ফেলি।

[সংসার—বিকাররোগ ও ঔষধ—'মামেকং শরণং ব্রজ']

শ্রীরামকৃষ্ণ—তা বটে। কিন্তু বিকারের ঔষধও আছে।

প্রতিবেশী—মহাশয়, কি ঔষধ?

শ্রীরামকৃষ্ণ—সাধুসঙ্গ, তাঁর নাম গুণগান, তাঁকে সর্বদা প্রার্থনা। আমি বলেছিলাম, 'মা, আমি জ্ঞান চাই না; এই নাও তোমার জ্ঞান; এই নাও তোমার অজ্ঞান,—মা আমায় তোমার পাদপদ্মে কেবল শুদ্ধাভক্তি দাও। আর আমি কিছুই চাই নাই।'

"যেমন রোগ, তার তেমনি ঔষধ। গীতায় তিনি বলেছেন, 'হে অর্জুন, তুমি আমার শরণ লও, তোমাকে সব রকম পাপ থেকে আমি মুক্ত ক'রবো।' তাঁর শরণাগত হও, তিনি সদ্‌বুদ্ধি দেবেন। তিনি সব ভার লবেন। তখন সব রকম বিকার দূরে যাবে। এ বুদ্ধি দিয়ে কি তাঁকে বুঝা যায়? এক সের ঘটিতে কি চার সের দুধ ধরে? আর তিনি না বুঝালে কি বুঝা যায়? তাই বলছি—তাঁর শরণাগত হও—তাঁর যা ইচ্ছা তিনি করুন। তিনি ইচ্ছাময়। মানুষের কি শক্তি আছে?"

দশম খণ্ড

শ্রীযুক্ত সুরেন্দ্রের বাগানে মহোৎসব

প্রথম পরিচ্ছেদ

ভক্তসঙ্গে ঠাকুরের আনন্দ

আজ ঠাকুর সুরেন্দ্রের বাগানে আসিয়াছেন। রবিবার জ্যৈষ্ঠ মাসের কৃষ্ণা ষষ্ঠী তিথি, ১৫ই জুন, ১৮৮৪ খৃষ্টাব্দ। ঠাকুর সকাল নয়টা হইতে ভক্তসঙ্গে আনন্দ করিতেছেন।

সুরেন্দ্রের বাগান কলিকাতার নিকটস্থ কাঁকুড়গাছি নামক পল্লীর অন্তর্গত। নিকটেই রামের বাগান—যে বাগানে ঠাকুর প্রায় ছয় মাস পূর্বে শুভাগমন করিয়াছিলেন। আজ সুরেন্দ্রের বাগানে মহোৎসব।

সকাল হইতেই সংকীর্ত্তন আরম্ভ হইয়াছে। কীর্তনিয়াগণ মাথুর গাহিতেছে। গোপীদিগের প্রেম, শ্রীকৃষ্ণ বিরহে শ্রীমতীর শোচনীয় অবস্থা—সমস্ত বর্ণিত হইতেছিল। ঠাকুর মুহুর্মুহুঃ ভাবাবিষ্ট হইতেছেন। ভক্তগণ উদ্যানগৃহমধ্যে চতুর্দিকে কাতার দিয়া দাঁড়াইয়া আছেন।

উদ্যানগৃহমধ্যে প্রধান প্রকোষ্ঠে সংকীর্ত্তন হইতেছে। ঘরের মেঝেতে সাদা চাদর পাতা ও মাঝে মাঝে তাকিয়া রহিয়াছে। এই প্রকোষ্ঠের পূর্বে ও পশ্চিমে একটি করিয়া কামরা এবং উত্তরে ও দক্ষিণে বারান্দা আছে। উদ্যান গৃহের সম্মুখে অর্থাৎ দক্ষিণ দিকে একটি বাঁধা ঘাটবিশিষ্ট সুন্দর পুষ্করিণী। গৃহ ও পুষ্করিণী ঘাটের মধ্যবর্তী পূর্ব-পশ্চিমে উদ্যান-পথ। পথের দুই ধারে পুষ্পবৃক্ষ ও ক্রোটনাদি গাছ। উদ্যানগৃহের পূর্বধার হইতে উত্তরে ফটক পর্যন্ত আর একটি রাস্তা গিয়াছে। লাল সুরকির রাস্তা। তাহারও দুই পার্শ্বে নানাবিধ পুষ্পবৃক্ষ ক্রোটনাদি গাছ। ফটকের নিকট ও রাস্তার পূর্ব ধারে আর একটি বাঁধা ঘাট পুষ্করিণী। পল্লীবাসী সাধারণ লোকে এখানে স্নানাদি করে এবং পানীয় জল লয়; উদ্যান-গৃহের পশ্চিম ধারেও উদ্যান-পথ, সেই পথের দক্ষিণ-পশ্চিমে রন্ধনশালা। আজ এখানে খুব ধুমধাম, ঠাকুর ও ভক্তদের সেবা হইবে। সুরেশ ও রাম সর্বদা তত্ত্বাবধান করিতেছেন।

উদ্যানগৃহের বারান্দাতেও ভক্তদের সমাবেশ হইয়াছে। কেহ কেহ একাকী বা বন্ধুসঙ্গে প্রথমোক্ত পুষ্করিণীর ধারে বেড়াইতেছেন। কেহ কেহ বাঁধাঘাটে মাঝে মাঝে আসিয়া বিশ্রাম করিতেছেন।

১ সংকীর্ত্তন চলিতেছে। সংকীর্ত্তন গৃহমধ্যে ভক্তের জনতা হইয়াছে।

ভবনাথ, নিরঞ্জন, রাখাল, সুরেন্দ্র, রাম, মাষ্টার, মহিমাচরণ ও মণি মল্লিক ইত্যাদি অনেকেই উপস্থিত। অনেকগুলি ব্রাহ্মভক্তও উপস্থিত।

মাথুর গান হইতেছে। কীর্ত্তনিয়া প্রথমে গৌরচন্দ্রিকা গাহিতেছেন। গৌরাঙ্গ সন্ন্যাস করিয়াছেন—কৃষ্ণপ্রেমে পাগল হইয়াছেন। তাঁর অদর্শনে নবদ্বীপের ভক্তেরা কাতর হইয়া কাঁদিতেছেন। তাই কীর্ত্তনিয়া গাহিতেছেন—গৌর একবার চল নদীয়ায়।

তৎপরে শ্রীমতীর বিরহ অবস্থা বর্ণনা করিয়া আবার গাহিতেছেন।

ঠাকুর ভাবাবিষ্ট। হঠাৎ দণ্ডায়মান হইয়া অতি করুণ স্বরে আখর দিতেছেন—"সখি! হয় প্রাণবল্লভকে আমার কাছে নিয়ে আয়, নয় আমাকে সেখানে রেখে আয়।" ঠাকুরের শ্রীরাধার ভাব হইয়াছে। কথাগুলি বলিতে বলিতেই নির্বাক্ হইলেন; দেহ স্পন্দহীন, অর্ধনীমিলিতনেত্র! সম্পূর্ণ বাহ্যশূন্য; ঠাকুর সমাধিস্থ হইয়াছেন।

অনেকক্ষণ পরে প্রকৃতিস্থ হইলেন। আবার সেই করুণ স্বর। বলিতেছেন, "সখি! তাঁর কাছে লয়ে গিয়ে তুই আমাকে কিনে নে। আমি তোদের দাসী হ'ব। তুই তো কৃষ্ণপ্রেম শিখায়েছিলি। প্রাণবল্লভ!"

কীর্ত্তনিয়াদিগের গান চলিতে লাগিল। শ্রীমতী বলিতেছেন—সখি! যমুনার জল আনতে আমি যাব না। কদম্বতলে প্রিয় সখাকে দেখেছিলাম সেখানে গেলেই আমি বিহ্বল হই!"

ঠাকুর আবার ভাবাবিষ্ট হইতেছেন। দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলিয়া কাতর হইয়া বলিতেছেন, 'আহা' 'আহা!'

কীর্ত্তন চলিতেছে—শ্রীমতীর উক্তি—

গান—শীতল তছু অঙ্গ হেরি সঙ্গসুখ লালসে (হে)।

মাঝে মাঝে আখর দিতেছেন (না হয় তোদের হবে, আমায় একবার দেখা গো)। (ভূষণের ভূষণ গেছে আর ভূষণে কাজ নাই)। (আমার সুদিন গিয়ে দুর্দিন হ'য়েছে) (দুর্দশার দিন কি দেরী হয় না)।

ঠাকুর আখর দিতেছেন—(সে কাল কি আজও হয় নাই)।

কীর্ত্তনিয়া আখর দিতেছেন—(এতকাল গেল, সে কাল কি আজও হয় নাই)।

গান—মরিব মরিব সখি, নিশ্চয় মরিব,
(আমার) কানু হেন গুণনিধি কারে দিয়ে যাব।
না পোড়াইও রাধা অঙ্গ, না ভাসাইও জলে,
(দেখো যেন অঙ্গ পোড়াইও নাগো)
(কৃষ্ণ বিলাসের অঙ্গ ভাসাইও-না গো)
(কৃষ্ণ বিলাসের অঙ্গ জলে না ডারবি, অনলে না দিবি)

বাঁধিয়ে ঝুলিয়ে রেখ তমালের ডালে।
(বেঁধে তমালের ডালে রাখবি) (তাতে পরশ হবে)
(কালোতে পরশ হবে) (কৃষ্ণ কালো তমাল কালো)
(কালো বড় ভালবাসি) (শিশুকাল হইতে)
(আমার কানু অনুগত তনু)
(দেখ যেন কানু ছাড়া ক'রো না গো)।

শ্রীমতীর দশম দশা—মূর্ছিতা হইয়া পড়িয়াছেন।

গান—ধনি ভেল মুরছিত, হরল গেয়ান, (নাম করিতে করিতে) (হাট কি ভাঙ্গলি রাই) তখনই তো প্রাণসখি মুদিল নয়ান। (ধনি কেন এমন হলো) (এই যে কথা কইতেছিল) কেহ কেহ চন্দন দেয় ধনির অঙ্গে; কেহ কেহ রোউত বিষাদতরঙ্গে। (সাধের প্রাণ যাবে ব'লে) কেহ কেহ জল ঢালি দেয় রাইয়ের বদনে (যদি বাঁচে) (যে কৃষ্ণ অনুরাগে মরে, সে কি জলে বাঁচে।)

মূর্ছিতা দেখিয়া সখীরা কৃষ্ণনাম করিতেছেন। শ্যামনামে তাঁহার সংজ্ঞা হইল। তমাল দেখে ভাবছেন বুঝি সম্মুখে কৃষ্ণ এসেছেন।

গান—শ্যাম নামে প্রাণ পেয়ে, ধনি ইতি উতি চায়, না দেখি সে চাঁদমুখ কাঁদে উভরায়। (বলে, কইরে শ্রীদাম) (তোরা যার নাম শুনাইলি কই) (একবার এনে দেখা গো) সম্মুখে তমাল তরু দেখিবারে পায়। (তখন) সেই তমালতরু করি নিরীক্ষণ (বলে ঐ যে চূড়া) (আমার কৃষ্ণের ঐ যে চূড়া) (চূড়া দেখা যায়) (তমাল গাছে ময়ূর হেরে বলে ঐ চূড়া দেখা যায়)।

সখীরা যুক্তি করিয়া মথুরায় দূতী পাঠাইয়াছেন। তিনি একজন মথুরাবাসিনীর সহিত পরিচয় করিলেন—

গান—এক রমণী সমবয়সিনী, নিজ পরিচয় পুছে।

শ্রীমতীর সখী দূতী ব'লছেন—আমায় ডাকতে হবে না, সে আপনি আস্‌বে। দূতী মথুরাবাসিনীর সঙ্গে যেখানে কৃষ্ণ আছেন সেইখানে যাইতেছেন। তৎপরে ব্যাকুল হ'য়ে কেঁদে কেঁদে ডাকছেন—

"কোথায় হরি হে, গোপীজনজীবন! প্রাণবল্লভ! রাধাবল্লভ! লজ্জানিবারণ হরি! একবার দেখা দাও। আমি অনেক গরব ক'রে এদের বলেছি, তুমি আপনি দেখা দিবে।"

গান—মধুপুর নাগরী, হাঁসি কহত ফিরি, গোপী কোঁয়ারী (হায় গো) (কেমন করে বা যাবি গো) (এমন কাঙালিনী বেশে)। সপ্তম দ্বার পারে রাজা বৈঠত, তাঁহা কাঁহা যাওবি নারি। (কেমন করে বা যাবি) (তোর সাহস দেখে লাজে মরি বল কেমনে যাবি)। হা হা নাগর গোপীজনজীবন (কাঁহা নাগর দেখা দিয়ে দাসীর প্রাণ রাখ!) (কোথায় গোপীজনজীবন প্রাণবল্লভ!) (হে মথুরানাথ, দেখা দিয়ে দাসীর মন প্রাণ রাখ হরি, হা হা রাধাবল্লভ!)

(কোথায় আছ হে, হৃদয়বল্লভ লজ্জানিবারণ হরি) (দেখা দিয়ে দাসীর মান রাখ হরি)। হা হা নাগর গোপীজনজীবনধন, দূতী ডাকত উভরায়।

কোথায় গোপীজনজীবন প্রাণবল্লভ! এই কথা শুনিয়া ঠাকুর সমাধিস্থ হইলেন। কীর্ত্তনান্তে কীর্ত্তনিয়ারা উচ্চ সংকীর্ত্তন করিতেছেন। প্রভু আবার দণ্ডায়মান! সমাধিস্থ! কতক সংজ্ঞা লাভ করিয়া অস্ফুট স্বরে বলিতেছেন, "কিট্ন কিট্ন" (কৃষ্ণ কৃষ্ণ)। ভাবে নিমগ্ন। নাম সম্পূর্ণ উচ্চারণ হইতেছে না।

রাধাকৃষ্ণের মিলন হইল। কীর্ত্তনিয়ারা ঐ ভাবের গান গাহিতেছেন।

ঠাকুর আখর দিতেছেন—

ধনি দাঁড়ালো রে।
অঙ্গ হেলাইয়ে ধনি দাঁড়ালো রে।
শ্যামের বামে ধনি দাঁড়ালো রে।
তমাল বেড়ি বেড়ি ধনি দাঁড়ালো রে।

এইবার নাম-সংকীর্ত্তন। তাহারা খোল-করতাল সঙ্গে গাহিতে লাগিল "রাধে গোবিন্দ জয়!" ভক্তেরা সকলেই উন্মত্ত।

ঠাকুর নৃত্য করিতেছেন। ভক্তেরাও তাঁহাকে বেড়িয়া আনন্দে নাচিতেছেন! মুখে "রাধে গোবিন্দ জয়, রাধে গোবিন্দ জয়।"

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

সরলতা ও ঈশ্বরলাভ—ঈশ্বরের সেবা আর সংসারের সেবা

কীর্ত্তনান্তে ঠাকুর ভক্তসঙ্গে একটু উপবেশন করিয়াছেন। এমন সময় নিরঞ্জন আসিয়া ভূমিষ্ঠ হইয়া প্রণাম করিলেন। ঠাকুর তাঁহাকে দেখিয়াই দাঁড়াইয়া উঠিলেন। আনন্দে বিস্ফারিত লোচনে সস্মিত মুখে বলিয়া উঠিলেন, "তুই এসেছিস!"

(মাস্টারের প্রতি)—"দেখ, এ ছোকরাটি বড় সরল। সরলতা পূর্বজন্মে অনেক তপস্যা না করলে হয় না। কপটতা, পাটোয়ারী—এ সব থাকতে ঈশ্বরকে পাওয়া যায় না।

"দেখছো না, ভগবান যেখানে অবতার হ'য়েছেন, সেইখানেই সরলতা। দশরথ কত সরল। নন্দ—শ্রীকৃষ্ণের বাবা কত সরল। লোকে বলে, আহা কি স্বভাব, ঠিক যেন নন্দ ঘোষ!"

ভক্তরা সরল। ঠাকুর কি ইঙ্গিত করিতেছেন যে, আবার ভগবান অবতীর্ণ হয়েছেন?

শ্রীরামকৃষ্ণ (নিরঞ্জনের প্রতি)—দেখ, তোর মুখে যেন একটা কালো আবরণ প'ড়েছে। তুই আফিসের কাজ করিস্ কি না, তাই প'ড়েছে। আফিসের হিসাবপত্র করতে হয়,—আরও নানা রকম কাজ আছে; সর্বদা ভাবতে হয়।

"সংসারী লোকেরা যেমন চাকরি করে তুইও চাকরি করছিস্। তবে একটু তফাৎ আছে। তুই মার জন্য চাকরি স্বীকার করেছিস্।

"মা গুরুজন ব্রহ্মময়ীস্বরূপা। যদি মাগ-ছেলের জন্যে চাক্‌রি করতিস্, তা'হলে আমি বলতুম, ধিক! শত ধিক! একশ' ছি!

(মণি মল্লিকের প্রতি)—"দেখ, ছোকরাটি ভারী সরল। তবে আজকাল একটু-আধটু মিথ্যা কথা কয়, এই যা দোষ। সেদিন ব'লে গেল যে আসবে, কিন্তু আর এলো না। (নিরঞ্জনের প্রতি) তাই রাখাল বলেছিল—তুই এ'ড়েদয়ে এসেও দেখা করিস্ নাই কেন?"

নিরঞ্জন—আমি এ'ড়েদয়ে সবে দুদিন এসেছিলাম।

শ্রীরামকৃষ্ণ (নিরঞ্জনের প্রতি)—ইনি হেডমাষ্টার। তোর সঙ্গে দেখা করতে গিছলেন। আমি পাঠিয়েছিলাম। (মাষ্টারের প্রতি) তুমি সেদিন বাবুরামকে আমার কাছে পাঠিয়ে দিয়েছিলে?

তৃতীয় পরিচ্ছেদ

শ্রীরাধাকৃষ্ণ ও গোপীপ্রেম

ঠাকুর পশ্চিমের কামরায় দু'চারজন ভক্তের সহিত কথাবার্তা কহিতেছেন। সেই ঘরে টেবিল-চেয়ার কয়েকখানা জড় করা ছিল।

ঠাকুর টেবিল ভর দিয়া অর্ধেক দাঁড়িয়েছেন, অর্ধেক ব'সেছেন।

শ্রীরামকৃষ্ণ (মাষ্টারের প্রতি)—আহা, গোপীদের কি অনুরাগ! তমাল দেখে একেবারে প্রেমোন্মাদ! শ্রীমতীর এরূপ বিরহানল যে চক্ষের জল সে আগুনের ঝাঁজে শুকিয়ে যেতো—জল হ'তে হ'তে বাষ্প হয়ে উড়ে যেতো। কখনও কখনও তাঁর ভাব কেউ টের পেতো না। সায়ের দীঘিতে হাতী নামলে কেউ টের পায় না।

মাষ্টার—আজ্ঞে হাঁ, গৌরাঙ্গেরও ঐ রকম হ'য়েছিল। বন দেখে বৃন্দাবন ভেবেছিলেন, সমুদ্র দেখে যমুনা ভেবেছিলেন—

শ্রীরামকৃষ্ণ—আহা, সেই প্রেমের যদি একবিন্দু কারু হয়! কি অনুরাগ। কি ভালবাসা! শুধু ষোল আনা অনুরাগ নয়, পাঁচ সিকা পাঁচ আনা! এরই নাম প্রেমোন্মাদ। কথাটা এই তাঁকে ভালবাসতে হবে। তাঁর জন্য ব্যাকুল হ'তে হবে। তা তুমি যে পথেই থাকো, সাকারেই বিশ্বাস কর বা নিরাকারেই বিশ্বাস কর,—ভগবান মানুষ হ'য়ে অবতার হন, এ কথা বিশ্বাস কর আর না কর;—তাঁতে অনুরাগ থাকলেই হ'ল। তখন তিনি যে কেমন, তিনি নিজেই জানিয়ে দেবেন।

"যদি পাগল হ'তে হয়, সংসারের জিনিস লয়ে কেন পাগল হবে? যদি পাগল হ'তে হয়, তবে ঈশ্বরের জন্য পাগল হও!"

চতুর্থ পরিচ্ছেদ

ভবনাথ, মহিমা প্রভৃতি ভক্তসঙ্গে হরিকথা প্রসঙ্গে

ঠাকুর হলঘরে আবার ফিরিলেন। তাঁহার বসিবার আসনের কাছে একটি তাকিয়া দেওয়া হইল। ঠাকুর বসিবার সময় "ওঁ তৎসৎ" এই মন্ত্র উচ্চারণ করিয়া তাকিয়া স্পর্শ করিলেন। বিষয়ী লোকেরা এই বাগানে আসা-যাওয়া করে ও এই সকল তাকিয়া ব্যবহার করে; এই জন্য বুঝি ঠাকুর ঐ মন্ত্র উচ্চারণ করিয়া উপাধানটি শুদ্ধ করিয়া লইলেন; ভবনাথ, মাষ্টার প্রভৃতি কাছে বসিলেন। বেলা অনেক হইয়াছে, এখনও খাওয়া-দাওয়ার আয়োজন হয় নাই। ঠাকুর বালক স্বভাব। বলিলেন, "কৈগো, এখনও দেয় না। নরেন্দ্র কোথায়?"

একজন ভক্ত (ঠাকুরের প্রতি সহাস্যে)—মহাশয়! রামবাবু অধ্যক্ষ। তিনি সব দেখছেন। (সকলের হাস্য)।

শ্রীরামকৃষ্ণ (হাসিতে হাসিতে)—রাম অধ্যক্ষ! তবেই হয়েছে!

একজন ভক্ত—আজ্ঞা, রামবাবু যেখানে অধ্যক্ষ, সেখানে এই রকমই হ'য়ে থাকে। (সকলের হাস্য)।

শ্রীরামকৃষ্ণ (ভক্তদের প্রতি)—সুরেন্দ্র কোথায়? আহা, সুরেন্দ্রের বেশ স্বভাবটি হ'য়েছে। বড় স্পষ্ট বক্তা, কারুকে ভয় ক'রে কথা কয় না। আর দেখ খুব মুক্তহস্ত। কেউ তার কাছে সাহায্যের জন্য গেলে শুধু হাতে ফেরে না। (মাষ্টারের প্রতি) তুমি ভগবান দাসের কাছে গিয়েছিলে, কি রকম দেখলে?

মাষ্টার—আজ্ঞা, কালনায় গিয়েছিলাম। ভগবানদাস খুব বুড়ো হ'য়েছেন। রাত্রে দেখা হ'য়েছিল, কাঁথার উপর শুয়েছিলেন। প্রসাদ এনে একজন খাইয়ে দিতে লাগল। চেঁচিয়ে কথা কইলে শুন্‌তে পান। আপনার নাম শুনে বল্‌তে লাগলেন, তোমাদের আর ভাবনা কি?

"সেই বাড়িতে নাম ব্রহ্মের পূজা হয়।"

ভবনাথ (মাষ্টারের প্রতি)—আপনি অনেকদিন দক্ষিণেশ্বরে যান নাই। ইনি আমাকে দক্ষিণেশ্বরে আপনার বিষয় জিজ্ঞাসা ক'রছিলেন, আর ব'লছিলেন যে, মাষ্টারের কি অরুচি হ'য়ে গেল।

এই বলিয়া ভবনাথ হাসিতে লাগিলেন। ঠাকুর উভয়ের কথোপকথন সমস্ত শুনিতেছিলেন। মাষ্টারের প্রতি সস্নেহে দৃষ্টি করিয়া বলিতেছেন, হ্যাঁ গো, তুমি অনেকদিন যাও নাই কেন বল দেখি?

মাষ্টার তো তো করিতে লাগিলেন।

এমন সময় মহিমাচরণ আসিয়া উপস্থিত। মহিমাচরণ কাশীপুরবাসী, ঠাকুরকে ভারী শ্রদ্ধা-ভক্তি করেন ও সর্বদা দক্ষিণেশ্বরে যান। ব্রাহ্মণ সন্তান, কিছু পৈতৃক বিষয় আছে। স্বাধীনভাবে থাকেন, কাহারও চাকরি করেন না।

সর্বদা শাস্ত্রালোচনা ও ঈশ্বরচিন্তা করেন। কিছু পাণ্ডিত্যও আছে। ইংরাজী, সংস্কৃত অনেক গ্রন্থ পড়িয়াছেন।

শ্রীরামকৃষ্ণ (সহাস্যে, মহিমার প্রতি)—একি! এখানে জাহাজ এসে উপস্থিত! (সকলের হাস্য)। এমন জায়গায় ডিঙ্গি-টিঙ্গি আসতে পারে; এ যে একেবারে জাহাজ! (সকলের হাস্য)। তবে একটা কথা আছে—এটা আষাঢ় মাস! (সকলের হাস্য)।

মহিমাচরণের সঙ্গে অনেক কথাবার্তা হইতেছে।

শ্রীরামকৃষ্ণ (মহিমার প্রতি)—আচ্ছা, লোককে খাওয়ানো এক রকম তাঁরই সেবা করা, কি বলো? সব জীবের ভিতরে তিনি অগ্নি রূপে রয়েছেন। খাওয়ানো কি না, তাঁকে আহূতি দেওয়া।

"কিন্তু তা বলে অসৎ লোককে খাওয়াতে নাই। এমন লোক, যারা ব্যভিচারাদি মহাপাতক ক'রেছে—ঘোর বিষয়াসক্ত লোক, এরা যেখানে ব'সে খায়, সে জায়গায় সাত হাত মাটি অপবিত্র হয়।

"হৃদে সিওড়ে একবার লোক খাইয়েছিল। তাদের মধ্যে অনেকেই খারাপ লোক। আমি বললুম, 'দেখ হৃদে, ওদের যদি তুই খাওয়াস, তবে এই তোর বাড়ি থেকে চললুম।' (মহিমার প্রতি)—আচ্ছা, আমি শুনেছি, তুমি আগে লোকদের খুব খাওয়াতে, এখন বুঝি খরচা বেড়ে গেছে?" (সকলের হাস্য)।

পঞ্চম পরিচ্ছেদ

ব্রাহ্মভক্তসঙ্গে

এইবার পাতা হইতেছে। দক্ষিণের বারান্দায়। ঠাকুর মহিমাচরণকে বলিতেছেন, আপনি একবার যাও, দেখো ওরা সব কি ক'রছে। আর আপনাকে আমি বলতে পারি না, না হয় একটু পরিবেশন করলে? মহিমাচরণ বলিতেছেন, "নিয়ে আসুক না তারপর দেখা যাবে", এই বলিয়া 'হুঁ হুঁ' করিয়া একটু দালানের দিকে গেলেন, কিন্তু কিয়ৎক্ষণ পরে ফিরিয়া আসিলেন।

ঠাকুর ভক্তসঙ্গে পরমানন্দে আহার করিতে বসিলেন। আহারান্তে ঘরে আসিয়া বিশ্রাম করিতেছেন। ভক্তেরাও দক্ষিণের পুষ্করিণীর বাঁধা ঘাটে আচমন করিয়া পান খাইতে খাইতে আবার ঠাকুরের কাছে আসিয়া জুটিলেন। সকলেই আসন গ্রহণ করিলেন। বেলা দুইটার পর প্রতাপ আসিয়া উপস্থিত। তিনি একজন ব্রাহ্মভক্ত। আসিয়া ঠাকুরকে অভিবাদন করিলেন। ঠাকুরও মস্তক অবনত করিয়া নমস্কার করিলেন। প্রতাপের সহিত অনেক কথাবার্তা হইতেছে।

প্রতাপ—মহাশয়! আমি পাহাড়ে গিয়েছিলাম। (দার্জিলিং-এ)।

শ্রীরামকৃষ্ণ—কিন্তু তোমার শরীর ত তত ভাল হয় নাই। তোমার কী অসুখ হয়েছে।

প্রতাপ—আজ্ঞা, তাঁর যে অসুখ ছিল, আমারও সেই অসুখ হ'য়েছে।

কেশবেরও ঐ অসুখ ছিল। কেশবের অন্যান্য কথা হইতে লাগিল। প্রতাপ বলিতে লাগিলেন, কেশবের বৈরাগ্য বাল্যকাল থেকেই দেখা গিছিল। তাঁকে আহ্লাদ আমোদ করতে প্রায় দেখা যেত না। হিন্দু কলেজে প'ড়তেন, সেই সময় সত্যেন্দ্রের সঙ্গে তাঁর খুব বন্ধুত্ব হয়। আর ঐ সূত্রে শ্রীযুক্ত দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরের সঙ্গে আলাপ হয়। কেশবের দুই-ই ছিল। যোগও ছিল, ভক্তিও ছিল। সময়ে সময়ে তাঁর ভক্তির এত উচ্ছ্বাস হ'তো যে মাঝে মাঝে মূর্ছা হ'ত। গৃহস্থদের ভিতর ধর্ম আনা তাঁর জীবনের প্রধান উদ্দেশ্য ছিল।

[লোকমান্য ও অহংকার—'আমি কর্তা' 'আমি গুরু'—দর্শনের লক্ষণ]

একটি মহারাষ্ট্রদেশীয় স্ত্রীলোক সম্বন্ধে কথা হইতেছে।

প্রতাপ—এ দেশের মেয়েরাও কেউ কেউ বিলেতে গেছে। একটি মহারাষ্ট্রদেশের মেয়ে, খুব পণ্ডিত, বিলেতে গিছিল। তিনি কিন্তু খৃস্টান হ'য়েছেন। মহাশয় কি তাঁর নাম শুনেছেন?

শ্রীরামকৃষ্ণ—না; তবে তোমার মুখে যা শুনলুম তাতে বোধ হ'চ্ছে যে তার লোকমান্য হবার ইচ্ছা। এরূপ অহঙ্কার ভাল নয়। 'আমি করছি', এটি অজ্ঞান থেকে হয়; হে ঈশ্বর, তুমি করছ—এইটি জ্ঞান। ঈশ্বর কর্তা আর সব অকর্তা।

'আমি' 'আমি' করলে যে কত দুর্গতি হয়, বাছুরের অবস্থা ভাবলে বুঝতে পারবে। বাছুর 'হাম্ মা', 'হাম্ মা' (আমি আমি) করে। তার দুর্গতি দেখ। হয়ত সকাল থেকে সন্ধ্যা পর্যন্ত লাঙ্গল টান্‌তে হচ্ছে; রোদ নাই, বৃষ্টি নাই। হয়ত কষাই কেটে ফেললে। মাংসগুলো লোকে খাবে। ছালটা চামড়া হবে। সেই চামড়ায় জুতো এই সব তৈয়ার হবে। লোকে তার উপর পা দিয়ে চলে যাবে। তাতেও দুর্গতির শেষ হয় না। চামড়ায় ঢাক তৈয়ার হয়। আর ঢাকের কাঠি দিয়ে অনবরত চামড়ার উপর আঘাত করে। অবশেষে কিনা নাড়ীভুঁড়িগুলো নিয়ে তাঁত তৈয়ার করে; যখন ধুনুরীর তাঁত তৈয়ার হয় তখন ধোনবার সময় 'তুঁহু তুঁহু' বলে। আর 'হাম্ মা, হাম্ মা' বলে না। তুঁহু তুঁহু বলে, তবেই নিস্তার, তবেই তার মুক্তি! কর্মক্ষেত্রে আর আস্‌তে হয় না।

"জীবও যখন বলে, হে ঈশ্বর, আমি কর্তা নই, তুমিই কর্তা—আমি যন্ত্র, তুমি যন্ত্রী', জীবের সংসার-যন্ত্রণা শেষ হয়। তখনই জীবের মুক্তি হয়, আর এ কর্মক্ষেত্রে আস্‌তে হয় না।"

একজন ভক্ত—জীবের অহঙ্কার কেমন ক'রে যায়?

শ্রীরামকৃষ্ণ—ঈশ্বরকে দর্শন না করলে অহঙ্কার যায় না। যদি কার অহঙ্কার গিয়ে থাকে, তার অবশ্য ঈশ্বরদর্শন হয়েছে।

একজন ভক্ত—মহাশয়! কেমন ক'রে জানা যায় যে, ঈশ্বরদর্শন হয়েছে?

শ্রীরামকৃষ্ণ—ঈশ্বরদর্শনের লক্ষণ আছে। শ্রীমদ্ভাগবতে আছে, যে ব্যক্তি ঈশ্বরদর্শন ক'রেছে, তার চারিটি লক্ষণ হয়, (১) বালকবৎ (২) পিশাচবৎ (৩) জড়বৎ (৪) উন্মাদবৎ।

"যার ঈশ্বর দর্শন হয়েছে, তার বালকের স্বভাব হয়। সে ত্রিগুণাতীত—কোন গুণের আঁট নাই। আবার শুচি অশুচি তার কাছে দুই সমান—তাই পিশাচবৎ। আবার পাগলের মত 'কভু হাসে, কভু কাঁদে'; এই বাবুর মত সাজে-গোজে, আবার খানিক পরে ন্যাংটা; বগলের নীচে কাপড় রেখে বেড়াচ্ছে—তাই উন্মাদবৎ। আবার কখনও বা জড়ের ন্যায় চুপ ক'রে বসে আছে—জড়বৎ।"

একজন ভক্ত—ঈশ্বরদর্শনের পর কি অহঙ্কার একেবারে যায়?

শ্রীরামকৃষ্ণ—কখন কখন তিনি অহঙ্কার একেবারে পুঁছে ফেলেন—যেমন সমাধি অবস্থায়। আবার প্রায় অহঙ্কার একটু রেখে দেন। কিন্তু সে অহঙ্কারে দোষ নাই। যেমন বালকের অহঙ্কার। পাঁচ বছরের বালক 'আমি' 'আমি' করে, কিন্তু কারু অনিষ্ট কর্‌তে জানে না।

"পরশমণি ছুঁলে লোহা সোনা হয়ে যায়। লোহার তরোয়াল সোনার তরোয়াল হ'য়ে যায়। তরোয়ালের আকার থাকে, কারু অনিষ্ট করে না। সোনার তরোয়ালে মারা কাটা চলে না।"

ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ

বিলাতে কাঞ্চনের পূজা—জীবনের উদ্দেশ্য কর্ম না ঈশ্বরলাভ?

শ্রীরামকৃষ্ণ (প্রতাপের প্রতি)—তুমি বিলাত গিয়েছিলে, কি দেখ্‌লে, সব বল।

প্রতাপ—বিলাতের লোকেরা আপনি যাকে কাঞ্চন বলেন, তারই পূজা করে—তবে অবশ্য কেউ কেউ ভাল লোক—অনাসক্ত লোক আছে। কিন্তু সাধারণতঃ আগাগোড়া রজোগুণের কান্ড। আমেরিকাতেও তাই দেখে এলুম।

[বিলাত ও কর্মযোগ—কলিযুগে কর্মযোগ না ভক্তিযোগ]

শ্রীরামকৃষ্ণ (প্রতাপকে)—বিষয়কর্মে আসক্তি শুধু যে বিলাতে আছে, এমন নয়। সব জায়গায় আছে। তবে কি জান? কর্মকান্ড হ'চ্ছে আদিকাণ্ড। সত্ত্বগুণ (ভক্তি, বিবেক, বৈরাগ্য, দয়া এই সব) না হ'লে ঈশ্বরকে পাওয়া যায় না। রজোগুণে কাজের আড়ম্বর হয়। তাই রজোগুণ থেকে তমোগুণ এসে পড়ে। বেশী কাজ জড়ালেই ঈশ্বরকে ভুলিয়ে দেয়। আর কামিনী-কাঞ্চনে আসক্তি বাড়ে।

"তবে কর্ম একেবারে ত্যাগ করবার যো নাই। তোমার প্রকৃতিতে তোমায় কর্ম করাবে। তা তুমি ইচ্ছা কর আর নাই কর। তাই ব'লেছে অনাসক্ত হ'য়ে কর্ম কর। অনাসক্ত হ'য়ে কর্ম করো;—কি না, কর্মের ফল আকাঙ্ক্ষা ক'রবে না। যেমন পূজা জপ তপ ক'রছো, কিন্তু লোকমান্য হবার জন্য নয় কিম্বা পুণ্য করবার জন্য নয়।

"এরূপ অনাসক্ত হ'য়ে কর্ম করার নাম কর্মযোগ। ভারী কঠিন। একে কলিযুগ, সহজেই আসক্তি এসে যায়। মনে করছি অনাসক্ত হ'য়ে কাজ করছি কিন্তু কোন দিক দিয়ে আসক্তি এসে যায়, জানতে দেয় না। হয়তো পূজা মহোৎসব করলুম, কি অনেক গরীব কাঙ্গালদের সেবা করলুম—মনে করলুম যে, অনাসক্ত হ'য়ে করছি, কিন্তু কোন্ দিক দিয়ে লোকমান্য হবার ইচ্ছা হয়েছে, জান্‌তে দেয় না। তবে একেবারে অনাসক্ত হওয়া সম্ভব কেবল তাঁর, যাঁর ঈশ্বর দর্শন হয়েছে।"

একজন ভক্ত—যাঁরা ঈশ্বরকে লাভ করেন নাই তাঁদের উপায় কি? তাঁরা কি বিষয়-কর্ম সব ছেড়ে দেবেন?

শ্রীরামকৃষ্ণ—কলিতে ভক্তিযোগ। নারদীয় ভক্তি। ঈশ্বরের নাম গুণ গান করা ও ব্যাকুল হ'য়ে প্রার্থনা করা; 'হে ঈশ্বর, আমায় জ্ঞান দাও, ভক্তি দাও, আমায় দেখা দাও।' কর্মযোগ বড় কঠিন। তাই প্রার্থনা করতে হয়, 'হে ঈশ্বর, আমার কর্ম কমিয়ে দাও। আর যেটুকু কর্ম রেখেছো, সেটুকু যেন তোমার কৃপায় অনাসক্ত হ'য়ে করতে পারি। আর যেন বেশী কর্ম জড়াতে না ইচ্ছা হয়।'

"কর্ম ছাড়বার যো নাই। আমি চিন্তা ক'রছি আমি ধ্যান ক'রছি, এও কর্ম। ভক্তিলাভ ক'রলে বিষয়-কর্ম আপনা আপনি কমে যায়। আর ভাল লাগে না। ওলা মিছরীর পানা পেলে চিটে-গুড়ের পানা কে খেতে চায়?"

একজন ভক্ত—বিলেতের লোকেরা কেবল 'কর্ম কর' 'কর্ম কর' করে। কর্ম তবে জীবনের উদ্দেশ্য নয়?

শ্রীরামকৃষ্ণ—জীবনের উদ্দেশ্য ঈশ্বর লাভ। কর্ম তো আদিকাণ্ড; জীবনের উদ্দেশ্য হ'তে পারে না। তবে নিষ্কাম কর্ম একটা উপায়,—উদ্দেশ্য নয়।

"শম্ভু বললে, এখন এই আশীর্বাদ করুন যে, যা টাকা আছে, সেগুলি সদ্ব্যয়ে যায়,—হাসপাতাল, ডিস্পেন্সারী করা, রাস্তা-ঘাট করা, কুয়ো করা এই সবে। আমি বললাম, এ সব কর্ম অনাসক্ত হ'য়ে করতে পারলে ভাল, কিন্তু তা বড় কঠিন। আর যাই হোক এটি যেন মনে থাকে যে, তোমার মানবজন্মের উদ্দেশ্য ঈশ্বর লাভ। হাসপাতাল ডিস্পেন্সারী করা নয়! মনে কর ঈশ্বর তোমার সামনে এলেন; এসে বললেন, তুমি বর লও। তা হলে তুমি কি বল্‌বে, আমায় কতকগুলো হাসপাতাল, ডিস্পেন্সারী ক'রে দাও, না, বল্‌বে—হে ভগবান, তোমার পাদপদ্মে যেন শুদ্ধা ভক্তি হয়, আর যেন তোমাকে আমি

সর্বদা দেখতে পাই। হাসপাতাল, ডিস্পেন্সারী, এ সব অনিত্য বস্তু। ঈশ্বরই বস্তু আর সব অবস্তু। তাঁকে লাভ হ'লে আবার বোধ হয়, তিনিই কর্ত্তা আমরা অকর্ত্তা। তবে কেন তাঁকে ছেড়ে নানা কাজ বাড়িয়ে মরি? তাঁকে লাভ হ'লে তাঁর ইচ্ছায় অনেক হাসপাতাল, ডিস্পেন্সারী হ'তে পারে। তাই বলছি, কর্ম আদিকান্ড। কর্ম জীবনের উদ্দেশ্য নয়। সাধন ক'রে আরও এগিয়ে পড়। সাধন ক'রতে ক'রতে আরও এগিয়ে পড়্‌লে শেষে জানতে পারবে যে ঈশ্বরই বস্তু, আর সব অবস্তু, ঈশ্বর লাভই জীবনের উদ্দেশ্য।

"একজন কাঠুরে বনে কাঠ কাট্‌তে গিছলো। হঠাৎ এক ব্রহ্মচারীর সঙ্গে দেখা হ'লো। ব্রহ্মচারী বললেন, 'ওহে, এগিয়ে পড়ো!' কাঠুরে বাড়িতে ফিরে এসে ভাব্‌তে লাগলো ব্রহ্মচারী এগিয়ে যেতে বললেন কেন?

"এই রকমে কিছুদিন যায়। একদিন সে বসে আছে, এমন সময় এই ব্রহ্মচারীর কথাগুলি মনে পড়লো। তখন সে মনে মনে বললে আজ আমি আরো এগিয়ে যাবো। বনে গিয়ে আরো এগিয়ে দেখে যে, অসংখ্য চন্দনের গাছ। তখন আনন্দে গাড়ি গাড়ি চন্দনের কাঠ নিয়ে এলো, আর বাজারে বেচে খুব বড় মানুষ হ'য়ে গেল।

"এই রকমে কিছুদিন যায়। আর একদিন মনে প'ড়লো ব্রহ্মচারী বলেছেন 'এগিয়ে পড়।' তখন আবার বনে গিয়ে এগিয়ে দেখে নদীর ধারে রূপোর খনি। এ কথা সে কখন স্বপ্নেও ভাবে নাই। তখন খনি থেকে কেবল রূপো নিয়ে গিয়ে বিক্রি ক'রতে লাগলো। এত টাকা হ'লো যে আন্ডিল হয়ে গেল।

"আবার কিছুদিন যায়। একদিন ব'সে ভাব্‌ছে ব্রহ্মচারী তো আমাকে রূপোর খনি পর্যন্ত যেতে বলেন নাই—তিনি যে আমাকে এগিয়ে যেতে ব'লেছেন। এবার নদীর পারে গিয়ে দেখে, সোনার খনি। তখন সে ভাব্‌লে, ওহো! তাই ব্রহ্মচারী ব'লেছিলেন, এগিয়ে পড়।

"আবার কিছুদিন পরে এগিয়ে দেখে, হীরে মাণিক রাশিকৃত প'ড়ে আছে। তখন তার কুবেরের মত ঐশ্বর্য হ'লো।

"তাই বলছি যে, যা কিছু কর না কেন, এগিয়ে গেলে আরো ভালো জিনিস পাবে। একটু জপ ক'রে উদ্দীপন হ'য়েছে বলে মনে করো না, যা হবার তা হয়ে গেছে। কর্ম কিন্তু জীবনের উদ্দেশ্য নয়। আরো এগোও, কর্ম নিষ্কাম ক'রতে পারবে। তবে, নিষ্কাম কর্ম বড় কঠিন, তাই ভক্তি ক'রে ব্যাকুল হ'য়ে তাঁকে প্রার্থনা কর, 'হে ঈশ্বর, তোমার পাদপদ্মে ভক্তি দাও, আর কর্ম কমিয়ে দাও; আর যেটুকু রাখবে, সেটুকু কর্ম যেন নিষ্কাম হ'য়ে ক'রতে পারি।

"আরো এগিয়ে গেলে ঈশ্বরকে লাভ হবে। তাঁকে দর্শন হবে। ক্রমে তাঁর সঙ্গে আলাপ কথাবার্তা হবে।

কেশবের স্বর্গলাভের পর মন্দিরের বেদী লইয়া যে বিবাদ হয়, এইবার তাহার কথা পাড়িল।

শ্রীরামকৃষ্ণ (প্রতাপের প্রতি)—শুন্‌ছি তোমার সঙ্গে বেদী নিয়ে নাকি ঝগড়া হ'য়েছে। যারা ঝগড়া ক'রছে, তারা তো সব হ'রে, প্যালা, পঞ্চা। (সকলের হাস্য)।

(ভক্তদের প্রতি)—"দেখ, প্রতাপ, অমৃত, এ সব শাঁক বাজে! আর যা সব শুন তাদের কোন আওয়াজ নাই।" (সকলের হাস্য)।

প্রতাপ—মহাশয়, বাজে যদি বল্‌লেন তো আঁবের কশিও বাজে।

সপ্তম পরিচ্ছেদ

ব্রাহ্মসমাজ ও শ্রীরামকৃষ্ণ—প্রতাপকে শিক্ষা

শ্রীরামকৃষ্ণ (প্রতাপের প্রতি)—দেখো, তোমাদের ব্রাহ্মসমাজের লেক্‌চার শুন্‌লে লোকটার ভাব বেশ বোঝা যায়। এক হরিসভায় আমায় নিয়ে গিছলো। আচার্য হয়েছিলেন একজন পণ্ডিত, তাঁর নাম সামাধ্যায়ী। বলে কি, ঈশ্বর নীরস, আমাদের প্রেম-ভক্তি দিয়ে তাঁকে সরস ক'রে নিতে হ'বে। এই কথা শুনে অবাক। তখন একটা গল্প মনে পড়লো। একটি ছেলে বলেছিল, আমার মামার বাড়িতে অনেক ঘোড়া আছে, এক গোয়াল ঘোড়া! এখন গোয়াল যদি হয় তা হ'লে কখন ঘোড়া থাক্‌তে পারে না, গরু থাকাই সম্ভব। এরূপ অসম্বন্ধ কথা শুন্‌লে লোকে কি ভাবে? এই ভাবে যে, ঘোড়া টোড়া কিছুই নাই। (সকলের হাস্য)।

একজন ভক্ত—ঘোড়া ত নাই-ই। গরুও নাই। (সকলের হাস্য)।

শ্রীরামকৃষ্ণ—দেখ দেখিন্, যিনি রসস্বরূপ তাঁকে কিনা ব'লছে 'নীরস'! এতে এই বোঝা যায় যে, ঈশ্বর যে কি জিনিস, কখনও অনুভব করে নাই।

['আমি কর্ত্তা', 'আমার ঘর' অজ্ঞান—জীবনের উদ্দেশ্য 'ডুব দাও']

শ্রীরামকৃষ্ণ (প্রতাপের প্রতি)—দেখ, তোমায় বলি, তুমি লেখাপড়া জান, বুদ্ধিমান, গম্ভীরাত্মা। কেশব আর তুমি ছিলে, যেন গৌর-নিতাই দু ভাই। লেক্‌চার দেওয়া, তর্ক, ঝগড়া, বাদ-বিসম্বাদ এ'সব অনেক তো হ'লো। আর কি এ সব তোমার ভাল লাগে? এখন সব মনটা কুড়িয়ে ঈশ্বরের দিকে দাও। ঈশ্বরেতে এখন ঝাঁপ দাও।

প্রতাপ—আজ্ঞা হাঁ, তার সন্দেহ নাই, তাই করা কর্তব্য। তবে এ সব করা তাঁর নামটা যাতে থাকে।

শ্রীরামকৃষ্ণ (হাসিয়া)—তুমি ব'ল্‌ছো বটে, তাঁর নাম রাখবার জন্য সব করছো; কিন্তু কিছুদিন পরে এ ভাবও থাকবে না। একটা গল্প শোন—

"একজন লোকের পাহাড়ের উপর একখানা ঘর ছিল। কুঁড়েঘর। অনেক মেহনত ক'রে ঘরখানি ক'রেছিল। কিছুদিন পরে একদিন ভারী ঝড় এলো। কুঁড়েঘর টল টল ক'রতে লাগলো। তখন ঘর রক্ষার জন্য সে ভারী চিন্তিত হ'লো। বল্‌লে, হে পবনদেব, দেখো ঘরটি ভেঙ্গো না বাবা! পবনদেব কিন্তু শুনছেন না! ঘর মড় মড় ক'রতে লাগলো; তখন লোকটা একটা ফিকির ঠাওরালে;—তার মনে পড়লো যে, হনুমান পবনের ছেলে। যাই মনে পড়া অমনি ব্যস্ত হ'য়ে ব'লে উঠ্‌লো—বাবা! ঘর ভেঙ্গো না, হনুমানের ঘর, দোহাই তোমার! ঘর তবুও মড় মড় করে। কেবা তার কথা শুনে। অনেকবার হনুমানের ঘর' 'হনুমানের ঘর' করার পর দেখলে যে কিছুই হলো না। তখন বল্‌তে লাগলো, বাবা 'লক্ষ্মণের ঘর!' 'লক্ষ্মণের ঘর!' তাতেও হল না। তখন বলে বাবা, 'রামের ঘর!' 'রামের ঘর!' দেখো বাবা ভেঙ্গো না, দোহাই তোমার। তাতেও কিছু হ'লো না, ঘর মড় মড় ক'রে ভাঙ্গতে আরম্ভ হলো। তখন প্রাণ বাঁচাতে হবে, লোকটা ঘর থেকে বেরিয়ে আসবার সময় ব'লছে—যা শালার ঘর।

(প্রতাপের প্রতি)—"কেশবের নাম তোমায় রক্ষা করতে হবে না। যা কিছু হয়েছে, জানবে—ঈশ্বরের ইচ্ছায়! তাঁর ইচ্ছাতে হ'লো আবার তাঁর ইচ্ছাতে যাচ্ছে; তুমি কি ক'রবে? তোমার এখন কর্ত্তব্য যে ঈশ্বরেতে সব মন দাও—তাঁর প্রেমের সাগরে ঝাঁপ দাও।

এই কথা বলিয়া ঠাকুর সেই অতুলনীয় কণ্ঠে মধুর গান গাহিতে লাগিলেন—

ডুব্ ডুব্ ডুব্ রূপ সাগরে আমার মন।
তলাতল পাতাল খুঁজলে পাবি রে প্রেম রত্ন ধন॥
খুঁজ খুঁজ খুঁজ খুঁজলে পাবি হৃদয় মাঝে বৃন্দাবন।
দীপ দীপ দীপ জ্ঞানের বাতি, জ্বলবে হৃদে অনুক্ষণ॥
ড্যাং ড্যাং ড্যাং ড্যাঙ্গায় ডিঙে চালায় আবার সে কোন্ জন।
কুবীর বলে শোন্ শোন্ শোন্ ভাব গুরুর শ্রীচরণ॥

(প্রতাপের প্রতি)—"গান শুনলে? লেক্‌চার, ঝগড়া ও সব তো অনেক হ'লো, এখন ডুব দাও। আর এ সমুদ্রে ডুব দিলে মরবার ভয় নাই। এ যে অমৃতের সাগর! মনে ক'রো না যে এতে মানুষ বেহেড হয়; মনে ক'রো না যে বেশী ঈশ্বর ঈশ্বর করলে মানুষ পাগল হ'য়ে যায়। আমি নরেন্দ্রকে বলেছিলাম—"

প্রতাপ—মহাশয়, নরেন্দ্র কে?

শ্রীরামকৃষ্ণ—ও আছে একটি ছোকরা। আমি নরেন্দ্রকে বলেছিলুম, দেখ, ঈশ্বর রসের সাগর। তোর ইচ্ছা হয় না কি যে, এই রসের সাগরে ডুব দিই? আচ্ছা মনে কর, এক খুলি রস আছে, তুই মাছি হয়েছিস্; তা কোন্‌খানে বসে

রস খাবি? নরেন্দ্র বল্‌লে, 'আমি খুলির কিনারায় ব'সে মুখ বাড়িয়ে খাব।' আমি জিজ্ঞাসা কল্লুম, কেন? কিনারায় বসবি কেন? সে বললে, 'বেশী দূরে গেলে ডুবে যাব, আর প্রাণ হারাব!' তখন আমি বললুম, 'বাবা! সচ্চিদানন্দ সাগরে সে ভয় নাই! এ যে, অমৃতের সাগর, ঐ সাগরে ডুব দিলে মৃত্যু হয় না, মানুষ অমর হয়! ঈশ্বরেতে পাগল হ'লে মানুষ বেহেড হয় না।'

(ভক্তদের প্রতি)—'আমি' আর 'আমার' এইটির নাম অজ্ঞান। রাসমণি কালীবাড়ি ক'রেছেন, এই কথাই লোকে বলে। কেউ বলে না যে, ঈশ্বর ক'রেছেন। 'ব্রাহ্মসমাজ অমুক লোক ক'রে গেছেন,'—এ কথা আর কেউ বলে না যে, ঈশ্বরের ইচ্ছায় এটি হ'য়েছে! আমি ক'রছি এইটির নাম অজ্ঞান। হে ঈশ্বর, তুমি কর্ত্তা আর আমি অকর্ত্তা; তুমি যন্ত্রী, আমি যন্ত্র; এইটির নাম জ্ঞান। হে ঈশ্বর আমার কিছুই নয়—এ মন্দির আমার নয়, এ কালীবাড়ি আমার নয়, এ সমাজ আমার নয়, সব তোমার জিনিস; এ স্ত্রী, পুত্র, পরিবার এ সব কিছুই আমার নয়, সব তোমার জিনিস; এর নাম জ্ঞান।

"আমার জিনিস, আমার জিনিস, বলে—সেই সকল জিনিসকে ভালবাসার নাম মায়া। সবাইকে ভালবাসার নাম দয়া। শুধু ব্রাহ্মসমাজের লোকগুলিকে ভালবাসি, কি শুধু পরিবারদের ভালবাসি, এর নাম মায়া। শুধু দেশের লোকগুলিকে ভালবাসা এর নাম মায়া; সব দেশের লোককে ভালবাসা, সব ধর্মের লোকদের ভালবাসা, এটি দয়া থেকে হয়, ভক্তি থেকে হয়।

"মায়াতে মানুষ বদ্ধ হ'য়ে যায়, ভগবান থেকে বিমুখ হয়। দয়া থেকে ঈশ্বর লাভ হয়। শুকদেব, নারদ এ'রা দয়া রেখেছিলেন।"

অষ্টম পরিচ্ছেদ

প্রতাপকে শিক্ষা—ব্রাহ্মসমাজ ও কামিনী-কাঞ্চন

প্রতাপ—যারা মহাশয়ের কাছে আসেন, তাঁদের ক্রমে ক্রমে উন্নতি হচ্ছে তো?

শ্রীরামকৃষ্ণ—আমি বলি যে, সংসার করতে দোষ কি? তবে সংসারে দাসীর মত থাক।

[গৃহস্থের সাধন]

"দাসী মনিবের বাড়ির কথায় বলে, 'আমাদের বাড়ি।' কিন্তু তার নিজের বাড়ি হয়তো কোন পাড়াগাঁয়ে। মনিবের বাড়িকে দেখিয়ে মুখে বলে, 'আমাদের বাড়ি।' মনে জানে যে ওবাড়ি আমাদের নয়, আমাদের বাড়ি সেই পাড়াগাঁয়ে। আবার মনিবের ছেলেকে মানুষ করে, আর বলে, 'হরি আমার বড় দুষ্টু হয়েছে; 'আমার হরি মিষ্টি খেতে ভালবাসে না।' 'আমার হরি' মুখে বলে বটে, কিন্তু জানে যে, হরি আমার নয়, মনিবের ছেলে।

"তাই যারা আসে, তাদের আমি বলি, সংসার কর না কেন, তাতে দোষ নাই। তবে ঈশ্বরেতে মন রেখে কর, জেনো যে বাড়ি ঘর পরিবার আমার নয়; এ সব ঈশ্বরের। আমার ঘর ঈশ্বরের কাছে। আর বলি যে, তাঁর পাদপদ্মে ভক্তির জন্য ব্যাকুল হ'য়ে সর্বদা প্রার্থনা ক'রবে।"

বিলাতের কথা আবার পড়িল। একজন ভক্ত বলিলেন, মহাশয় আজকাল বিলাতের পণ্ডিতেরা নাকি ঈশ্বর আছেন এ কথা মানেন না।

প্রতাপ—মুখে যে যা বলুন, আন্তরিক তাঁরা যে কেউ নাস্তিক তা আমার বোধ হয় না। এই জগতের ব্যাপারের পেছনে যে একটা মহাশক্তি আছে, এ কথা অনেককেই মান্‌তে হ'য়েছে।

শ্রীরামকৃষ্ণ—তা হ'লেই হ'লো; শক্তি তো মানছে? নাস্তিক কেন হবে?

প্রতাপ— তা ছাড়া ইউরোপের পণ্ডিতেরা moral government (সৎকার্যের পুরস্কার আর পাপের শাস্তি এই জগতে হয়) এ কথাও মানেন।

অনেক কথাবার্তার পর প্রতাপ বিদায় লইতে গাত্রোত্থান করিলেন।

শ্রীরামকৃষ্ণ (প্রতাপের প্রতি)—আর কি বলবো তোমায়? তবে এই বলা যে, আর ঝগড়া-বিবাদের ভিতর থেকো না।

"আর এক কথা—কামিনী-কাঞ্চনই ঈশ্বর থেকে মানুষকে বিমুখ করে। সেদিকে যেতে দেয় না। এই দেখ না, সকলেই নিজের পরিবারকে সুখ্যাত করে। (সকলের হাস্য)। তা ভালোই হোক আর মন্দই হোক,—যদি জিজ্ঞাসা কর, তোমার পরিবারটি কেমন গা, অমনি বলে, 'আজ্ঞে খুব ভাল'—"

প্রতাপ—তবে আমি আসি।

প্রতাপ চলিয়া গেলেন। ঠাকুরের অমৃতময়ী কথা, কামিনী-কাঞ্চন ত্যাগের কথা সমাপ্ত হইল না। সুরেন্দ্রের বাগানের বৃক্ষস্থিত পত্রগুলি দক্ষিণাবায়ু-সংঘাতে দুলিতেছিল ও মর্মর শব্দ করিতেছিল। কথাগুলি সেই শব্দের সঙ্গে মিশাইয়া গেল। একবার মাত্র ভক্তদের হৃদয়ে আঘাত করিয়া অবশেষে অনন্ত আকাশে লয় প্রাপ্ত হইল।

কিন্তু প্রতাপের হৃদয়ে কি এ কথা প্রতিধ্বনিত হয় নাই?

কিয়ৎক্ষণ পরে শ্রীযুক্ত মণিলাল মল্লিক ঠাকুরকে বলিতেছেন—

মহাশয়, এই বেলা দক্ষিণেশ্বরে যাত্রা করুন। আজ সেখানে কেশব সেনের মা ও বাড়ির মেয়েরা আপনাকে দর্শন করতে যাবেন। তাঁরা আপনাকে না দেখতে পেলে হয়ত দুঃখিত হ'য়ে ফিরে আস্‌বেন।

কয় মাস হইল কেশব স্বর্গারোহণ করিয়াছেন। তাই তাঁহার বৃদ্ধা মাতাঠাকুরাণী, পরিবার ও বাড়ির অন্যান্য মেয়েরা ঠাকুরকে দর্শন করিতে যাইবেন।

শ্রীরামকৃষ্ণ (মণি মল্লিকের প্রতি)—রোসো বাপু, একে আমার ঘুম-টুম হয়

নাই;—তাড়াতাড়ি কর্‌তে পারি না। তারা গেছে তা আর কি ক'রবো। আর সেখানে তারা বাগানে বেড়াবে—বেশ আনন্দ হ'বে।

কিয়ৎক্ষণ বিশ্রাম করিয়া ঠাকুর যাত্রা করিতেছেন—দক্ষিণেশ্বরে যাইবেন। যাইবার সময় সুরেন্দ্রের কল্যাণ চিন্তা করিতেছেন। সব ঘরে এক-একবার যাইতেছেন আর মৃদু-মৃদু নামোচ্চারণ করিতেছেন। কিছু অসম্পূর্ণ রাখিবেন না, তাই দাঁড়াইয়া দাঁড়াইয়াই বলিতেছেন—"আমি তখন নুচি খাই নাই, একটু নুচি এনে দাও"। কণিকামাত্র লইয়া খাইতেছেন। আর বলিতেছেন—"এর অনেক মানে আছে! নুচি খাই নাই মনে হ'লে আবার আসবার ইচ্ছা হবে।" (সকলের হাস্য)।

মণি মল্লিক (সহাস্যে)—বেশ'ত আমরাও আসতাম!

ভক্তেরা সকলে হাসিতেছেন।

একাদশ খণ্ড
ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণের পণ্ডিত দর্শন

প্রথম পরিচ্ছেদ
ঈশানের বাড়িতে শুভাগমন

আজ রথযাত্রা। বুধবার, ২৫শে জুন, ১৮৮৪; আষাঢ় শুক্লা দ্বিতীয়া। সকালে ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ কলিকাতায় ঈশানের বাড়ি নিমন্ত্রণে আসিয়াছেন। ঠনঠনিয়ার ঈশানের ভদ্রাসন-বাটী। সেখানে আসিয়া ঠাকুর শুনিলেন যে, পণ্ডিত শশধর অনতিদূরে কলেজ স্ট্রীটে, চাটুযোদের বাড়ি রহিয়াছেন। পণ্ডিতকে দেখিবার তাঁর ভারী ইচ্ছা। বৈকালে পণ্ডিতের বাড়ি যাইবেন, স্থির হইল।

বেলা প্রায় দশটা। শ্রীরামকৃষ্ণ ঈশানের নীচের বৈঠকখানায় ভক্তসঙ্গে বসিয়া আছেন। ঈশানের পরিচিত ভাটপাড়ার দুই-একটি ব্রাহ্মণ, তাহাদের মধ্যে একজন ভাগবতের পণ্ডিত। ঠাকুরের সঙ্গে হাজরা ও আরও দুই-একটি ভক্ত আসিয়াছেন। শ্রীশ প্রভৃতি ঈশানের ছেলেরাও উপস্থিত। একজন ভক্ত শক্তির উপাসক আসিয়াছেন। কপালে সিন্দুরের ফোঁটা। ঠাকুর আনন্দময়; সিন্দুরের টিপ দেখিয়া হাসিতে হাসিতে বলিতেছেন,—'উনি ত মার্কামারা।'

কিয়ৎক্ষণ পরে নরেন্দ্র ও মাস্টার তাঁহাদের কলিকাতার বাটী হইতে আসিলেন। তাঁহারা ঠাকুরকে প্রণাম করিয়া তাঁহার কাছে উপবিষ্ট হইলেন। ঠাকুর মাস্টারকে বলিয়াছিলেন, 'আমি অমুক দিন ঈশানের বাড়ি যাইতেছি, তুমিও যাইবে ও নরেন্দ্রকে সঙ্গে করিয়া আনিবে।'

ঠাকুর মাস্টারকে বলিতেছেন "সেদিন তোমার বাড়ি যাচ্ছিলাম—তোমার আড্ডাটা কোন্ ঠিকানায়?"

মাস্টার—আজ্ঞা, এখন শ্যামপুকুর তেলিপাড়ায়, স্কুলের কাছে।

শ্রীরামকৃষ্ণ—আজ স্কুলে যাও নাই?

মাস্টার—আজ্ঞা, আজ রথের ছুটি।

নরেন্দ্রের পিতৃবিয়োগের পর বাড়িতে অত্যন্ত কষ্ট। তিনি পিতার জ্যেষ্ঠ পুত্র—ছোট ছোট ভাই-ভগ্নী আছে। পিতা উকিল ছিলেন, কিছু রাখিয়া যাইতে পারেন নাই। সংসার প্রতিপালনের জন্য নরেন্দ্র কাজকর্ম চেষ্টা করিতেছেন। ঠাকুর নরেন্দ্রের কর্মের জন্য ঈশান প্রভৃতি ভক্তদের বলিয়া রাখিয়াছেন। ঈশান কম্পট্রোলার জেনার‍্যালের আফিসে কর্মচারিদিগের একজন অধ্যক্ষ ছিলেন। নরেন্দ্রের বাটীর কষ্ট শুনিয়া ঠাকুর সর্বদা চিন্তিত থাকেন।

শ্রীরামকৃষ্ণ (নরেন্দ্রের প্রতি)—আমি ঈশানকে তোর কথা বলেছি। ঈশান ওখানে (দক্ষিণেশ্বরে কালীমন্দিরে) একদিন ছিল কি না—তাই বলেছিলাম। তার অনেকের সঙ্গে আলাপ আছে।

ঈশান ঠাকুরকে নিমন্ত্রণ করিয়া আনিয়াছেন। সেই উপলক্ষে কতকগুলি বন্ধুদের নিমন্ত্রণ করিয়াছেন। গান হইবে। পাখোয়াজ, বাঁয়া তবলা ও তানপুরার আয়োজন হইয়াছে। বাড়ির একজন একটি পাত্র করিয়া পাখোয়াজের জন্য ময়দা আনিয়া দিল। বেলা ১১টা হইবে। ঈশানের ইচ্ছা নরেন্দ্র গান করেন।

শ্রীরামকৃষ্ণ (ঈশানের প্রতি)—এখনও ময়দা। তবে বুঝি (খাবার) অনেক দেরী।

ঈশান (সহাস্যে)—আজ্ঞে না, তত দেরী নাই।

ভক্তেরা কেহ কেহ হাসিতেছেন। ভাগবতের পণ্ডিতও হাসিয়া একটি উদ্ভট শ্লোক* বলিতেছেন। শ্লোক আবৃত্তির পর পণ্ডিত ব্যাখ্যা করিতেছেন: দর্শনাদি শাস্ত্র অপেক্ষা কাব্য মনোহর। যখন কাব্য পাঠ হয় বা লোকে শ্রবণ করে তখন বেদান্ত, সাংখ্য, ন্যায়, পাতঞ্জল এই সব দর্শন শুষ্ক বোধ হয়। কাব্য অপেক্ষা গীত মনোহর। সঙ্গীতে পাষাণহৃদয় লোকও গলে যায়; কিন্তু যদিও গীতের এত আকর্ষণ, যদি সুন্দরী নারী কাছ দিয়ে চলে যায়, কাব্যও প'ড়ে থাকে, গীত পর্যন্ত ভাল লাগে না। সব মন ঐ নারীর দিকে চলে যায়। আবার যখন বুভুক্ষা হয়, ক্ষুধা পায়, কাব্য, গীত, নারী কিছুই ভাল লাগে না। অন্নচিন্তা চমৎকারা!

শ্রীরামকৃষ্ণ (সহাস্যে)—ইনি রসিক।

পাখোয়াজ বাঁধা হইল। নরেন্দ্র গান গাহিতেছেন।

গান একটু আরম্ভ হইতে না হইতে ঠাকুর উপরের বৈঠকখানা ঘরে বিশ্রাম করিবার জন্য চলিয়া আসিলেন। সঙ্গে মাষ্টার ও শ্রীশ। বৈঠকখানা ঘর রাস্তার উপর। ঈশানের শ্বশুর ক্ষেত্রনাথ চাটুয্যে মহাশয় এই বৈঠকখানা ঘর করিয়াছেন।

মাষ্টার শ্রীশের পরিচয় দিলেন। বলিলেন—'ইনি পণ্ডিত ও অতিশয় শান্ত প্রকৃতি। শিশুকাল হইতে ইনি আমার সঙ্গে বরাবর পড়িয়াছিলেন। ইনি ওকালতি করেন।'

শ্রীরামকৃষ্ণ—এ রকম লোকের উকিল হওয়া!

মাষ্টার—ভুলে ওঁর ও পথে যাওয়া হয়েছে।

---

* কাব্যেন দর্শনং হন্তি, কাব্যং গীতেন হন্যতে।
গীতঞ্চ স্ত্রীবিলাসেন, সর্বং হন্তি বুভুক্ষতা॥
(এই শ্লোকটি উদ্ধার হওয়ায় পাদটীকার সন্নিবেশিত হইল—প্রকাশক)

শ্রীরামকৃষ্ণ—আমি গণেশ উকিলকে দেখেছি। ওখানে (দক্ষিণেশ্বর কালীবাটীতে) বাবুদের সঙ্গে মাঝে মাঝে যায়। পান্নাও যায়—সুন্দর নয়, তবে গান ভাল। আমায় কিন্তু বড় মানে; সরল।

(শ্রীশের প্রতি)—"আপনি কি সার মনে করেছো?"

শ্রীশ—ঈশ্বর আছেন আর তিনিই সব করছেন। তবে তাঁর গুণ (Attributes) আমরা যা ধারণা করি তা ঠিক নয়। মানুষ তাঁর বিষয় কি ধারণা করবে; অনন্ত কাণ্ড!

শ্রীরামকৃষ্ণ—বাগানে কত গাছ, গাছে কত ডাল—এ সব হিসাবে তোমার কাজ কি? তুমি বাগানে আম খেতে এসেছ, আম খেয়ে যাও। তাঁতে ভক্তি প্রেম হবার জন্যই মানুষ জন্ম। তুমি আম খেয়ে চলে যাও।

"তুমি মদ খেতে এসেছ, শুঁড়ির দোকানে কত মণ মদ এ খপরে তোমার কাজ কি! এক গেলাস হ'লেই তোমার হ'য়ে যায়।

"তোমার অনন্ত কাণ্ড জানবার কি দরকার।

"তাঁর গুণ কোটি বৎসর বিচার করলেও কিছু জানতে পারবে না।"

ঠাকুর একটু চুপ করিয়া আছেন। আবার কথা কহিতেছেন। ভাটপাড়ার একটি ব্রাহ্মণও বসিয়া আছেন।

শ্রীরামকৃষ্ণ (মাষ্টারের প্রতি)—সংসারে কিছুই নাই। এ'র (ঈশানের) সংসার ভাল তাই,—তা না হ'লে যদি ছেলেরা রাঁড়-খোর, গাঁজা-খোর, মাতাল, অবাধ্য এই সব হ'তো, কষ্টের একশেষ হ'তো। সকলেরই ঈশ্বরের দিকে মন —বিদ্যার সংসার, এরূপ প্রায় দেখা যায় না। এরূপ দু'চারটে বাড়ি দেখলাম। কেবল ঝগড়া, কোঁদল, হিংসা, তারপর রোগ, শোক, দারিদ্র্য। দেখে বললাম—মা, এই বেলা মোড় ফিরিয়ে দাও। দেখ না, নরেন্দ্র কি মুশকিলেই পড়েছে। বাপ মারা গেছে, বাড়িতে খেতে পাচ্ছে না—কাজ-কর্মের এত চেষ্টা ক'রছে, জুটছে না—এখন কি করে বেড়াচ্ছে দেখো।

"মাষ্টার, তুমি আগে অত যেতে, এখন তত যাওনা কেন? বুঝি পরিবারের সঙ্গে বেশী ভাব হয়েছে?

"তা দোষই বা কি, চারিদিকে কামিনী-কাঞ্চন! তাই বলি, মা যদি কখনও শরীর ধারণ হয়, যেন সংসারী ক'রো না।"

ভাটপাড়ার ব্রাহ্মণ—কি! গৃহস্থ ধর্মের সুখ্যাতি আছে।

শ্রীরামকৃষ্ণ—হাঁ, কিন্তু বড় কঠিন।

ঠাকুর অন্য কথা পাড়িতেছেন।

শ্রীরামকৃষ্ণ (মাষ্টারের প্রতি)—আমরা কি অন্যায় করলাম? ওরা গাচ্ছে—নরেন্দ্র গাচ্ছে—আর—আমরা সব পালিয়ে এলাম।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

কলিতে ভক্তিযোগ—কর্মযোগ নহে

প্রায় বেলা চারিটার সময় ঠাকুর গাড়িতে উঠিলেন। অতি কোমলাঙ্গ, অতি সন্তর্পণে তাঁহার দেহ রক্ষা হয়। তাই পথে যাইতে কষ্ট হয়—প্রায় গাড়ি না হ'লে অল্প দূরও যাইতে পারেন না। গাড়িতে উঠিয়া ভাব সমাধিতে মগ্ন হইলেন! তখন টিপ্ টিপ্ করিয়া বৃষ্টি পড়িতেছে। বর্ষাকাল—আকাশে মেঘ, পথে কাদা। ভক্তেরা গাড়ির পশ্চাৎ পশ্চাৎ পদব্রজে যাইতেছেন। তাঁহারা দেখিলেন, রথযাত্রা উপলক্ষে ছেলেরা তালপাতার ভেঁপু বাজাইতেছে।

গাড়ি বাটীর সম্মুখে উপনীত হইল। দ্বারদেশে গৃহস্বামী ও তাঁহার আত্মীয়গণ আসিয়া অভ্যর্থনা করিলেন।

উপরে যাইবার সিঁড়ি। তৎপরে বৈঠকখানা। উপরে উঠিয়াই শ্রীরামকৃষ্ণ দেখিলেন যে শশধর তাঁহাকে অভ্যর্থনা করিতে আসিতেছেন। পন্ডিতকে দেখিয়া বোধ হইল যে তিনি যৌবন অতিক্রম করিয়া প্রৌঢ়াবস্থা প্রাপ্ত হইয়াছেন। বর্ণ উজ্জ্বল, গৌর বলিলে বলা যায়। গলায় রুদ্রাক্ষের মালা। তিনি অতি বিনীতভাবে ভক্তিভরে ঠাকুরকে প্রণাম করিলেন। তৎপরে সঙ্গে করিয়া ঘরে লইয়া বসাইলেন। ভক্তগণ পশ্চাৎ পশ্চাৎ যাইয়া আসন গ্রহণ করিলেন।

সকলেই উৎসুক যে, তাঁহার নিকটে বসেন ও তাঁহার শ্রীমুখনিঃসৃত কথামৃত পান করেন। নরেন্দ্র, রাখাল, রাম, মাষ্টার ও অন্যান্য অনেক ভক্তেরা উপস্থিত আছেন। হাজরাও শ্রীরামকৃষ্ণের সঙ্গে দক্ষিণেশ্বরের কালীবাড়ি হইতে আসিয়াছেন।

ঠাকুর পন্ডিতকে দেখিতে দেখিতে ভাবাবিষ্ট হইলেন। কিয়ৎক্ষণ পরে সেই অবস্থায় হাসিতে হাসিতে পন্ডিতের দিকে তাকাইয়া বলিতেছেন, "বেশ! বেশ!" পরে বলিতেছেন, "আচ্ছা, তুমি কি রকম লেক্চার দাও?"

শশধর—মহাশয়, আমি শাস্ত্রের কথা বুঝাইতে চেষ্টা করি।

শ্রীরামকৃষ্ণ—**কলিযুগের পক্ষে নারদীয় ভক্তি**।—শাস্ত্রে যে সকল কর্মের কথা আছে, তার সময় কৈ? আজকালকার জ্বরে দশমূল পাঁচন চলে না। দশমূল পাঁচন দিতে গেলে রোগীর এদিকে হ'য়ে যায়। আজকাল ফিবার মিক্শ্চার। কর্ম করতে যদি বল,—তো নেজামুড়া বাদ দিয়ে বল্বে। আমি লোকদের বলি, তোমাদের 'আপোধন্যন্যা' ও সব অত বলতে হবে না। তোমাদের গায়ত্রী জপলেই হবে। কর্মের কথা যদি একান্ত বল তবে ঈশানের মত কর্মী দুই-একজনকে ব'ল্তে পার।

[বিষয়ী লোক ও লেকচার]

"হাজার লেক্‌চার দাও বিষয়ী লোকদের কিছু ক'রতে পারবে না। পাথরের দেওয়ালে কি পেরেক মারা যায়? পেরেকের মাথা ভেঙ্গে যাবে তো দেওয়ালের কিছু হবে না। তরোয়ালের চোট মারলে কুমীরের কি হবে? সাধুর কমণ্ডলু (তুম্বা) চার ধাম ক'রে আসে কিন্তু যেমন তে'তো তেমনি তে'তো। তোমার লেক্‌চারে বিষয়ী লোকদের বড় কিছু হচ্ছে না। তবে তুমি ক্রমে ক্রমে জান্‌তে পারবে। বাছুর একেবারে দাঁড়াতে পারে না। মাঝে মাঝে পড়ে যায়, আবার দাঁড়ায়; তবে দাঁড়াতে ও চল্‌তে শিখে।

[নবানুরাগ ও বিচার—ঈশ্বরলাভ হ'লে কর্মত্যাগ—যোগ ও সমাধি]

"কে ভক্ত, কে বিষয়ী চিন্তে পার না। তা সে তোমার দোষ নয়। প্রথম ঝড় উঠলে কোনটা তে'তুল গাছ, কোনটা আম গাছ বুঝা যায় না।

"ঈশ্বরলাভ না হ'লে কেউ একবারে কর্মত্যাগ ক'র্‌তে পারে না। সন্ধ্যাদি কর্ম কতদিন? যতদিন না ঈশ্বরের নামে অশ্রু আর পুলক হয়। একবার 'ওঁ রাম' বলতে যদি চোখে জল আসে, নিশ্চয় জেনো তোমার কর্ম শেষ হ'য়েছে। আর সন্ধ্যাদি কর্ম ক'রতে হবে না।

"ফল হ'লেই ফুল প'ড়ে যায়। ভক্তি—ফল; কর্ম—ফুল। গৃহস্থের বউ পেটে ছেলে হ'লে বেশী কর্ম করতে পারে না। শাশুড়ী দিন দিন তার কর্ম কমিয়ে দেয়। দশমাস পড়লে শাশুড়ী প্রায় কর্ম ক'রতে দেয় না। ছেলে হ'লে সে ঐটিকে নিয়ে কেবল নাড়াচাড়া করে, আর কর্ম ক'রতে হয় না। সন্ধ্যা গায়ত্রীতে লয় হয়। গায়ত্রী প্রণবে লয় হয়। প্রণব সমাধিতে লয় হয়। যেমন ঘণ্টার শব্দ—টং—ট-অ-ম। যোগী নাদ ভেদ ক'রে পরব্রহ্মে লয় হন। সমাধি মধ্যে সন্ধ্যাদি কর্মের লয় হয়। এই রকমে জ্ঞানীদের কর্মত্যাগ হয়।"

তৃতীয় পরিচ্ছেদ

শুধু পাণ্ডিত্য মিথ্যা—সাধনা ও বিবেক বৈরাগ্য

সমাধির কথা বলিতে বলিতে ঠাকুরের ভাবান্তর হইল। তাঁহার চন্দ্রমুখ হইতে স্বর্গীয় জ্যোতিঃ বহির্গত হইতেছে। আর বাহ্যজ্ঞান নাই। মুখে একটি কথা নাই। নেত্র স্থির! নিশ্চয়ই জগতের নাথকে দর্শন করিতেছেন! অনেকক্ষণ পরে প্রকৃতিস্থ হইয়া বালকের ন্যায় বলিতেছেন, "আমি জল খাব।" সমাধির পর যখন জল খাইতে চাহিতেন, তখন ভক্তেরা জানিতে পারিতেন যে, এবার ইনি ক্রমশঃ বাহ্যজ্ঞান লাভ করিবেন।

ঠাকুর ভাবে বলিতে লাগিলেন, "মা! সেদিন ঈশ্বর বিদ্যাসাগরকে দেখালি!" তারপর আমি আবার বলেছিলাম, "মা! আমি আর একজন পণ্ডিতকে দেখবো, তাই তুই আমায় এখানে এনেছিস।"

পরে শশধরের দিকে তাকাইয়া বলিলেন, "বাবা! আর একটু বল বাড়াও, আর কিছুদিন সাধন-ভজন কর। গাছে না উঠতেই এক কাঁদি; তবে তুমি লোকের ভালর জন্য এ সব ক'রছ।"

এই বলিয়া ঠাকুর শশধরকে মাথা নোয়াইয়া নমস্কার করিতেছেন।

আরও বলিতেছেন, "যখন প্রথমে তোমার কথা শুনলুম, জিজ্ঞাসা করলুম যে, এই পণ্ডিত কি শুধু পণ্ডিত, না, বিবেক বৈরাগ্য আছে।

[আদেশ না পেলে আচার্য হওয়া যায় না]

"যে পণ্ডিতের বিবেক নাই, সে পণ্ডিতই নয়।

"যদি আদেশ হ'য়ে থাকে, তা'হলে লোকশিক্ষায় দোষ নাই। আদেশ পেয়ে যদি কেউ লোকশিক্ষা দেয়, তাকে কেউ হারাতে পারে না।

"বাগ্বাদিনীর কাছ থেকে যদি একটি কিরণ আসে, তাহ'লে এমন শক্তি হয় যে, বড় বড় পণ্ডিতগুলো কেঁচোর মত হ'য়ে যায়।

"প্রদীপ জ্বাললে বাদুলে পোকাগুলো ঝাঁকে ঝাঁকে আপনি আসে—ডাক্‌তে হয় না। তেমনি যে আদেশ পেয়েছে, তার লোক ডাক্‌তে হয় না; অমুক সময়ে লেক্‌চার হবে ব'লে, খবর পাঠাতে হয় না। তার নিজের এমনি টান যে লোক তার কাছে আপনি আসে। তখন রাজা, বাবু, সকলে দলে দলে আসে। আর বলতে থাকে আপনি কি লবেন? আম, সন্দেশ, টাকা-কড়ি, শাল এই সব এনেছি; আপনি কি লবেন? আমি সে সকল লোককে বলি, 'দূর কর —আমার ও সব ভাল লাগে না, আমি কিছু চাই না।'

"চুম্বুক পাথর কি লোহাকে বলে, তুমি আমার কাছে এস? এস বলতে হয় না,—লোহা আপনি চুম্বুক পাথরের টানে ছুটে আসে।

"এরূপ লোক, পণ্ডিত নয় বটে। তা'বোলে মনে ক'রো না যে তার জ্ঞানের কিছু কম্‌তি হয়। বই পড়ে কি জ্ঞান হয়? যে আদেশ পেয়েছে তার জ্ঞানের শেষ নাই। সে জ্ঞান ঈশ্বরের কাছ থেকে আসে,—ফুরায় না।

"ও-দেশে ধান মাপবার সময় একজন মাপে, আর একজন রাশ ঠেলে দেয়; তেমনি যে আদেশ পায় সে যত লোকশিক্ষা দিতে থাকে, মা তাহার পেছন থেকে জ্ঞানের রাশ ঠেলে ঠেলে দেন। জ্ঞান আর ফুরায় না।

"মার যদি একবার কটাক্ষ হয়, তাহ'লে কি আর জ্ঞানের অভাব থাকে? তাই জিজ্ঞাসা ক'রছি কোন আদেশ পেয়েছ কি না?"

হাজরা—হাঁ, অবশ্য আদেশ পেয়েছেন। কেমন মহাশয়?

পণ্ডিত—না, আদেশ? তা এমন কিছু পাই নাই।

গৃহস্বামী—আদেশ পান নাই বটে, কর্তব্যবোধে লেক্‌চার দিচ্ছেন।

শ্রীরামকৃষ্ণ—যে আদেশ পায় নাই, তার লেক্‌চার কি হবে?

“একজন (ব্রাহ্ম) লেক্‌চার দিতে দিতে ব'লেছিল, ‘ভাইরে, আমি কত মদ খেতুম, হেন্ করতাম তেন্ করতাম্।’ এ কথা শুনে, লোকগুলো বলাবলি করতে লাগলো, শালা, বলে কিরে? মদ খেতো! এই কথা বলাতে উল্টো উৎপত্তি হ'ল। তাই ভাল লোক না হ'লে লেক্‌চারে কোন উপকার হয় না।

“বরিশালে বাড়ি একজন সদরওয়ালা বলেছিল, ‘মহাশয়, আপনি প্রচার করতে আরম্ভ করুন। তা'হলে আমিও কোমর বাঁধি।’ আমি বললাম, ওগো একটা গল্প শোন—ওদেশে হালদার পুকুর ব'লে একটি পুকুর আছে। যত লোক তার পাড়ে বাহ্যে করতো। সকাল বেলা যারা পুকুরে আস্‌তো গালাগালে তাদের ভূত ছাড়িয়ে দিত। কিন্তু গালাগালে কোন কাজ হ'ত না; আবার তার পরদিন সকালে পাড়ে বাহ্যে ক'রেছে, লোকে দেখ্‌তো। কিছুদিন পরে কোম্পানী থেকে একজন চাপরাসী পুকুরের কাছে একটা হুকুম মেরে দিল; কি আশ্চর্য! একেবারে বাহ্যে করা বন্ধ হ'য়ে গেল।

“তাই বলছি, হেঁজি পেঁজি লোক লেক্‌চার দিলে কিছু কাজ হয় না। চাপরাশ থাক্‌লে তবে লোকে মান্‌বে। ঈশ্বরের আদেশ না থাক্‌লে লোক-শিক্ষা হয় না। যে লোকশিক্ষা দিবে, তার খুব শক্তি চাই। কলকাতায় অনেক হনুমান পুরী আছে—তাদের সঙ্গে তোমার লড়তে হবে। এরা তো (যারা চারিদিকে সভায় বসে আছে) পাঠ্‌ঠা!

“চৈতন্যদেব অবতার। তিনি যা ক'রে গেলেন তারই কি র'য়েছে বল দেখি? আর যে আদেশ পায় নাই, তার লেক্‌চারে কি উপকার হবে?

[কিরূপে আদেশ পাওয়া যায়]

শ্রীরামকৃষ্ণ—তাই বল্‌ছি, ঈশ্বরের পাদপদ্মে মগ্ন হও!

এই কথা বলিয়া ঠাকুর প্রেমে মাতোয়ারা হইয়া গান গাহিতেছেন—

ডুব্ ডুব্ ডুব্ রূপ-সাগরে আমার মন।
তলাতল পাতাল খুঁজ্‌লে পাবি রে প্রেম রত্নধন। [৬৫ পৃঃ

“এ সাগরে ডুবলে মরে না—এ যে অমৃতের সাগর।

[নরেন্দ্রকে শিক্ষা—ঈশ্বর অমৃতের সাগর]

“আমি নরেন্দ্রকে বলেছিলাম—ঈশ্বর রসের সমুদ্র, তুই এ সমুদ্রে ডুব দিবি কি না বল্। আচ্ছা, মনে কর খুলিতে এক খুলি রস র'য়েছে আর তুই মাছি হয়েছিস। কোথা ব'সে রস খাবি বল্? নরেন্দ্র বললে, ‘আমি খুলির আড়ায় ব'সে মুখ বাড়িয়ে খাবো। কেন না বেশী দূরে গেলে ডুবে যাব।’ তখন আমি বল্‌লাম, বাবা, এ সচ্চিদানন্দ সাগর—এতে মরণের ভয় নাই, এ

সাগর অমৃতের সাগর। যারা অজ্ঞান তারাই বলে যে, ভক্তি প্রেমের বাড়াবাড়ি কর্‌তে নাই। ঈশ্বরপ্রেমের কি বাড়াবাড়ি আছে? তাই তোমায় বলি, সচ্চিদানন্দ-সাগরে মগ্ন হও।

"ঈশ্বরলাভ হ'লে ভাবনা কি? তখন আদেশও হবে, লোকশিক্ষাও হবে।"

চতুর্থ পরিচ্ছেদ

ঈশ্বরলাভের অনন্ত পথ—ভক্তিযোগই যুগধর্ম

শ্রীরামকৃষ্ণ—দেখ, অমৃত-সাগরে যাবার অনন্ত পথ। যে কোন প্রকারে হউক এ সাগরে পড়তে পারলেই হ'ল। মনে কর অমৃতের একটি কুণ্ড আছে। কোন রকমে এই অমৃত একটু মুখে পড়লেই অমর হবে;—তা তুমি নিজে ঝাঁপ দিয়েই পড়, বা সিঁড়িতে আস্তে আস্তে নেমে একটু খাও, বা কেউ তোমায় ধাক্কা মেরে ফেলেই দিক। একই ফল। একটু অমৃতের আস্বাদন করলেই অমর হবে।

"অনন্ত পথ—তার মধ্যে জ্ঞান, কর্ম, ভক্তি—যে পথ দিয়া যাও, আন্তরিক হ'লে ঈশ্বরকে পাবে।

"মোটামুটি যোগ তিন প্রকার;—জ্ঞানযোগ, কর্মযোগ, আর ভক্তিযোগ।

"জ্ঞানযোগ—জ্ঞানী, ব্রহ্মকে জান্‌তে চায়; নেতি নেতি বিচার করে। ব্রহ্ম সত্য, জগৎ মিথ্যা এই বিচার করে। সদসৎ বিচার করে। বিচারের শেষ যেখানে, সেখানে সমাধি হয়, আর ব্রহ্মজ্ঞান লাভ হয়।

"কর্মযোগ—কর্ম দ্বারা ঈশ্বরে মন রাখা। তুমি যা শিখাচ্ছ। অনাসক্ত হ'য়ে প্রাণায়াম, ধ্যানধারণাদি কর্মযোগ। সংসারী লোকেরা যদি অনাসক্ত হ'য়ে ঈশ্বরে ফল সমর্পণ ক'রে, তাঁতে ভক্তি রেখে, সংসারের কর্ম করে, সেও কর্মযোগ। ঈশ্বরে ফল সমর্পণ ক'রে পূজা জপাদি কর্ম করার নামও কর্মযোগ। ঈশ্বরলাভই কর্মযোগের উদ্দেশ্য।

"ভক্তিযোগ—ঈশ্বরের নাম গুণ কীর্ত্তন এই সব ক'রে তাঁতে মন রাখা। কলিযুগের পক্ষে ভক্তিযোগ সহজ পথ। ভক্তিযোগই যুগধর্ম।

"কর্মযোগ বড় কঠিন—প্রথমতঃ, আগেই বলেছি, সময় কৈ? শাস্ত্রে যে সব কর্ম ক'রতে ব'লেছে, তার সময় কৈ? কলিতে আয়ু কম। তারপর অনাসক্ত হ'য়ে, ফল কামনা না করে, কর্ম করা ভারী কঠিন। ঈশ্বর লাভ না করলে ঠিক অনাসক্ত হওয়া যায় না। তুমি হয় তো জান না, কিন্তু কোথা থেকে আসক্তি এসে পড়ে।

"জ্ঞানযোগও—এ যুগে ভারী কঠিন। জীবের একে অন্নগত প্রাণ; তাতে আয়ু কম। আবার দেহবুদ্ধি কোন মতে যায় না। এদিকে দেহবুদ্ধি না গেলে একেবারে জ্ঞানই হবে না। জ্ঞানী বলে, আমি সেই ব্রহ্ম; আমি শরীর

নই, আমি ক্ষুধা, তৃষ্ণা, রোগ, শোক, জন্ম মৃত্যু, সুখ দুঃখ এ সকলের পার। যদি রোগ, শোক, সুখ, দুঃখ এ সব বোধ থাকে, তুমি জ্ঞানী কেমন করে হবে? এদিকে কাঁটায় হাত কেটে যাচ্ছে, দরদর ক'রে রক্ত পড়্‌ছে, খুব লাগ্‌ছে—অথচ বলছে, কৈ হাত তো কাটে নাই। আমার কি হয়েছে?

[জ্ঞানযোগ বা কর্মযোগ যুগধর্ম নহে]

"তাই এ যুগের পক্ষে ভক্তিযোগ। এতে অন্যান্য পথের চেয়ে সহজে ঈশ্বরের কাছে যাওয়া যায়। জ্ঞানযোগ বা কর্মযোগ আর অন্যান্য পথ দিয়েও ঈশ্বরের কাছে যাওয়া যেতে পারে, কিন্তু এ সব ভারী কঠিন।

"ভক্তিযোগ যুগধর্ম—তার এ মানে নয় যে, ভক্ত এক জায়গায় যাবে, জ্ঞানী বা কর্মী আর এক জায়গায় যাবে। এর মানে যিনি ব্রহ্মজ্ঞান চান, তিনি যদি ভক্তি পথ ধরেও যান, তা হ'লেও সেই জ্ঞান লাভ ক'র্‌বেন। ভক্তবৎসল মনে ক'রলেই ব্রহ্মজ্ঞান দিতে পারেন।

[ভক্তের কি ব্রহ্মজ্ঞান হয়? ভক্ত কিরূপ কর্ম ও কী প্রার্থনা করে]

"ভক্ত ঈশ্বরের সাকার রূপ দেখতে চায় ও তাঁর সঙ্গে আলাপ ক'রতে চায়;—প্রায় ব্রহ্মজ্ঞান চায় না। তবে ঈশ্বর ইচ্ছাময়, তাঁর যদি খুশি হয় তিনি ভক্তকে সকল ঐশ্বর্যের অধিকারী করেন। ভক্তিও দেন, জ্ঞানও দেন। কলকাতায় যদি কেউ একবার এসে পড়তে পারে তা হ'লে গড়ের মাঠ, সুসাইটি, (Asiatic Society's Museum) সবই দেখতে পায়।

"কথাটা এই, এখন কলকাতায় কেমন ক'রে আসি।

"জগতের মাকে পেলে, ভক্তিও পাবে, জ্ঞানও পাবে। জ্ঞানও পাবে, ভক্তিও পাবে। ভাবসমাধিতে রূপদর্শন, নির্বিকল্প সমাধিতে অখণ্ডসচ্চিদানন্দ দর্শন হয়, তখন অহং, নাম, রূপ থাকে না।

"ভক্ত বলে, 'মা, সকাম কর্মে আমার বড় ভয় হয়। সে কর্মে কামনা আছে। সে কর্ম করলেই ফল পেতে হবে। আবার অনাসক্ত হ'য়ে কর্ম করা কঠিন। সকাম কর্ম ক'রতে গেলে, তোমায় ভুলে যাবো। তবে এমন কর্মে কাজ নাই। যতদিন না তোমায় লাভ করতে পারি, ততদিন পর্যন্ত যেন কর্ম কমে যায়। যেটুকু কর্ম থাক্‌বে, সেটুকু কর্ম যেন অনাসক্ত হ'য়ে করতে পারি, আর সঙ্গে সঙ্গে যেন খুব ভক্তি হয়। আর যতদিন না তোমায় লাভ ক'রতে পারি, ততদিন কোন নূতন কর্ম জড়াতে মন না যায়। তবে যখন তুমি আদেশ করবে তখন তোমার কর্ম ক'রবো, নচেৎ নয়।'"

পঞ্চম পরিচ্ছেদ

তীর্থ যাত্রা ও ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ—আচার্যের তিন

পণ্ডিত—মহাশয়ের তীর্থে কতদূর যাওয়া হ'য়েছিল?

শ্রীরামকৃষ্ণ—হাঁ, কতক জায়গা দেখেছি। (সহাস্যে) হাজরা অনেক দূরে গিছল; আর খুব উঁচুতে উঠেছিল। হৃষিকেশ গিছল। (সকলের হাস্য)। আমি অত দূরে যাই নাই, অত উঁচুতেও উঠি নাই।

"চিল শকুনিও অনেক উচ্চে উঠে, কিন্তু নজর ভাগাড়ে। (সকলের হাস্য)। ভাগাড় কি জান? কামিনী ও কাঞ্চন।

"যদি এখানে ব'সে ভক্তি লাভ করতে পার, তা হ'লে তীর্থে যাবার কি দরকার? কাশী গিয়ে দেখলাম, সেই গাছ! সেই তেঁতুলপাতা!

"তীর্থে গিয়ে যদি ভক্তিলাভ না হ'লো, তা'হলে তীর্থে যাওয়ায় আর ফল হ'ল না। ভক্তিই সার, একমাত্র প্রয়োজন। চিল শকুনি কি জান? অনেক লোক আছে, তারা লম্বা লম্বা কথা কয়। আর বলে যে, শাস্ত্রে যে সকল কর্ম ক'রতে বলছে, আমরা অনেক করেছি। এদিকে তাদের মন ভারী বিষয়াসক্ত—টাকাকড়ি, মান, সম্ভ্রম, দেহের সুখ, এই সব নিয়ে ব্যস্ত।"

পণ্ডিত—আজ্ঞে, হাঁ। মহাশয়, তীর্থে যাওয়া যা, আর কৌস্তুভ মণি ফেলে অন্য হীরা-মাণিক খুঁজে বেড়ানও তা।

শ্রীরামকৃষ্ণ—আর তুমি এইটি জেনো, হাজার শিক্ষা দাও—সময় না হ'লে ফল হবে না। ছেলে বিছানায় শোবার সময় মাকে বল্‌লে, 'মা আমার যখন হাগা পাবে, তখন তুমি আমায় উঠিও।' মা বল্‌লে, 'বাবা, হাগাই তোমাকে উঠাবে, এ জন্য তুমি কিছু ভেবো না।' (হাস্য)।

"সেইরূপ ভগবানের জন্য ব্যাকুল হওয়া ঠিক সময় হ'লেই হয়।

[পাত্রাপাত্র দেখে উপদেশ—ঈশ্বর কি দয়াময়?]

"তিন রকম বৈদ্য আছে।

"এক রকম—তারা নাড়ী দেখে ঔষধ ব্যবস্থা করে চলে যায়। রোগীকে কেবল ব'লে যায়, ঔষধ খেয়ো হে। এরা অধম থাকের বৈদ্য।

"সেইরূপ কতকগুলি আচার্য উপদেশ দিয়ে যায়, কিন্তু উপদেশে লোকের ভাল হ'ল কি মন্দ হ'ল তা দেখে না। তার জন্য ভাবে না।

"কতকগুলি বৈদ্য আছে, তারা ঔষধ ব্যবস্থা ক'রে রোগীকে ঔষধ খেতে বলে। রোগী যদি খেতে না চায়, তাকে অনেক বুঝায়। এরা মধ্যম থাকের বৈদ্য। সেইরূপ মধ্যম থাকের আচার্যও আছে। তাঁরা উপদেশ দেন, আবার অনেক ক'রে লোকদের বুঝান যাতে উপদেশ অনুসারে চলে। আবার উত্তম থাকের বৈদ্য আছে। মিষ্টি কথাতে রোগী যদি না বুঝে, তারা জোর পর্যন্ত করে। দরকার হয়, রোগীর বুকে হাঁটু দিয়ে রোগীকে ঔষধ গিলিয়ে দেয়।

সেইরূপ উত্তম থাকের আচার্য আছে। তাঁরা ঈশ্বরের পথে আনবার জন্য শিষ্যদের উপর জোর পর্যন্ত করেন।”

পণ্ডিত—মহাশয়, যদি উত্তম থাকের আচার্য থাকেন, তবে কেন আপনি সময় না হ'লে জ্ঞান হয় না, এ কথা বললেন?

শ্রীরামকৃষ্ণ—সত্য বটে। কিন্তু মনে কর, ঔষধ যদি পেটে না যায়—যদি মুখ থেকে গড়িয়ে যায়, তা হ'লে বৈদ্য কি ক'রবে? উত্তম বৈদ্যও কিছু করতে পারে না।

“পাত্র দেখে উপদেশ দিতে হয়। তোমরা পাত্র দেখে উপদেশ দাও না। আমার কাছে কেহ ছোক্‌রা এলে আমি জিজ্ঞাসা করি, 'তোর কে আছে?' মনে কর, বাপ নাই; হয়তো বাপের ঋণ আছে, সে কেমন ক'রে ঈশ্বরে মন দিবেক? শুনছো বাপু?”

পণ্ডিত—আজ্ঞা হাঁ, আমি সব শুনছি।

শ্রীরামকৃষ্ণ—একদিন ঠাকুরবাড়িতে কতকগুলি শিখ শিপাহি এসেছিল। মা কালীর মন্দিরের সম্মুখে তাদের সঙ্গে দেখা হ'ল। একজন বল্‌লে, 'ঈশ্বর দয়াময়।' আমি বললাম, 'বটে? সত্য না কি? কেমন ক'রে জান্‌লে?' তারা বললে, 'কেন মহারাজ, ঈশ্বর আমাদের খাওয়াচ্ছেন,—এত যত্ন ক'রছেন!' আমি বল্‌লাম, 'সে কি আশ্চর্য? ঈশ্বর যে সকলের বাপ! বাপ ছেলেকে দেখবে না তো কে দেখবে? ও-পাড়ার লোক এসে দেখবে নাকি?”

নরেন্দ্র—তবে ঈশ্বরকে দয়াময় ব'লবো না?

শ্রীরামকৃষ্ণ—তাঁকে কি দয়াময় বল্‌তে বারণ করছি? আমার বলবার মানে এই যে ঈশ্বর আমাদের আপনার লোক, পর নন।

পণ্ডিত—কথা অমূল্য!

শ্রীরামকৃষ্ণ—তোর গান শুনছিলুম—কিন্তু ভাল লাগ্‌লো না। তাই উঠে গেলুম। বললুম, উমেদারী অবস্থা—গান আলুনি বোধ হ'লো।

নরেন্দ্র লজ্জিত হইলেন, মুখ ঈষৎ আরক্তিম হইল। তিনি চুপ করিয়া রহিলেন।

ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ

বিদায়

ঠাকুর জল খাইতে চাহিলেন। তাঁহার কাছে এক গ্লাস জল রাখা হইয়াছিল, সে জল খাইতে পারিলেন না, আর এক গ্লাস জল আনিতে বলিলেন। পরে শুনা গেল কোনও ঘোর ইন্দ্রিয়াসক্ত ব্যক্তি ঐ জল স্পর্শ করিয়াছিল।

পণ্ডিত (হাজরার প্রতি)—আপনারা ইঁহার সঙ্গে রাত-দিন থাকেন—আপনারা মহানন্দে আছেন।

শ্রীরামকৃষ্ণ (হাসিতে হাসিতে)—আজ আমার খুব দিন। আমি দ্বিতীয়ার চাঁদ দেখলাম। (সকলের হাস্য)। দ্বিতীয়ার চাঁদ কেন বললুম জান? সীতা রাবণকে বলেছিলেন, রাবণ পূর্ণচন্দ্র, আর রামচন্দ্র আমার দ্বিতীয়ার চাঁদ। রাবণ মানে বুঝতে পারে নাই, তাই ভারী খুশী। সীতার বলবার উদ্দেশ্য এই যে, রাবণের সম্পদ যতদূর হবার হ'য়েছে, এইবার দিন দিন পূর্ণচন্দ্রের ন্যায় হ্রাস পাবে। রামচন্দ্র দ্বিতীয়ার চাঁদ, তাঁর দিন দিন বৃদ্ধি হবে!

ঠাকুর গাত্রোত্থান করিলেন। বন্ধুবান্ধব সঙ্গে পণ্ডিত ভক্তিভাবে প্রণাম করিলেন। ঠাকুর ভক্তসঙ্গে বিদায় গ্রহণ করিলেন।

সপ্তম পরিচ্ছেদ

ঈশানের বাটীতে পুনরাগমন

ঠাকুর ভক্তসঙ্গে ঈশানের বাটীতে ফিরিলেন। সন্ধ্যা হয় নাই। ঈশানের নীচের বৈঠকখানায় আসিয়া বসিলেন। ভক্তেরা কেহ কেহ আছেন। ভাগবতের পণ্ডিত, ঈশান, ঈশানের ছেলেরা উপস্থিত আছেন।

শ্রীরামকৃষ্ণ (সহাস্যে)—শশধরকে বললাম গাছে না উঠতে এক কাঁদি—আরও কিছু সাধন-ভজন কর, তারপর লোক-শিক্ষা দিও।

ঈশান—সকলেই মনে করে যে আমি লোকশিক্ষা দিই। জোনাকি পোকা মনে করে আমি জগৎকে আলোকিত করছি। তা একজন বলেছিল, হে জোনাকি পোকা, তুমি আবার আলো কি দেবে!—ওহে তুমি অন্ধকার আরও প্রকাশ করছো।'

শ্রীরামকৃষ্ণ (ঈষৎ হাস্য করিয়া)—কিন্তু শুধু পণ্ডিত নয়,—একটু বিবেক বৈরাগ্য আছে।

ভাটপাড়ার ভাগবতের পণ্ডিতটিও এখনও বসিয়া আছেন। বয়স ৭০।৭৫ হইবে। তিনি ঠাকুরকে একদৃষ্টে দেখিতেছিলেন।

ভাগবত পণ্ডিত (শ্রীরামকৃষ্ণের প্রতি)—আপনি মহাত্মা।

শ্রীরামকৃষ্ণ—সে নারদ, প্রহ্লাদ, শুকদেব এদের বল্‌তে পারেন; আমি আপনার সন্তানের ন্যায়।

"তবে এক হিসাবে বলতে পারেন। এমনি আছে যে ভগবানের চেয়ে ভক্ত বড়—কেননা ভক্ত ভগবানকে হৃদয়ে বয়ে নিয়ে বেড়ায় (সকলের আনন্দ)। ভক্ত 'মোরে দেখে হীন, আপনাকে দেখে বড়।' যশোদা কৃষ্ণকে বাঁধতে গিছলেন। যশোদার বিশ্বাস, আমি কৃষ্ণকে না দেখ্‌লে তাকে কে দেখবে! কখনও ভগবান চুম্বুক, ভক্ত ছুঁচ—ভগবান আকর্ষণ ক'রে ভক্তকে টেনে লন। আবার কখনও ভক্ত চুম্বুক পাথর হন, ভগবান ছুঁচ হন। ভক্তের এত আকর্ষণ যে তার প্রেমে মুগ্ধ হ'য়ে ভগবান তার কাছে গিয়ে পড়েন।"

ঠাকুর দক্ষিণেশ্বরে প্রত্যাবর্তন করিবেন। নীচের বৈঠকখানার দক্ষিণ দিকের বারান্দায় আসিয়া দাঁড়াইয়াছেন। ঈশান প্রভৃতি ভক্তেরাও দাঁড়াইয়া আছেন। ঈশানকে কথাচ্ছলে অনেক উপদেশ দিতেছেন।

শ্রীরামকৃষ্ণ (ঈশানের প্রতি)—সংসারে থেকে যে তাঁকে ডাকে সে বীর ভক্ত। ভগবান বলেন, যে সংসার ছেড়ে দিয়েছে সে ত আমায় ডাকবেই, আমার সেবা ক'রবেই—তার আর বাহাদুরী কি? সে যদি আমায় না ডাকে সকলে ছি ছি করবে। আর যে সংসারে থেকে আমায় ডাকে—বিশ মণ পাথর ঠেলে যে আমায় দেখে সেই-ই বাহাদুর, সেই-ই বীরপুরুষ।

ভাগবত-পণ্ডিত—শাস্ত্রে ত ঐ কথাই আছে। ধর্মব্যাধের কথা আর পতিব্রতার কথা। তপস্বী মনে করেছিল যে আমি কাক আর বককে ভস্ম ক'রেছি, অতএব আমি খুব উঁচু হয়েছি। সে পতিব্রতার বাড়ি গিছ্‌লো। তার স্বামীর উপর এত ভক্তি যে দিন-রাত স্বামীর সেবা ক'রত। স্বামী বাড়িতে এলে পা ধোবার জল দিত; এমন কি মাথার চুল দিয়ে তার পা পুঁছে দিত। তপস্বী অতিথি, ভিক্ষা পাওয়ার দেরী হচ্ছিল তাই চেঁচিয়ে বলেছিল যে, তোমাদের ভাল হবে না। পতিব্রতা অমনি দূর থেকে ব'ললে, এ তো কাকী-বকী ভস্ম করা নয়। একটু দাঁড়াও ঠাকুর, আমি স্বামীর সেবা ক'রে তোমার পূজা ক'রছি।

"ধর্মব্যাধের কাছে ব্রহ্মজ্ঞানের জন্য গিছিলো। ব্যাধ পশুর মাংস বিক্রী করতো কিন্তু রাত-দিন ঈশ্বর জ্ঞানে বাপ-মার সেবা করতো। যে ব্রহ্মজ্ঞানের জন্য তার কাছে গিছিলো সে দেখে অবাক্—ভাবতে লাগলো এ ব্যাধ মাংস বিক্রী করে, আর সংসারী লোক! এ আবার আমায় কি ব্রহ্মজ্ঞান দিবে। কিন্তু সেই ব্যাধ পূর্ণজ্ঞানী।"

ঠাকুর এইবার গাড়িতে উঠিবেন। পাশের বাড়ির (ঈশানের শ্বশুরবাড়ির) দরজায় দাঁড়াইয়াছেন। ঈশান ও ভক্তেরা কাছে দাঁড়াইয়া আছেন—তাঁহাকে গাড়িতে তুলিয়া দিবেন। ঠাকুর আবার কথাচ্ছলে ঈশানকে উপদেশ দিতেছেন—পিঁপড়ের মত সংসারে থাক, এই সংসারে নিত্য অনিত্য মিশিয়ে রয়েছে। বালিতে চিনিতে মিশান—পিঁপড়ে হ'য়ে চিনিটুকু নেবে।

"জলে দুধে একসঙ্গে রয়েছে। চিদানন্দরস আর বিষয় রস। হংসের মত দুধটুকু নিয়ে জলটি ত্যাগ ক'রবে।

"আর পানকৌটির মত। গায়ে জল লাগছে, ঝেড়ে ফেলবে। আর পাঁকাল মাছের মত। পাঁকে থাকে কিন্তু গা দেখ পরিষ্কার উজ্জ্বল।

"গোলমালে মাল আছে—'গোল ছেড়ে মালটি নেবে।"

ঠাকুর গাড়িতে উঠিয়া দক্ষিণেশ্বরে যাত্রা করিতেছেন।

দ্বাদশ খণ্ড

সিঁথির ব্রাহ্মসমাজ পুনর্বার দর্শন ও বিজয়কৃষ্ণ প্রভৃতি ব্রাহ্ম ভক্তদিগকে উপদেশ ও তাঁহাদের সহিত আনন্দ

প্রথম পরিচ্ছেদ

শ্রীরামকৃষ্ণ সমাধি মন্দিরে

আবার ব্রাহ্ম ভক্তেরা সিঁথির ব্রাহ্মসমাজে মিলিত হইলেন। 'কালীপূজার পর দিন, কার্তিক মাসের শুক্লা প্রতিপদ তিথি, ১৯শে অক্টোবর ১৮৮৪। এবার শরতের মহোৎসব। শ্রীযুক্ত বেণীমাধব পালের মনোহর উদ্যানবাটীতে আবার ব্রাহ্মসমাজের অধিবেশন হইল। প্রাতঃকালের উপাসনাদি হইয়া গিয়াছে। শ্রীশ্রীপরমহংসদেব বেলা সাড়ে চারিটার সময় আসিয়া পৌঁছিলেন। তাঁহার গাড়ী আসিয়া বাগানের মধ্যে দাঁড়াইল। অমনি দলে দলে ভক্ত আসিয়া মণ্ডলাকারে তাঁহাকে ঘেরিতে লাগিলেন। প্রথম প্রকোষ্ঠ মধ্যে সমাজের বেদী রচনা হইয়াছে। সম্মুখে দালান। সেই দালানে ঠাকুর উপবেশন করিলেন। অমনি ভক্তগণ চারিধারে তাঁহাকে বেষ্টন করিয়া বসিলেন। বিজয়, ত্রৈলোক্য ও অনেকগুলি ব্রাহ্ম ভক্ত উপস্থিত। তন্মধ্যে ব্রাহ্মসমাজভুক্ত একজন সদর-ওয়ালাও (সাব-জজ) আছেন।

সমাজগৃহ মহোৎসব উপলক্ষে বিচিত্র শোভা ধারণ করিয়াছে। কোথাও নানা বর্ণের পতাকা; মধ্যে মধ্যে হর্ম্যোপরি বা বাতায়নপথে নয়নরঞ্জন, সুন্দর পাদক-বিভ্রমকারী বৃক্ষপল্লব। সম্মুখে পূর্বপরিচিত সেই সরোবরের স্বচ্ছ-সলিল মধ্যে শরতের সুনীল নভোমণ্ডল প্রতিভাসিত হইতেছে। উদ্যানস্থিত রাঙ্গা রাঙ্গা পথগুলির দুই পার্শ্বে সেই পূর্বপরিচিত ফল পুষ্পের বৃক্ষশ্রেণী। আজ ঠাকুরের শ্রীমুখ-নিঃসৃত সেই বেদধ্বনি ভক্তেরা আবার শুনিতে পাইবেন—যে ধ্বনি আর্যঋষিদের মুখ হইতে বেদাকারে এককালে বহির্গত হইয়াছিল—যে ধ্বনি আর একবার নররূপধারী পরমসন্ন্যাসী, ব্রহ্মগতপ্রাণ, জীবের দুঃখে কাতর, ভক্তবৎসল, ভক্তাবতার হরিপ্রেমবিহ্বল, ঈশার মুখ হইতে তাঁহার দ্বাদশ শিষ্য সেই নিরক্ষর মৎসজীবিগণ শুনিয়াছিলেন, যে ধ্বনি পুণ্যক্ষেত্রে কুরুক্ষেত্রে ভগবান শ্রীকৃষ্ণের মুখ হইতে শ্রীমদ্ভগবত্‌গীতাকারে এককালে বহির্গত হইয়াছিল—সারথিবেশধারী মানবাকার সচ্চিদানন্দগুরু প্রমুখাৎ যে মেঘগম্ভীর-ধ্বনিমধ্যে বিনয়নম্র ব্যাকুল 'গুড়াকেশ কৌন্তেয়' এই কথামৃত পান করিয়াছিলেন যথা—

> কবিং পুরাণমনুশাসিতারমণোরণীয়াংসমনুস্মরেদ্ যঃ।
> সর্বস্ব ধাতারমচিন্ত্যরূপম্, আদিত্যবর্ণং তমসঃ পরস্তাৎ॥

প্রয়াণ-কালে মনসাঽচলেন, ভক্ত্যা যুক্তো যোগবলেন চৈব।
ভ্রুবোর্মধ্যে প্রাণমাবেশ্য সম্যক, স তৎ পরং পুরুষমুপৈতি দিব্যম্॥
যদক্ষরং বেদবিদো বদন্তি, বিশন্তি যদ যতয়ো বীতরাগাঃ।
যদিচ্ছন্তো ব্রহ্মচর্যং চরন্তি তৎ তে পদং সংগ্রহেণ প্রবক্ষ্যে॥

ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ আসন গ্রহণ করিয়া সমাজের সুন্দররচিত বেদীর প্রতি দৃষ্টিপাত করিয়াই অমনি নতশির হইয়া প্রণাম করিলেন। বেদী হইতে শ্রীভগবানের কথা হয়—তাই তিনি দেখিতেছেন যে, বেদীক্ষেত্র পুণ্যক্ষেত্র। দেখিতেছেন এখানে অচ্যুতের কথা হয়, তাই সর্বতীর্থের সমাগম হইয়াছে। আদালতগৃহ দেখিলে যেমন মোকদ্দমা মনে পড়ে ও জজ মনে পড়ে, সেইরূপ এই হরিকথার স্থান দেখিয়া তাঁহার ভগবানের উদ্দীপন হইয়াছে।

শ্রীযুক্ত ত্রৈলোক্য গান গাহিতেছেন। শ্রীরামকৃষ্ণ কহিলেন, হ্যাঁগা, ঐ গানটি তোমার বেশ 'দে মা পাগল করে', ঐটি গাও না।

তিনি গাহিতেছেন,—

আমায় দে মা পাগল ক'রে (ব্রহ্মময়ী)।
আর কাজ নাই জ্ঞান বিচারে॥
তোমার প্রেমের সুরা, পানে কর মাতোয়ারা,
ও মা ভক্ত চিত্তহরা ডুবাও প্রেমসাগরে॥
তোমার এ পাগলা গারদে, কেহ হাসে কেহ কাঁদে,
কেহ নাচে আনন্দ ভরে।
ঈশা মুসা শ্রীচৈতন্য, ওমা প্রেমের ভরে অচৈতন্য,
হায় কবে হব মা ধন্য, (ওমা) মিশে তার ভিতরে॥
স্বর্গেতে পাগলের মেলা, যেমন গুরু তেমনি চেলা,
প্রেমের খেলা কে বুঝতে পারে।
তুই প্রেমে উন্মাদিনী, ওমা পাগলের শিরোমণি,
প্রেমধনে কর মা ধনী, কাঙ্গাল প্রেমদাসেরে॥

গান শুনিতে শুনিতে শ্রীরামকৃষ্ণের ভাবান্তর হইল। একেবারে সমাধিস্থ—'উপেক্ষিয়া মহত্তত্ত্ব, ত্যজি চতুর্বিংশ তত্ত্ব, সর্বতত্ত্বাতীত তত্ত্ব দেখি আপনি আপনে।' কর্মেন্দ্রিয়, জ্ঞানেন্দ্রিয়, মন, বুদ্ধি, অহঙ্কার সমস্তই যেন পুঁছিয়া গিয়াছে। দেহমাত্র চিত্রপুত্তলিকার ন্যায় বিদ্যমান। একদিন ভগবান পাণ্ডবনাথের এইরূপ অবস্থা দেখিয়া যুধিষ্ঠির প্রমুখ শ্রীকৃষ্ণগতান্তরাত্মা পাণ্ডবগণ কাঁদিয়াছিলেন। তখন আর্যকুলগৌরব ভীষ্মদেব শরশয্যায় শায়িত থাকিয়া অন্তিমকালে ভগবানের ধ্যাননিরত ছিলেন। তখন কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধ সবে সমাপ্ত হইয়াছে। সহজেই কাঁদিবার দিন! শ্রীকৃষ্ণের এই সমাধিপ্রাপ্ত অবস্থা বুঝিতে না পারিয়া পাণ্ডবেরা কাঁদিয়াছিলেন; ভাবিয়াছিলেন, তিনি বুঝি দেহত্যাগ করিলেন।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

হরিকথা প্রসঙ্গে—ব্রাহ্মসমাজে নিরাকারবাদ

কিয়ৎক্ষণ বিলম্বে ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ কিঞ্চিৎ প্রকৃতিস্থ হইয়া ভাবাবস্থায় ব্রাহ্ম-ভক্তদের উপদেশ দিতেছেন। এই ঈশ্বরীয় ভাব খুব ঘনীভূত; যেন বক্তা মাতাল হইয়া কি বলিতেছেন। ভাব ক্রমে ক্রমে কমিয়া আসিতেছে, অবশেষে পূর্বের ঠিক সহজাবস্থা।

['আমি সিদ্ধি খাব'—গীতা ও অষ্টসিদ্ধি—ঈশ্বর লাভ কি?]

শ্রীরামকৃষ্ণ (ভাবস্থ)—মা, কারণানন্দ চাই না। সিদ্ধি খাব।

"সিদ্ধি কিনা বস্তু লাভ। অষ্টসিদ্ধি'র সিদ্ধি নয়। সে (অণিমা লঘিমাদি) সিদ্ধির কথা কৃষ্ণ অর্জুনকে ব'লেছিলেন, 'ভাই, যদি দেখ যে, অষ্টসিদ্ধির একটি সিদ্ধি কারও আছে, তাহলে জেনো যে, সে ব্যক্তি আমাকে পাবে না। কেননা, সিদ্ধি থাকলেই অহঙ্কার থাকবে, আর অহঙ্কারের লেশ থাকলে ভগবানকে পাওয়া যায় না।

"আর এক আছে প্রবর্তক, সাধক, সিদ্ধ, সিদ্ধের সিদ্ধ। যে ব্যক্তি সবে ঈশ্বরের আরাধনায় প্রবৃত্ত হয়েছে, সে প্রবর্তকের থাক্। প্রবর্তক ফোঁটা কাটে, তিলক মালা পরে, বাহিরে খুব আচার করে। সাধক আরো এগিয়ে গেছে; তার লোক-দেখান ভাব কমে যায়। সাধক ঈশ্বরকে পাবার জন্য ব্যাকুল হয়, আন্তরিক তাঁকে ডাকে, তাঁর নাম করে, তাঁকে সরল অন্তঃকরণে প্রার্থনা করে। সিদ্ধ কে? যার নিশ্চয়াত্মিকা বুদ্ধি হয়েছে যে ঈশ্বর আছেন, আর তিনিই সব ক'রছেন; যিনি ঈশ্বরকে দর্শন ক'রছেন। 'সিদ্ধের সিদ্ধ' কে? যিনি তাঁর সঙ্গে আলাপ ক'রেছেন। শুধু দর্শন নয়; কেউ পিতৃভাবে, কেউ বাৎসল্য-ভাবে, কেউ সখ্যভাবে, কেউ মধুর ভাবে; তাঁর সঙ্গে আলাপ ক'রেছেন।

"কাঠে আগুন নিশ্চিত আছে, এই বিশ্বাস; আর কাঠ থেকে আগুন বার ক'রে ভাত রেঁধে, খেয়ে শান্তি আর তৃপ্তি লাভ করা; দুটি ভিন্ন জিনিস।

"ঈশ্বরীয় অবস্থার ইতি করা যায় না। তারে বাড়া তারে বাড়া আছে।

[বিষয়ীর ঈশ্বর—ব্যাকুলতা ও ঈশ্বরলাভ—দৃঢ় হও]

(ভাবস্থ)—"এরা ব্রহ্মজ্ঞানী, নিরাকারবাদী। তা বেশ।

(ব্রাহ্ম ভক্তদের প্রতি)—"একটাতে দৃঢ় হও, হয় সাকারে নয় নিরাকারে। তবে ঈশ্বরলাভ হয়, নচেৎ হয় না। দৃঢ় হ'লে সাকারবাদীও ঈশ্বরলাভ ক'রবে, নিরাকারবাদীও ক'রবে। মিছরীর রুটি সিধে ক'রে খাও, আর আড় ক'রে খাও, মিষ্টি লাগবে। (সকলের হাস্য)।

"কিন্তু দৃঢ় হ'তে হবে; ব্যাকুল হ'য়ে তাঁকে ডাক্‌তে হবে। বিষয়ীর ঈশ্বর কিরূপ জান? যেমন খুড়ী-জেঠীর কোঁদল শুনে ছেলেরা খেলা কর্‌বার

সময় পরস্পর বলে, 'আমার ঈশ্বরের দিব্য।' আর যেমন কোন ফিট্ বাবু, পান চিবুতে চিবুতে হাতে স্টিক ধরে বাগানে বেড়াতে বেড়াতে একটি ফুল তুলে বন্ধুকে বলে,—ঈশ্বর কি বিউটিফুল ফুল করেছেন। কিন্তু এ বিষয়ীর ভাব ক্ষণিক, যেন তপ্ত লোহার উপর জলের ছিটে।

"একটার উপর দৃঢ় হ'তে হবে। ডুব দাও। না দিলে সমুদ্রের ভিতর রত্ন পাওয়া যায় না। জলের উপর কেবল ভাস্‌লে পাওয়া যায় না।"

এই বলিয়া ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ, যে গানে কেশবাদি ভক্তদের মন মুগ্ধ করিতেন, সেই গান—সেই মধুর কণ্ঠে—গাইতেছেন; সকলের বোধ হইতেছে, যেন স্বর্গধামে বা বৈকুণ্ঠে বসিয়া আছেন—

ডুব্ ডুব্ ডুব্ রূপসাগরে আমার মন।
তলাতল পাতাল খুঁজলে পাবি রে প্রেম রত্নধন॥
খুঁজ খুঁজ খুঁজ খুঁজলে পাবি হৃদয় মাঝে বৃন্দাবন।
দীপ দীপ দীপ জ্ঞানের বাতি, জ্বলবে হৃদে অনুক্ষণ॥
ড্যাং ড্যাং ড্যাং ড্যাঙ্গায় ডিঙ্গে চালায় আবার সে কোন জন।
কুবীর বলে শোন্ শোন্ শোন্ ভাব গুরুর শ্রীচরণ॥

তৃতীয় পরিচ্ছেদ

ব্রাহ্ম ভক্তগণে—ব্রাহ্মসমাজ ও ঈশ্বরের ঐশ্বর্য বর্ণনা

শ্রীরামকৃষ্ণ—ডুব দাও। ঈশ্বরকে ভালবাসতে শেখ। তাঁর প্রেমে মগ্ন হও। দেখ, তোমাদের উপাসনা শুনেছি। কিন্তু তোমাদের ব্রাহ্মসমাজে ঈশ্বরের ঐশ্বর্য অত বর্ণনা কর কেন? 'হে ঈশ্বর, তুমি আকাশ করিয়াছ; বড় বড় সমুদ্র করিয়াছ, চন্দ্রলোক, সূর্যলোক, নক্ষত্রলোক, সব করিয়াছ,' এ সব কথায় আমাদের অত কাজ কি?

"সব লোক বাবুর বাগান দেখেই অবাক্—কেমন গাছ, কেমন ফুল, কেমন ঝিল, কেমন বৈঠকখানা, কেমন তার ভিতর ছবি, এই সব দেখেই অবাক। কিন্তু কই, বাগানের মালিক যে বাবু তাঁকে খোঁজে ক'জন? বাবুকে খোঁজে দুই-একজনা। ঈশ্বরকে ব্যাকুল হ'য়ে খুঁজলে তাঁকে দর্শন হয়, তাঁর সঙ্গে আলাপ হয়, কথা হয়; যেমন, আমি তোমাদের সঙ্গে কথা কচ্ছি। সত্য বলছি দর্শন হয়!

"এ কথা কারেই বা ব'লছি—কে বা বিশ্বাস করে।

[শাস্ত্র না প্রত্যক্ষ—*The Law of Revelation*]

"শাস্ত্রের ভিতর কি ঈশ্বরকে পাওয়া যায়? শাস্ত্র প'ড়ে হন্দ অস্তিমাত্র বোধ হয়। কিন্তু নিজে ডুব না দিলে ঈশ্বর দেখা দেন না। ডুব দেবার পর

তিনি নিজে জানিয়ে দিলে তবে সন্দেহ দূর হয়। বই হাজার পড়, মুখে হাজার শ্লোক বল, ব্যাকুল হ'য়ে তাঁতে ডুব না দিলে তাঁকে ধরতে পারবে না। শুধু পাণ্ডিত্যে মানুষকে ভোলাতে পারবে, কিন্তু তাঁকে পারবে না।

"শাস্ত্র, বই শুধু এ সব তাতে কি হবে? তাঁর কৃপা না হ'লে কিছু হবে না; যাতে তাঁর কৃপা হয়, ব্যাকুল হ'য়ে তার চেষ্টা করো; কৃপা হ'লে তাঁর দর্শন হবে। তিনি তোমাদের সঙ্গে কথা কইবেন।"

[ব্রাহ্মসমাজ ও সাম্য—ঈশ্বরের বৈষম্য দোষ]

সদরওয়ালা—মহাশয়, তাঁর কৃপা কি একজনের উপর বেশী আর একজনের উপর কম? তা হ'লে যে ঈশ্বরের বৈষম্য দোষ হয়।

শ্রীরামকৃষ্ণ—সে কি! ঘোড়াটাও টা আর সরাটাও টা! তুমি যা বল্‌ছো ঈশ্বর বিদ্যাসাগর ঐ কথা বলেছিল। ব'লেছিল, মহাশয়, তিনি কি কারুকে বেশী শক্তি দিয়েছেন, কারুকে কম দিয়েছেন? আমি বললাম, বিভুরূপে তিনি সকলের ভিতর আছেন—আমার ভিতরে যেমনি পিঁপড়েটির ভিতরেও তেমনি। কিন্তু শক্তিবিশেষ আছে। যদি সকলেই সমান হবে, তবে ঈশ্বর বিদ্যাসাগর নাম শুনে তোমায় আমরা কেন দেখ্‌তে এসেছি। তোমার কি দুটো শিং বেরিয়েছে, তাই দেখ্‌তে এসেছি, তা নয়; তুমি দয়ালু, তুমি পণ্ডিত; এই সব গুণ তোমার অপরের চেয়ে বেশী আছে, তাই তোমার এত নাম। দেখ না এমন লোক আছে যে, একলা একশো লোককে হারাতে পারে; আবার এমন আছে, একজনের ভয়ে পালায়।

"যদি শক্তিবিশেষ না হয় লোকে কেশবকে এত মান্‌তো কেন?

"গীতায় আছে, যাকে অনেকে গণে-মানে—তা বিদ্যার জন্যই হউক, বা গান-বাজনার জন্যই হউক, বা লেক্‌চার দেবার জন্যই হউক, বা আর কিছুর জন্যই হউক—নিশ্চিত জেনো যে, তাতে ঈশ্বরের বিশেষ শক্তি আছে।"

ব্রাহ্ম ভক্ত (সদরওয়ালার প্রতি)—যা বল্‌ছেন মেনে নেন না!

শ্রীরামকৃষ্ণ (ব্রাহ্ম ভক্তের প্রতি)—তুমি কি রকম লোক। কথায় বিশ্বাস না ক'রে শুধু মেনে লওয়া! কপটতা! তুমি ঢং কাচ দেখছি!

ব্রাহ্ম ভক্তটি অতিশয় লজ্জিত হইলেন।

চতুর্থ পরিচ্ছেদ

ব্রাহ্মসমাজ—কেশব ও নির্লিপ্ত সংসার—সংসার ত্যাগ

[পূর্বকথা—কেশবকে শিক্ষা—নির্জনে সাধন—জ্ঞানের লক্ষণ]

সদরওয়ালা—মহাশয়, সংসার কি ত্যাগ ক'রতে হবে?

শ্রীরামকৃষ্ণ—না, তোমাদের ত্যাগ কেন কর্‌তে হবে? সংসারে থেকেই হ'তে

পারে। তবে আগে দিন কতক নির্জনে থাকতে হয়। নির্জনে থেকে ঈশ্বরের সাধনা ক'রতে হয়। বাড়ির কাছে এমন একটি আড্ডা ক'রতে হয়, যেখান থেকে বাড়িতে এসে অমনি একবার ভাত খেয়ে যেতে পার। কেশব সেন, প্রতাপ, এরা সব ব'লেছিল, মহাশয়, আমাদের জনক রাজার মত। আমি বললুম, জনক রাজা অমনি মুখে বললেই হওয়া যায় না। জনক রাজা হে'টমুণ্ড হ'য়ে আগে নির্জনে কত তপস্যা ক'রেছিল! তোমরা কিছু কর, তবে তো 'জনক রাজা' হবে। অমুক খুব তর তর ক'রে ইংরাজী লিখ্‌তে পারে, তা কি একেবারে লিখ্‌তে পেরেছিল? সে গরীবের ছেলে, আগে একজনের বাড়িতে থেকে তাদের রেঁধে দিতো, আর দুটি দুটি খেতো, অনেক কষ্টে লেখাপড়া শিখেছিলো, তাই এখন তর তর করে লিখতে পারে।

"কেশব সেনকে আরও বলেছিলুম, নির্জনে না গেলে, শক্ত রোগ সারবে কেমন ক'রে? রোগটি হচ্ছে বিকার। আবার যে ঘরে বিকারী রোগী, সেই ঘরেই আচার, তে'তুল আর জলের জালা! তা রোগ সারবে কেমন ক'রে? আচার, তে'তুল—এই দেখো, বল্‌তে বল্‌তে আমার মুখে জল এসেছে। (সকলের হাস্য)। সম্মুখে থাকলে কি হয়, সকলেই তো জানো! মেয়ে মানুষ পুরুষের পক্ষে এই আচার তে'তুল। ভোগবাসনা—জলের জালা; বিষয়-তৃষ্ণার শেষ নাই, আর এই বিষয় রোগীর ঘরে! এতে কি বিকার রোগ সারে? দিন কতক ঠাঁইনাড়া হ'য়ে থাকতে হয়, যেখানে আচার-তে'তুল নাই, জলের জালা নাই। তারপর নীরোগ হ'য়ে আবার সেই ঘরে এলে আর ভয় নাই। তাঁকে লাভ ক'রে সংসারে এসে থাক্‌লে, আর কামিনীকাঞ্চনে কিছু ক'রতে পারে না। তখন জনকের মত নির্লিপ্ত হ'তে পার্‌বে। কিন্তু প্রথমাবস্থায় সাবধান হওয়া চাই। খুব নির্জনে থেকে সাধন করা চাই। অশ্বত্থ গাছ যখন চারা থাকে, তখন চারিদিকে বেড়া দেয়, পাছে ছাগলে-গরুতে নষ্ট করে। কিন্তু গুঁড়ি মোটা হ'লে আর বেড়ার দরকার থাকে না। হাতী বেঁধে দিলেও গাছের কিছু ক'রতে পারে না। যদি নির্জনে সাধন ক'রে ঈশ্বরের পাদপদ্মে ভক্তিলাভ করে বল বাড়িয়ে, বাড়ি গিয়ে সংসার কর, তাহ'লে কামিনী-কাঞ্চন তোমার কিছু ক'রতে পারবে না।

"নির্জনে দই পেতে মাখন তুলতে হয়। জ্ঞানভক্তিরূপ মাখন যদি একবার মনরূপ দুধ থেকে তোলা হয়, তাহ'লে সংসাররূপ জলের উপর রাখ্‌লে নির্লিপ্ত হ'য়ে ভাসবে। কিন্তু মনকে কাঁচা অবস্থায়—দুধের অবস্থায়, যদি সংসার রূপ জলের উপর রাখ, তাহ'লে দুধে-জলে মিশে যাবে। তখন আর মন নির্লিপ্ত হ'য়ে ভাসতে পার্‌বে না।

"ঈশ্বর লাভের জন্য সংসারে থেকে, এক হাতে ঈশ্বরের পাদপদ্ম ধ'রে থাকবে আর এক হাতে কাজ ক'রবে। যখন কাজ থেকে অবসর হবে, তখন

দুই হাতেই ঈশ্বরের পাদপদ্ম ধ'রে থাকবে, তখন নির্জনে বাস ক'রবে, কেবল তাঁর চিন্তা আর সেবা ক'রবে।"

সদরওয়ালা (আনন্দিত হইয়া)—মহাশয়, এ অতি সুন্দর কথা! নির্জনে সাধন চাই বই কি! কিন্তু ঐটি আমরা ভুলে যাই। মনে করি একেবারে জনক রাজা হ'য়ে পড়েছি! (শ্রীরামকৃষ্ণ ও সকলের হাস্য)। সংসার ত্যাগের যে প্রয়োজন নাই, বাড়িতে থেকেও ঈশ্বরকে পাওয়া যায়, এ কথা শুনেও আমার শান্তি ও আনন্দ হ'লো।

শ্রীরামকৃষ্ণ—ত্যাগ তোমাদের কেন ক'রতে হবে? যে কালে যুদ্ধ করতেই হবে, কেল্লা থেকেই যুদ্ধ ভাল। ইন্দ্রিয়ের সঙ্গে যুদ্ধ, খিদে-তৃষ্ণা এ সবের সঙ্গে যুদ্ধ ক'রতে হবে। এ যুদ্ধ সংসার থেকেই ভাল। আবার কলিতে অন্নগত প্রাণ, হয়তো খেতেই পেলে না। তখন ঈশ্বর-টীশ্বর সব ঘুরে যাবে। একজন তার মাগ্‌কে বলেছিল, 'আমি সংসার ত্যাগ করে চললুম।' মাগ্‌টি একটু জ্ঞানী ছিল। সে বল্‌লে 'কেন তুমি ঘুরে ঘুরে বেড়াবে? যদি পেটের ভাতের জন্য দশ ঘরে যেতে না হয় তবে যাও। তা যদি হয়, তাহ'লে এই এক ঘরই ভাল।'

"তোমরা ত্যাগ কেন ক'রবে? বাড়িতে বরং সুবিধা। আহারের জন্য ভাবতে হবে না। সহবাস স্বদারার সঙ্গে, তাতে দোষ নাই। শরীরের যখন যেটি দরকার কাছেই পাবে। রোগ হ'লে সেবা করবার লোক কাছে পাবে।

জনক, ব্যাস, বশিষ্ঠ জ্ঞানলাভ ক'রে সংসারে ছিলেন। এ'রা দুখানা তরবার ঘুরাতেন। একখানা জ্ঞানের, একখানা কর্মের।"

সদরওয়ালা—মহাশয়! জ্ঞান হ'য়েছে তা কেমন ক'রে জান্‌বো?

শ্রীরামকৃষ্ণ—জ্ঞান হ'লে তাঁকে (ঈশ্বরকে) আর দূরে দেখায় না। তিনি আর তিনি বোধ হয় না। তখন ইনি! হৃদয়মধ্যে তাঁকে দেখা যায়। তিনি সকলের ভিতর আছেন, যে খুঁজে সেই পায়।

সদরওয়ালা—মহাশয়! আমি পাপী, কেমন ক'রে বলি যে, তিনি আমার ভিতর আছেন?

[ব্রাহ্মসমাজ, খৃষ্টধর্ম ও পাপবাদ]

শ্রীরামকৃষ্ণ—ঐ তোমাদের পাপ আর পাপ! এ সব বুঝি খৃষ্টানী মত? আমায় একজন একখানি বই (বাইবেল) দিলে। একটু পড়া শুনলাম; তা তাতে কেবল ঐ এক কথা—পাপ আর পাপ! আমি তাঁর নাম করেছি; ঈশ্বর, কি রাম, কি হরি ব'লেছি—আমার আবার পাপ। এমন বিশ্বাস থাকা চাই। নামমাহাত্ম্যে বিশ্বাস থাকা চাই।

সদরওয়ালা—মহাশয়! কেমন করে ঐ বিশ্বাস হয়?

শ্রীরামকৃষ্ণ—তাঁতে অনুরাগ কর। তোমাদেরই গানে আছে, 'প্রভু! বিনে

অনুরাগ ক'রে যজ্ঞ যাগ, তোমারে কি যায় জানা।' যাতে এরূপ অনুরাগ, এরূপ ঈশ্বরে ভালবাসা হয়, জন্য তাঁর কাছে গোপনে ব্যাকুল হ'য়ে প্রার্থনা করো, আর কাঁদো। মাগের ব্যামো হলে, কি টাকা লোকসান হ'লে, কি কর্মের জন্য, লোকে এক ঘটি কাঁদে, ঈশ্বরের জন্য কে কাঁদে বল দেখি?

পঞ্চম পরিচ্ছেদ

আমমোক্তারী দাও—গৃহস্থের কর্তব্য কতদিন?

ত্রৈলোক্য—মহাশয়, এঁদের সময় কই; ইংরেজের কর্ম করতে হয়।

শ্রীরামকৃষ্ণ (সদরওয়ালার প্রতি)—আচ্ছা তাঁকে আমমোক্তারী দাও। ভাল লোকের উপর যদি কেউ ভার দেয়, সে লোক কি তার মন্দ করে? তাঁর উপর আন্তরিক সব ভার দিয়ে তুমি নিশ্চিন্ত হ'য়ে বসে থাক। তিনি যা কাজ ক'রতে দিয়েছেন, তাই ক'রো।

"বিড়ালছানার পাটোয়ারী বুদ্ধি নাই। মা মা করে। মা যদি হেঁসেলে রাখে সেইখানেই পড়ে থাকে। কেবল মিউ মিউ ক'রে ডাকে। মা যখন গৃহস্থের বিছানায় রাখে, তখন সেই ভাব। মা মা করে।"

সদরওয়ালা—আমরা গৃহস্থ, কতদিন এ সব কর্তব্য ক'রতে হবে?

শ্রীরামকৃষ্ণ—তোমাদের কর্তব্য আছে বৈ কি? ছেলেদের মানুষ করা; স্ত্রীকে ভরণপোষণ করতে, তোমার অবর্ত্তমানে স্ত্রীর ভরণপোষণের যোগাড় ক'রে রাখতে হবে। তা যদি না কর, তুমি নির্দয়। শুকদেবাদি দয়া রেখেছিলেন। দয়া যার নাই সে মানুষই নয়।

সদরওয়ালা—সন্তান প্রতিপালন কত দিন?

শ্রীরামকৃষ্ণ—সাবালক হওয়া পর্যন্ত। পাখী বড় হ'লে যখন সে আপনার ভার নিতে পারে, তখন তাকে ধাড়ী ঠোক্‌রায়, কাছে আস্‌তে দেয় না। (সকলের হাস্য)।

সদরওয়ালা—স্ত্রীর প্রতি কি কর্তব্য?

শ্রীরামকৃষ্ণ—তুমি বেঁচে থাক্‌তে থাকতে ধর্মোপদেশ দেবে, ভরণপোষণ করবে। যদি সতী হয়, তোমার অবর্ত্তমানে তার খাবার যোগাড় ক'রে রাখতে হবে।

"তবে জ্ঞানোন্মাদ হ'লে আর কর্তব্য থাকে না। তখন কালকার জন্য তুমি না ভাবলে ঈশ্বর ভাবেন। জ্ঞানোন্মাদ হ'লে তোমার পরিবারদের জন্য তিনি ভাববেন। যখন জমিদার নাবালক ছেলে রেখে ম'রে যায়, তখন 'অছি' সেই নাবালকের ভার লয়। এ সব আইনের ব্যাপার, তুমি তো সব জান।"

সদরওয়ালা—আজ্ঞে হাঁ।

বিজয় গোস্বামী—আহা। আহা। কি কথা। যিনি অনন্যমন হ'য়ে তাঁর

চিন্তা করেন, যিনি তাঁর প্রেমে পাগল, তাঁর ভার ভগবান নিজে বহন করেন। নাবালকের অমনি 'অছি' এসে জোটে। আহা কবে সেই অবস্থা হবে। যাদের হয় তারা কি ভাগ্যবান!

ত্রৈলোক্য—মহাশয়, সংসারে যথার্থ কি জ্ঞান হয়? ঈশ্বরলাভ হয়?

শ্রীরামকৃষ্ণ (হাসিতে হাসিতে)—কেন গো, তুমি তো সা-রে-মা-তে আছো। (সকলের হাস্য)। ঈশ্বরে মন রেখে সংসারে আছো তো। কেন সংসারে হবে না? অবশ্য হবে।

[সংসারে জ্ঞানীর লক্ষণ—ঈশ্বর লাভের লক্ষণ—জীবন্মুক্ত]

ত্রৈলোক্য—সংসারে জ্ঞান লাভ হয়েছে তার লক্ষণ কি?

শ্রীরামকৃষ্ণ—হরিনামে ধারা আর পুলক। তাঁর মধুর নাম শুনেই শরীর রোমাঞ্চ হয়ে চক্ষু দিয়ে ধারা বেয়ে পড়বে।

"যতক্ষণ বিষয়াসক্তি থাকে, কামিনী-কাঞ্চনে ভালবাসা থাকে ততক্ষণ দেহবুদ্ধি যায় না। বিষয়াসক্তি যত কমে ততই আত্মজ্ঞানের দিকে চ'লে যেতে পারা যায়, আর দেহবুদ্ধি কমে। বিষয়াসক্তি একেবারে চলে গেলে আত্মজ্ঞান হয়, তখন আত্মা আলাদা আর দেহ আলাদা বোধ হয়। নারিকেলের জল না শুকুলে দা দিয়ে কেটে শাঁস আলাদা, মালা আলাদা করা কঠিন হয়। জল যদি শুকিয়ে যায়, তা হলে নড় নড় করে, শাঁস আলাদা হয়ে যায়। একে বলে খড়ো নারিকেল।

'ঈশ্বরলাভ হলে লক্ষণ এই যে, সে ব্যক্তি খড়ো নারিকেলের মত হ'য়ে যায়—দেহাত্মবুদ্ধি চ'লে যায়। দেহের সুখ-দুঃখে তার সুখ-দুঃখ বোধ হয় না, সে ব্যক্তি দেহের সুখ চায় না। সে জীবন্মুক্ত হ'য়ে বেড়ায়।

"কালীর ভক্ত জীবন্মুক্ত নিত্যানন্দময়।

"যখন দেখ্‌বে ঈশ্বরের নাম ক'রতেই অশ্রু আর পুলক হয়, তখন জানবে, কামিনী-কাঞ্চনে আসক্তি চলে গেছে, ঈশ্বর লাভ হ'য়েছে। দেশলাই যদি শুক্‌নো হয়, একটা ঘস্‌লেই দপ্‌ ক'রে জ্বলে উঠে। আর যদি ভিজে হয়, পঞ্চাশটা ঘস্‌লেও কিছু হয় না। কেবল কাঠিগুলো ফেলা যায়। বিষয়-রসে রোসে থাক্‌লে, কামিনী-কাঞ্চন-রসে মন ভিজে থাকলে, ঈশ্বরের উদ্দীপনা হয় না। হাজার চেষ্টা কর, কেবল পণ্ডশ্রম। বিষয়-রস শুকুলে তৎক্ষণাৎ উদ্দীপন হয়।"

[উপায় ব্যাকুলতা—তিনি যে আপনার মা]

ত্রৈলোক্য—বিষয়-রস শুকোবার এখন উপায় কি?

শ্রীরামকৃষ্ণ—মার কাছে ব্যাকুল হ'য়ে ডাকো। তাঁর দর্শন হ'লে বিষয়-রস শুকিয়ে যাবে; কামিনী-কাঞ্চনে আসক্তি সব দূরে চ'লে যাবে। আপনার মা বোধ থাক্‌লে এক্ষণেই হয়। তিনি তো ধর্ম-মা নন। আপনারই মা। ব্যাকুল

হয়ে মার কাছে আব্দার কর। ছেলে ঘুড়ি কিনবার জন্য মার আঁচল ধরে পয়সা চায়—মা হয়তো আর মেয়েদের সঙ্গে গল্প করছে। প্রথমে মা কোনমতে দিতে চায় না। বলে, 'না, তিনি বারণ ক'রে গেছেন, তিনি এলে ব'লে দিব, এক্ষণই ঘুড়ি নিয়ে একটা কাণ্ড করবি।' যখন ছেলে কাঁদতে শুরু করে, কোনমতে ছাড়ে না, মা অন্য মেয়েদের বলে, 'রোস মা, এ ছেলেটাকে একবার শান্ত ক'রে আসি। এই কথা ব'লে, চাবিটা নিয়ে কড়াৎ কড়াৎ করে বাক্স খুলে একটা পয়সা ফেলে দেয়। তোমরাও মার কাছে আব্দার করো, তিনি অবশ্য দেখা দিবেন। আমি শিখদের ঐ কথা ব'লেছিলাম। তারা দক্ষিণেশ্বর কালীবাড়িতে এসেছিল; মা-কালীর মন্দিরের সম্মুখে ব'সে কথা হয়েছিল। তারা বলেছিল, ঈশ্বর দয়াময়।' আমি জিজ্ঞাসা করলুম, কিসে দয়াময়? তারা বললে, কেন মহারাজ! তিনি সর্বদা আমাদের দেখছেন, আমাদের ধর্ম, অর্থ সব দিচ্ছেন, আহার যোগাচ্ছেন। আমি বললুম, যদি কারো ছেলেপুলে হয়, তাদের খাওয়ার ভার, বাপে নেবে, না, তো, কি বামুনপাড়ার লোকে এসে নেবে?

সদরওয়ালা—মহাশয়। তিনি কি তবে দয়াময় নন?

শ্রীরামকৃষ্ণ—তা কেন গো? ও একটা বললুম; তিনি যে বড় আপনার লোক! তাঁর উপর আমাদের জোর চলে! আপনার লোককে এমন কথা পর্যন্ত বলা যায়, 'দিবি না রে শালা!'

ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ

অহঙ্কার ও সদরওয়ালা

শ্রীরামকৃষ্ণ (সদরওয়ালার প্রতি)—আচ্ছা, অভিমান, অহঙ্কার জ্ঞানে হয়—না, অজ্ঞানে হয়? অহঙ্কার তমোগুণ, অজ্ঞান থেকে উৎপন্ন হয়। এই অহঙ্কার আড়াল আছে ব'লে তাই ঈশ্বরকে দেখা যায় না। 'আমি ম'লে ঘুচিবে জঞ্জাল।' অহঙ্কার করা বৃথা। এ শরীর, এ ঐশ্বর্য কিছুই থাকবে না। একটা মাতাল দুর্গা প্রতিমা দেখ্‌ছিল। প্রতিমার সাজগোজ দেখে বল্‌ছে, মা, যতই সাজো-গোজো, দিনদুই তিন পরে তোমায় টেনে গঙ্গায় ফেলে দিবে।' (সকলের হাস্য)। তাই সকলকে বলছি, জজই হও আর যেই হও সব দুদিনের জন্য। তাই অভিমান, অহঙ্কার ত্যাগ করতে হয়।

[ব্রাহ্মসমাজ ও সাম্য—লোক ভিন্ন প্রকৃতি]

"সত্ত্ব, রজঃ ও তমোগুণের ভিন্ন স্বভাব। তমোগুণীদের লক্ষণ, অহঙ্কার, নিদ্রা, বেশী ভোজন, কাম, ক্রোধ এই সব। রজোগুণীরা বেশী কাজ জড়ায়; কাপড়, পোষাক ফিট-ফাট, বাড়ি পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন, বৈঠকখানায় কুইনের ছবি

যখন ঈশ্বর চিন্তা করে তখন চেলী-গরদ পরে, গলায় রুদ্রাক্ষের মালা, তার মাঝে মাঝে একটি একটি সোনার রুদ্রাক্ষ; যদি কেউ ঠাকুরবাড়ি দেখতে আসে তবে সঙ্গে করে করে দেখায় আর বলে, এদিকে আসুন আরও আছে, শ্বেত পাথরের, মার্বেল পাথরের মেঝে আছে, ষোল-ফোকর নাটমন্দির আছে। আবার দান করে, লোককে দেখিয়ে। সত্ত্বগুণী লোক অতি শিষ্ট-শান্ত, কাপড় যা তা; রোজগার পেট চলা পর্যন্ত, কখনও লোকের তোষামোদ ক'রে ধন লয় না, বাড়িতে মেরামত নাই, ছেলেদের পোষাকের জন্য ভাবে না; মান-সম্ভ্রমের জন্য ব্যস্ত হয় না, ঈশ্বর চিন্তা, দানধ্যান সমস্ত গোপনে—লোকে টের পায় না; মশারীর ভিতর ধ্যান করে, লোকে ভাবে বাবুর রাতে ঘুম হয় নাই তাই বেলা পর্যন্ত ঘুমোচ্ছেন। সত্ত্বগুণ সিঁড়ির শেষ ধাপ, তার পরেই ছাদ। সত্ত্বগুণ এলেই ঈশ্বর লাভের আর দেরী হয় না—আর একটু গেলেই তাঁকে পাবে। (সদরওয়ালার প্রতি)—তুমি বলেছিলে সব লোক সমান। এই দেখ, কত ভিন্ন প্রকৃতি।

"আরও কত রকম থাক্ থাক্ আছে;—নিত্যজীব, মুক্তজীব, মুমুক্ষুজীব, বদ্ধজীব,—নানা রকম মানুষ। নারদ, শুকদেব এঁরা নিত্যজীব, যেমন স্টীম বোট্ (কলের জাহাজ) পারে আপনিও যেতে পারে আবার বড় জীব-জন্তু হাতী পর্যন্ত পারে নিয়ে যায়। নিত্যজীবেরা নায়েবের স্বরূপ; একটা তালুক শাসন করে—আর একটা তালুক শাসন ক'রতে যায়। আবার মুমুক্ষু জীব আছে, যারা সংসার জাল থেকে মুক্ত হবার জন্য ব্যাকুল হ'য়ে প্রাণপণে চেষ্টা ক'রছে। এদের মধ্যে দুই-একজন জাল থেকে পালাতে পারে, তারা মুক্তজীব। নিত্যজীবেরা এক-একটা সিয়ানা মাছের মত; কখনও জালে পড়ে না।

"কিন্তু বদ্ধজীব—সংসারী জীব—তাদের হুঁশ নাই। তারা জালে পড়েই আছে, অথচ জালে বদ্ধ হয়েছি, এরূপ জ্ঞানও নাই। এরা হরিকথা সম্মুখে হ'লে সেখান থেকে চলে যায়,—বলে হরিনাম মরবার সময় হবে; এখন কেন? আবার মৃত্যুশয্যায় শুয়ে, পরিবার কিম্বা ছেলেদের বলে, 'প্রদীপে অত সল্‌তে কেন, একটা সল্‌তে দাও; তা না হ'লে তেল পুড়ে যাবে'; আর পরিবার ও ছেলেদের মনে ক'রে কাঁদে আর বলে, 'হায়! আমি ম'লে এদের কি হবে!' আর বদ্ধজীব যাতে এত দুঃখ ভোগ করে, তাই আবার করে; যেমন উটের কাঁটা ঘাস খেতে খেতে মুখ দিয়ে দর্‌দর্ ক'রে রক্ত পড়ে, তবু কাঁটা ঘাস ছাড়ে না। এদিকে ছেলে মারা গেছে, শোকে কাতর, তবু আবার বছর বছর ছেলে হবে; মেয়ের বিয়েতে সর্বস্বান্ত হ'লো, আবার বছর বছর ছেলেমেয়ে হবে; বলে, কি করবো অদৃষ্টে ছিল। যদি তীর্থ ক'রতে যায়, নিজে ঈশ্বর চিন্তা করবার অবসর পায় না।—কেবল পরিবারদের পুঁটুলি বইতে বইতে প্রাণ যায়, ঠাকুরের

মন্দিরে গিয়ে ছেলেকে চরণামৃত খাওয়াতে আর গড়াগড়ি দেওয়াতেই ব্যস্ত। বদ্ধজীব নিজের আর পরিবারের পেটের জন্য দাসত্ব করে—আর মিথ্যা কথা, প্রবঞ্চনা, তোষামোদ ক'রে ধন উপায় করে। যারা ঈশ্বর চিন্তা করে, ঈশ্বরের ধ্যানে মগ্ন হয়, বদ্ধজীব তাদের পাগল ব'লে উড়িয়ে দেয়। (সদরওয়ালার প্রতি) মানুষ কত রকম দেখ; তুমি সব এক বলেছিলে। কত ভিন্ন প্রকৃতি। কারু বেশী শক্তি, কারু কম।

[বদ্ধজীব মৃত্যুকালে ঈশ্বরের নাম করে না]

"সংসারাসক্ত বদ্ধজীব মৃত্যুকালে সংসারের কথাই বলে। বাহিরে মালা জপলে, গঙ্গাস্নান করলে, তীর্থে গেলে—কি হবে? সংসার আসক্তি ভিতরে থাকলে মৃত্যুকালে সেটি দেখা যায়। কত আবল-তাবল বকে ; হয়তো বিকারের খেয়ালে 'হলুদ, পাঁচফোড়ন, তেজপাতা' ব'লে চেঁচিয়ে উঠলো! শুকপাখি সহজ বেলা রাধাকৃষ্ণ বলে, বিল্লি ধ'রলে নিজের বুলি বেরোয়, ক্যাঁ ক্যাঁ করে। গীতায় আছে মৃত্যুকালে যা মনে ক'রবে, পরলোকে তাই হবে। ভরত রাজা 'হরিণ', 'হরিণ' ক'রে দেহত্যাগ ক'রেছিল, তাই হরিণ জন্ম হ'লো। ঈশ্বর চিন্তা করে দেহত্যাগ করলে ঈশ্বর লাভ হয়, আর এ সংসারে আসতে হয় না।"

ব্রাহ্মভক্ত—মহাশয়, অন্য সময় ঈশ্বর চিন্তা করেছে, কিন্তু মৃত্যু সময় করে নাই বলে কি আবার এই সুখ-দুঃখময় সংসারে আস্‌তে হবে? কেন, আগে তো ঈশ্বর চিন্তা করেছিল?

শ্রীরামকৃষ্ণ—জীব ঈশ্বর চিন্তা করে, কিন্তু ঈশ্বরে বিশ্বাস নাই, আবার ভুলে যায়; সংসারে আসক্ত হয়। যেমন এই হাতীকে স্নান করিয়ে দিলে, আবার ধূলা-কাদা মাখে। মনমত্তকরী! তবে হাতীকে নাইয়েই যদি আস্তাবলে সাঁধ করিয়ে দিতে পার, তা'হলে আর ধূলা-কাদা মাখ্‌তে পারে না। যদি জীব মৃত্যুকালে ঈশ্বর চিন্তা করে, তা হ'লে শুদ্ধ মন হয়, সে মন কামিনী-কাঞ্চনে আবার আসক্ত হবার অবসর পায় না।

ঈশ্বরে বিশ্বাস নাই; তাই এতো কর্মভোগ। লোকে বলে যে, গঙ্গা-স্নানের সময় তোমার পাপগুলো তোমায় ছেড়ে গঙ্গার তীরের গাছের উপর ব'সে থাকে। যাই তুমি গঙ্গাস্নান ক'রে তীরে উঠ্‌ছো অমনি পাপগুলো তোমার ঘাড়ে আবার চেপে বসে। (সকলের হাস্য)। দেহত্যাগের সময় যাতে ঈশ্বর চিন্তা হয়, তাই তার আগে থাকতে উপায় করতে হয়। উপায়—অভ্যাসযোগ। ঈশ্বর চিন্তা অভ্যাস করলে শেষের দিনও তাঁকে মনে পড়বে।"

ব্রাহ্মভক্ত—বেশ কথা হলো। অতি সুন্দর কথা।

শ্রীরামকৃষ্ণ—কি এলোমেলো বকলুম! তবে আমার ভাব কি জান? আমি যন্ত্র তিনি যন্ত্রী; আমি ঘর তিনি ঘরণী; আমি গাড়ি তিনি Engineer ; আমি রথ তিনি রথী; যেমন চালান তেমনি চলি; যেমন করান তেমনি করি।

সপ্তম পরিচ্ছেদ

শ্রীরামকৃষ্ণ সংকীর্ত্তনানন্দে

ত্রৈলোক্য আবার গান গাহিতেছেন। সঙ্গে খোল-করতাল বাজিতেছে। শ্রীরামকৃষ্ণ প্রেমে উন্মত্ত হইয়া নৃত্য করিতেছেন। নৃত্য করিতে করিতে কতবার সমাধিস্থ হইতেছেন। সমাধিস্থ অবস্থায় দাঁড়াইয়া আছেন; স্পন্দহীন দেহ, স্থিরনেত্র, সহাস্য বদন; কোন প্রিয় ভক্তের স্কন্ধদেশে হাত দিয়ে আছেন। আবার ভাবান্তে মত্ত মাতঙ্গের ন্যায় নৃত্য। বাহ্যদশা প্রাপ্ত হইয়া গানের আখর দিতেছেন,—

'নাচ মা, ভক্তবৃন্দ বেড়ে বেড়ে;
আপনি নেচে নাচাও গো মা;
(আবার বলি) হৃদিপদ্মে একবার নাচ মা;
নাচ গো ব্রহ্মময়ী সেই ভুবনমোহনরূপে।"

সে অপূর্ব দৃশ্য! মাতৃগতপ্রাণ, প্রেমে মাতোয়ারা সেই স্বর্গীয় বালকের নৃত্য! ব্রাহ্মভক্তেরা তাঁহাকে বেষ্টন করিয়া নৃত্য করিতেছেন—যেন লোহাকে চুম্বুকে ধরিয়াছে! সকলে উন্মত্ত হইয়া ব্রহ্মনাম করিতেছেন; আবার ব্রহ্মের সেই মধুর নাম,—মা নাম করিতেছেন। অনেকে বালকের মত 'মা, মা' বলিতে বলিতে কাঁদিতেছেন।

কীর্ত্তনান্তে সকলে আসন গ্রহণ করিলেন। এখনও সমাজের সন্ধ্যাকালীন উপাসনা হয় নাই। হঠাৎ এই কীর্ত্তনানন্দে সমস্ত নিয়ম কোথায় ভাসিয়া গিয়াছে! শ্রীযুক্ত বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামী রাত্রে বেদীতে বসিবেন এইরূপ বন্দোবস্ত হইয়াছে। এখন রাত্রি প্রায় ৮টা।

সকলে আসন গ্রহণ করিয়াছেন। শ্রীরামকৃষ্ণও আসীন। সম্মুখে বিজয়। বিজয়ের শাশুড়ী ঠাকুরাণী ও অন্যান্য মেয়ে ভক্তেরা তাঁহাকে দর্শন করিবেন ও তাঁহার সঙ্গে কথা কহিবেন বলিয়া সংবাদ পাঠাইলেন, তিনি একটি ঘরের ভিতর গিয়া তাহাদের সঙ্গে দেখা করিলেন।

কিয়ৎক্ষণ পরে ফিরিয়া আসিয়া বিজয়কে বলিতেছেন, "দেখ, তোমার শাশুড়ীর কি ভক্তি! বলে, সংসারের কথা আর বলবেন না। এক ঢেউ যাচ্ছে, আর এক ঢেউ আসছে! আমি বল্লুম, ওগো, তোমার আর তাতে কি! তোমার তো জ্ঞান-হয়েছে! তোমার শাশুড়ী তাতে বললে, 'আমার আবার কি জ্ঞান হয়েছে! এখনও বিদ্যামায়া আর অবিদ্যামায়ার পার হই নাই; শুধু অবিদ্যার পার হ'লে তো হবে না, বিদ্যার পার হ'তে হবে, তবে তো জ্ঞান হবে; আপনিই তো ও কথা বলেন।'

এ কথা হইতেছে এমন সময় শ্রীযুক্ত বেণী পাল আসিয়া উপস্থিত হইলেন।

বেণী পাল (বিজয়ের প্রতি)— মহাশয়, তবে গাত্রোত্থান করুন, অনেক দেরী হ'য়ে গেছে, উপাসনা আরম্ভ করুন।

বিজয়—মহাশয়, আর উপাসনার কি দরকার। আপনাদের এখানে আগে পায়সের ব্যবস্থা, তারপর কড়ার ডাল ও অন্যান্য ব্যবস্থা।

শ্রীরামকৃষ্ণ (হাসিয়া)—যে যেমন ভক্ত সে সেইরূপ আয়োজন করে। সত্ত্বগুণী-ভক্ত পায়স দেয়, রজোগুণীভক্ত পঞ্চাশ ব্যঞ্জন দিয়ে ভোগ দেয়, তমোগুণীভক্ত ছাগ ও অন্যান্য বলি দেয়।

বিজয় উপাসনা করিতে বেদীতে বসিবেন কিনা ভাবিতেছেন।

অষ্টম পরিচ্ছেদ

বিজয়ের প্রতি উপদেশ

[ব্রাহ্মসমাজে লেকচার—আচার্যের কার্য—ঈশ্বরই গুরু]

বিজয়—আপনি অনুগ্রহ করুন, তবে আমি বেদী থেকে ব'লবো।

শ্রীরামকৃষ্ণ—অভিমান গেলেই হ'লো। 'আমি লেকচার দিচ্ছি, তোমরা শুন' এ অভিমান না থাকলেই হলো। অহঙ্কার জ্ঞানে হয়, না, অজ্ঞানে হয়? যে নিরহঙ্কার তারই জ্ঞান হয়। নীচু জায়গায় বৃষ্টির জল দাঁড়ায়, উঁচু জায়গা থেকে গড়িয়ে যায়।

"যতক্ষণ অহঙ্কার থাকে, ততক্ষণ জ্ঞান হয় না; আবার মুক্তিও হয় না। এই সংসারে ফিরে ফিরে আস্‌তে হয়। বাছুর হাম্বা হাম্বা (আমি আমি) করে, তাই অত যন্ত্রণা। কষায়ে কাটে, চামড়ায় জুতা হয়। আবার ঢোল-ঢাকের চামড়া হয়; সে ঢাক কত পেটে, কষ্টের শেষ নাই। শেষে নাড়ী থেকে তাঁত হয়, সেই তাঁতে যখন ধুনুরীর যন্ত্র তৈয়ার হয় আর ধুনুরীর তাঁতে তুঁহু তুঁহু (তুমি তুমি) ব'লতে থাকে, তখন নিস্তার হয়। তখন আর হাম্বা হাম্বা (আমি আমি) ব'ল্‌ছে না; বলছে তুঁহু তুঁহু (তুমি তুমি) অর্থাৎ হে ঈশ্বর, তুমি কর্ত্তা, আমি অকর্ত্তা; তুমি যন্ত্রী, আমি যন্ত্র; তুমিই সব।

[ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ ও গুরুবাদ]

"গুরু বাবা ও কর্ত্তা, এই তিন কথায় আমার গায়ে কাঁটা বেঁধে। আমি তাঁর ছেলে, আমি চিরকাল বালক, আমি আবার 'বাবা' কি? ঈশ্বর কর্ত্তা, আমি অকর্ত্তা; তিনি যন্ত্রী, আমি যন্ত্র।

"যদি কেউ আমায় গুরু বলে, আমি বলি, দূর শালা গুরু কিরে? এক সচ্চিদানন্দ বই আর গুরু নাই। তিনি বিনা আর কোন উপায় নাই। তিনিই একমাত্র ভবসাগরের কাণ্ডারী।

(বিজয়ের প্রতি)—"আচার্যগিরি করা বড় কঠিন। ওতে নিজের হানি হয়।

অমনি দশজন মানছে দেখে, পায়ের উপর পা দিয়ে বলে 'আমি বলছি আর তোমরা শুন।' এই ভাবটা বড় খারাপ। তার ঐ পর্যন্ত! ঐ একটু মান; লোকে হদ্দ বলবে, 'আহা বিজয়বাবু বেশ বল্‌লেন, লোকটা খুব জ্ঞানী।' 'আমি ব'লছি' এ জ্ঞান ক'রো না। আমি মাকে বলি, 'মা তুমি যন্ত্রী, আমি যন্ত্র; যেমন করাও তেমনি করি; যেমন বলাও তেমনি বলি।"

বিজয় (বিনীতভাবে)—আপনি বলুন, তবে আমি গিয়ে বসবো।

শ্রীরামকৃষ্ণ (হাসিতে হাসিতে)—আমি কি ব'লবো; চাঁদা মামা সকলেরই মামা। তুমিই তাঁকে বলো। যদি আন্তরিক হয়, কোন ভয় নাই।

বিজয় আবার অনুনয় করাতে শ্রীরামকৃষ্ণ বলিলেন, "যাও, যেমন পদ্ধতি আছে তেমনি করগে; আন্তরিক তাঁর উপর ভক্তি থাকলেই হ'লো।"

বিজয় বেদীতে আসীন হইয়া ব্রাহ্মসমাজের পদ্ধতি অনুসারে উপাসনা করিতেছেন। বিজয় প্রার্থনার সময় মা মা করিয়া ডাকিতেছেন। সকলেরই মন দ্রবীভূত হইল।

উপাসনান্তে ভক্তদের সেবার জন্য ভোজনের আয়োজন হইয়াছে। সতরঞ্চ, গালিচা সমস্ত উঠাইয়া পাতা হইতে লাগিল, ভক্তেরা সকলেই বসিলেন। ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণেরও আসন-হইল। তিনি বসিয়া শ্রীযুক্ত বেণী পাল প্রদত্ত উপাদেয় লুচি, কচুরী, পাঁপর, নানাবিধ মিষ্টান্ন, দধি, ক্ষীর ইত্যাদি সমস্ত ভগবানকে নিবেদন করিয়া আনন্দে প্রসাদ গ্রহণ করিলেন।

নবম পরিচ্ছেদ

মা—কালী ব্রহ্ম—পূর্ণ জ্ঞানের পর অভেদ

আহারান্তে সকলে পান খাইয়া বাড়ি প্রত্যাগমনের উদ্যোগ করিতেছেন। যাইবার পূর্বে ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ বিজয়ের সহিত একান্তে বসিয়া কথা কহিতেছেন। সেখানে মাষ্টারও আছেন।

[ব্রাহ্মসমাজ ও ঈশ্বরের মাতৃভাব—Motherhood of God]

শ্রীরামকৃষ্ণ—তুমি তাঁকে মা মা ব'লে প্রার্থনা কর্‌ছিলে। এ খুব ভাল। কথায় বলে, মায়ের টান বাপের চেয়েও বেশী। মায়ের উপর জোর চলে, বাপের উপর চলে না। ত্রৈলোক্যের মায়ের জমিদারী থেকে গাড়ি গাড়ি ধন আসছিল, সঙ্গে কত লাল পাগড়ীওয়ালা লাঠি হাতে দ্বারবান্‌। ত্রৈলোক্য রাস্তায় লোকজন নিয়ে দাঁড়িয়েছিল, জোর ক'রে সব ধন কেড়ে নিলে। মায়ের ধনের উপর খুব জোর চলে। বলে নাকি ছেলের নামে তেমন নালিশ চলে না।

বিজয়—ব্রহ্ম যদি মা, তা হ'লে তিনি সাকার না নিরাকার?

শ্রীরামকৃষ্ণ—যিনি ব্রহ্ম, তিনিই কালী (মা আদ্যাশক্তি)। যখন নিষ্ক্রিয়, তাঁকে ব্রহ্ম ব'লে কই। যখন সৃষ্টি, স্থিতি, প্রলয় এই সব কাজ করেন, তাঁকে

শক্তি ব'লে কই। স্থির জল ব্রহ্মের উপমা। জল হেল্‌চে দুল্‌চে, শক্তি বা কালীর উপমা। কালী! কি না—যিনি মহাকালের (ব্রহ্মের) সহিত রমণ করেন। কালী 'সাকার আকার নিরাকারা।' তোমাদের যদি নিরাকার ব'লে বিশ্বাস, কালীকে সেইরূপ চিন্তা ক'রবে। একটা দৃঢ় ক'রে তার চিন্তা করলে তিনিই জানিয়ে দেবেন, তিনি কেমন। শ্যামপুকুরে পৌঁছিলে তেলীপাড়াও জানতে পারবে। তখন জান্‌তে পার্‌বে যে তিনি শুধু আছেন (অস্তিমাত্রম্‌) তা নয়। তিনি তোমার কাছে এসে কথা কবেন—আমি যেমন তোমার সঙ্গে কথা কচ্ছি। বিশ্বাস করো সব হ'য়ে যাবে। আর একটি কথা—তোমার নিরাকার বলে যদি বিশ্বাস, দৃঢ় ক'রে তাই বিশ্বাস করো। কিন্তু মতুয়ার বুদ্ধি (Dogmatism) কোরো না। তাঁর সম্বন্ধে এমন কথা জোর করে ব'লো না যে তিনি এই হ'তে পারেন, আর এই হ'তে পারেন না। ব'লো আমার বিশ্বাস তিনি নিরাকার, আর কত কি হ'তে পারেন তিনি জানেন। আমি জানি না। বুঝতে পারি না। মানুষের এক ছটাক বুদ্ধিতে ঈশ্বরের স্বরূপ কি বুঝা যায়? এক সের ঘটিতে কি চার সের দুধ ধরে? তিনি যদি কৃপা ক'রে কখনও দর্শন দেন, আর বুঝিয়ে দেন, তবে বুঝা যায়; নচেৎ নয়।

'যিনি ব্রহ্ম, তিনিই শক্তি, তিনিই মা।'

"প্রসাদ বলে মাতৃভাবে আমি তত্ত্ব করি যাঁরে।
সেটা চাতরে কি ভাঙ্গবো হাঁড়ি, বোঝনা রে মন ঠারে ঠোরে॥

"আমি তত্ত্ব করি যাঁরে। অর্থাৎ আমি সেই ব্রহ্মের তত্ত্ব ক'রছি। তাঁকেই মা মা ব'লে ডাকছি। আবার রামপ্রসাদ ঐ কথাই বল্‌ছে,—

"আমি কালীব্রহ্ম জেনে মর্ম, ধর্মাধর্ম সব ছেড়েছি।'

"অধর্ম কিনা অসৎ কর্ম। ধর্ম কিনা বৈধী কর্ম—এতো দান করতে হবে, এতো ব্রাহ্মণ ভোজন করাতে হবে, এই সব ধর্ম।"

বিজয়—ধর্মাধর্ম ত্যাগ ক'রলে কি বাকী থাকে?

শ্রীরামকৃষ্ণ—শুদ্ধা ভক্তি। আমি মাকে বলেছিলাম, মা! এই লও তোমার ধর্ম, এই লও তোমার অধর্ম, আমায় শুদ্ধা ভক্তি দাও; এই লও তোমার পুণ্য, এই লও তোমার পাপ, আমায় শুদ্ধা ভক্তি দাও; এই লও তোমার জ্ঞান, এই লও তোমার অজ্ঞান, আমায় শুদ্ধা ভক্তি দাও! দেখ, জ্ঞান পর্যন্ত আমি চাই নাই। আমি লোকমান্যও চাই নাই। ধর্মাধর্ম ছাড়লে শুদ্ধা ভক্তি—অমলা, নিষ্কাম, অহেতুকী ভক্তি—বাকী থাকে।

[ব্রাহ্মসমাজ ও বেদান্ত প্রতিপাদ্য ব্রহ্ম—আদ্যাশক্তি]

ব্রাহ্মভক্ত—তিনি আর তাঁর শক্তি কি তফাত?

শ্রীরামকৃষ্ণ—পূর্ণ জ্ঞানের পর অভেদ। যেমন মণির জ্যোতিঃ আর মণি, অভেদ। মণির জ্যোতিঃ ভাবলেই মণি ভাবতে হয়। দুধ আর দুধের ধবলত্ব

যেমন অভেদ। একটাকে ভাব্‌লেই আর একটাকে ভাব্‌তে হয়। কিন্তু এ অভেদ জ্ঞান—পূর্ণজ্ঞান না হ'লে হয় না। পূর্ণজ্ঞানে সমাধি হয়, চতুর্বিংশতি তত্ত্ব ছেড়ে চ'লে যায়—তাই অহংতত্ত্ব থাকে না। সমাধিতে কি বোধ হয় মুখে বলা যায় না। নেমে একটু আভাসের মত বলা যায়। যখন সমাধি ভঙ্গের পর 'ওঁ ওঁ' বলি, আমি একশো হাত নেমে এসেছি। ব্রহ্ম বেদবিধির পার, মুখে বলা যায় না। সেখানে 'আমি' 'তুমি' নাই।

"যতক্ষণ 'আমি' 'তুমি' আছে, যতক্ষণ 'আমি প্রার্থনা কি ধ্যান করছি' এ জ্ঞান আছে, ততক্ষণ 'তুমি' (ঈশ্বর) প্রার্থনা শুনছো, এ জ্ঞানও আছে ; ঈশ্বরকে ব্যক্তি ব'লে বোধ আছে। তুমি প্রভু, আমি দাস ; তুমি পূর্ণ, আমি অংশ ; তুমি মা, আমি ছেলে ; এ বোধ থাক্‌বে। এই ভেদ বোধ ; আমি একটি, তুমি একটি। এ ভেদ বোধ তিনিই করাচ্ছেন। তাই পুরুষ-মেয়ে, আলো-অন্ধকার, এই সব বোধ হ'চ্ছে। যতক্ষণ এই ভেদ বোধ, ততক্ষণ শক্তি (Personal God) মান্‌তে হবে। তিনিই আমাদের ভিতর 'আমি' রেখে দিয়েছেন। হাজার বিচার কর, 'আমি' আর যায় না। আর তিনি ব্যক্তি হ'য়ে দেখা দেন।

"তাই যতক্ষণ 'আমি' আছে—ভেদবুদ্ধি আছে—ততক্ষণ ব্রহ্ম নির্গুণ বলবার যো নাই। ততক্ষণ সগুণব্রহ্ম মান্‌তে হবে। এই সগুণ ব্রহ্মকে বেদ, পুরাণ, তন্ত্রে কালী বা আদ্যাশক্তি ব'লে গেছে।"

বিজয়—এই আদ্যাশক্তি দর্শন আর ঐ ব্রহ্মজ্ঞান, কি উপায়ে হ'তে পারে?

শ্রীরামকৃষ্ণ—ব্যাকুল হৃদয়ে তাঁকে প্রার্থনা করো। আর কাঁদো! এইরূপে চিত্তশুদ্ধি হ'য়ে যাবে। নির্মল জলে সূর্যের প্রতিবিম্ব দেখতে পাবে। ভক্তের আমিরূপ আরশিতে সেই সগুণব্রহ্ম আদ্যাশক্তি দর্শন করবে। কিন্তু আরশি খুব পোঁছা চাই। ময়লা থাক্‌লে ঠিক প্রতিবিম্ব পড়বে না।

"যতক্ষণ 'আমি' জলে সূর্যকে দেখতে হয়, সূর্যকে দেখবার আর কোনরূপ উপায় হয় না। আর যতক্ষণ প্রতিবিম্ব সূর্য বই সত্য সূর্যকে দেখবার উপায় নাই, ততক্ষণ প্রতিবিম্ব সূর্যই ষোল আনা সত্য—যতক্ষণ আমি সত্য ততক্ষণ প্রতিবিম্ব সূর্যও সত্য—ষোল আনা সত্য। সেই প্রতিবিম্ব সূর্যই আদ্যাশক্তি।

"ব্রহ্মজ্ঞান যদি চাও—সেই প্রতিবিম্বকে ধ'রে সত্য সূর্যের দিকে যাও। সেই সগুণব্রহ্ম, যিনি প্রার্থনা শুনেন তাঁরেই বলো, তিনিই সেই ব্রহ্মজ্ঞান দিবেন। কেন না, যিনিই সগুণব্রহ্ম, তিনিই নির্গুণ ব্রহ্ম, যিনিই শক্তি, তিনিই ব্রহ্ম। পূর্ণ জ্ঞানের পর অভেদ।

"মা ব্রহ্মজ্ঞানও দেন। কিন্তু শুদ্ধভক্ত প্রায় ব্রহ্মজ্ঞান চায় না।

"আর এক পথ—জ্ঞানযোগ, বড় কঠিন পথ। ব্রাহ্মসমাজের তোমরা জ্ঞানী নও, ভক্ত! যারা জ্ঞানী, তাদের বিশ্বাস যে ব্রহ্ম সত্য, জগৎ মিথ্যা, স্বপ্নবৎ! আমি, তুমি, সব স্বপ্নবৎ!

[ব্রাহ্মসমাজে বিদ্বেষ ভাব]

"তিনি অন্তর্যামী! তাঁকে সরল মনে, শুদ্ধ মনে প্রার্থনা কর। তিনি সব বুঝিয়ে দিবেন। অহংকার ত্যাগ করে তাঁর শরণাগত হও ; সব পাবে।

"আপনাতে আপনি থেকো মন যেও নাকো কারু ঘরে।
যা চাবি তা ব'সে পাবি খোঁজ নিজ অন্তঃপুরে।
পরম ধন ঐ পরশমণি, যা চাবি তা দিতে পারে
কত মণি প'ড়ে আছে, চিন্তামণির নাচ দুয়ারে॥

"যখন বাহিরে লোকের সঙ্গে মিশবে, তখন সকলকে ভালবাসবে, মিশে যেন এক হ'য়ে যাবে—বিদ্বেষ ভাব আর রাখবে না।' 'ও ব্যক্তি সাকার মানে, নিরাকার মানে না ; ও নিরাকার মানে, সাকার মানে না ; ও হিন্দু, ও মুসলমান, ও খৃষ্টান'—এই ব'লে নাক সিঁট্‌কে ঘৃণা ক'রো না! তিনি যাকে যেমন বুঝিয়েছেন। সকলের ভিন্ন ভিন্ন প্রকৃতি জানবে, জেনে তাদের সঙ্গে মিশবে,—যত দূর পার। আর ভালবাসবে। তার পর নিজের ঘরে গিয়ে শান্তি আনন্দভোগ ক'রবে। 'জ্ঞানদীপ জেবলে ঘরে ব্রহ্মময়ীর মুখ দেখো না।' নিজের ঘরে স্ব-স্বরূপকে দেখতে পাবে।

"রাখাল যখন গরু চরাতে যায়, গরু সব মাঠে গিয়ে এক হ'য়ে যায়। এক পালের গরু। যখন সন্ধ্যায় নিজের ঘরে যায়, আবার পৃথক হ'য়ে যায়। নিজের ঘরে 'আপনাতে আপনি থাকে।"

[সন্ন্যাসে সঞ্চয় করিতে নাই—শ্রীযুক্ত বেণী পালের অর্থের সদ্ব্যবহার]

রাত্রি দশটার পর শ্রীরামকৃষ্ণ দক্ষিণেশ্বরের কালীবাড়িতে ফিরিবার জন্য গাড়ীতে উঠিলেন। সঙ্গে দুই-একজন সেবক ভক্ত। গভীর অন্ধকার, গাছতলায় গাড়ী দাঁড়াইয়া আছে। বেণী পাল রামলালের জন্য লুচি মিষ্টান্নাদি গাড়ীতে তুলিয়া দিতে আসিলেন।

বেণী পাল—মহাশয়! রামলাল আস্‌তে পারেন নাই, তাঁর জন্য কিছু খাবার এঁদের হাতে দিতে ইচ্ছা করি। আপনি অনুমতি করুন।

শ্রীরামকৃষ্ণ (ব্যস্ত হইয়া)—ও বাবু বেণী পাল! তুমি আমার সঙ্গে ও সব দিও না! ওতে আমার দোষ হয়। আমার সঙ্গে কোন জিনিস সঞ্চয় ক'রে নিয়ে যেতে নাই। তুমি কিছু মনে ক'রবে না।

বেণী পাল—যে আজ্ঞা, আপনি আশীর্বাদ করুন।

শ্রীরামকৃষ্ণ—আজ খুব আনন্দ হ'লো। দেখ, অর্থ যার দাস, সেই মানুষ। যারা অর্থের ব্যবহার জানে না, তারা মানুষ হ'য়ে মানুষ নয়। আকৃতি মানুষের কিন্তু পশুর ব্যবহার! ধন্য তুমি! এতগুলি ভক্তকে আনন্দ দিলে।

ত্রয়োদশ খণ্ড

দক্ষিণেশ্বরে ভক্তসঙ্গে

প্রথম পরিচ্ছেদ

দক্ষিণেশ্বরে মনোমোহন, মহিমা প্রভৃতি ভক্তসঙ্গে

চল ভাই, আবার তাঁকে দর্শন করিতে যাই। সেই মহাপুরুষকে, সেই বালককে দেখিব, যিনি মা বই আর কিছু জানেন না; যিনি আমাদের জন্য দেহ ধারণ ক'রে এসেছেন—তিনি ব'লে দেবেন, কি ক'রে এই কঠিন জীবন সমস্যা পূরণ করতে হবে! সন্ন্যাসীকে ব'লে দেবেন, গৃহীকে ব'লে দেবেন! অবারিত দ্বার! দক্ষিণেশ্বরের কালীবাড়িতে আমাদের জন্য অপেক্ষা ক'রছেন। চল, চল, তাঁকে দেখ্‌বো।

'অনন্ত গুণাধার প্রসন্নমূরতি, শ্রবণে যাঁর কথা আঁখি ঝরে।!'

চল ভাই, অহেতুক কৃপাসিন্ধু, প্রিয়দর্শন, ঈশ্বরপ্রেমে নিশিদিন মাতোয়ারা, সহাস্যবদন শ্রীরামকৃষ্ণকে দর্শন ক'রে মানব-জীবন সার্থক করি!

আজ রবিবার, ২৬শে অক্টোবর, ১৮৮৪; হেমন্তকাল। কার্ত্তিকের শুক্লাসপ্তমী তিথি। দু'প্রহর বেলা। ঠাকুরের সেই পূর্ব-পরিচিত ঘরে ভক্তেরা সমবেত হইয়াছেন। সে ঘরের পশ্চিম গায়ে অর্ধচন্দ্রাকার বারান্দা। বারান্দার পশ্চিমে উদ্যান-পথ; উত্তর-দক্ষিণে যাইতেছে। পথের পশ্চিমে মা কালীর পুষ্পোদ্যান, তাহার পরই পোস্তা, তৎপরে পবিত্র-সলিলা দক্ষিণবাহিনী গঙ্গা।

ভক্তেরা অনেকেই উপস্থিত। আজ আনন্দের হাট। আনন্দময় ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণের ঈশ্বরপ্রেম ভক্তমুখদর্পণে মুকুরিত হইতেছিল। কি আশ্চর্য! আনন্দ কেবল ভক্তমুখ-দর্পণে কেন? বাহিরের উদ্যানে, বৃক্ষপত্রে, নানাবিধ যে কুসুম ফুটিয়া রহিয়াছে তন্মধ্যে, বিশাল ভাগীরথী বক্ষে, রবিকর প্রদীপ্ত নীলনভোমণ্ডলে, মুরারিচরণচ্যুত গঙ্গা-বারিকণাবাহী শীতল সমীরণ মধ্যে, এই আনন্দ প্রতিভাসিত হইতেছিল। কি আশ্চর্য! সত্য সত্যই 'মধুমৎ পার্থিবং রজঃ'—উদ্যানের ধূলি পর্যন্ত মধুময়!—ইচ্ছা হয়, গোপনে বা ভক্তসঙ্গে এই ধূলির উপর গড়াগড়ি দিই! ইচ্ছা হয়, এই উদ্যানের একপার্শ্বে দাঁড়াইয়া সমস্ত দিন এই মনোহারী গঙ্গাবারি দর্শন করি। ইচ্ছা হয়, এই উদ্যানের তরু লতা গুল্ম ও পত্রপুষ্পশোভিত স্নিগ্ধোজ্জ্বল বৃক্ষগুলিকে আত্মীয়জ্ঞানে সাদর সম্ভাষণ ও প্রেমালিঙ্গন দান করি। এই ধূলির উপর দিয়া কি ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ পাদচারণ করেন! এই বৃক্ষ লতা গুল্ম মধ্য দিয়া তিনি কি অহরহঃ

যাতায়াত করেন। ইচ্ছা ক'রে জ্যোতির্ময় গগনপানে অনন্যদৃষ্টি হইয়া তাকাইয়া থাকি। কেন না দেখিতেছি ভূলোক-দ্যুলোক সমস্তই প্রেমানন্দে ভাসিতেছে!

ঠাকুরবাড়ির পূজারী, দৌবারিক, পরিচারক, সকলকে কেন পরমাত্মীয় বোধ হইতেছে—কেন এ স্থান বহুদিনান্তে দৃষ্ট জন্মভূমির ন্যায় মধুর লাগিতেছে? আকাশ, গঙ্গা, দেবমন্দির, উদ্যানপথ, বৃক্ষ, লতা, গুল্ম, সেবকগণ আসনে উপবিষ্ট ভক্তগণ, সকলে যেন এক জিনিসের তৈয়ারী বোধ হইতেছে। যে জিনিসে নির্মিত শ্রীরামকৃষ্ণ, এঁরাও বোধ হইতেছে সেই জিনিসের হইবেন। যেন একটি মোমের বাগান, গাছপালা, ফল, পাতা, সব মোমের; বাগানের পথ, বাগানের মালী, বাগানের নিবাসীগণ, বাগান মধ্যস্থিত গৃহ সমস্তই মোমের। এখানকার সব আনন্দ দিয়ে গড়া!

শ্রীমনোমোহন, শ্রীযুক্ত মহিমাচরণ, মাষ্টার উপস্থিত ছিলেন। ক্রমে ঈশান, হৃদয় ও হাজরা। এঁরা ছাড়া অনেক ভক্তেরা ছিলেন। বলরাম, রাখাল, এঁরা তখন শ্রীবৃন্দাবনধামে। এই সময়ে নূতন ভক্তেরা আসেন যান; নারায়ণ, পল্টু, ছোট নরেন, তেজচন্দ্র, বিনোদ, হরিপদ। বাবুরাম আসিয়া মাঝে মাঝে থাকেন। রাম, সুরেশ, কেদার ও দেবেন্দ্রাদি ভক্তগণ প্রায় আসেন—কেহ কেহ সপ্তাহান্তে, কেহ দুই সপ্তাহের পর। লাটু থাকেন। যোগীনের বাড়ি নিকটে, তিনি প্রায় প্রত্যহ যাতায়াত করেন। নরেন্দ্র মাঝে মাঝে আসেন, এলেই আনন্দের হাট। নরেন্দ্র তাঁহার দেবদুর্লভ কণ্ঠে ভগবানের নামগুণ গান করেন, অমনি ঠাকুরের নানাবিধ ভাব ও সমাধি হইতে থাকে। একটি যেন উৎসব পড়িয়া যায়। ঠাকুরের ভারী ইচ্ছা, ছেলেদের কেহ তাঁর কাছে রাত্রি-দিন থাকেন, কেন না তারা শুদ্ধাত্মা, সংসারে বিবাহাদিসূত্রে বা বিষয়-কর্মে আবদ্ধ হয় নাই। বাবুরামকে থাকিতে বলেন; তিনি মাঝ মাঝে থাকেন। শ্রীযুক্ত অধর সেন প্রায় আসেন।

ঘরের মধ্যে ভক্তেরা বসিয়া আছেন। ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ বালকের ন্যায় দাঁড়াইয়া কি ভাবছেন। ভক্তেরা চেয়ে আছেন।

[অব্যক্ত ও ব্যক্ত— The Undifferentiated and the Differentiated]

শ্রীরামকৃষ্ণ (মনোমোহনের প্রতি)—সব রাম দেখছি! তোমরা সব বসে আছ, দেখছি রামই সব এক-একটি হ'য়েছেন।

মনোমোহন—রামই সব হ'য়েছেন; তবে আপনি যেমন বলেন, 'আপো নারায়ণ', জলই নারায়ণ; কিন্তু কোন জল খাওয়া যায়, কোন জলে মুখ ধোয়া চলে, কোন জলে বাসন মাজা।

শ্রীরামকৃষ্ণ—হাঁ, কিন্তু দেখছি তিনিই সব। জীব জগৎ তিনি হ'য়েছেন। এই কথা বলিতে বলিতে ঠাকুর ছোট খাটটিতে বসিলেন।

[শ্রীরামকৃষ্ণের সত্যে আঁট ও সঞ্চয়ে বিঘ্ন]

শ্রীরামকৃষ্ণ (মহিমাচরণের প্রতি)—"হ্যাঁগা, সত্য কথা কহিতে হবে ব'লে কি আমার ছুচিবাই হ'লো নাকি! যদি হঠাৎ ব'লে ফেলি, খাব না, তবে খিদে পেলেও আর খাবার যো নাই। যদি বলি ঝাউতলায় আমার গাড়ু নিয়ে অমুক লোকের যেতে হবে,—আর কেউ নিয়ে গেলে তাকে আবার ফিরে যেতে ব'লতে হবে। একি হ'লো বাপু! এর কি কোন উপায় নাই!

"আবার সঙ্গে করে কিছু আন্‌বার যো নাই। পান, খাবার—কোন জিনিস সঙ্গে ক'রে আনবার যো নাই। তা হ'লে সঞ্চয় হ'লো কি না। হাতে মাটি নিয়ে আসবার যো নাই।"

এই সময় একটি লোক আসিয়া বলিল, মহাশয়! হৃদয়* যদু মল্লিকের বাগানে এসেছেন, ফটকের কাছে দাঁড়িয়ে; আপনার সঙ্গে দেখা ক'রতে চায়। শ্রীরামকৃষ্ণ ভক্তদের বলিতেছেন, হৃদের সঙ্গে একবার দেখা ক'রে আসি, তোমরা ব'সো। এই বলিয়া কালো বার্ণিস করা চটি জুতাটি প'রে পূর্বদিকের ফটক অভিমুখে চলিলেন। সঙ্গে কেবল মাষ্টার। লাল সুরকীর উদ্যানপথ। সেই পথে ঠাকুর পূর্বাস্য হইয়া যাইতেছেন। পথে খাজাঞ্চী দাঁড়াইয়াছিলেন ঠাকুরকে প্রণাম করিলেন। দক্ষিণে উঠানের ফটক রহিল, সেখানে শ্মশ্রুবিশিষ্ট দৌবারিকগণ বসিয়াছিল। বামে কুঠি—বাবুদের বৈঠকখানা; আগে এখানে নীলকুঠি ছিল তাই কুঠি বলে। তৎপরে পথের দুই দিকে কুসুম বৃক্ষ,—অদূরে পথের ঠিক দক্ষিণ দিকে গাজীতলা ও মা কালীর পুষ্করিণীর সোপানাবলিশোভিত ঘাট। ক্রমে পূর্বদ্বার, বামদিকে দ্বারবানদের ঘর ও দক্ষিণে তুলসীমঞ্চ। উদ্যানের বাহিরে আসিয়া দেখেন, যদু মল্লিকের বাগানের ফটকের কাছে হৃদয় দণ্ডায়মান।

---

* হৃদয় মুখোপাধ্যায় সম্পর্কে ঠাকুরের ভাগিনেয়। ঠাকুরের জন্মভূমি কামারপুকুরের নিকট সিওড়ে হৃদয়ের বাড়ি। বিংশতি বর্ষ ঠাকুরের কাছে থাকিয়া দক্ষিণেশ্বরের মন্দিরে মা কালীর পূজা ও ঠাকুরের সেবা করিয়াছিলেন। তিনি বাগানের কর্তৃপক্ষীয়দের অসন্তোষ-ভাজন হওয়াতে তাঁহার বাগানে প্রবেশ করিবার হুকুম ছিল না। হৃদয়ের মাতামহী ঠাকুরের পিসী।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

সেবক সন্নিকটে—হৃদয় দণ্ডায়মান

হৃদয় কৃতাঞ্জলিপুটে দণ্ডায়মান। দর্শন মাত্র রাজপথের উপর দণ্ডের ন্যায় নিপতিত হইলেন। ঠাকুর উঠিতে বলিলেন। হৃদয় আবার, হাত জোড় করিয়া বালকের মত কাঁদিতেছেন।

কি আশ্চর্য! ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণও কাঁদিতেছেন! চক্ষের কোণে কয়েক ফোঁটা জল দেখা দিল! তিনি অশ্রুবারি হাত দিয়া মুছিয়া ফেলিলেন—যেন চক্ষে জল পড়ে নাই। একি! যে হৃদয় তাঁকে কত যন্ত্রণা দিয়াছিল তাঁর জন্য ছুটে এসেছেন! আর কাঁদছেন!

শ্রীরামকৃষ্ণ—এখন যে এলি?

হৃদয় (কাঁদিতে কাঁদিতে)—তোমার সঙ্গে দেখা ক'রতে এলাম। আমার দুঃখ আর কার কাছে বল্‌বো?

শ্রীরামকৃষ্ণ (সান্ত্বনার্থ সহাস্যে)—সংসারে এইরূপ দুঃখ আছে। সংসার কর'তে গেলেই সুখ-দুঃখ আছে। (মাষ্টারকে দেখাইয়া) এ'রা এক-একবার তাই আসে ; এসে ঈশ্বরীয় কথা দুটো শুনলে মনে শান্তি হয়। তোর কিসের দুঃখ?

হৃদয় (কাঁদিতে কাঁদিতে)—আপনার সঙ্গ ছাড়া, তাই দুঃখ।

শ্রীরামকৃষ্ণ—তুই তো ব'লেছিলি, তোমার ভাব 'তোমাতে থাক্, আমার ভাব আমাতে থাক্।'

হৃদয়—হাঁ, তাতো বলেছিলাম—আমি কি জানি?

শ্রীরামকৃষ্ণ—আজ এখন তবে আয়, আর একদিন তখন ব'সে কথা কহিব। আজ রবিবার অনেক লোক এসেছে, তারা ব'সে রয়েছে। এবার দেশে ধান-টান কেমন হ'য়েছে?

হৃদয়—হাঁ, তা এক রকম মন্দ হয় নাই।

শ্রীরামকৃষ্ণ—আজ তবে আয়, আবার একদিন আসিস্।

হৃদয় আবার সাষ্টাঙ্গ হইয়া প্রণাম করিল। ঠাকুর সেই পথ দিয়া ফিরিয়া আসিতে লাগিলেন। সঙ্গে মাষ্টার।

শ্রীরামকৃষ্ণ (মাষ্টারের প্রতি)—আমার সেবাও যত করেছে, যন্ত্রণাও তেমনি দিয়েছে! আমি যখন পেটের ব্যারামে দুখানা হাড় হ'য়ে গেছি—কিছু খেতে পারতুম না তখন আমায় বল্‌লে, 'এই দেখ আমি কেমন খাই, তোমার মনের গুণে খেতে পারো না।' আবার বলতো, 'বোকা—আমি না থাক্‌লে তোমার

সাধুগিরি বেরিয়ে যেতো।' একদিন এ রকম ক'রে যন্ত্রণা দিলে যে পোস্তার উপর দাঁড়িয়ে জোয়ারের জলে দেহত্যাগ ক'রতে গিয়েছিলুম!

মাষ্টার শুনিয়া অবাক্। বোধ হয় ভাবিতেছেন, কি আশ্চর্য! এখন লোকের জন্য ইনি অশ্রুবারি বিসর্জন করিতেছিলেন।

শ্রীরামকৃষ্ণ (মাষ্টারের প্রতি)—আচ্ছা, অত সেবা করতো,—তবে কেন ওর এমন হ'লো? ছেলেকে যেমন মানুষ করে, সেই রকম ক'রে আমাকে দেখেছে। আমি তো রাত-দিন বেহুঁস হ'য়ে থাকতুম, তার উপর আবার অনেক দিন ধ'রে ব্যামোয় ভুগেছি। ও যে রকম ক'রে আমায় রাখ্‌তো, সেই রকম আমি থাকতুম।

মাষ্টার কি বলিবেন, চুপ করিয়া রহিলেন। হয়তো ভাবিতেছিলেন, হৃদয় বুঝি নিষ্কাম হইয়া ঠাকুরের সেবা করেন নাই!

কথা কহিতে কহিতে ঠাকুর নিজের ঘরে পৌঁছিলেন। ভক্তেরা প্রতীক্ষা করিতেছিলেন। ঠাকুর আবার ছোট খাটটিতে বসিলেন।

তৃতীয় পরিচ্ছেদ

ভক্তসঙ্গে—নানাপ্রসঙ্গে—ভাব মহাভাবের গূঢ়তত্ত্ব

শ্রীযুক্ত মহিমাচরণ প্রভৃতি ছাড়া কয়েকটি কোন্নগরের ভক্ত আসিয়াছেন; একজন শ্রীরামকৃষ্ণের সঙ্গে কিয়ৎকাল বিচার করেছিলেন।

কোন্নগরের ভক্ত—মহাশয় শুনলাম যে, আপনার ভাব হয়, সমাধি হয়। কেন হয়, কিরূপে হয়, আমাদের বুঝিয়ে দিন।

শ্রীরামকৃষ্ণ—শ্রীমতীর মহাভাব হ'তো; সখীরা কেহ ছুঁতে গেলে অন্য সখী বলতো, কৃষ্ণবিলাসের অঙ্গ ছুঁস্‌নি—এ'র দেহমধ্যে এখন কৃষ্ণ বিলাস ক'রছেন।' ঈশ্বর অনুভব না হ'লে ভাব বা মহাভাব হয় না। গভীর জল থেকে মাছ এলে জলটা নড়ে,—তেমন মাছ হ'লে জল তোলপাড় করে।—তাই 'ভাবে—হাসে-কাঁদে, নাচে-গায়।'

"অনেকক্ষণ ভাবে থাকা যায় না। আয়নার কাছে ব'সে কেবল মুখ দেখ্‌লে লোকে পাগল মনে ক'রবে।"

কোন্নগরের ভক্ত—শুনেছি, মহাশয় ঈশ্বর দর্শন ক'রে থাকেন, তা হ'লে আমাদের দেখিয়ে দিন।

[কর্ম বা সাধনা না ক'রলে ঈশ্বর দর্শন হয় না]

শ্রীরামকৃষ্ণ—সবই ঈশ্বরাধীন—মানুষে কি কর্‌বে? তাঁর নাম কর্‌তে কর্‌তে কখনও ধারা পড়ে, কখনও পড়ে না। তাঁর ধ্যান করতে এক এক দিন বেশ উদ্দীপনা হয়—আবার একদিন কিছুই হলো না।

"কর্ম চাই, তবে দর্শন হয়। একদিন ভাবে হালদার পুকুর* দেখ্‌লুম। দেখি, একজন ছোটলোক পানা ঠেলে জল নিচ্ছে, আর হাতে তুলে এক একবার দেখ্‌ছে। যেন দেখালে, পানা না ঠেল্‌লে জল দেখা যায় না—কর্ম না করলে ভক্তি লাভ হয় না, ঈশ্বর দর্শন হয় না। ধ্যান, জপ এই সব কর্ম, তাঁর নাম গুণকীর্তনও কর্ম—আবার দান, যজ্ঞ এ সবও কর্ম।

"মাখন যদি চাও, তবে দুধকে দই পাত্‌তে হয়। তার পর নির্জনে রাখ্‌তে হয়। তারপর দই বস্‌লে পরিশ্রম ক'রে মন্থন ক'রতে হয়। তবে মাখন তোলা হয়।"

মহিমাচরণ—আজ্ঞা হাঁ, কর্ম চাই বই কি! অনেক খাট্‌তে হয়, তবে লাভ হয়। পড়তেই কত হয়! অনন্ত শাস্ত্র!

[আগে বিদ্যা (জ্ঞান বিচার)—না আগে ঈশ্বর লাভ?]

শ্রীরামকৃষ্ণ (মহিমার প্রতি)—শাস্ত্র কত পড়বে? শুধু বিচার করলে কি হবে? আগে তাকে লাভ করবার চেষ্টা কর, গুরুবাক্যে বিশ্বাস ক'রে কিছু কর্ম কর। গুরু না থাকেন, তাঁকে ব্যাকুল হ'য়ে প্রার্থনা কর, তিনি কেমন—তিনিই জানিয়ে দিবেন।

"বই পড়ে কি জানবে? যতক্ষণ না হাটে পৌঁছান যায় ততক্ষণ দূর হ'তে কেবল হো হো শব্দ। হাটে পৌঁছিলে আর এক রকম। তখন স্পষ্ট দেখ্‌তে পাবে, শুনতে পাবে। 'আলু নাও' 'পয়সা দাও' স্পষ্ট শুনতে পাবে।

"সমুদ্র দূর হ'তে হো হো শব্দ ক'রছে। কাছে গেলে কত জাহাজ যাচ্ছে, পাখী উড়ছে, ঢেউ হচ্ছে—দেখতে পাবে।

"বই পড়ে ঠিক অনুভব হয় না। অনেক তফাত। তাঁকে দর্শনের পর বই, শাস্ত্র, সায়েন্স সব খড়কুটো বোধ হয়।

"বড়বাবুর সঙ্গে আলাপ দরকার। তাঁর ক'খানা বাড়ি, ক'টা বাগান, কত কোম্পানির কাগজ, এ আগে জানবার জন্য অত ব্যস্ত কেন? চাকরদের কাছে গেলে তারা দাঁড়াতেই দেয় না,—কোম্পানির কাগজের খবর কি দিবে! কিন্তু যো-সো ক'রে বড়বাবুর সঙ্গে একবার আলাপ কর, ধাক্কা খেয়েই হোক, আর বেড়া ডিঙিয়েই হোক,—তখন কত বাড়ি, কত বাগান, কত কোম্পানির কাগজ, তিনিই ব'লে দিবেন। বাবুর সঙ্গে আলাপ হ'লে আবার চাকর, দ্বারবান্‌ সব সেলাম ক'রবে।"† (সকলের হাস্য)।

---

* হুগলী জেলার অন্তঃপাতী কামারপুকুর গ্রামে ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণের বাড়ি। সেই বাড়ির সম্মুখে হালদারপুকুর, একটি দীঘি বিশেষ।

† "Seek ye first the kingdom of Heaven and all other things shall be added unto you."

ভক্ত—এখন বড়বাবুর সঙ্গে আলাপ কিসে হয়? (সকলের হাস্য)।

শ্রীরামকৃষ্ণ—তাই কর্ম চাই। ঈশ্বর আছেন ব'লে বসে থাকলে হবে না। যো সো ক'রে তাঁর কাছে যেতে হবে। নির্জনে তাঁকে ডাকো, প্রার্থনা কর; 'দেখা দাও' বলে ব্যাকুল হ'য়ে কাঁদো। কামিনী-কাঞ্চনের জন্য পাগল হ'য়ে বেড়াতে পারো; তবে তাঁর জন্য একটু পাগল হও। লোকে বলুক যে ঈশ্বরের জন্য অমুক পাগল হ'য়ে গেছে। দিন কতক না হয় সব ত্যাগ ক'রে তাঁকে একলা ডাকো।

"শুধু তিনি আছেন' ব'লে বসে থাকলে কি হবে? হালদার পুকুরে বড় মাছ আছে। পুকুরের পাড়ে শুধু ব'সে থাকলে কি মাছ পাওয়া যায়? চার করো, চারা ফেলো। ক্রমে গভীর জল থেকে মাছ আস্‌বে আর জল নড়বে। তখন আনন্দ হবে। হয়তো মাছটার খানিকটা একবার দেখা গেলো—মাছটা ধপাঙ ক'রে উঠলো। যখন দেখা গেল, তখন আরো আনন্দ।

"দুধকে দই পেতে মন্থন করলে তবে তো মাখন পাবে।

(মহিমার প্রতি)—"এ তো ভাল বালাই হ'লো! ঈশ্বরকে দেখিয়ে দাও, আর উনি চুপ ক'রে বসে থাকবেন। মাখন তুলে মুখের কাছে ধরো। (সকলের হাস্য।) ভাল বালাই—মাছ ধ'রে হাতে দাও।

"একজন রাজাকে দেখতে চায়। রাজা আছেন সাত দেউড়ীর পরে। প্রথম দেউড়ী পার না হ'তে হ'তে বলে 'রাজা কই?' যেমন আছে, এক-একটা দেউড়ী তো পার হতে হবে!"

[ঈশ্বরলাভের উপায়—ব্যাকুলতা]

মহিমাচরণ—কি কর্মের দ্বারা তাঁকে পাওয়া যেতে পারে?

শ্রীরামকৃষ্ণ—এই কর্মের দ্বারা তাঁকে পাওয়া যাবে, আর এ কর্মের দ্বারা পাওয়া যাবে না, তা নয়। তাঁর কৃপার উপর নির্ভর। তবে ব্যাকুল হ'য়ে কিছু কর্ম ক'রে যেতে হয়। ব্যাকুলতা থাক্‌লে তাঁর কৃপা হয়।

"একটা সুযোগ হওয়া চাই। সাধুসঙ্গ, বিবেক, সদ্‌গুরু লাভ, হয় তো একজন বড় ভাই সংসারের ভার নিলে; হয় তো স্ত্রীটি বিদ্যা-শক্তি, বড় ধার্মিক; কি বিবাহ আদপেই হলো না, সংসারে বদ্ধ হ'তে হ'লো না;—এই সব যোগাযোগ হ'লে হ'য়ে যায়।

"একজনের বাড়িতে ভারী অসুখ—যায় যায়। কেউ বললে স্বাতী নক্ষত্রে বৃষ্টি পড়বে, সেই বৃষ্টির জল মড়ার মাথার খুলিতে থাক্‌বে, আর একটা সাপ ব্যাঙকে তেড়ে যাবে, ব্যাঙকে ছোবল মারবার সময় ব্যাঙটা যাই লাফ দিয়ে পালাবে, অমনি সেই সাপের বিষ মড়ার খুলিতে পড়ে যাবে; সেই বিষের ঔষধ তৈয়ার করে যদি খাওয়াতে পার, তবে বাঁচে। তখন যার বাড়িতে অসুখ, সেই লোক দিন-ক্ষণ-নক্ষত্র দেখে বাড়ি থেকে বেরুলো, আর ব্যাকুল হ'য়ে ঐ সব

খুঁজতে লাগলো। মনে মনে ঈশ্বরকে ডাক্‌ছে, 'ঠাকুর! তুমি যদি জোটপাট ক'রে দাও, তবেই হয়!' এইরূপে যেতে সত্য-সত্যই দেখতে পেলে, একটা মড়ার মাথার খুলি পড়ে রয়েছে। দেখতে দেখতে এক পশলা বৃষ্টিও হ'ল। তখন সে ব্যক্তি বলছে, 'হে গুরুদেব! মড়ার মাথার খুলিও পেলুম, আবার স্বাতীনক্ষত্রে বৃষ্টিও হ'লো, সেই বৃষ্টির জলও ঐ খুলিতে প'ড়েছে; এখন কৃপা করে আর কয়টির যোগাযোগ ক'রে দাও ঠাকুর।' ব্যাকুল হয়ে ভাবছে। এমন সময় দেখে একটা বিষধর সাপ আস্‌ছে। তখন সে লোকটির ভারী আহ্লাদ হ'ল; আর সে এত ব্যাকুল হলো যে বুক দুর্‌ দুর্‌ করতে লাগলো; আর সে বলতে লাগলো, 'হে গুরুদেব! এবার সাপও এসেছে; অনেকগুলির যোগাযোগও হ'ল। কৃপা ক'রে এখন আর যেগুলি বাকী আছে, সেগুলি করিয়ে দাও! বল্‌তে বল্‌তে ব্যাঙও এলো, সাপটা ব্যাঙ তাড়া ক'রে যেতেও লাগলো; মড়ার মাথার খুলির কাছে এসে যাই ছোবল দিতে যাবে, ব্যাঙটা লাফিয়ে ওদিকে গিয়ে প'ড়লো আর বিষ অমনি খুলির ভিতর প'ড়ে গেল। তখন লোকটি আনন্দে হাততালি দিয়ে নাচতে লাগলো।

"তাই বল্‌ছি ব্যাকুলতা থাকলে সব হ'য়ে যায়।"

চতুর্থ পরিচ্ছেদ

সন্ন্যাস ও গৃহস্থাশ্রম—ঈশ্বরলাভ ও ত্যাগ—ঠিক সন্ন্যাসী কে?

শ্রীরামকৃষ্ণ—মন থেকে সব ত্যাগ না হ'লে ঈশ্বর লাভ হয় না। সাধু সঞ্চয় কর্‌তে পারে না। সঞ্চয় না করে 'পন্‌ছী আউর দরবেশ।' পাখী আর সাধু সঞ্চয় করে না। এখানকার ভাব,—হাতে মাটি দেবার জন্য মাটি নিয়ে যেতে পারি না। বেটুয়াটা ক'রে পান আনবার যো নাই। হৃদে যখন বড় যন্ত্রণা দিচ্ছে, তখন এখান থেকে কাশী চলে যাবো মতলব হ'ল। ভাবলুম কাপড় লব—কিন্তু টাকা কেমন করে লব? আর কাশী যাওয়া হ'ল না। (সকলের হাস্য)।

(মহিমার প্রতি)—"তোমরা সংসারী, তোমরা এও রাখ, অও রাখ। সংসারও রাখ, ধর্মও রাখ।"

মহিমা—'এ, ও' কি আর থাকে?

শ্রীরামকৃষ্ণ—আমি পঞ্চবটীর কাছে গঙ্গার ধারে 'টাকা মাটি, মাটিই টাকা, টাকাই মাটি,' এই বিচার করতে করতে যখন টাকা গঙ্গার জলে ফেলে দিলুম, তখন একটু ভয় হ'ল। ভাবলুম, আমি কি লক্ষ্মীছাড়া হলুম! মা লক্ষ্মী যদি খ্যাট বন্ধ ক'রে দেন, তা হলে কি হবে। তখন হাজরার মত পাটোয়ারী করলুম। বললুম, মা! তুমি যেন হৃদয়ে থেকো! একজন তপস্যা ক'রাতে ভগবতী সন্তুষ্ট

হ'য়ে বললেন, তুমি বর লও। সে বল্‌লে, মা যদি বর দিবে, তবে এই কর যেন আমি নাতির সঙ্গে সোনার থালে ভাত খাই। এক বরেতে নাতি, ঐশ্বর্য, সোনার থাল সব হ'ল! (সকলের হাস্য)।

"মন থেকে কামিনী-কাঞ্চন ত্যাগ হ'লে ঈশ্বরে মন যায়, মন গিয়ে লিপ্ত হয়। যিনিই বদ্ধ, তিনিই মুক্ত হ'তে পারেন। ঈশ্বর থেকে বিমুখ হ'লেই বদ্ধ—নিক্‌তির নীচের কাঁটা উপরের কাঁটা থেকে তফাৎ হয় কখন, যখন নিক্‌তির বাটিতে কামিনী-কাঞ্চনের ভার পড়ে।

"ছেলে ভূমিষ্ঠ হ'য়ে কেন কাঁদে? 'গর্ভে ছিলাম, যোগে ছিলাম।' ভূমিষ্ঠ হ'য়ে এই ব'লে কাঁদে—কাঁহা এ, কাঁহা এ; এ কোথায় এলুম, ঈশ্বরের পাদপদ্ম চিন্তা ক'রছিলাম, এ আবার কোথায় এলাম।

"তোমাদের পক্ষে মনে ত্যাগ—সংসার অনাসক্ত হ'য়ে কর।"

[সংসার ত্যাগ কি দরকার]

মহিমা—তাঁর উপর মন গেলে আর কি সংসার থাকে?

শ্রীরামকৃষ্ণ—সে কি? সংসারে থাকবে না তো কোথায় যাবে? আমি দেখছি যেখানে থাকি, রামের অযোধ্যায় আছি। এই জগৎ সংসার রামের অযোধ্যা। রামচন্দ্র গুরুর কাছে জ্ঞানলাভ করবার পর বললেন, আমি সংসার ত্যাগ ক'রবো। দশরথ তাঁকে বুঝাবার জন্য বশিষ্ঠকে পাঠালেন। বশিষ্ঠ দেখলেন, রামের তীব্র বৈরাগ্য। তখন বললেন, 'রাম, আগে আমার সঙ্গে বিচার কর, তারপর সংসার ত্যাগ ক'রো। আচ্ছা, জিজ্ঞাসা করি, সংসার কি ঈশ্বর ছাড়া? তা যদি হয় তুমি ত্যাগ কর।' রাম দেখলেন, ঈশ্বরই জীব জগৎ সব হয়েছেন। তাঁর সত্তাতে সমস্ত সত্য ব'লে বোধ হচ্ছে। তখন রামচন্দ্র চুপ ক'রে রইলেন।

"সংসারে কাম, ক্রোধ এই সবের সঙ্গে যুদ্ধ করতে হয়, নানা বাসনার সঙ্গে যুদ্ধ করতে হয়, আসক্তির সঙ্গে যুদ্ধ করতে হয়। যুদ্ধ কেল্লা থেকে হ'লেই সুবিধা! গৃহ থেকে যুদ্ধই ভাল;—খাওয়া মেলে, ধর্মপত্নী অনেক রকম সাহায্য ক'রে। কলিতে অন্নগত প্রাণ—অন্নের জন্য; সাত জায়গায় ঘুরার চেয়ে এক জায়গাই ভাল। গৃহ কেল্লার ভিতরে থেকে যেন যুদ্ধ করা।

"আর সংসারে থাকো ঝড়ের এ'টো পাত হ'য়ে। ঝড়ের এ'টো পাতাকে কখনও ঘরের ভিতর লয়ে যায়, কখনও আঁস্তাকুড়ে। হাওয়া যেদিকে যায়, পাতাও সেইদিকে যায়। কখনও ভাল জায়গায়, কখনও মন্দ জায়গায়! তোমাকে এখন সংসারে ফেলেছেন; ভাল, এখন সেই স্থানেই থাকো—আবার যখন সেখান থেকে তুলে ওর চেয়ে ভাল জায়গায় লয়ে ফেলবেন, তখন যা হয় হবে।

[সংসারে আত্মসমর্পণ (Resignation) —রামের ইচ্ছা]

"সংসারে রেখেছেন তা কি করবে? সমস্ত তাঁকে সমর্পণ করো—তাঁকে আত্মসমর্পণ করো। তা হ'লে আর কোন গোল থাকবে না। তখন দেখবে, তিনিই সব করছেন। সবই রামের ইচ্ছা।"

একজন ভক্ত—'রামের ইচ্ছা' গল্পটি কি?

শ্রীরামকৃষ্ণ—কোন এক গ্রামে একটি তাঁতী থাকে। বড় ধার্মিক, সকলেই তাকে বিশ্বাস করে আর ভালবাসে। তাঁতী হাটে গিয়ে কাপড় বিক্রী করে। খরিদ্দার দাম জিজ্ঞাসা করলে বলে, রামের ইচ্ছা, সুতার দাম এক টাকা, রামের ইচ্ছা মেহনতের দাম চারি আনা, রামের ইচ্ছা, মুনাফা দুই আনা। কাপড়ের দাম রামের ইচ্ছা এক টাকা ছয় আনা। লোকের এত বিশ্বাস যে, তৎক্ষণাৎ দাম ফেলে দিয়ে কাপড় নিত। লোকটি ভারী ভক্ত, রাত্রিতে খাওয়াদাওয়ার পরে অনেকক্ষণ চণ্ডীমণ্ডপে বসে ঈশ্বর চিন্তা করে, তাঁর নামগুণ কীর্তন করে। একদিন অনেক রাত হয়েছে, লোকটির ঘুম হচ্ছে না, বসে আছে, এক একবার তামাক খাচ্ছে; এমন সময় সেই পথ দিয়ে একদল ডাকাত ডাকাতি করতে যাচ্ছে। তাদের মুটের অভাব হওয়াতে ঐ তাঁতীকে এসে বললে, আয় আমাদের সঙ্গে—এই ব'লে হাত ধ'রে টেনে নিয়ে চললো। তারপর একজন গৃহস্থের বাড়ি গিয়ে ডাকাতি ক'রলে। কতকগুলো জিনিস তাঁতীর মাথায় দিলে। এমন সময় পুলিশ এসে পড়লো। ডাকাতেরা পালাল, কেবল তাঁতীটি মাথায় মোট ধরা পড়লো। সে রাত্রি তাকে হাজতে রাখা হ'লো। পরদিন ম্যাজিষ্টার সাহেবের কাছে বিচার। গ্রামের লোক জানতে পেরে সব এসে উপস্থিত। তাঁরা সকলে বললে, 'হুজুর! এ লোক কখনও ডাকাতি করতে পারে না।' সাহেব তখন তাঁতীকে জিজ্ঞাসা করলে, 'কিগো, তোমার কি হয়েছে বল।' তাঁতী বললে, হুজুর! রামের ইচ্ছা, আমি রাত্রিতে ভাত খেলুম। তারপর রামের ইচ্ছা, আমি চণ্ডীমণ্ডপে ব'সে আছি, রামের ইচ্ছা, অনেক রাত হল। আমি, রামের ইচ্ছা, তাঁর চিন্তা ক'রছিলাম আর তাঁর নাম গুণ গান করছিলাম। এমন সময়ে রামের ইচ্ছা, একদল ডাকাত সেই পথ দিয়ে যাচ্ছিল। রামের ইচ্ছা তারা আমায় ধ'রে টেনে ল'য়ে গেল। রামের ইচ্ছা, তারা এক গৃহস্থের বাড়ি ডাকাতি করলে। রামের ইচ্ছা, আমার মাথায় মোট দিলে। এমন সময় রামের ইচ্ছা, পুলিশ এসে পড়ল। রামের ইচ্ছা, আমি ধরা পড়লুম। তখন রামের ইচ্ছা, পুলিশের লোকেরা হাজতে দিল। আজ সকালে রামের ইচ্ছা, হুজুরের কাছে এনেছে।'

"অমন ধার্মিক লোক দেখে, সাহেব তাঁতীটিকে ছেড়ে দিবার হুকুম দিলেন। তাঁতী রাস্তায় বন্ধুদের বল্‌লে, রামের ইচ্ছা, আমাকে ছেড়ে দিয়েছে। সংসার করা, সন্ন্যাস করা, সবই রামের ইচ্ছা। তাই তাঁর উপর সব ফেলে দিয়ে সংসারে কাজ কর।

"তা না হ'লে আর কিই বা করবে?"

"একজন কেরাণী জেলে গিছিল। জেল খাটা শেষ হ'লে, সে জেল থেকে বেরিয়ে এল। এখন জেল থেকে এসে, সে কি কেবল ধেই ধেই ক'রে নাচবে? না, কেরাণীগিরিই করবে?

"সংসারী যদি জীবন্মুক্ত হয়, সে মনে করলে অনায়াসে সংসারে থাক্‌তে পারে। যার জ্ঞান লাভ হ'য়েছে, তার এখান সেখান নাই। তার সব সমান। যার সেখানে আছে, তার এখানেও আছে।

[পূর্বকথা—কেশব সেনের সঙ্গে কথা—সংসারে জীবন্মুক্ত]

"যখন কেশব সেনকে বাগানে প্রথম দেখলুম, ব'লেছিলাম—'এরই ল্যাজ খ'সেছে।' সভাশুদ্ধ লোক হেসে উঠ্‌লো। কেশব বল্‌লে, তোমরা হেসো না, এর কিছু মানে আছে, এঁকে জিজ্ঞাসা করি। আমি বল্‌লাম, যতদিন বেঙাচির ল্যাজ না খসে, ততদিন কেবল জলে থাক্‌তে হয়, আড়ায় উঠে ডাঙ্গায় বেড়াতে পারে না; যেই ল্যাজ খসে, অমনি লাফ দিয়ে ডাঙ্গায় পড়ে। তখন জলেও থাকে, আবার ডাঙ্গায়ও থাকে। তেমনি মানুষের যতদিন অবিদ্যার ল্যাজ না খসে, ততদিন সংসার জলে পড়ে থাকে। অবিদ্যার ল্যাজ খস্‌লে—জ্ঞান হ'লে, তবে মুক্ত হ'য়ে বেড়াতে পারে, আবার ইচ্ছা হ'লে সংসারে থাকতে পারে।"

পঞ্চম পরিচ্ছেদ

গৃহস্থাশ্রমকথা প্রসঙ্গে—নির্লিপ্ত সংসারী

শ্রীযুক্ত মহিমাচরণাদি ভক্তেরা বসিয়া শ্রীরামকৃষ্ণের হরিকথামৃত পান করিতেছেন। কথাগুলি যেন বিবিধ বর্ণের মণিরত্ন, যে যত পারেন কুড়াইতেছেন—কিন্তু কোঁচড় পরিপূর্ণ হয়েছে, এত ভার বোধ হচ্ছে যে উঠা যায় না। ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র আধার, আর ধারণা হয় না। সৃষ্টি হইতে এ পর্যন্ত যত বিষয়ে মানুষের হৃদয়ে যত রকম সমস্যা উদয় হয়েছে, সব সমস্যা পূরণ হইতেছে। পদ্মলোচন, নারায়ণ শাস্ত্রী, গৌরী পণ্ডিত, দয়ানন্দ সরস্বতী ইত্যাদি শাস্ত্রবিৎ পণ্ডিতেরা অবাক হয়েছেন। দয়ানন্দ শ্রীরামকৃষ্ণকে যখন দর্শন করেন ও তাঁহার সমাধি অবস্থা দেখিলেন, তখন আক্ষেপ ক'রে বলেছিলেন, আমরা এত বেদ বেদান্ত কেবল প'ড়েছি, কিন্তু এই মহাপুরুষে তার ফল দেখিতেছি; এঁকে দেখে প্রমাণ হ'লো যে পণ্ডিতেরা কেবল শাস্ত্র মন্থন ক'রে ঘোলটা খান, এরূপ মহাপুরুষেরা মাখনটা সমস্ত খান। আবার ইংরাজী পড়া কেশবচন্দ্র সেনাদি পণ্ডিতেরাও ঠাকুরকে দেখে অবাক হয়েছেন। ভাবেন, কি আশ্চর্য, নিরক্ষর ব্যক্তি এ সব কথা কিরূপে বল্‌ছেন। এ যে ঠিক যীশুখৃষ্টের মত কথা! গ্রাম্য ভাষা! সেই গল্প ক'রে ক'রে বুঝান—যাতে পুরুষ স্ত্রী ছেলে সকলে অনায়াসে বুঝতে পারে। যীশু ফাদার (পিতা) ফাদার (পিতা) ক'রে পাগল হয়েছিলেন, ইনি মা মা ক'রে পাগল।

শুধু জ্ঞানের অক্ষয় ভাণ্ডার নহে,—ঈশ্বরপ্রেম 'কলসে কলসে ঢালে তবু না ফুরায়।' ইনিও যীশুর মত ত্যাগী, তাঁহারই মত ইঁহারও জ্বলন্ত বিশ্বাস। তাই কথাগুলির এত জোর। সংসারী লোক বললে তো এর জোর হয় না; কেন না তারা ত্যাগী নয়, তাদের জ্বলন্ত বিশ্বাস কই? কেশব সেনাদি পণ্ডিতেরা আরো ভাবেন,—এই নিরক্ষর লোকের এত উদার ভাব কেমন ক'রে হ'ল! কি আশ্চর্য। কোনরূপ বিদ্বেষভাব নাই! সব ধর্মাবলম্বীদের আদর করেন—কাহারও সহিত ঝগড়া নাই।

আজ মহিমাচরণের সহিত ঠাকুরের কথাবার্ত্তা শুনিয়া কোন ভক্ত ভাবছেন, ঠাকুর তো সংসার ত্যাগ করতে বল্‌লেন না—বরং বল্‌ছেন সংসার কেল্লাস্বরূপ, এই কেল্লায় থেকে কাম, ক্রোধ ইত্যাদি সহিত যুদ্ধ করিতে পারা যায়। আবার বল্‌ছেন, সংসারে থাকবে না তো কোথায় যাবে? কেরাণী জেল থেকে বেরিয়ে এসে কেরাণীর কাজই করে। অতএব এক রকম বলা হ'লো জীবন্মুক্ত সংসারেও থাক্‌তে পারে। আদর্শ—কেশব সেন? তাঁকে বলেছিলেন, 'তোমারই ল্যাজ খসেছে—আর কারুর হয় নাই।' কিন্তু একটা কথা আছে, ঠাকুর কেবল বল্‌ছেন, মাঝে মাঝে নির্জনে থাক্‌তে হবে। চারা গাছে বেড়া দিতে হবে—নচেৎ ছাগল-গরুতে খেয়ে ফেলবে। গাছের গুঁড়ি হয়ে গেলে চারিদিকের বেড়া ভেঙে দাও আর না দাও; এমন কি হাতী বেঁধে দিলেও গাছের কিছু হবে না। নির্জনে থেকে থেকে জ্ঞান লাভ ক'রে—ঈশ্বরে ভক্তি লাভ ক'রে সংসারে এসে থাকলে কিছু ভয় নাই। তাই নির্জনবাস কথাটি কেবল ব'লছেন।

ভক্তেরা এইরূপ চিন্তা করিতেছেন। শ্রীরামকৃষ্ণ কেশবের কথার পর, আর দু-একটি সংসারী ভক্তের কথা বলিতেছেন।

[শ্রীদেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর—যোগ ও ভোগ]

শ্রীরামকৃষ্ণ (মহিমাচরণাদির প্রতি)—আবার সেজোবাবুর* সঙ্গে দেবেন্দ্র ঠাকুরকে দেখ্‌তে গিছিলাম। সেজোবাবুকে বললুম, 'আমি শুনেছি দেবেন্দ্র ঠাকুর ঈশ্বর চিন্তা করে, আমার তাকে দেখবার ইচ্ছা হয়।' সেজোবাবু বললে 'আচ্ছা বাবা, আমি তোমায় নিয়ে যাব; আমরা হিন্দু কলেজে এক ক্লাসে প'ড়তুম, আমার সঙ্গে বেশ ভাব আছে।' সেজোবাবুর সঙ্গে অনেক দিন পরে দেখা হ'ল। দেখে দেবেন্দ্র বল্‌লে তোমার একটু বদ্‌লেছে—তোমার ভুঁড়ি হয়েছে। সেজোবাবু আমার কথা বলল, ইনি তোমায় দেখতে এসেছেন—ইনি ঈশ্বর ঈশ্বর ক'রে পাগল। আমি লক্ষণ দেখবার জন্য দেবেন্দ্রকে বল্‌লুম, 'দেখি গা, তোমার গা।' দেবেন্দ্র গায়ের জামা তুল্‌লে, দেখলাম—গৌরবর্ণ, তার উপর সিঁদুর ছড়ান। তখন দেবেন্দ্রের চুল পাকে নাই।

---

* সেজোবাবু—রাণী রাসমণির জামাতা, শ্রীযুক্ত মথুরানাথ বিশ্বাস। ঠাকুরকে প্রথমাবধি শাতিশয় ভক্তি ও শিষ্যের ন্যায় সেবা করিতেন।

"প্রথম যাবার পর একটু অভিমান দেখেছিলাম। তা হবে না গা? অত ঐশ্বর্য বিদ্যা, মান সম্ভ্রম? অভিমান দেখে সেজোবাবুকে বললুম, আচ্ছা, অভিমান জ্ঞানে হয়, না অজ্ঞানে হয়? যার ব্রহ্মজ্ঞান হয়েছে তার কি 'আমি পণ্ডিত', 'আমি জ্ঞানী', 'আমি ধনী'; বলে অভিমান থাকতে পারে?

"দেবেন্দ্রর সঙ্গে কথা কইতে কইতে আমার হঠাৎ সেই অবস্থাটি হ'ল। সেই অবস্থাটি হ'লে কে কিরূপ লোক দেখতে পাই। আমার ভিতর থেকে হী হী ক'রে একটা হাসি উঠল। যখন ঐ অবস্থাটা হয়, তখন পণ্ডিত-ফণ্ডিত তৃণ জ্ঞান হয়! যদি দেখি, পণ্ডিতের বিবেকবৈরাগ্য নাই, তখন খড়-কুটোর মত বোধ হয়। তখন দেখি যেন শকুনি খুব উঁচুতে উঠেছে কিন্তু ভাগাড়ের দিকে নজর।

"দেখলাম, যোগ ভোগ দুই-ই আছে; অনেক ছেলেপুলে, ছোট ছোট; ডাক্তার এসেছে; তবেই হ'লো, অত জ্ঞানী হ'য়ে সংসার নিয়ে সর্বদা থাকতে হয়। বললুম, তুমি কলির জনক। 'জনক এদিক উদিক দু'দিক রেখে খেয়েছিল দুধের বাটি।' তুমি সংসারে থেকে ঈশ্বরে মন রেখেছো শুনে তোমায় দেখতে এসেছি; আমায় ঈশ্বরীয় কথা কিছু শুনাও।

"তখন বেদ থেকে কিছু কিছু শুনালে। বললে, এই জগৎ যেন একটি ঝাড়ের মত, আর জীব হয়েছে—এক-একটি ঝাড়ের দীপ। আমি এখানে পঞ্চবটীতে যখন ধ্যান করতুম ঠিক ঐ রকম দেখেছিলাম। দেবেন্দ্রের কথার সঙ্গে মিলল দেখে ভাবলুম, তবে তো খুব বড়লোক। ব্যাখ্যা করতে বললুম—তা বললে 'এ জগৎ কে জানতো?—ঈশ্বর মানুষ করেছেন, তাঁর মহিমা প্রকাশ করবার জন্য। ঝাড়ের আলো না থাকলে সব অন্ধকার, ঝাড় পর্যন্ত দেখা যায় না।

[ব্রাহ্মসমাজে 'অসভ্যতা'—কাপ্তেন, ভক্ত গৃহস্থ]

"অনেক কথাবার্তার পর দেবেন্দ্র খুশি হ'য়ে বললে, 'আপনাকে উৎসবে (ব্রহ্মোৎসব) আসতে হবে!' আমি বললাম, সে ঈশ্বরের ইচ্ছা; আমার তো এই অবস্থা দেখছো!—কখন কি ভাবে তিনি রাখেন।' দেবেন্দ্র বললে, 'না আসতে হবে; তবে ধুতি আর উড়ানি পরে এসো,—তোমাকে এলোমেলো দেখে কেউ কিছু বললে, আমার কষ্ট হবে।' আমি বললাম, 'তা পারবো না। আমি বাবু হ'তে পারবো না।' দেবেন্দ্র, সেজোবাবু সব হাসতে লাগলো।

"তার পর দিনই সেজোবাবুর কাছে দেবেন্দ্রের চিঠি এলো—আমাকে উৎসব দেখতে যেতে বারণ ক'রেছে। বলে—অসভ্যতা হবে, গায়ে উড়ানি থাকবে না। (সকলের হাস্য)।

(মহিমার প্রতি)—"আর একটি আছে—কাপ্তেন*। সংসারী বটে, কিন্তু ভারী ভক্ত। তুমি আলাপ ক'রো।

"কাপ্তেনের বেদ, বেদান্ত, শ্রীমদ্ভাগবত, গীতা, অধ্যাত্ম, এ সব কন্ঠস্থ। তুমি আলাপ ক'রে দেখো।

"খুব ভক্তি! আমি বরাহনগরে রাস্তা দিয়ে যাচ্ছি, তা আমায় ছাতা ধরে! ওর বাড়িতে লয়ে গিয়ে কত যত্ন! বাতাস করে—পা টিপে দেয়—আর নানা তরকারী ক'রে খাওয়ায়। আমি একদিন ওর বাড়িতে পাইখানায় বেহুঁশ হ'য়ে গেছি। ও তো অত আচারী, পাইখানার ভিতর আমার কাছে গিয়ে পা ফাঁক করে বসিয়ে দেয়। অত আচারী, ঘৃণা ক'রলে না।

"কাপ্তেনের অনেক খরচা। কাশীতে ভায়েরা থাকে, তাদের দিতে হয়। মাগ আগে কৃপণ ছিল, এখন এত বিব্রত হয়েছে যে সব রকম খরচ করতে পারে না।

"কাপ্তেনের পরিবার আমায় বললে যে, সংসার ওঁর ভাল লাগে না। তাই মাঝে বলেছিল, সংসার ছেড়ে দেবো। মাঝে মাঝে ছেড়ে দেবো, ছেড়ে দেবো, ক'রতো।

"ওদের বংশই ভক্ত। বাপ লড়ায়ে যেতো। শুনেছি লড়ায়ের সময় এক হাতে শিব পূজা, এক হাতে তরবার খোলা, যুদ্ধ ক'রতো।

"লোকটা ভারী আচারী। আমি কেশব সেনের কাছে যেতুম, তাই এখানে একমাস আসে নাই। বলে, কেশব সেন ভ্রষ্টাচার—ইংরাজের সঙ্গে খায়, ভিন্ন জাতে মেয়ের বিয়ে দিয়েছে, জাত নাই। আমি বল্‌লুম, আমার সে সবের দরকার কি? কেশব হরিনাম করে, দেখতে যাই, ঈশ্বরীয় কথা শুনতে যাই—আমি কুলটি খাই, কাঁটায় আমার কি কাজ? তবুও আমায় ছাড়ে না; বলে তুমি কেশব সেনের ওখানে কেন যাও? তখন আমি বললুম, একটু বিরক্ত হ'য়ে, আমি তো টাকার জন্য যাই না—আমি হরিনাম শুনতে যাই—আর তুমি লাট সাহেবের বাড়িতে যাও কেমন করে? তারা ম্লেচ্ছ, তাদের সঙ্গে থাকো কেমন ক'রে? এই সব বলার পর একটু থামে।

"কিন্তু খুব ভক্তি। যখন পূজা করে, কর্পূরের আরতি করে। আর পূজা ক'রতে ক'রতে আসনে বসে স্তব করে। তখন আর একটি মানুষ। যেন তন্ময় হ'য়ে যায়।"

---

*শ্রীবিশ্বনাথ উপাধ্যায়, নেপাল নিবাসী, নেপালের রাজার উকিল, কলকাতায় থাকিতেন। অতি সদাচারনিষ্ঠ ব্রাহ্মণ ও পরম ভক্ত।

ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ

বেদান্তবিচারে—মায়াবাদ ও শ্রীরামকৃষ্ণ

শ্রীরামকৃষ্ণ (মহিমাচরণের প্রতি)—বেদান্ত বিচারে, সংসার মায়াময়,—স্বপ্নের মত, সব মিথ্যা। যিনি পরমাত্মা, তিনি সাক্ষিস্বরূপ—জাগ্রত, স্বপ্ন, সুষুপ্তি তিন অবস্থারই সাক্ষিস্বরূপ। এ সব তোমার ভাবের কথা। স্বপ্নও যত সত্য, জাগরণও সেইরূপ সত্য। একটা গল্প বলি শুন। তোমার ভাবের—

"এক দেশে একটি চাষা থাকে। ভারী জ্ঞানী। চাষ-বাস করে—পরিবার আছে, একটি ছেলে অনেক দিন পরে হ'য়েছে; নাম হারু। ছেলেটার উপর বাপ মা দুজনেরই ভালবাসা; কেন না, সবে ধন নীলমণি। চাষাটি ধার্মিক, গাঁয়ের সব লোকেই ভালবাসে। একদিন মাঠে কাজ করছে এমন সময় একজন এসে খপর দিলে, হারুর কলেরা হয়েছে। চাষাটি বাড়ি গিয়ে অনেক চিকিৎসা করালে কিন্তু ছেলেটি মারা গেল। বাড়ির সকলে শোকে কাতর হ'লো কিন্তু চাষাটির যেন কিছুই হয় নাই। উল্টে সকলকে বুঝায় যে, শোক ক'রে কি হবে? তারপর আবার চাষ ক'রতে গেল। বাড়ি ফিরে এসে দেখে, পরিবার আরও কাঁদছে। পরিবার বললে, তুমি নিষ্ঠুর—ছেলেটার জন্য একবার কাঁদলেও না? চাষা তখন স্থির হ'য়ে বললে, কেন কাঁদছি না বলবো? আমি কাল একটা ভারী স্বপ্ন দেখেছি। দেখ্‌লাম যে, রাজা হ'য়েছি আর আট ছেলের বাপ হ'য়েছি—খুব সুখে আছি। তারপর ঘুম ভেঙ্গে গেল। এখন মহা ভাবনায় পড়েছি—আমার সেই আট ছেলের জন্য শোক করবো, না, তোমার এই এক ছেলে হারুর জন্য শোক করবো?

"চাষা জ্ঞানী, তাই দেখছিল স্বপ্ন অবস্থাও যেমন মিথ্যা, জাগরণ অবস্থাও তেমনি মিথ্যা; এক নিত্যবস্তু সেই আত্মা।

"আমি সবই লই। তুরীয় আবার জাগ্রত, স্বপ্ন, সুষুপ্তি। আমি তিন অবস্থাই লই। ব্রহ্ম আবার মায়া, জীব, জগৎ আমি সবই লই। সব না নিলে ওজনে কম পড়ে।"

একজন ভক্ত—ওজনে কেন কম পড়ে? (সকলের হাস্য)!

শ্রীরামকৃষ্ণ—ব্রহ্ম—জীবজগৎবিশিষ্ট। প্রথম নেতি নেতি করবার সময় জীব-জগৎকে ছেড়ে দিতে হয়। অহং বুদ্ধি যতক্ষণ, ততক্ষণ তিনিই সব হ'য়েছেন, এই বোধ হয়,—তিনিই চতুর্বিংশতি তত্ত্ব হয়েছেন।

"বেলের সার বলতে গেলে শাঁসই বুঝায়, তখন বীচি আর খোলা ফেলে দিতে হয়। কিন্তু বেলটা কত ওজনে ছিল ব'লতে গেলে শুধু শাঁস ওজন কর্‌লে হবে না। ওজনের সময় শাঁস, বীচি, খোলা সব নিতে হবে। যারই শাঁস, তারই বীচি, তারই খোলা।

"যাঁরই নিত্য, তাঁরই লীলা।

"তাই আমি নিত্য, লীলা সবই লই। মায়া ব'লে জগৎ সংসার উড়িয়ে দিই না। তা হ'লে যে ওজনে কম পড়বে।"

[মায়াবাদ ও বিশিষ্টাদ্বৈতবাদ—জ্ঞানযোগ ও ভক্তিযোগ]

মহিমাচরণ—এ বেশ সামঞ্জস্য,—নিত্য থেকেই লীলা, আবার লীলা থেকেই নিত্য।

শ্রীরামকৃষ্ণ—জ্ঞানীরা দেখে সব স্বপনবৎ। ভক্তেরা সব অবস্থা লয়। জ্ঞানী দুধ দেয় ছিড়িক্ ছিড়িক্ করে। (সকলের হাস্য)। এক-একটা গরু—বেছে বেছে খায়; তাই ছিড়িক্ ছিড়িক্ দুধ। যারা অত বাছে না আর সব খায়, তারা হুড়্ হুড়্ ক'রে দুধ দেয়। উত্তম ভক্ত*—নিত্য, লীলা দুই লয়। তাই নিত্য থেকে মন নেমে এলেও তাঁকে সম্ভোগ করতে পায়। উত্তম ভক্ত হুড়্ হুড়্ ক'রে দুধ দেয়। (সকলের হাস্য)।

মহিমা—তবে দুধে একটু গন্ধ হয়। (সকলের হাস্য)।

শ্রীরামকৃষ্ণ (সহাস্যে)—হয় বটে, তবে একটু আওটাতে হয়। একটু আগুনে আউটে নিতে হয়। জ্ঞানাগ্নির উপর একটু দুধটা চড়িয়ে দিতে হয়, তাহ'লে আর গন্ধটা থাকবে না। (সকলের হাস্য)।

[ওঁকার ও নিত্যলীলাযোগ]

(মহিমার প্রতি)—"ওঁকারের ব্যাখ্যা তোমরা কেবল বল 'অকার উকার মকার'।"

মহিমাচরণ—অকার, উকার, মকার—কিনা সৃষ্টি, স্থিতি, প্রলয়।

শ্রীরামকৃষ্ণ—আমি উপমা দিই ঘন্টার টং শব্দ। ট-অ-অ-ম-ম-। লীলা থেকে নিত্যে লয়; স্থূল, সূক্ষ্ম, কারণ থেকে মহাকারণে লয়। জাগ্রৎ, স্বপ্ন, সুষুপ্তি থেকে তুরীয়ে লয়। আবার ঘন্টা বাজলো, যেন মহাসমুদ্রে একটা গুরু জিনিস পড়্লো আর ঢেউ আরম্ভ হ'ল। নিত্য থেকে লীলা আরম্ভ হল, মহাকারণ থেকে স্থূল, সূক্ষ্ম, কারণ শরীর দেখা দিল—সেই তুরীয় থেকেই জাগ্রৎ, স্বপ্ন, সুষুপ্তি সব অবস্থা এসে পড়লো। আবার মহাসমুদ্রের ঢেউ মহাসমুদ্রেই লয় হ'ল। নিত্য ধ'রে ধ'রে লীলা, আবার লীলা ধরে নিত্য।† আমি টং শব্দ উপমা দিই। আমি ঠিক এই সব দেখেছি। আমায় দেখিয়ে দিয়েছে

---

* উত্তম ভক্ত—যো মাং পশ্যতি সর্বত্র সর্বঞ্চ ময়ি পশ্যতি।
তস্যাহং ন প্রণশ্যামি স চ মে ন প্রণশ্যতি।

† নিত্য ধরে লীলা— From the Absolute to the Relative, from the Infinite to the Finite—from the Undifferentiated to the Differentiated—from the Unconditioned to the Conditioned and again from the Relative to the Absolute.

চিৎসমুদ্র, অন্ত নাই। তাই থেকে এই সব লীলা উঠলো, আর ঐতেই লয় হয়ে গেল। চিদাকাশে কোটি ব্রহ্মাণ্ডের উৎপত্তি, আবার ঐতেই লয় হয়, তোমাদের বইয়ে কি আছে, অত আমি জানি না।

মহিমা—যাঁরা দেখেছেন, তাঁরা তো শাস্ত্র লেখেন নাই। তাঁরা নিজের ভাবেই বিভোর, লিখবেন কখন! লিখ্‌তে গেলেই একটু হিসাবী বুদ্ধির দরকার। তাঁদের কাছে শুনে অন্য লোকে লিখেছে।

[সংসারাসক্তি কতদিন—ব্রহ্মানন্দ পর্যন্ত]

শ্রীরামকৃষ্ণ—সংসারীরা বলে, কেন কামিনী কাঞ্চনে আসক্তি যায় না? তাঁকে লাভ করলে আসক্তি যায়।* যদি একবার ব্রহ্মানন্দ পায়, তাহ'লে ইন্দ্রিয়সুখ ভোগ করতে বা অর্থ, মান সম্ভ্রমের জন্য, আর মন দৌড়ায় না।

"বাদুলে পোকা যদি একবার আলো দেখে, তাহ'লে আর অন্ধকারে যায় না।

"রাবণকে ব'লেছিল, তুমি সীতার জন্য মায়ায় নানা রূপ ধ'রছো, একবার রামরূপ ধরে সীতার কাছে যাও না কেন? রাবণ বল্‌লে, তুচ্ছং ব্রহ্মপদং পরবধূসঙ্গঃ কুতঃ—যখন রামকে চিন্তা করি, তখন ব্রহ্মপদ তুচ্ছ হয়, পরস্ত্রী তো সামান্য কথা! তা রামরূপ কি ধ'রবো।

[যত ভক্তি বাড়ে, সাংসারাসক্তি কমে—শ্রীচৈতন্যভক্ত নির্লিপ্ত]

"তাই জন্যই সাধন-ভজন। তাঁকে চিন্তা যত ক'র্‌বে, ততই সংসারের সামান্য ভোগের জিনিসে আসক্তি কমবে। তাঁর পাদপদ্মে যত ভক্তি হবে, ততই বিষয়-বাসনা কম প'ড়ে আসবে, ততই দেহের সুখের দিকে নজর ক'মবে; পরস্ত্রীকে মাতৃবৎ বোধ হবে, নিজের স্ত্রীকে ধর্মের সহায় বন্ধু বোধ হবে, পশুভাব চ'লে যাবে, দেবভাব আসবে, সংসারে একেবারে অনাসক্ত হ'য়ে যাবে। তখন সংসারে যদিও থাকো জীবন্মুক্ত হ'য়ে বেড়াবে। চৈতন্যদেবের ভক্তেরা অনাসক্ত হ'য়ে সংসারে ছিল।

[জ্ঞানী ও ভক্তের গূঢ় রহস্য]

(মহিমার প্রতি)—"যে ঠিক ভক্ত, তার কাছে হাজার বেদান্ত বিচার করো, আর 'স্বপ্নবৎ' বল তার ভক্তি যাবার নয়। ফিরে ঘুরে একটুখানি থাকবেই। একটা মুষল ব্যানা বনে পড়েছিল, তাতেই 'মুষলং কুলনাশনম্‌।'

"শিব অংশে জন্মালে জ্ঞানী হয়; ব্রহ্ম সত্য, জগৎ মিথ্যা, এই বোধের দিকে মন সর্বদা যায়। বিষ্ণু অংশে জন্মালে প্রেম ভক্তি হয়, সে প্রেম ভক্তি যাবার নয়। জ্ঞান বিচারের পর এই প্রেম ভক্তি যদি কমে যায়, আবার এক সময় হুহু ক'রে বেড়ে যায়; যদুবংশ ধ্বংস ক'রেছিল 'মুষল, তারই মত।"

---

* রসবর্জং রসোঽপ্যস্য পরং দৃষ্টা নিবর্ত্ততে।

সপ্তম পরিচ্ছেদ

মাতৃসেবা ও শ্রীরামকৃষ্ণ—হাজরা মহাশয়*

ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণের ঘরের পূর্ব বারান্দায় হাজরা মহাশয় বসিয়া জপ করেন। বয়স ৪৬/৪৭ হইবে। ঠাকুরের দেশের লোক। অনেকদিন হইতে বৈরাগ্য হইয়াছে—বাহিরে বাহিরে বেড়ান, কখন কখন বাড়িতে গিয়া থাকেন। বাড়িতে কিছু জমি-টমি আছে, তাহাতে স্ত্রী পুত্রকন্যাদের ভরণপোষণ হয়। তবে প্রায় হাজার টাকা দেনা আছে, তজ্জন্য হাজরা মহাশয় সর্বদা চিন্তিত থাকেন ও কিসে শোধ যায়, সর্বদা চেষ্টা করেন। কলিকাতায় সর্বদা যাতায়াত আছে, সেখানে ঠন্‌ঠনে নিবাসী শ্রীযুক্ত ঈশানচন্দ্র মুখোপাধ্যায় মহাশয় তাঁহাকে সাতিশয় যত্ন করেন ও সাধুর ন্যায় সেবা করেন। ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ তাঁহাকে যত্ন ক'রে রেখেছেন, কাপড় ছিঁড়ে গেলে কাপড় কিনে দেওয়ান, সর্বদা সংবাদ লন ও ঈশ্বরীয় কথা তাঁহার সঙ্গে সর্বদা হ'য়ে থাকে। হাজরা মহাশয় বড় তার্কিক। প্রায় কথা কহিতে কহিতে তর্কের তরঙ্গে ভেসে এক দিকে চলে যেতেন। বারান্দায় আসন ক'রে সর্বদা জপের মালা লয়ে জপ ক'র্‌তেন।

হাজরা মহাশয়ের মাতাঠাকুরাণীর অসুখ সংবাদ আসিয়াছে। রামলালকে দেশ থেকে আসবার সময় তিনি হাতে ধ'রে অনেক ক'রে বলেছিলেন, খুড়ো মহাশয়কে আমার কাকুতি জানিয়ে ব'লো তিনি যেন প্রতাপকে ব'লে-ক'য়ে দেশে পাঠিয়ে দেন; একবার যেন আমার সঙ্গে দেখা হয়। ঠাকুর তাই হাজরাকে ব'লেছিলেন 'একবার বাড়িতে গিয়ে মার সঙ্গে দেখা ক'রে এসো; তিনি রামলালকে অনেক ক'রে বলে দিয়েছেন। **মাকে কষ্ট দিয়ে কখন ঈশ্বরকে ডাকা হয়? একবার দেখা দিয়ে বরং চলে এসো।**'

ভক্তের মজলিস্‌ ভাঙ্গিলে পর, মহিমাচরণ হাজরাকে সঙ্গে করিয়া ঠাকুরের কাছে উপস্থিত হইলেন। মাষ্টারও আছেন।

মহিমাচরণ (শ্রীরামকৃষ্ণের প্রতি, সহাস্যে)—মহাশয়! আপনার কাছে দরবার আছে। আপনি কেন হাজরাকে বাড়ি যেতে ব'লেছেন? আবার সংসারে যেতে ওর ইচ্ছা নাই।

শ্রীরামকৃষ্ণ—ওর মা রামলালের কাছে অনেক দুঃখ ক'রেছে; তাই বললুম, তিন দিনের জন্য না হয় যাও, একবার দেখা দিয়ে এসো; মাকে কষ্ট দিয়ে কি

---

* ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণের জন্মভূমি কামারপুকুরের সন্নিকট মড়াগোড় গ্রাম ইঁহার জন্মভূমি। ১৩০৬ সালের চৈত্র মাসে স্বদেশে থাকিয়া ইঁহার পরলোক প্রাপ্তি হইয়াছে। মৃত্যুকালে ঠাকুরের প্রতি ইঁহার অদ্ভুত বিশ্বাস ও ভক্তির পরিচয় পাওয়া গিয়াছে। ইঁহার বয়ঃক্রম ৬৩।৬৪ হইয়াছিল।

ঈশ্বর সাধনা হয়? আমি বৃন্দাবনে রয়ে যাচ্ছিলাম, তখন মাকে মনে পড়লো; ভাবলুম—মা যে কাঁদবে; তখন আবার সেজোবাবুর সঙ্গে এখানে চলে এলুম।

"আর সংসারে যেতে জ্ঞানীর ভয় কি?"

মহিমাচরণ (সহাস্যে)—মহাশয়! জ্ঞান হ'লে তো।

শ্রীরামকৃষ্ণ (সহাস্যে—হাজরার সবই হ'য়েছে, একটু সংসারে মন আছে—ছেলেরা র'য়েছে, কিছু টাকা ধার র'য়েছে। মামীর সব অসুখ সেরে গেছে, একটু কসুর আছে! (সকলের হাস্য)।

মহিমা—কোথায় জ্ঞান হ'য়েছে, মহাশয়?

শ্রীরামকৃষ্ণ (হাসিয়া)—না—গো তুমি জান না। সব্বাই বলে, হাজরা একটি লোক, রাসমণির ঠাকুরবাড়িতে আছে। হাজরারই নাম করে, এখানকার নাম কেউ করে? (সকলের হাস্য)।

হাজরা—আপনি নিরুপম—আপনার উপমা নাই, তাই কেউ আপনাকে বুঝ্‌তে পারে না।

শ্রীরামকৃষ্ণ—তবেই নিরুপমের সঙ্গে কোন কাজ হয় না; তা এখানকার নাম কেউ ক'রবে কেন?

মহিমা—মহাশয়! ও কি জানে? আপনি যেরূপ উপদেশ দেবেন ও তাই কর্‌বে।

শ্রীরামকৃষ্ণ—কেন, তুমি ওকে বরং জিজ্ঞাসা কর; ও আমায় বলেছে, তোমার সঙ্গে আমার লেনা-দেনা নাই।

মহিমা—ভারী তর্ক করে!

শ্রীরামকৃষ্ণ—ও মাঝে মাঝে আমায় আবার শিক্ষা দেয়। (সকলের হাস্য)। তর্ক যখন করে, হয়তো আমি গালাগালি দিয়ে বসলুম। তর্কের পর মশারির ভিতর হয়তো শুয়েছি; আবার কি ব'লেছি মনে ক'রে বেরিয়ে এসে হাজরাকে প্রণাম ক'রে যাই, তবে হয়!

[বেদান্ত ও শুদ্ধাত্মা]

(হাজরার প্রতি)—"তুমি শুদ্ধাত্মাকে ঈশ্বর বল কেন? শুদ্ধাত্মা নিষ্ক্রিয়, তিন অবস্থায় সাক্ষিস্বরূপ যখন সৃষ্টি, স্থিতি প্রলয় কার্য ভাবি তখন তাঁকে ঈশ্বর বলি। শুদ্ধাত্মা কিরূপ—যেমন চুম্বক পাথর অনেক দূরে আছে, কিন্তু ছুঁচ নড়ছে—চুম্বকপাথর চুপ করে আছে নিষ্ক্রিয়।"

অষ্টম পরিচ্ছেদ

সন্ধ্যা সঙ্গীত ও ঈশান সংবাদ

সন্ধ্যা আগতপ্রায়। ঠাকুর পাদচারণ করিতেছেন। মণি একাকী বসিয়া আছেন ও চিন্তা করিতেছেন দেখিয়া, ঠাকুর হঠাৎ তাঁহাকে সম্বোধন করিয়া সস্নেহে বলিতেছেন, "গোটা দু-এক মার্কিনের জামা দিও, সকলের জামা তো পরি না—কাপ্তেনকে বল্‌বো মনে করেছিলাম, তা তুমিই দিও।" মণি দাঁড়াইয়া উঠিয়াছিলেন, বলিলেন, "যে আজ্ঞা।"

সন্ধ্যা হইল। শ্রীরামকৃষ্ণের ঘরে ধূনা দেওয়া হইল। তিনি ঠাকুরদের প্রণাম করিয়া, বীজমন্ত্র জপিয়া, নাম গান করিতেছেন। ঘরের বাহিরে অপূর্ব শোভা! কার্ত্তিক মাসের শুক্লপক্ষের সপ্তমী তিথি। বিমল চন্দ্রকিরণে একদিকে ঠাকুরবাড়ি হাসিতেছে, আর একদিকে ভাগীরথীবক্ষ সুপ্ত শিশুর বক্ষের ন্যায় ঈষৎ বিকম্পিত হইতেছে। জোয়ার পূর্ণ হইয়া আসিল। আরতির শব্দ গঙ্গার স্নিগ্ধোজ্জ্বল প্রবাহসমুদ্ভূত কলকলনাদ সঙ্গে মিলিত হইয়া বহুদূর পর্যন্ত গমন করিয়া লয়প্রাপ্ত হইতেছিল। ঠাকুরবাড়িতে এককালে তিন মন্দিরে আরতি—কালীমন্দিরে, বিষ্ণুমন্দিরে ও শিবমন্দিরে। দ্বাদশ শিবমন্দিরে এক-একটি করিয়া শিবলিঙ্গের আরতি। পুরোহিত শিবের এক ঘর হইতে আর এক ঘরে যাইতেছেন। বাম হস্তে ঘন্টা, দক্ষিণ হস্তে পঞ্চপ্রদীপ, সঙ্গে পরিচারক—তাহার হস্তে কাঁসর। আরতি হইতেছে, তৎসঙ্গে ঠাকুরবাড়ির দক্ষিণ-পশ্চিম কোণ হইতে রোশনচৌকির সুমধুর নিনাদ শুনা যাইতেছে। সেখানে নহবৎখানা, সন্ধ্যাকালীন রাগ-রাগিণী বাজিতেছে। আনন্দময়ীর নিত্য উৎসব—যেন জীবকে স্মরণ করাইয়া দিতেছে—কেহ নিরানন্দ হইও না—ঐহিকের সুখ-দুঃখ আছেই ; থাকে থাকুক—জগদম্বা আছেন। আমাদের মা আছেন! আনন্দ কর! দাসীপুত্র ভাল খেতে পায় না, ভাল পরতে পায় না, বাড়ি নাই, ঘর নাই,—তবু বুকে জোর আছে ; তার যে মা আছে। মার কোলে নির্ভর। পাতানো মা নয়, সত্যকার মা। আমি কে, কোথা থেকে এলাম, আমার কি হবে, আমি কোথায় যাব, সব মা জানেন। কে অত ভাবে! আমার মা জানেন—আমার মা, যিনি দেহ, মন, প্রাণ, আত্মা দিয়ে আমায় গ'ড়েছেন। আমি জানতেও চাই না। যদি জানবার দরকার হয় তিনি জানিয়ে দিবেন। অত কে ভাবে? মায়ের ছেলেরা সব আনন্দ কর!

বাহিরে কৌমুদীপ্লাবিত জগৎ হাসিতেছে ;—কক্ষমধ্যে শ্রীরামকৃষ্ণ হরিপ্রেমানন্দে বসিয়া আছেন। ঈশান কলিকাতা হইতে আসিয়াছেন, আবার ঈশ্বরীয় কথা হইতেছে। ঈশানের ভারী বিশ্বাস। বলেন, একবার যিনি

দুর্গা নাম ক'রে বাড়ি থেকে যাত্রা করেন, তাঁর সংগে শূলপাণি শূলহস্তে যান। বিপদে ভয় কি? শিব নিজে রক্ষা করেন।

[বিশ্বাসে ঈশ্বরলাভ—ঈশানকে কর্মযোগ উপদেশ]

শ্রীরামকৃষ্ণ (ঈশানের প্রতি)—তোমার খুব বিশ্বাস—আমাদের কিন্তু অত নাই। (সকলের হাস্য)। বিশ্বাসেই তাঁকে পাওয়া যায়।

ঈশান—আজ্ঞা হাঁ।

শ্রীরামকৃষ্ণ—তুমি জপ, আহ্নিক, উপবাস, পুরশ্চরণ এই সব কর্ম ক'রছ তা বেশ। যার আন্তরিক ঈশ্বরের উপর টান থাকে, তাকে দিয়ে তিনি এই সব কর্ম করিয়ে লন। ফলকামনা না ক'রে এই সব কর্ম ক'রে যেতে পারলে নিশ্চিত তাঁকে লাভ হয়।

[বৈধীভক্তি ও রাগভক্তি—কর্মত্যাগ কখন?]

"শাস্ত্রে অনেক কর্ম ক'রতে বলে গেছে—তাই ক'রছি; এরূপ ভক্তিকে **বৈধীভক্তি** বলে। আর এক আছে, **রাগভক্তি**। সেটি অনুরাগ থেকে হয়, ঈশ্বরে ভালবাসা থেকে হয়—যেমন প্রহ্লাদের। সে ভক্তি যদি আসে, আর বৈধীকর্মের প্রয়োজন হয় না।"

নবম পরিচ্ছেদ

সেবক হৃদয়ে

সন্ধ্যার পূর্বে মণি বেড়াইতেছেন ও ভাবিতেছেন—'রামের ইচ্ছা' এটি তো বেশ কথা! এতে তো **Predestination** আর Free will, Liberty আর Necessity. এ সব ঝগড়া মিটে যাচ্ছে। আমায় ডাকাতে ধ'রে নিলে 'রামের ইচ্ছায়'; আবার আমি তামাক খাচ্ছি 'রামের ইচ্ছায়', আমি ডাকাতি ক'রছি 'রামের ইচ্ছায়' আমায় পুলিসে ধর্‌লে 'রামের ইচ্ছায়', আমি সাধু হ'য়েছি 'রামের ইচ্ছায়' আমি প্রার্থনা ক'রছি, 'হে প্রভু আমায় অসদ্বুদ্ধি দিও না—আমাকে দিয়ে ডাকাতি করিয়ো না'—এও 'রামের ইচ্ছা।' সৎ ইচ্ছা, অসৎ ইচ্ছা তিনি দিচ্ছেন। তবে একটা কথা আছে, অসৎ ইচ্ছা তিনি কেন দিবেন—ডাকাতি কর্‌বার ইচ্ছা তিনি কেন দিবেন? তার উত্তরে ঠাকুর বলেন এই,—তিনি জানোয়ারের ভিতর যেমন বাঘ, সিংহ, সাপ করেছেন; গাছের ভিতর যেমন বিষ গাছ ক'রেছেন সেইরূপ মানুষের ভিতর চোর, ডাকাতও করেছেন। কেন ক'রেছেন, তা কে বলবে? ঈশ্বরকে কে বুঝবে?

"কিন্তু তিনি যদি সব করেছেন, Sense of responsibility তো যায়; তা কেন যাবে? ঈশ্বরকে না জান্‌লে, তাঁর না দর্শন হ'লে 'রামের ইচ্ছা', এটি ষোল আনা বোধই হবে না। তাঁকে লাভ না ক'রলে এটি এক-একবার বোধ হয়; আবার ভুল হ'য়ে যাবে। যতক্ষণ না পূর্ণ বিশ্বাস হয়, ততক্ষণ পাপ-পুণ্য বোধ, responsibility বোধ, থাকবেই থাকবে। ঠাকুর বুঝালেন, 'রামের ইচ্ছা।' তোতা পাখীর মত 'রামের ইচ্ছা' মুখে বললে হয় না। যতক্ষণ ঈশ্বরকে জানা না হয়, তাঁর ইচ্ছায় আমার ইচ্ছায় এক না হয়, যতক্ষণ না 'আমি যন্ত্র' ঠিক বোধ হয়, ততক্ষণ তিনি পাপ-পুণ্য বোধ, সুখ-দুঃখ বোধ, শুচি-অশুচি বোধ, ভাল-মন্দ বোধ রেখে দেন; Sense of responsibility রেখে দেন; তা না হ'লে তাঁর মায়ার সংসার কেমন ক'রে চল্‌বে?

"ঠাকুরের ভক্তির কথা যত ভাবিতেছি, ততই অবাক হইতেছি। কেশব সেন হরিনাম করেন, ঈশ্বর চিন্তা করেন, অমনি তাঁকে দেখতে ছুটেছেন,— অমনি কেশব আপনার লোক হলেন! তখন কাপ্তেনের কথা আর শুনলেন না। তিনি বিলাতে গিয়াছিলেন, সাহেবদের সঙ্গে খেয়েছেন, কন্যাকে ভিন্ন জাতিতে বিবাহ দিয়েছেন, এ সব কথা ভেসে গেল! কুলটি খাই, কাঁটায় আমার কি কাজ? ভক্তিসূত্রে সাকারবাদী, নিরাকারবাদী এক হয়; হিন্দু, মুসলমান, খৃষ্টান এক হয়; চারি বর্ণ এক হয়। ভক্তিরই জয়। ধন্য শ্রীরামকৃষ্ণ! তোমারই জয়। তুমি সনাতন ধর্মের এই বিশ্বজনীন ভাব আবার মূর্ত্তিমান করিলে। তাই বুঝি তোমার এত আকর্ষণ! সকল ধর্মাবলম্বীদের তুমি পরআত্মীয়-নির্বিশেষে আলিঙ্গন করিতেছে! তোমার এক কষ্টিপাথর ভক্তি। তুমি কেবল দেখ—অন্তরে ঈশ্বরে ভালবাসা ও ভক্তি আছে কি না। যদি তা থাকে অমনি সে তোমার পরম আত্মীয়—হিন্দুর যদি ভক্তি দেখ, অমনি সে তোমার আত্মীয়—মুসলমানদের যদি আল্লার উপর ভক্তি থাকে, সেও তোমার আপনার লোক—খৃষ্টানদের যদি যীশুর উপর ভক্তি থাকে, সেও তোমার পরম আত্মীয়। তুমি বল যে, সব নদীই ভিন্ন দিগ্‌দেশ হইতে আসিয়া এক সমুদ্র মধ্যে পড়িতেছে। সকলেরই উদ্দেশ্য এক সমুদ্র।

"ঠাকুর এই জগৎ স্বপ্নবৎ ব'লছেন না। বলেন, 'তা হ'লে ওজনে কম পড়ে।' মায়াবাদ নয়। বিশিষ্টাদ্বৈতবাদ। কেন না, জীবজগৎ অলীক ব'লছেন না, মনের ভুল ব'লছেন না। ঈশ্বর সত্য আবার মানুষ সত্য, জগৎ সত্য। জীবজগৎবিশিষ্ট ব্রহ্ম। বীচি খোলা বাদ দিলে সব বেলটা পাওয়া যায় না।

"শুনিলাম, এই জগৎব্রহ্মাণ্ড মহাচিদাকাশে আবির্ভূত হইতেছে আবার কালে লয় হইতেছে—মহাসমুদ্রে তরঙ্গ উঠিতেছে আবার কালে লয় হইতেছে! আনন্দসিন্ধুনীরে অনন্ত-লীলালহরী! এ লীলার আদি কোথায়? অন্ত

কোথায়? তাহা মুখে বলিবার যো নাই—মনে চিন্তা করিবার যো নাই। মানুষ কতটুকু—তার বুদ্ধিই বা কতটুকু! শুনলাম মহাপুরুষেরা সমাধিস্থ হ'য়ে সেই নিত্য পরম পুরুষকে দর্শন করেছেন—নিত্য লীলাময় হরিকে সাক্ষাৎকার ক'রেছেন। অবশ্য করেছেন, কেননা ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণও বলিতেছেন। তবে এ চর্মচক্ষে নয়, বোধ হয় দিব্য চক্ষু যাহাকে বলে তাহার দ্বারা; যে দিব্য-চক্ষু পাইয়া অর্জুন বিশ্বরূপ দর্শন ক'রেছিলেন, যে চক্ষুর দ্বারা ঋষিরা আত্মার সাক্ষাৎকার ক'রেছিলেন, যে দিব্যচক্ষুর দ্বারা ঈশা তাঁহার স্বর্গীয় পিতাকে অহরহ দর্শন করিতেন। সে চক্ষু কিসে হয়? ঠাকুরের মুখে শুনিলাম ব্যাকুলতার দ্বারা হয়। এখন সে ব্যাকুলতা হয় কেমন ক'রে, সংসার কি ত্যাগ ক'রতে হবে? কৈ, তাও তো আজ বল্‌লেন না।"

চতুর্দশ খণ্ড

শ্রীরামকৃষ্ণের ভক্তগৃহে আগমন ও তাঁহার সহিত নরেন্দ্র, গিরিশ, বলরাম চুনীলাল, লাটু, মাষ্টার, নারায়ণ প্রভৃতি ভক্তের কথোপকথন ও আনন্দ

প্রথম পরিচ্ছেদ

ভক্তগৃহে—ভক্তসঙ্গে

ফাল্গুন কৃষ্ণা দশমী তিথি, পূর্বাষাঢ়ানক্ষত্র, ২৯শে ফাল্গুন, বুধবার—ইংরাজী ১১ই মার্চ, ১৮৮৫। আজ আন্দাজ বেলা দশটার সময় শ্রীরামকৃষ্ণ দক্ষিণেশ্বর হইতে আসিয়া ভক্তগৃহে বসুবলরামমন্দিরে শ্রীশ্রীজগন্নাথের প্রসাদ পাইয়াছেন। সঙ্গে লাটু প্রভৃতি ভক্ত।

ধন্য বলরাম! তোমারই আলয় আজ ঠাকুরের প্রধান কর্মক্ষেত্র হইয়াছে। কত নূতন নূতন ভক্তকে আকর্ষণ করিয়া প্রেমডোরে বাঁধিলেন, ভক্তসঙ্গে কত নাচিলেন, গাইলেন। যেন শ্রীগৌরাঙ্গ শ্রীবাসমন্দিরে প্রেমের হাট বসাচ্ছেন!

দক্ষিণেশ্বরের কালীবাটীতে ব'সে ব'সে কাঁদেন; নিজের অন্তরঙ্গ দেখিবেন ব'লে ব্যাকুল! রাত্রে ঘুম নাই। মাকে বলেন, 'মা, ওর বড় ভক্তি, ওকে টেনে নাও; মা ওকে এখানে এনে দাও; যদি সে না আস্‌তে পারে, তা হ'লে মা আমায় সেখানে লয়ে যাও, আমি দেখে আসি।' তাই বলরামের বাড়ি ছুটে ছুটে আসেন। লোকের কাছে কেবল বলেন, 'বলরামের 'জগন্নাথের সেবা আছে, খুব শুদ্ধ অন্ন।' যখন আসেন অমনি নিমন্ত্রণ করিতে বলরামকে পাঠান। বলেন, 'যাও—নরেন্দ্র, ভবনাথ, রাখালকে নিমন্ত্রণ করে এসো। এদের খাওয়ালে নারায়ণকে খাওয়ান হয়। এরা সামান্য নয়, এরা ঈশ্বরাংশে জন্মেছে, এদের খাওয়ালে তোমার খুব ভাল হবে।

বলরামের আলয়েই শ্রীযুক্ত গিরিশ ঘোষের সঙ্গে প্রথম ব'সে আলাপ। এইখানেই রথের সময় কীর্ত্তনানন্দ। এইখানেই কতবার 'প্রেমের দরবারে আনন্দের মেলা' হইয়াছে।

['পশ্যামি তব পন্থানম্'—ছোট নরেন]

মাষ্টার নিকটে একটি বিদ্যালয়ে পড়ান। শুনিয়াছেন আজ দশটার সময় শ্রীরামকৃষ্ণ বলরামের বাটীতে আসিবেন। মাঝে অধ্যাপনার কিঞ্চিৎ অবসর পাইয়া বেলা দুই প্রহরের সময় ঐখানে আসিয়া উপস্থিত। আসিয়া দর্শন ও প্রণাম করিলেন। ঠাকুর আহারান্তে বৈঠকখানায় একটু বিশ্রাম করিতেছেন। মাঝে মাঝে থলি থেকে কিছু মস্‌লা বা কাবাবচিনি খাচ্ছেন; অল্পবয়স্ক ভক্তেরা চারিদিকে ঘেরিয়া বসিয়া আছেন।

শ্রীরামকৃষ্ণ (সস্নেহে)—তুমি যে এলে? স্কুল নাই?

মাষ্টার—স্কুল থেকে আস্‌ছি—এখন সেখানে বিশেষ কাজ নাই।

ভক্ত—না, মহাশয়! উনি স্কুল পালিয়ে এসেছেন! (সকলের হাস্য)।

মাষ্টার (স্বগতঃ)—হায়! কে যেন টেনে আন্‌লে!

ঠাকুর যেন একটু চিন্তিত হইলেন। পরে মাষ্টারকে কাছে বসাইয়া কত কথা কহিতে লাগিলেন। আর বলিলেন, "আমার গামছাটা নিংড়ে দাও তো গা, আর জামাটা শুকোতে দাও, আর পা'টা একটু কামড়াচ্ছে, একটু হাত বুলিয়ে দিতে পার?" মাষ্টার সেবা করিতে জানেন না, অই ঠাকুর সেবা করিতে শিখাইতেছেন। মাষ্টার শশব্যস্ত হইয়া একে একে ঐ কাজগুলি করিতেছেন। তিনি পায়ে হাত বুলাইতেছেন। শ্রীরামকৃষ্ণ কথাচ্ছলে কত উপদেশ দিতে লাগিলেন।

[শ্রীরামকৃষ্ণ ও ঐশ্বর্যত্যাগের পরাকাষ্ঠা—ঠিক সন্ন্যাসী]

শ্রীরামকৃষ্ণ (মাষ্টারের প্রতি)—হ্যাঁগা, এটা আমার ক'দিন ধরে হ'চ্ছে, কেন বল দেখি? ধাতুর কোন জিনিসে হাত দেবার যো নাই। একবার একটা বাটিতে হাত দি'ছিলুম,—তা হাত শিঙ্গিমাছের কাঁটা ফোটার মত হ'লো। হাত ঝন্‌ ঝন্‌ কন্‌ কন্‌ ক'র্‌তে লাগলো। গাড়ু না ছুঁলে নয়, তাই মনে ক'রলুম, গামছাখানা ঢাকা দিয়ে দেখি, তুলতে পারি কি না; যাই হাত দিয়েছি, অমনি হাতটা ঝন্‌ ঝন্‌ কন্‌ কন্‌ করতে লাগল, খুব বেদনা। শেষে মাকে প্রার্থনা করলুম, 'মা আর অমন কর্ম ক'রবো না, মা এবার মাপ করো।'

"হ্যাঁগা, ছোট নরেন যাওয়া আসা ক'চ্ছে, বাড়িতে কিছু ব'লবে? খুব শুদ্ধ, মেয়ে সঙ্গ কখনও হয় নাই।"

মাষ্টার—আর খোল্‌টা বড়।

শ্রীরামকৃষ্ণ—হা, আবার বলে যে, ঈশ্বরীয় কথা একবার শুন্‌লে আমার মনে থাকে। বলে, ছেলেবেলায় আমি কাঁদতুম—ঈশ্বর দেখা দিচ্ছেন না ব'লে।

মাষ্টারের সঙ্গে ছোট নরেন সম্বন্ধে এইরূপ অনেক কথা হইল। এমন সময় উপস্থিত ভক্তদের মধ্যে একজন বলিয়া উঠিলেন, "মাষ্টার মহাশয়! আপনি স্কুলে যাবেন না?"

শ্রীরামকৃষ্ণ—ক'টা বেজেছে?

একজন ভক্ত—একটা বাজ্‌তে দশ মিনিট।

শ্রীরামকৃষ্ণ (মাষ্টারের প্রতি)—তুমি এস, তোমার দেরী হ'চ্ছে। একে কাজ ফেলে এসেছো। (লাটুর প্রতি)—রাখাল কোথায়?

লাটু—চলে গেছে;—বাড়ি।

শ্রীরামকৃষ্ণ—আমার সঙ্গে দেখা না ক'রে?

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

অপরাহ্ণে ভক্তসঙ্গে—অবতারবাদ ও শ্রীরামকৃষ্ণ

স্কুলের ছুটির পর মাষ্টার আসিয়া দেখিতেছেন—ঠাকুর বলরামের বৈঠকখানায় ভক্তের মজলিস করিয়া বসিয়া আছেন। ঠাকুরের মুখে মধুর হাসি, সেই হাসি ভক্তদের মুখে প্রতিবিম্বিত হইতেছে। মাষ্টারকে ফিরিয়া আসিতে দেখিয়া ও তিনি প্রণাম করিলে, ঠাকুর তাহাকে তাঁহার কাছে আসিয়া বসিতে ইঙ্গিত করিলেন। শ্রীযুক্ত গিরিশ ঘোষ, সুরেশ মিত্র, বলরাম, লাটু, চুনিলাল ইত্যাদি ভক্ত উপস্থিত আছেন।

শ্রীরামকৃষ্ণ (গিরিশের প্রতি)—তুমি একবার নরেন্দ্রের সঙ্গে বিচার ক'রে দেখো, সে কি বলে।

গিরিশ (সহাস্যে)—নরেন্দ্র বলে, ঈশ্বর অনন্ত। যা কিছু আমরা দেখি, শুনি,—জিনিসটি, কি ব্যক্তিটি—সব তাঁর অংশ, এ পর্যন্ত আমাদের বল্‌বার যো নাই। Infinity (অনন্ত আকাশ)—তার আবার অংশ কি? অংশ হয় না।

শ্রীরামকৃষ্ণ—ঈশ্বর অনন্ত হউন আর যত বড় হউন,—তিনি ইচ্ছা কর্‌লে তাঁর ভিতরের সার বস্তু মানুষের ভিতর দিয়ে আস্‌তে পারে ও আসে। তিনি অবতার হ'য়ে থাকেন, এটি উপমা দিয়ে বুঝান যায় না। অনুভব হওয়া চাই। প্রত্যক্ষ হওয়া চাই। উপমার দ্বারা কতকটা আভাস পাওয়া যায়। গরুর মধ্যে শিংটা যদি ছোঁয়, গরুকেই ছোঁয়া হলো; পা'টা বা লেজটা ছুঁলেও গরুটাকে ছোঁয়া হ'লো। কিন্তু আমাদের পক্ষে গরুর ভিতরের সার পদার্থ হচ্ছে দুধ। সেই দুধ বাঁট দিয়ে আসে।

"সেইরূপ প্রেম ভক্তি শিখাবার জন্য ঈশ্বর মানুষ দেহ ধারণ ক'রে সময়ে সময়ে অবতীর্ণ হন।"

গিরিশ—নরেন্দ্র বলে, তাঁর কি সব ধারণা করা যায়। তিনি অনন্ত।

[Perception of the Infinite*]

শ্রীরামকৃষ্ণ (গিরিশের প্রতি)—ঈশ্বরের সব ধারণা কে ক'রতে পারে? তা তাঁর বড় ভাবটাও পারে না, আবার ছোট ভাবটাও পারে না। আর সব ধারণা করা কি দরকার? তাঁকে প্রত্যক্ষ কর্‌তে পারলেই হ'লো। তাঁর অবতারকে দেখ্‌লেই তাঁকে দেখা হ'লো। যদি কেউ গঙ্গার কাছে গিয়ে গঙ্গা জল স্পর্শ

---

* Compare discussion about the order of perception of the Infinite and of the Finite in Max-Mullers Hibbert Lectures and Gifford Lectures.

করে, সে বলে—গংগা দর্শন স্পর্শন ক'রে এলুম। সব গংগাটা হরিদ্বার থেকে গংগাসাগর পর্যন্ত, হাত দিয়ে ছুঁতে হয় না। (সকলের হাস্য)।

"তোমার পা'টা যদি ছুঁই, তোমায় ছোঁয়াই হ'লো। (হাস্য)।

"যদি সাগরের কাছে গিয়ে একটু জল স্পর্শ করো, তাহ'লে সাগর স্পর্শ করাই হ'লো। অগ্নিতত্ত্ব সব জায়গায় আছে, তবে কাঠে বেশী।"

গিরিশ (হাসিতে হাসিতে)—যেখানে আগুন পাবো, সেইখানেই আমার দরকার।

শ্রীরামকৃষ্ণ (হাসিতে হাসিতে)—অগ্নিতত্ত্ব কাঠে বেশী। ঈশ্বরতত্ত্ব যদি খোঁজ, মানুষে খুঁজবে। মানুষে তিনি বেশী প্রকাশ হন। যে মানুষে দেখবে উর্জিতাভক্তি—প্রেমভক্তি উথ্‌লে পড়ছে—ঈশ্বরের জন্য পাগল—তাঁর প্রেমে মাতোয়ারা—সেই মানুষে নিশ্চিত জেনো, তিনি অবতীর্ণ হ'য়েছেন।

(মাস্টার দৃষ্টে)—"তিনি তো আছেনই, তবে তাঁর শক্তি কোথাও বেশী প্রকাশ, কোথাও বা কম প্রকাশ। **অবতারের ভিতর তাঁর শক্তি বেশী প্রকাশ; সেই শক্তি কখন কখন পূর্ণভাবে থাকে। শক্তিরই অবতার।"**

গিরিশ—নরেন্দ্র বলে, তিনি অবাঙ্মনসোগোচরম্‌।

শ্রীরামকৃষ্ণ—না; এ মনের গোচর নয় বটে—শুদ্ধ মনের গোচর। এ বুদ্ধির গোচর নয়—কিন্তু শুদ্ধ বুদ্ধির গোচর। কামিনী কাঞ্চনে আসক্তি গেলেই, শুদ্ধ মন আর শুদ্ধ বুদ্ধি হয়। তখন শুদ্ধ মন শুদ্ধবুদ্ধি এক। শুদ্ধমনের গোচর। ঋষি-মুনিরা কি তাঁকে দেখেন নাই? তাঁরা চৈতন্যের দ্বারা চৈতন্যের সাক্ষাৎকার করেছিলেন।

গিরিশ (সহাস্যে)—নরেন্দ্র আমার কাছে তর্কে হেরেছে।

শ্রীরামকৃষ্ণ—না; আমায় ব'লেছে, 'গিরিশ ঘোষের মানুষকে অবতার ব'লে অত বিশ্বাস; এখন আমি আর কি বলবো! অমন বিশ্বাসের উপর কিছু ব'ল্‌তে নাই।'

গিরিশ (সহাস্যে)—মহাশয়! আমরা সব হল হল ক'রে কথা কচ্ছি কিন্তু মাস্টার ঠোঁট চেপে বসে আছে। কি ভাবে? মহাশয়! কি বলুন!

শ্রীরামকৃষ্ণ (হাসিতে হাসিতে)—"মুখহলসা, ভেতরবুঁদে, কানতুল্‌সে, দীঘল ঘোম্‌টা নারী, পানা পুকুরের শীতল জল বড় মন্দকারী। (সকলের হাস্য)। (সহাস্যে)—কিন্তু ইনি তা নন্‌—ইনি 'গম্ভীরাত্মা।' (সকলের হাস্য)।

গিরিশ—মহাশয়! শ্লোকটি কি বল্‌লেন?

শ্রীরামকৃষ্ণ—এই ক'টি লোকের কাছে সাবধান হবেঃ প্রথম, মুখহলসা—হল্‌হল্‌ করে কথা কয়; তারপর ভেতর বুঁদে—মনের ভিতর ডুবুরি নামালেও অন্ত পাবে না; তারপর কান্‌তুলসে—কানে তুলসী দেয়, ভক্তি জানাবার জন্য;

দীঘল ঘোম্‌টা নারী—লম্বা ঘোম্‌টা, লোকে মনে করে ভারী সতী, তা নয়; আর পানাপুকুরের জল—নাইলে সান্নিপাতিক হয়। (হাস্য)।

চুনিলাল—এ'র (মাষ্টারের) নামে কথা উঠেছে। ছোট নরেন, বাবুরাম ওঁর পোড়ো; নারায়ণ, পল্টু, পূর্ণ, তেজচন্দ্র—এরা সব ওঁর পোড়ো। কথা উঠেছে যে, উনি তাদের এইখানে এনেছেন, আর তাদের পড়াশুনা খারাপ হ'য়ে যাচ্ছে! এ'র নামে দোষ দিচ্ছে।

শ্রীরামকৃষ্ণ—তাদের কথা কে বিশ্বাস ক'রবে?

এই সকল কথাবার্তা হইতেছে, এমন সময় নারা'ণ আসিয়া ঠাকুরকে প্রণাম করিল। নারা'ণ গৌরবর্ণ, ১৭/১৮ বছর বয়স, স্কুলে পড়ে, ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ তাঁহাকে বড় ভালবাসেন। তাকে দেখবার জন্য, তাকে খাওয়াবার জন্য ব্যাকুল। তার জন্য দক্ষিণেশ্বরে ব'সে ব'সে কাঁদেন। নারা'ণকে তিনি সাক্ষাৎ নারায়ণ দেখেন।

গিরিশ (নারায়ণ দৃষ্টে)—কে খবর দিলে? মাষ্টারই দেখ্‌ছি সব সারলে। (সকলের হাস্য)।

শ্রীরামকৃষ্ণ (হাসিতে হাসিতে)—রোসো! চুপ চাপ ক'রে থাকো! এ'র (মাষ্টারের) নামে একে বদনাম উঠেছে।

[অন্নচিন্তা চমৎকারা—ব্রাহ্মণের প্রতিগ্রহ করার ফল]

আবার নরেন্দ্রের কথা পড়িল।

একজন ভক্ত—এখন তত আসেন না কেন?

শ্রীরামকৃষ্ণ—'অন্নচিন্তা চমৎকারা,
—কালিদাস হয় বুদ্ধিহারা।' (সকলের হাস্য)।

বলরাম—শিব গুহোর বাড়ির ছেলে অন্নদা গুহোর কাছে খুব আনাগোনা আছে।

শ্রীরামকৃষ্ণ—হাঁ, একজন আফিসওয়ালার বাসায় নরেন্দ্র, অন্নদা এরা সব যায়। সেখানে তারা ব্রাহ্মসমাজ করে।

একজন ভক্ত—তাঁর (আফিসওয়ালার) নাম তারাপদ।

বলরাম (হাসিতে হাসিতে)—বামুনরা বলে, অন্নদা গুহ লোকটার বড় অহঙ্কার।

শ্রীরামকৃষ্ণ—বামুনদের ও সব কথা শুনো না। তাদের তো জানো, না দিলেই খারাপ লোক, দিলেই ভাল! (সকলের হাস্য)। অন্নদাকে আমি জানি, ভালো লোক।

তৃতীয় পরিচ্ছেদ

ভক্তসঙ্গে ভজনানন্দে

ঠাকুর গান শুনিবেন ইচ্ছা প্রকাশ করিলেন। বলরামের বৈঠকখানায় এক ঘর লোক। সকলেই তাঁহার পানে চাহিয়া আছেন—কি বলেন শুনিবেন, কি করেন দেখিবেন।

শ্রীযুক্ত তারাপদ গাহিতেছেন—

কেশব কুরু করুণা দীনে, কুঞ্জকাননচারী।
মাধব মনোমোহন, মোহনমুরলীধারী॥
(হরিবোল, হরিবোল, হরিবোল, মন আমার)।
ব্রজকিশোর, কালীয়হর, কাতর-ভয়-ভঞ্জন,
নয়ন বাঁকা, বাঁকা-শিখিপাখা রাধিকা-হৃদিরঞ্জন—
গোবর্ধনধারণ, বনকুসুমভূষণ, দামোদর কংসদর্পহারী।
শ্যামরাসরসবিহারী। (হরিবোল, ইত্যাদি)॥

শ্রীরামকৃষ্ণ (গিরিশের প্রতি)—আহা, বেশ গানটি! তুমিই কি সব গান বেঁধেছ?

একজন ভক্ত—হাঁ, উনিই চৈতন্যলীলার সব গান বেঁধেছেন।

শ্রীরামকৃষ্ণ (গিরিশের প্রতি)—এ গানটি খুব উতরেছে।

(গায়কের প্রতি)—"নিতাই-এর গান গাইতে পারো?"

আবার গান হইল, নিতাই গেয়েছিলেন—

কিশোরীর প্রেম নিবি আয়, প্রেমের জুয়ার বয়ে যায়।
বইছে রে প্রেম শতধারে, যে যত চায় তত পায়॥
প্রেমের কিশোরী, প্রেম বিলায় সাধ করি, রাধার প্রেমে বলরে হরি;
প্রেমে প্রাণ মত্ত করে, প্রেম তরঙ্গে প্রাণ নাচায়।
রাধার প্রেমে হরি বলি, আয় আয় আয় আয়॥

শ্রীগৌরাঙ্গের গান হইল—

কার ভাবে গৌর বেশে জুড়ালে হে প্রাণ।
প্রেম সাগরে উঠলো তুফান, থাকবে না আর কুল মান॥
(মন মজালে গৌর হে)
ব্রজ মাঝে, রাখাল সাজে, চরালে গোধন;
ধ'রলে করে মোহন বাঁশী, মজলো গোপীর মন;
ধ'রে গোবর্ধন, রাখ্‌লে বৃন্দাবন,
মানের দায়ে, ধ'রে গোপীর পায়, ভেসে গেল চাঁদ বয়ান॥
(মন মজালে গৌর হে)।

সকলে মাষ্টারকে অনুরোধ করিতেছেন, তুমি একটি গান গাও। মাষ্টার একটু লাজুক, ফিস ফিস ক'রে মাপ চাহিতেছেন।

গিরিশ (ঠাকুরের প্রতি, সহাস্যে)—মহাশয়! মাষ্টার কোন মতে গান গাইছে না।

শ্রীরামকৃষ্ণ (বিরক্ত হইয়া)—ও স্কুলে দাঁত বার কর্‌বে; গান গাইতে যত লজ্জা! মাষ্টার মুখটি চুণ ক'রে খানিকক্ষণ বসিয়া রহিলেন।

শ্রীযুক্ত সুরেশ মিত্র একটু দূরে বসেছিলেন। ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ তাঁহার দিকে সস্নেহে দৃষ্টিপাত করিয়া শ্রীযুক্ত গিরিশ ঘোষকে দেখাইয়া সহাস্য বদনে কথা কহিতেছেন।

শ্রীরামকৃষ্ণ (সহাস্যে)—তুমি তো কি? ইনি (গিরিশ) তোমার চেয়ে!

সুরেশ (হাসিতে হাসিতে)—আজ্ঞা হাঁ, আমার বড় দাদা। (সকলের হাস্য)।

গিরিশ (ঠাকুরের প্রতি)—আচ্ছা, মহাশয়! আমি ছেলেবেলায় কিছু লেখা-পড়া করি নাই, তবু লোকে বলে বিদ্বান!

শ্রীরামকৃষ্ণ—মহিম চক্রবর্তী অনেক শাস্ত্র-টাস্ত্র দেখেছে শুনেছে—খুব আধার! (মাষ্টারের প্রতি)—কেমন গা?

মাষ্টার—আজ্ঞা হাঁ।

গিরিশ—কি? বিদ্যা! ও অনেক দেখেছি! ওতে আর ভুলি না।

শ্রীরামকৃষ্ণ (হাসিতে হাসিতে)—এখানকার ভাব কি জান? **বই শাস্ত্র এ সব কেবল ঈশ্বরের কাছে পোঁছিবার পথ ব'লে দেয়।** পথ, উপায়, জেনে লবার পর, আর বই শাস্ত্রে কি দরকার? তখন নিজে কাজ ক'রতে হয়।

"একজন একখানা চিঠি পেয়েছিল, কুটুম বাড়ি তত্ত্ব ক'রতে হবে, কি কি জিনিস লেখা ছিল। জিনিস কিনতে দেবার সময় চিঠিখানা খুঁজে পাওয়া যাচ্ছিল না। কর্ত্তাটি তখন খুব ব্যস্ত হ'য়ে চিঠির খোঁজ আরম্ভ করলেন। অনেকক্ষণ ধ'রে অনেকজন মিলে খুঁজলে। শেষে চিঠিখানা পাওয়া গেল। তখন আর আনন্দের সীমা নাই। কর্ত্তা ব্যস্ত হ'য়ে অতি যত্নে চিঠিখানা হাতে নিলেন আর দেখ্‌তে লাগলেন, কি লেখা আছে। লেখা এই, পাঁচ সের সন্দেশ পাঠাইবে, একখানা কাপড় পাঠাইবে; আরও কত কি। তখন আর চিঠির দরকার নাই, চিঠি ফেলে দিয়ে সন্দেশ ও কাপড়ের আর অন্যান্য জিনিসের চেষ্টায় বেরুলেন। চিঠির দরকার কতক্ষণ? যতক্ষণ সন্দেশ, কাপড় ইত্যাদির বিষয় না জানা যায়। তার পরই পাবার চেষ্টা।

"শাস্ত্রে তাঁকে পাবার উপায়ের কথা পাবে। কিন্তু খবর সব জেনে কর্ম আরম্ভ ক'রতে হয়। তবে তো বস্তুলাভ!

"শুধু পাণ্ডিত্যে কি হবে? অনেক শ্লোক, অনেক শাস্ত্র, পণ্ডিতের

জানা থাকতে পারে; কিন্তু যার সংসারে আসক্তি আছে, যার কামিনী-কাঞ্চনে মনে মনে ভালবাসা আছে, তার শাস্ত্র ধারণা হয় না—মিছে পড়া। পাঁজিতে লিখেছে, বিশ আড়া জল, কিন্তু পাঁজি টিপ্‌লে এক ফোঁটাও পড়ে না। এক ফোঁটাই পড়—কিন্তু এক ফোঁটাও পড়ে না।" (সকলের হাস্য)।

গিরিশ (সহাস্যে)—মহাশয়! পাঁজি টিপ্‌লে এক ফোঁটাও পড়ে না? (সকলের হাস্য)।

শ্রীরামকৃষ্ণ (সহাস্যে)—পণ্ডিত খুব লম্বা লম্বা কথা বলে, কিন্তু নজর কোথায়? কামিনী আর কাঞ্চনে, দেহের সুখ আর টাকায়।

"শকুনি খুব উঁচুতে উড়ে, কিন্তু নজর ভাগাড়ে। (হাস্য)। কেবল খুঁজছে, কোথায় মড়া জানোয়ার, কোথায় ভাগাড়, কোথায় মড়া।

(গিরিশের প্রতি)—"নরেন্দ্র খুব ভাল; গাইতে বাজাতে, পড়ায় শুনায় বিদ্যায়; এদিকে জিতেন্দ্রিয়, বিবেক বৈরাগ্য আছে, সত্যবাদী। অনেক গুণ।

(মাষ্টারের প্রতি)—"কেমন রে? কেমন গা, খুব ভাল নয়?"

মাষ্টার—আজ্ঞা হাঁ, খুব ভাল।

শ্রীরামকৃষ্ণ (জনান্তিকে, মাষ্টারের প্রতি)—দেখ, ওর (গিরিশের) খুব অনুরাগ আর বিশ্বাস।

মাষ্টার অবাক্ হইয়া গিরিশকে একদৃষ্টে দেখিতেছেন। গিরিশ ঠাকুরের কাছে কয়েকদিন আসিতেছেন মাত্র। মাষ্টার কিন্তু দেখিলেন যেন পূর্বপরিচিত —অনেক দিনের আলাপ—পরমাত্মীয়—যেন একসূত্রে গাঁথা, মণিগণের একটি মণি।

নারা'ণ—মহাশয়! আপনার গান হবে না?

শ্রীরামকৃষ্ণ সেই মধুর কন্ঠে মায়ের নাম গুণ গান করিতেছেন—

যতনে হৃদয়ে রেখো আদরিণী শ্যামা মাকে।
মাকে তুমি দেখো আর আমি দেখি, আর যেন কেউ নাহি দেখে॥
কামাদিরে দিয়ে ফাঁকি, আয় মন বিরলে দেখি,
রসনারে সঙ্গে রাখি, সে যেন মা বলে ডাকে (মাঝে মাঝে)॥
কুরুচি কুমন্ত্রী যত, নিকট হ'তে দিও নাকো,
জ্ঞান নয়নে প্রহরী রেখো, সে যেন সাবধানে থাকে॥

ঠাকুর ত্রিতাপে তাপিত সংসারী জীবের ভাব আরোপ করিয়া মার কাছে অভিমান করিয়া গাইতেছেন—

গো আনন্দময়ী হ'য়ে মা আমায় নিরানন্দ কোরো না।
(ওমা) ও দুটি চরণ বিনে আমার মন, অন্য কিছু আর জানে না॥
তপন-তনয় আমায় মন্দ কয়, কি বলিব তায় বল না।
ভবানী বলিয়ে ভবে যাব চলে, মনে ছিল এই বাসনা।

অকূল পাথারে ডুবাবি আমারে (ওমা) স্বপনেও তাতো জানি না॥
আমি অহর্নিশি, শ্রীদুর্গানামে ভাসি, তবু দুঃখ রাশি গেল না।
এবার যদি মরি ও হরসুন্দরী, তোর দুর্গানাম আর কেউ লবে না॥

আর নিত্যানন্দময়ী ব্রহ্মানন্দের কথা গাইতেছেন—

শিব সঙ্গে সদা রঙ্গে আনন্দে মগনা,
সুধাপানে ঢল ঢল টলে কিন্তু পড়ে না (মা)।
বিপরীত রতাতুরা, পদভরে কাঁপে ধরা,
উভয়ে পাগলের পারা, লজ্জা ভয় আর মানে না (মা)।

ভক্তেরা নিস্তব্ধ হইয়া গান শুনিতেছেন। তাঁহারা একদৃষ্টে ঠাকুরের অদ্ভুত আত্মহারা মাতোয়ারা ভাব দেখিতেছেন।

গান সমাপ্ত হইল। কিয়ৎকাল পরে ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ বলিতেছেন, "আমার আজ গান ভাল হ'ল না—সর্দি হয়েছে।"

চতুর্থ পরিচ্ছেদ

সন্ধ্যাসমাগমে

ক্রমে সন্ধ্যা হইল। সিন্ধুবক্ষে যথায় অনন্তের নীল ছায়া পড়িয়াছে, নিবিড় অরণ্যমধ্যে, অম্বরস্পর্শী পর্বতশিখরে, বায়ুবিকম্পিত নদীর তীরে, দিগ্-দিগন্তব্যাপী প্রান্তরমধ্যে, ক্ষুদ্র মানবের সহজেই ভাবান্তর হইল। এই সূর্য চরাচর বিশ্বকে আলোকিত করিতেছিলেন, কোথায় গেলেন? বালক ভাবিতেছে, আবার ভাবিতেছেন—বালকস্বভাবাপন্ন মহাপুরুষ। সন্ধ্যা হইল। কি আশ্চর্য। কে এরূপ করিল? —পাখীরা পাদপশাখা আশ্রয় করিয়া রব করিতেছে। মানুষের মধ্যে যাঁহাদের চৈতন্য হইয়াছে, তাঁহারাও সেই আদি কবি কারণের কারণ পুরুষোত্তমের নাম করিতেছেন।

কথা কহিতে কহিতে সন্ধ্যা হইল। ভক্তেরা যে যে আসনে বসিয়াছিলেন, তিনি সেই আসনেই বসিয়া রহিলেন। শ্রীরামকৃষ্ণ মধুর নাম করিতেছেন, সকলে উদ্‌গ্রীব ও উৎকীর্ণ হইয়া শুনিতেছেন। এমন মিষ্ট নাম তাঁরা কখনও শুনেন নাই—যেন সুধা বর্ষণ হইতেছে। এমন প্রেমমাখা বালকের মা মা ব'লে ডাকা, তাঁরা কখনও শুনেন নাই, দেখেন নাই! আকাশ, পর্বত, মহাসাগর, প্রান্তর, বন আর দেখিবার কি প্রয়োজন? গরুর শৃঙ্গ, পদাদি ও শরীরের অন্যান্য অংশ আর দেখিবার কি প্রয়োজন? দয়াময় গুরুদেব যে গরুর বাঁটের কথা বলিলেন, এই গৃহমধ্যে কি তাই দেখিতেছি? সকলের অশান্ত মন কিসে শান্তিলাভ করিল? নিরানন্দ ধরা কিসে আনন্দে ভাসিল? কেন ভক্তদের দেখিতেছি শান্ত ও আনন্দময়? এই প্রেমিক সন্ন্যাসী কি সুন্দর রূপধারী

অনন্ত ঈশ্বর? এইখানেই কি দুগ্ধপানপিপাসুর পিপাসা শান্তি হইবে? অবতার হউন, আর নাই হউন, ইঁহারই চরণপ্রান্তে মন বিকাইয়াছে, আর যাইবার যো নাই! ইঁহারেই করিয়াছি জীবনের ধ্রুবতারা। দেখি, ইঁহার হৃদয়-সরোবরে সেই আদিপুরুষ কিরূপ প্রতিবিম্বিত হইয়াছেন।

ভক্তেরা কেহ কেহ ঐরূপ চিন্তা করিতেছেন ও শ্রীরামকৃষ্ণের শ্রীমুখবিগলিত হরিনাম, আর মায়ের নাম, শ্রবণ করিয়া কৃতকৃতার্থ বোধ করিতেছেন। নামগুণকীর্ত্তনান্তে ঠাকুর প্রার্থনা করিতেছেন। যেন সাক্ষাৎ ভগবান প্রেমের দেহ ধারণ করিয়া জীবকে শিক্ষা দিতেছেন, কিরূপে প্রার্থনা করিতে হয়। বলিলেন, **"মা আমি তোমার শরণাগত, শরণাগত! তোমার শ্রীপাদপদ্মে শরণ নিলাম। দেহসুখ চাই না মা! লোকমান্য চাই না, (অণিমাদি) অষ্টসিদ্ধি চাই না, কেবল এই ক'রো যেন তোমার শ্রীপাদপদ্মে শুদ্ধাভক্তি হয়—নিষ্কাম অমলা, অহৈতুকী ভক্তি হয়। আর যেন মা, তোমার ভুবনমোহিনী মায়ায় মুগ্ধ না হই—তোমার মায়ার সংসারে, কামিনীকাঞ্চনের উপর ভালবাসা যেন কখন না হয়! মা! তোমা বই আমার আর কেউ নাই। আমি ভজনহীন, সাধনহীন, জ্ঞানহীন, ভক্তিহীন—কৃপা ক'রে শ্রীপাদপদ্মে আমায় ভক্তি দাও।"**

মণি ভাবিতেছেন—ত্রিসন্ধ্যা যিনি তাঁর নাম করিতেছেন—যাঁর শ্রীমুখবিনিঃসৃত নামগঙ্গা তৈলধারার ন্যায় নিরবচ্ছিন্না, তাঁর আবার সন্ধ্যা কি? মণি পরে বুঝিলেন, লোকশিক্ষার জন্য ঠাকুর মানবদেহ ধারণ করিয়াছেন—

"হরি আপনি এসে, যোগিবেশে, করিলে নাম সংকীর্ত্তন।"

গিরিশ ঠাকুরকে নিমন্ত্রণ করিলেন। সেই রাত্রেই যেতে হবে।

শ্রীরামকৃষ্ণ—রাত হবে না?

গিরিশ—না, যখন ইচ্ছা আপনি যাবেন, আমার আজ থিয়েটারে যেতে হবে। তাদের ঝগড়া মেটাতে হবে।

পঞ্চম পরিচ্ছেদ

রাজপথে শ্রীরামকৃষ্ণের অদ্ভুত ঈশ্বরাবেশ

গিরিশের নিমন্ত্রণ! রাত্রেই যেতে হবে। এখন রাত ৯টা, ঠাকুর খাবেন ব'লে রাত্রের খাবার বলরামও প্রস্তুত ক'রেছেন। পাছে বলরাম মনে কষ্ট পান, ঠাকুর গিরিশের বাড়ি যাইবার সময় তাই বুঝি বলিতেছেন,—"বলরাম! তুমিও খাবার পাঠিয়ে দিও।"

দু'তলা হইতে নীচে নামিতে নামিতে ভগবদ্ভাবে বিভোর! যেন মাতাল। সঙ্গে নারা'ণ ও মাষ্টার। পশ্চাতে রাম, চুনি ইত্যাদি অনেকে। একজন ভক্ত বলিতেছেন, সঙ্গে কে যাবে? ঠাকুর বলিলেন, "একজন হ'লেই হ'লো।" নামিতে

নামিতেই বিভোর। নারা'ণ হাত ধরিতে গেলেন, পাছে পড়িয়া যান। ঠাকুর বিরক্তি প্রকাশ করিলেন। কিয়ৎক্ষণ পরে নারা'ণকে সস্নেহে বলিলেন, "হাত ধরলে লোকে মাতাল মনে করবে, আমি আপনি চ'লে যাবো।"

বোসপাড়ার তেমাথা পার হ'চ্ছেন—কিছুদূরেই শ্রীযুক্ত গিরিশের বাড়ি। এত শীঘ্র চলছেন কেন? ভক্তেরা পশ্চাতে প'ড়ে থাকছে। না জানি হৃদয়মধ্যে কি অদ্ভুত দেবভাব হইয়াছে! বেদে যাঁহাকে বাক্য-মনের অতীত বলিয়াছেন, তাঁহাকে চিন্তা করিয়া কি ঠাকুর পাগলের মত পাদবিক্ষেপ করিতেছেন? এইমাত্র বলরামের বাড়িতে বলিলেন যে, সেই পুরুষ বাক্য-মনের অতীত নহেন; তিনি শুদ্ধ মনের, শুদ্ধ বুদ্ধির, শুদ্ধ আত্মার গোচর। তবে বুঝি সেই পুরুষকে সাক্ষাৎকার ক'রছেন! এই কি দেখছেন—"যো কুছ্ হ্যায়, সো তুঁহি হ্যায়?"

এই যে নরেন্দ্র আসিতেছেন। 'নরেন্দ্র', 'নরেন্দ্র' বলিয়া পাগল। কই, নরেন্দ্র সম্মুখে আসিলেন, ঠাকুর ত কথা কহিতেছেন না। লোকে বলে, এর নাম ভাব, এইরূপ কি শ্রীগৌরাঙ্গের হইত?

কে এ ভাব বুঝিবে? গিরিশের বাড়ি প্রবেশ করিবার গলির সম্মুখে ঠাকুর আসিয়া উপস্থিত হইলেন। সঙ্গে ভক্তগণ। এইবার নরেন্দ্রকে সম্ভাষণ করিতেছেন।

নরেন্দ্রকে বলছেন, "ভাল আছ, বাবা? আমি তখন কথা কইতে পারি নাই।" —কথার প্রতি অক্ষর করুণা-মাখা। তখনও দ্বারদেশে উপস্থিত হন নাই। এইবার হঠাৎ দাঁড়াইয়া পড়িলেন।

নরেন্দ্রের দিকে চাহিয়া বলিয়া উঠিলেন, একটা কথা—এই একটি (দেহী?) ও একটি (জগৎ?)।

জীব জগৎ! ভাবে এ সব কি দেখিতেছিলেন? তিনিই জানেন, অবাক হ'য়ে কি দেখিলেন। দু-একটি কথা উচ্চারিত হইল, যেন বেদবাক্য—যেন দৈববাণী—অথবা, যেন অনন্ত সমুদ্রের তীরে গিয়াছি ও অবাক হ'য়ে দাঁড়াইয়াছি; আর যেন অনন্ততরঙ্গমালোত্থিত অনাহত শব্দের একটি-দুটি ধ্বনি কর্ণকুহরে প্রবিষ্ট হইল।

ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ

ঠাকুর ভক্তমন্দিরে—সংবাদপত্র—নিত্যগোপাল

দ্বারদেশে গিরিশ; ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণকে গৃহমধ্যে লইয়া যাইতে আসিয়াছেন। ঠাকুর ভক্তসঙ্গে যেই নিকটে এলেন, অমনি গিরিশ দণ্ডের ন্যায় সম্মুখে পড়িলেন। আজ্ঞা পাইয়া উঠিলেন, ঠাকুরের পদধূলা গ্রহণ করিলেন ও সঙ্গে করিয়া দু-তলায় বৈঠকখানা ঘরে লইয়া বসাইলেন। ভক্তেরা শশব্যস্ত হ'য়ে আসন গ্রহণ করিলেন—সকলের ইচ্ছা, তাঁহার কাছে বসেন ও তাঁহার মধুর কথামৃত পান করেন।

আসন গ্রহণ করিতে গিয়া ঠাকুর দেখিলেন, একখানা খবরের কাগজ রহিয়াছে। খবরের কাগজে বিষয়ীদের কথা। বিষয় কথা, পরচর্চা, পরনিন্দা তাই অপবিত্র—তাঁহার চক্ষে। তিনি ইসারা করিলেন, ওখানা যাতে স্থানান্তরিত করা হয়।

কাগজখানা সরানো হবার পর আসন গ্রহণ করিলেন।

নিত্যগোপাল প্রণাম করিলেন।

শ্রীরামকৃষ্ণ (নিত্যগোপালের প্রতি)—ওখানে?

নিত্য—আজ্ঞে হাঁ, দক্ষিণেশ্বরে যাই নাই। শরীর খারাপ। ব্যথা।

শ্রীরামকৃষ্ণ—কেমন আছিস?

নিত্য—ভাল নয়।

শ্রীরামকৃষ্ণ—দুই-এক গ্রাম নীচে থাকিস।

নিত্য—লোক ভাল লাগে না। কত কি বলে—ভয় হয়। এক-একবার খুব সাহস হয়।

শ্রীরামকৃষ্ণ—তা হবে বৈ কি: তোর সঙ্গে কে থাকে?

নিত্য—তারক*। ও সর্বদা আমার সঙ্গে থাকে, ওকেও সময়ে সময়ে ভাল লাগে না।

শ্রীরামকৃষ্ণ—ন্যাঙটা বল্‌তো, তাদের মঠে একজন সিদ্ধ ছিল। সে আকাশ তাকিয়ে চলে যেতো; গণেশগর্জী—সঙ্গী যেতে বড় দুঃখ—অধৈর্য হ'য়ে গিছ্‌লো।

বলিতে বলিতে শ্রীরামকৃষ্ণের ভাবান্তর হইল। কি ভাবে অবাক্ হ'য়ে রহিলেন। কিয়ৎ পরে বলিতেছেন, "তুই এসেছিস্? আমিও এসেছি।"

এ কথা কে বুঝিবে? এই কি দেব-ভাষা?

---

* তারকনাথ ঘোষাল—শ্রীশিবানন্দ।

সপ্তম পরিচ্ছেদ

পার্ষদসঙ্গে—অবতার সম্বন্ধে বিচার

ভক্তেরা অনেকেই উপস্থিত; —শ্রীরামকৃষ্ণের কাছে বসিয়া। নরেন্দ্র, গিরিশ, রাম, হরিপদ, চুনি, বলরাম, মাষ্টার—অনেকে আছেন।

নরেন্দ্র মানেন না যে, মানুষদেহ লইয়া ঈশ্বর অবতার হন। এদিকে গিরিশের জ্বলন্ত বিশ্বাস যে, তিনি যুগে যুগে অবতার হন, আর মানবদেহ ধারণ ক'রে মর্ত্ত্যলোকে আসেন। ঠাকুরের ভারী ইচ্ছা যে, এ সম্বন্ধে দুজনের বিচার হয়। শ্রীরামকৃষ্ণ গিরিশকে বলিতেছেন, "একটু ইংরাজীতে দুজনে বিচার করো, আমি দেখবো!"

বিচার আরম্ভ হইল। ইংরাজীতে হইল না, বাংলাতেই হইল—মাঝে মাঝে দু-একটা ইংরাজী কথা। নরেন্দ্র বলিলেন, "ঈশ্বর অনন্ত। তাঁকে ধারণা করা আমাদের সাধ্য কি? তিনি সকলের ভিতরেই আছেন—শুধু একজনের ভিতর এসেছেন, এমন নয়।"

শ্রীরামকৃষ্ণ (সস্নেহে)—ওরও যা মত আমারও তাই মত। তিনি সর্বত্র আছেন। তবে একটা কথা আছে—শক্তিবিশেষ। তিনি কোনখানে অবিদ্যাশক্তির প্রকাশ, কোনখানে বিদ্যাশক্তির। কোন আধারে শক্তি বেশী, কোন আধারে শক্তি কম। তাই সব মানুষ সমান নয়।

রাম—এ সব মিছে তর্কে কি হবে?

শ্রীরামকৃষ্ণ (বিরক্তভাবে)—না, না, ওর একটা মানে আছে।

গিরিশ (নরেন্দ্রের প্রতি)—তুমি কেমন ক'রে জান্‌লে, তিনি দেহ ধারণ ক'রে আসেন না?

নরেন্দ্র—তিনি অবাঙ্মনসোগোচরম্।

শ্রীরামকৃষ্ণ—না; তিনি শুদ্ধ বুদ্ধির গোচর। শুদ্ধবুদ্ধি শুদ্ধআত্মা একই, ঋষিরা শুদ্ধবুদ্ধি শুদ্ধআত্মা দ্বারা শুদ্ধআত্মাকে সাক্ষাৎকার ক'রেছিলেন।

গিরিশ (নরেন্দ্রের প্রতি)—মানুষে অবতার না হ'লে কে বুঝিয়ে দেবে? মানুষকে জ্ঞান ভক্তি দিবার জন্য তিনি দেহ ধারণ ক'রে আসেন। না হ'লে কে শিক্ষা দেবে?

নরেন্দ্র—কেন? তিনি অন্তরে থেকে বুঝিয়ে দেবেন।

শ্রীরামকৃষ্ণ (সস্নেহে)—হাঁ হাঁ, অন্তর্যামীরূপে তিনি বুঝাবেন।

তারপর ঘোরতার তর্ক। ইনফিনিটি—তার কি অংশ হয়? আবার হ্যামিলটন্ কি বলেন? হার্বার্ট স্পেন্সার কি বলেন? টিণ্ডেল, হাক্সলে বা কি ব'লে গেছেন, এই কথা হ'তে লাগলো।

শ্রীরামকৃষ্ণ (মাষ্টারের প্রতি)—দেখ, ইগুণো* আমার ভাল লাগছে না। আমি সব তাই দেখ্‌ছি। বিচার আর কি করবো? দেখ্‌ছি—তিনিই সব। তিনিই সব হয়েছেন। তাও বটে, আবার তাও বটে। এক অবস্থায়, অখণ্ডে মনবুদ্ধি হারা হ'য়ে যায়! নরেন্দ্রকে দেখে আমার মন অখণ্ডে লীন হয়।

(গিরিশের প্রতি)—"তার কি করলে বল দেখি।"

গিরিশ (হাসিতে হাসিতে)—ঐটে ছাড়া প্রায় সব বুঝেছি কি না। (সকলের হাস্য)।

[রামানুজ ও বিশিষ্টাদ্বৈতবাদ]

শ্রীরামকৃষ্ণ—আবার দু-থাক না নামলে কথা কইতে পারি না।

"বেদান্ত—শঙ্কর যা বুঝিয়েছেন, তাও আছে; আবার রামানুজের বিশিষ্টাদ্বৈতবাদও আছে।

নরেন্দ্র—বিশিষ্টাদ্বৈতবাদ কি?

শ্রীরামকৃষ্ণ (নরেন্দ্রকে)—বিশিষ্টাদ্বৈতবাদ আছে—রামানুজের মত। কিনা, জীবজগৎবিশিষ্ট ব্রহ্ম। সব জড়িয়ে একটি।

"যেমন একটি বেল। খোলা আলাদা, বীজ আলাদা, শাঁস আলাদা একজন করেছিল। বেলটি কত ওজনের জান্‌বার দরকার হয়েছিল। এখন শুধু শাঁস ওজন করলে কি বেলের ওজন পাওয়া যায়? খোলা বীচি, শাঁস সব একসঙ্গে ওজন করতে হবে। প্রথমে খোলা নয়, বীচি নয়, শাঁসটিই সার পদার্থ বলে বোধ হয়। তারপর বিচার ক'রে দেখে,—যে বস্তুর শাঁস সেই বস্তুরই খোলা আর বীচি। আগে নেতি নেতি ক'রে যেতে হয়। জীব নেতি, জগৎ নেতি এইরূপ বিচার করতে হয়; ব্রহ্মই বস্তু আর সব অবস্তু। তারপর অনুভব হয়, যার শাঁস তারই খোলা, বীচি, যা থেকে ব্রহ্ম বলছো তাই থেকে জীবজগৎ। যাঁরই নিত্য তাঁরই লীলা। তাই রামানুজ বল্‌তেন, জীবজগৎবিশিষ্ট ব্রহ্ম। এরই নাম বিশিষ্টাদ্বৈতবাদ।"

---

* তাঁহার ব্যবহৃত সুমিষ্ট কথা—ইগুলো অর্থাৎ এইগুলি।

অষ্টম পরিচ্ছেদ

ঈশ্বরদর্শন (God Vision) —অবতার প্রত্যক্ষসিদ্ধ

শ্রীরামকৃষ্ণ (মাষ্টারের প্রতি)—আমি তাই দেখছি সাক্ষাৎ—আর কি বিচার কর্‌বো? আমি দেখছি, তিনিই এই সব হ'য়েছেন। তিনিই জীব ও জগৎ হ'য়েছেন।

"তবে চৈতন্য না লাভ ক'রলে চৈতন্যকে জানা যায় না। বিচার কতক্ষণ? যতক্ষণ না তাঁকে লাভ করা যায়; শুধু মুখে বললে হবে না, এই আমি দেখছি তিনিই সব হ'য়েছেন। তাঁর কৃপায় চৈতন্য লাভ করা চাই! চৈতন্য লাভ করলে সমাধি হয়, মাঝে মাঝে দেহ ভুল হ'য়ে যায়, কামিনী-কাঞ্চনের উপর আসক্তি থাকে না, ঈশ্বরীয় কথা ছাড়া কিছু ভাল লাগে না; বিষয় কথা শুনলে কষ্ট হয়।

[প্রত্যক্ষ (Revelation)—নরেন্দ্রকে শিক্ষা—কালীই ব্রহ্ম*]

"চৈতন্য লাভ ক'রলে তবে চৈতন্যকে জানতে পারা যায়।

বিচারান্তে ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ মাষ্টারকে বলিতেছেন—

"দেখেছি, বিচার ক'রে এক রকম জানা যায়, তাঁকে ধ্যান ক'রে এক রকম জানা যায়। আবার তিনি যখন দেখিয়ে দেন—সে এক। তিনি যদি দেখিয়ে দেন —এর নাম অবতার—তিনি যদি তাঁর মানুষ লীলা দেখিয়ে দেন, তাহ'লে আর বিচার ক'রতে হয় না, কারুকে বুঝিয়ে দিতে হয় না! কি রকম জানো? যেমন অন্ধকারের ভিতর দেশলাই ঘসতে ঘসতে দপ্‌ ক'রে আলো হয়। সেই রকম দপ্‌ ক'রে আলো যদি তিনি দেন, তাহ'লে সব সন্দেহ মিটে যায়। এরূপ বিচার ক'রে কি তাঁকে জানা যায়?"

ঠাকুর নরেন্দ্রকে কাছে ডাকিয়া বসাইলেন ও কুশল প্রশ্ন ও কত আদর করিতেছেন।

নরেন্দ্র (শ্রীরামকৃষ্ণের প্রতি)—কই কালীর ধ্যান তিন-চার দিন করলুম, কিছুই তো হলো না।

শ্রীরামকৃষ্ণ—ক্রমে হবে। কালী আর কেউ নয়, যিনিই ব্রহ্ম, তিনিই কালী। কালী আদ্যাশক্তি। যখন নিষ্ক্রিয়, তখন ব্রহ্ম ব'লে কই। যখন সৃষ্টি, স্থিতি, প্রলয় করেন তখন শক্তি ব'লে কই, কালী ব'লে কই। যাঁকে তুমি ব্রহ্ম বলছো, তাঁকেই কালী বলছি।

---

* কালী—God in His relations, to the conditioned.

ব্রহ্ম—The Unconditioned, the Absolute.

"ব্রহ্ম আর কালী অভেদ। যেমন অগ্নি আর দাহিকাশক্তি। অগ্নি ভাবলেই দাহিকাশক্তি ভাবতে হয়। কালী মানলেই ব্রহ্ম মানতে হয় আবার ব্রহ্ম মানলেই কালী মানতে হয়।

"ব্রহ্ম ও শক্তি অভেদ। ওকেই শক্তি, ওকেই কালী আমি বলি।"

এদিকে রাত হ'য়ে গেছে। গিরিশ হরিপদকে বলিতেছেন, ভাই একখানা গাড়ী যদি ডেকে দিস্—থিয়েটারে যেতে হবে।

শ্রীরামকৃষ্ণ (সহাস্যে)—দেখিস যেন আনিস! (সকলের হাস্য)।

হরিপদ (সহাস্যে)—আমি আনতে যাচ্ছি—আর আনবো না?

[ঈশ্বরলাভ ও কর্ম—রাম ও কাম]

গিরিশ (শ্রীরামকৃষ্ণের প্রতি)—আপনাকে ছেড়ে আবার থিয়েটারে যেতে হবে।

শ্রীরামকৃষ্ণ—না, ইদিক্‌উদিক্‌ দুদিক্‌ রাখতে হবে; জনক রাজা ইদিক-উদিক দুদিক রেখে, খেয়েছিল দুধের বাটি।' (সকলের হাস্য)।

গিরিশ—থিয়েটারগুলো ছোঁড়াদেরই ছেড়ে দিই মনে করছি।

শ্রীরামকৃষ্ণ—না না, ও বেশ আছে; অনেকের উপকার হচ্ছে।

নরেন্দ্র (মৃদুস্বরে)—এই তো ঈশ্বর বলছে, অবতার বলছে! আবার থিয়েটার টানে!

নবম পরিচ্ছেদ

সমাধিমন্দিরে—গর্গরমাতোয়ারা শ্রীরামকৃষ্ণ

শ্রীরামকৃষ্ণ নরেন্দ্রকে কাছে বসাইয়া একদৃষ্টে দেখিতেছেন, হঠাৎ তাঁহার সন্নিকটে আরও সরিয়া গিয়া বসিলেন। নরেন্দ্র অবতার মানেন নাই—তায় কি এসে যায়? ঠাকুরের ভালবাসা যেন আরও উথলিয়া পড়িল। গায়ে হাত দিয়া নরেন্দ্রের প্রতি কহিতেছেন, 'মান কর্‌লি তো কর্‌লি, আমরাও তো মানে আছি (রাই)!'

[বিচার ঈশ্বরলাভ পর্যন্ত]

(নরেন্দ্রের প্রতি)—"যতক্ষণ বিচার, ততক্ষণ তাঁকে পায় নাই। তোমরা বিচার করছিলে, আমার ভাল লাগে নাই।

নিমন্ত্রণবাড়ির শব্দ কতক্ষণ শুনা যায়? যতক্ষণ লোকে খেতে না বসে। যাই লুচি তরকারী পড়ে, অমনি বার আনা শব্দ কমে যায়। (সকলের হাস্য)। অন্য খাবার পড়লে আরও কমতে থাকে। দই পাতে পাতে পড়লে কেবল সুপ সাপ্‌। ক্রমে খাওয়া হ'য়ে গেলেই নিদ্রা।

"ঈশ্বরকে যত লাভ হবে, ততই বিচার কম্‌বে। তাঁকে লাভ হ'লে আর শব্দ বিচার থাকে না। তখন নিদ্রা—সমাধি।"

এই বলিয়া নরেন্দ্রের গায় হাত বুলাইয়া, মুখে হাত দিয়া আদর করিতেছেন ও বলিতেছেন, "হরি ওঁ, হরি ওঁ, হরি ওঁ।"

কেন এরূপ করিতেছেন ও বলিতেছেন? শ্রীরামকৃষ্ণ কি নরেন্দ্রের মধ্যে সাক্ষাৎ নারায়ণ দর্শন করিতেছেন? এরই নাম কি মানুষে ঈশ্বর দর্শন? কি আশ্চর্য! দেখিতে দেখিতে ঠাকুরের সংজ্ঞা যাইতেছে। ঐ দেখ বহির্জগতের হুঁশ চলিয়া যাইতেছে। এরই নাম বুঝি অর্ধ বাহ্যদশা—যাহা শ্রীগৌরাঙ্গের হইয়াছিল। এখনও নরেন্দ্রের পায়ের উপর হাত—যেন ছল করিয়া নারায়ণের পা টিপিতেছেন—আবার গায়ে হাত বুলাইতেছেন। এত গা-টেপা, পা-টেপা কেন? একি নারায়ণের সেবা ক'রছেন, না শক্তি সঞ্চার ক'রছেন?

দেখিতে দেখিতে আরও ভাবান্তর হইতেছে। এই আবার নরেন্দ্রের কাছে হাত জোড় ক'রে কি বলছেন! বলছেন—"একটা গান (গা)—তাহ'লে ভাল হ'বো;—উঠতে পারবো কেমন করে! গোরাপ্রেমে গর্গরমাতোয়ারা (নিতাই আমার)—"

কিয়ৎক্ষণ আবার অবাক্, চিত্রপুত্তলিকার মত চুপ ক'রে রহিয়াছেন। আবার ভাবে মাতোয়ারা হ'য়ে ব'লছেন—

"দেখিস রাই—যমুনায় যে প'ড়ে যাবি—কৃষ্ণপ্রেমে উন্মাদিনী।"

আবার ভাবে বিভোর! বলিতেছেন—

"সখি! সে বন কত দূর! (যে বনে আমার শ্যামসুন্দর)!

(ঐ যে কৃষ্ণগন্ধ পাওয়া যায়)! (আমি চলিতে যে-নারি)।

এখন জগৎ ভুল হ'য়েছে—কাহাকেও মনে নাই—নরেন্দ্র সম্মুখে, কিন্তু নরেন্দ্রকে আর মনে নাই—কোথায় বসে আছেন, কিছুই হুঁশ নাই। এখন যেন মন-প্রাণ ঈশ্বরে গত হ'য়েছে! 'মদ্‌গত-অন্তরাত্মা।'

"গোরাপ্রেমে গর্গরমাতোয়ারা! এই কথা বলিতে বলিতে হঠাৎ হুঙ্কার দিয়া দণ্ডায়মান! আবার বসিতেছেন, বসিয়া বলিতেছেন,—

"ঐ একটা আলো আস্‌ছে দেখতে পাচ্ছি,—কিন্তু কোন্ দিক্ দিয়ে আলোটা আস্‌ছে এখনও বুঝতে পারছি না।"

এইবার নরেন্দ্র গান গাহিতেছেন—

> সব দুঃখ দূর করিলে দরশন দিয়ে—মোহিলে প্রাণ।
> সপ্ত লোক ভুলে শোক, তোমারে পাইয়ে—
> কোথায় আমি অতি দীন হীন॥

গান শুনিতে শুনিতে শ্রীরামকৃষ্ণের বহির্জগৎ ভুল হইয়া আসিতেছে। আবার নিমীলিত নেত্র! স্পন্দহীন দেহ! সমাধিস্থ!

সমাধি ভঙ্গের পর বলিতেছেন, "আমাকে কে লয়ে যাবে?" বালক যেমন সঙ্গী না দেখলে অন্ধকার দেখে সেইরূপ।

অনেক রাত হইয়াছে। ফাল্গুন কৃষ্ণাদশমী—অন্ধকার রাত্রি। ঠাকুর দক্ষিণেশ্বরে কালীবাড়িতে যাইবেন। গাড়ীতে উঠিবেন। ভক্তেরা গাড়ীর কাছে দাঁড়াইয়া। তিনি উঠিতেছেন—অনেক সন্তর্পণে তাঁহাকে উঠান হইতেছে। এখনও গর্গরমাতোয়ারা!'

গাড়ী চলিয়া গেল। ভক্তেরা যে যার বাড়ি যাইতেছেন।

দশম পরিচ্ছেদ

সেবক হৃদয়ে

মস্তকের উপরে তারকামণ্ডিত নৈশগগন—হৃদয়পটে অদ্ভুত শ্রীরামকৃষ্ণ ছবি, স্মৃতিমধ্যে ভক্তের মজলিস—সুখস্বপ্নের ন্যায় নয়ন পথে সেই প্রেমের হাট—কলিকাতার রাজপথে গৃহাভিমুখে ভক্তেরা যাইতেছেন। কেহ সরস বসন্তানিল সেবন করিতে করিতে সেই গানটি আবার গাইতে যাচ্ছেন—

"সব দুঃখ দূর করিলে দরশন দিয়ে—মোহিলে প্রাণ!"

মণি ভাব্‌তে ভাব্‌তে যাচ্ছেন, "সত্য সত্যই কি ঈশ্বর মানুষদেহ ধারণ ক'রে আসেন? তবে অবতার কি সত্য? অনন্ত ঈশ্বর চৌদ্দ পোয়া মানুষ কি ক'রে হবেন? অনন্ত কি সান্ত হয়? বিচার তো অনেক হ'ল। কি বুঝলাম. বিচারের দ্বারা কিছুই বুঝলাম না।

ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ তো বেশ বললেন, 'যতক্ষণ বিচার ততক্ষণ বস্তুলাভ হয় নাই, ততক্ষণ ঈশ্বরকে পাওয়া যায় নাই।' তাও বটে! এই তো এক ছটাক বুদ্ধি; এর দ্বারা আর কি বুঝবো ঈশ্বরের কথা! এক সের বাটিতে কি চার সের দুধ ধরে? তবে অবতার বিশ্বাস কিরূপে হয়? ঠাকুর বললেন, ঈশ্বর যদি দেখিয়ে দেন দপ ক'রে, তা হলে এক দণ্ডেই বুঝা যায়! Goethe মৃত্যুশয্যায় বলেছিলেন Light! More Light! তিনি যদি দপ করে আলো জেবলে দেখিয়ে দেন, তবে—'ছিদ্যন্তে সর্বসংশয়াঃ।'

"যেমন প্যালেস্টাইন-এর মূর্খ ধীবরেরা **Jesus**-কে অথবা যেমন শ্রীবাসাদি ভক্ত শ্রীগৌরাঙ্গকে পূর্ণাবতার দেখেছিলেন।

"যদি দপ্ ক'রে তিনি না দেখান্ তা হ'লে উপায় কি? কেন, যেকালে ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ ব'লেছেন ও কথা, সেকালে অবতার বিশ্বাস করবো। তিনিই শিখিয়েছেন—বিশ্বাস, বিশ্বাস, বিশ্বাস! গুরুবাক্যে বিশ্বাস! আর—

"তোমারেই করিয়াছি জীবনের ধ্রুবতারা।
এ সমুদ্রে আর কভু হ'ব নাকো পথহারা॥"

'আমার তাঁর বাক্যে—ঈশ্বর কৃপায় বিশ্বাস হ'য়েছে;—আমি বিশ্বাস করবো, অন্যে যা করে করুক; আমি এই দেবদুর্লভ বিশ্বাস কেন ছাড়বো? বিচার থাক। জ্ঞান চর্চ্চা করে কি আর একটি Faust হতে হবে? আবার কি গভীর রজনীমধ্যে বাতায়ন পথে চন্দ্রাকিরণ আসবে, আর Faust নাকি একাকী ঘরের মধ্যে হায় কিছু জানিতে পারিলাম না, সায়েন্স্ ফিলসফি বৃথা অধ্যয়ন করিলাম, এই জীবনে ধিক্! এই বলিয়া বিষের শিশি লইয়া আত্মহত্যা করিতে বসিবে? না, আর একজন Alastor -এর মত অজ্ঞানের বোঝা বইতে না পেরে শিলাখন্ডের উপর মাথা রেখে মৃত্যুর অপেক্ষা করিবে! না, আমার এ সব ভয়ানক পন্ডিতদের মত এক ছটাক জ্ঞানের দ্বারা এ রহস্য ভেদ ক'রতে যাবার প্রয়োজন নাই। আর এক সের বাটিতে চার সের দুধ ধ'রলো না ব'লে, মরিতে যাবারও দরকার নাই! বেশ কথা—গুরুবাক্যে বিশ্বাস। হে ভগবন, আমায় বিশ্বাস দাও; আর মিছামিছি ঘুরাইও না। যা হবার নয়, তা খুঁজ্‌তে যাওয়াইও না। আর ঠাকুর যা শিখিয়েছেন, 'যেন তোমার পাদপদ্মে শুদ্ধা-ভক্তি হয়,—অমলা অহৈতুকী—ভক্তি, আর যেন তোমার ভুবনমোহিনী মায়ায় মুগ্ধ না হই! কৃপা ক'রে এই আশীর্বাদ কর।

শ্রীরামকৃষ্ণের অদৃষ্টপূর্ব প্রেমের কথা ভাবিতে ভাবিতে মণি সেই তমসাচ্ছন্ন রাত্রি মধ্যে রাজপথ দিয়া বাড়ি ফিরিয়া যাইতেছেন ও ভাবিতেছেন কি ভালবাসা গিরিশকে! গিরিশ থিয়েটারে চ'লে যাবেন, তবু তাঁর বাড়িতে যেতে হবে। শুধু তা নয়! এমনও ব'লছেন না যে, ত্যাগ কর—আমার জন্য গৃহ পরিজন, বিষয়-কর্ম সব ত্যাগ ক'রে সন্ন্যাস অবলম্বন কর।' বুঝেছি —এর মানে এই যে, সময় না হলে, তীব্র বৈরাগ্য না হলে, ছাড়লে কষ্ট হবে; ঠাকুর যেমন নিজে বলেন, ঘায়ের মাম্‌ড়ী ঘা শুকুতে না শুকুতে ছিঁড়লে, রক্ত পড়ে কষ্ট হয়, কিন্তু ঘা শুকিয়ে গেলে মাম্‌ড়ী আপনি খসে প'ড়ে যায়। সামান্য লোকে, যাদের অন্তর্দৃষ্টি নাই, তারা বলে, এখনি সংসার ত্যাগ কর। ইনি সদ্‌গুরু, অহেতুক কৃপাসিন্ধু, প্রেমের সমুদ্র, জীবের কিসে মঙ্গল হয় এই চেষ্টা নিশিদিন করিতেছেন।

"আর গিরিশের কি বিশ্বাস! দুদিন দর্শনের পরই ব'লেছিলেন, 'প্রভু, তুমিই ঈশ্বর—মানুষদেহ ধারণ ক'রে এসেছ—আমার পরিত্রাণের জন্য।' গিরিশ ঠিক তো ব'লেছেন, ঈশ্বর মানুষদেহ ধারণ না কর্‌লে ঘরের লোকের মত কে শিক্ষা দেবে, কে জানিয়ে দেবে, ঈশ্বরই বস্তু আর সব অবস্তু, কে ধরায় পতিত দুর্বল সন্তানকে হাত ধরে তুলবে? কে কামিনী-কাঞ্চনাসক্ত পাশব-স্বভাবপ্রাপ্ত মানুষকে আবার পূর্ববৎ অমৃতের অধিকারী ক'রবে? আর তিনি মানুষরূপে সঙ্গে সঙ্গে না বেড়ালে যাঁরা তদ্‌গতান্তরাত্মা, যাঁদের ঈশ্বর বই আর কিছু ভাল লাগে না তাঁরা কি ক'রে কাটাবেন? তাই—

'পরিত্রাণায় সাধূনাং বিনাশায় চ দুষ্কৃতাং,
ধর্মসংস্থাপনার্থায় সম্ভবামি যুগে যুগে॥'

"কি ভালবাসা!—নরেন্দ্রের জন্য পাগল, নারায়ণের জন্য ক্রন্দন! বলেন, 'এরা ও অন্যান্য ছেলেরা—রাখাল, ভবনাথ, পূর্ণ, বাবুরাম, ইত্যাদি—সাক্ষাৎ নারায়ণ, আমার জন্য দেহ ধারণ করে এসেছে!' এ প্রেম তো মানুষ জ্ঞানে নয়, এ প্রেম দেখছি ঈশ্বর প্রেম! ছেলেরা শুদ্ধ-আত্মা, স্ত্রীলোক অন্যভাবে স্পর্শ করে নাই; বিষয়-কর্ম ক'রে এদের লোভ, অহঙ্কার, হিংসা ইত্যাদি স্ফূর্তি হয় নাই, তাই ছেলেদের ভিতর ঈশ্বরের বেশী প্রকাশ। কিন্তু এ দৃষ্টি কার আছে? ঠাকুরের অন্তর্দৃষ্টি; সমস্ত দেখিতেছেন—কে বিষয়াসক্ত, কে সরল উদার, ঈশ্বর ভক্ত! তাই এরূপ ভক্ত দেখলেই সাক্ষাৎ নারায়ণ বলে সেবা করেন। তাদের নাওয়ান, শোয়ান, তাদের দেখিবার জন্য কাঁদেন; কলিকাতায় ছুটিয়া ছুটিয়া যান। লোকের খোশামোদ ক'রে বেড়ান কলিকাতা থেকে তাদের গাড়ী করে আন্‌তে; গৃহস্থ ভক্তদের সর্বদা বলেন, ওদের নিমন্ত্রণ ক'রে খাওয়াইয়ো; তাহ'লে তোমাদের ভাল হবে। একি মায়িক স্নেহ? না, বিশুদ্ধ ঈশ্বর প্রেম? মাটির প্রতিমাতে এত ষোড়শোপচারে ঈশ্বরের পূজা ও সেবা হয়, আর শুদ্ধ নরদেহে কি হয় না? তা ছাড়া এরাই ভগবানের প্রত্যেক লীলার সহায়! জন্ম জন্ম সাঙ্গোপাঙ্গ!

"নরেন্দ্রকে দেখ্‌তে দেখ্‌তে বাহ্যজগৎ ভুলে গেলেন; ক্রমে দেহী নরেন্দ্রকে ভুলে গেলেন, বাহ্যিক মনুষ্যকে (Apparent man) ভুলে গেলেন; প্রকৃত মনুষ্যকে (Real man) দর্শন করতে লাগিলেন; অখণ্ড সচ্চিদানন্দে মন লীন হইল, যাঁকে দর্শন ক'রে কখনও অবাক স্পন্দহীন হয়ে চুপ করে থাকেন, কখনও বা ওঁ ওঁ বলেন; কখন বা মা মা ক'রে বালকের মত ডাকেন, নরেন্দ্রের ভিতর তাঁকে বেশী প্রকাশ দেখেন। নরেন্দ্র নরেন্দ্র ক'রে পাগল!

"নরেন্দ্র অবতার মানেন নাই, তার আর কি হ'য়েছে। ঠাকুরের দিব্যচক্ষু; তিনি দেখলেন, যে, এ অভিমান হতে পারে। তিনি যে বড় আপনার লোক, তিনি যে আপনার মা, পাতানো মা তো নন। তিনি কেন বুঝিয়ে দেন না, তিনি কেন দপ্‌ ক'রে আলো জেবলে দেখিয়ে দেন না! তাই বুঝি ঠাকুর বললেন—

'মান কয়লি তো কয়লি, আমরাও তোর মানে আছি।'

"আত্মীয় হ'তে যিনি পরমাত্মীয় তাঁর উপর অভিমান ক'রবে না তো কার উপর ক'রবে। ধন্য নরেন্দ্রনাথ, তোমার উপর এই পুরুষোত্তমের এত ভালবাসা! তোমাকে দেখে এত সহজে ঈশ্বরের উদ্দীপন!"

এইরূপ চিন্তা করিতে করিতে সেই গভীর রাত্রে শ্রীরামকৃষ্ণ স্মরণ করিতে করিতে ভক্তেরা গৃহে প্রত্যাবর্তন করিতেছেন।

পঞ্চদশ খণ্ড

শ্রীরামকৃষ্ণ, ঈশান, ডাক্তার সরকার, গিরিশ প্রভৃতি ভক্তসঙ্গে শ্যামপুকুরের বাটীতে আনন্দ ও কথোপকথন

প্রথম পরিচ্ছেদ

গৃহস্থাশ্রম কথা-প্রসঙ্গে

আশ্বিন শুক্লাচতুর্দশী সপ্তমী, অষ্টমী ও নবমী তিনদিন মহামায়ার পূজা মহোৎসব হইয়া গিয়াছে। দশমীতে বিজয়া; তদুপলক্ষে পরস্পরের প্রেমালিঙ্গন ব্যাপার সম্পন্ন হইয়াছে। ভগবান শ্রীরামকৃষ্ণ ভক্তসঙ্গে কলিকাতার অন্তর্বর্তী সেই শ্যামপুকুর নামক পল্লীতে বাস করিতেছেন। শরীরে কঠিন ব্যাধি, গলায় ক্যান্সার। বলরামের বাড়িতে যখন ছিলেন কবিরাজ গঙ্গাপ্রসাদ দেখিতে আসিয়াছিলেন। তাঁহাকে ঠাকুর জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন, এ রোগ সাধ্য না অসাধ্য। কবিরাজ এ প্রশ্নের উত্তর দেন নাই, চুপ করিয়াছিলেন। ইংরাজ ডাক্তারেরাও রোগটি অসাধ্য, এ কথা ইঙ্গিত করিয়াছিলেন। এক্ষণে ডাক্তার সরকার চিকিৎসা করিতেছেন।

আজ বৃহস্পতিবার, ২২শে অক্টোবর, ১৮৮৫ খৃষ্টাব্দ। শ্যামপুকুরস্থিত একটি দ্বিতল গৃহ মধ্যে শ্রীরামকৃষ্ণ—দুতলা ঘরের মধ্যে শয্যা রচনা হইয়াছে, তাহাতে উপবিষ্ট। ডাক্তার সরকার, শ্রীযুক্ত ঈশানচন্দ্র মুখোপাধ্যায় ও ভক্তেরা সম্মুখে এবং চারিদিকে সমাসীন। ঈশান বড় দানী, পেন্সন লইয়াও দান করেন, ঋণ করিয়া দান করেন আর সর্বদাই ঈশ্বর চিন্তায় থাকেন। পীড়া শুনিয়া তিনি দেখিতে আসিয়াছেন। ডাক্তার সরকার চিকিৎসা করিতে আসিয়া ছয়-সাত ঘণ্টা করিয়া থাকেন, শ্রীরামকৃষ্ণকে সাতিশয় ভক্তি শ্রদ্ধা করেন ও ভক্তদের সহিত পরম আত্মীয়ের ন্যায় ব্যবহার করেন।

রাত্রি প্রায় ৭টা হইয়াছে। বাহিরে জ্যোৎস্না—পূর্ণাবয়ব নিশানাথ যেন চারিদিকে সুধা ঢালিয়াছেন। ভিতরে দীপালোক, ঘরে অনেক লোক। অনেকে মহাপুরুষ দর্শন করিতে আসিয়াছেন। সকলেই একদৃষ্টে তাঁহার দিকে চাহিয়া রহিয়াছেন। শুনিবেন তিনি কি বলেন ও দেখিবেন তিনি কি করেন। ঈশানকে দেখিয়া ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ বলিতেছেন—

[নির্লিপ্ত সংসারী—নির্লিপ্ত হবার উপায়]

"যে সংসারী ঈশ্বরের পাদপদ্মে ভক্তি রেখে সংসার করে, সে ধন্য সে বীরপুরুষ! যেমন কারু মাথায় দু মণ বোঝা আছে, আর বর যাচ্ছে, মাথায় বোঝা—তবু সে বর দেখছে। খুব শক্তি না থাকলে হয় না। যেমন পাঁকাল মাছ

পাঁকে থাকে, কিন্তু গায়ে একটুকুও পাঁক নাই। পানকৌটি জলে সর্বদা ডুব মারে, কিন্তু পাখা একবার ঝাড়া দিলেই আর গায়ে জল থাকে না।

"কিন্তু সংসারে নির্লিপ্তভাবে থাকতে গেলে কিছু সাধন করা চাই। দিন কতক নির্জনে থাকা দরকার; তা এক বছর হোক, ছয় মাস হোক, তিন মাস হোক, বা একমাস হোক। সেই নির্জনে ঈশ্বর চিন্তা ক'রতে হয়। সর্বদা তাঁকে ব্যাকুল হ'য়ে ভক্তির জন্য প্রার্থনা করতে হয়। আর মনে মনে ব'লতে হয়, 'আমার এ সংসারে কেউ নাই, যাদের আপনার বলি, তারা দুদিনের জন্য। ভগবান আমার একমাত্র আপনার লোক, তিনিই আমার সর্বস্ব; হায়! কেমন ক'রে তাঁকে পাব!'

"ভক্তি লাভের পর সংসার করা যায়। যেমন হাতে তেল মেখে কাঁটাল ভাঙ্গলে হাতে আর আঠা লাগে না। সংসার জলের স্বরূপ আর মানুষের মনটি যেন দুধ। জলে যদি দুধ রাখতে যাও, দুধে-জলে এক হ'য়ে যাবে। তাই নির্জন স্থানে দই পাত্তে হয়। দই পেতে মাখন তুলতে হয়। মাখন তুলে যদি জলে রাখ, তা হ'লে জলে মিশ্‌বে না; নির্লিপ্ত হ'য়ে ভাস্‌তে থাকবে।

"ব্রহ্মজ্ঞানীরা আমায় ব'লেছিল, মহাশয়! আমাদের জনক রাজার মত। তাঁর মত নির্লিপ্তভাবে আমরা সংসার ক'রবো। আমি বললুম, নির্লিপ্তভাবে সংসার করা বড় কঠিন। মুখে বললেই জনক রাজা হওয়া যায় না। জনক রাজা হেঁটমুণ্ড হ'য়ে ঊর্ধ্বপদ ক'রে কত তপস্যা করেছিলেন! তোমাদের হেঁটমুণ্ড বা ঊর্ধ্বপদ হ'তে হবে না, কিন্তু সাধন চাই। নির্জনে বাস চাই। নির্জনে জ্ঞানলাভ, ভক্তিলাভ ক'রে তবে গিয়ে সংসার ক'রতে হয়। দই নির্জনে পাত্তে হয়। ঠেলাঠেলি নাড়ানাড়ি ক'রলে দই বসে না।'

"জনক নির্লিপ্ত ব'লে তাঁর একটি নাম বিদেহ;—কি না, দেহে দেহবুদ্ধি নাই। সংসারে থেকেও জীবন্মুক্ত হ'য়ে বেড়াতেন। কিন্তু দেহবুদ্ধি যাওয়া অনেক দূরের কথা। খুব সাধন চাই।

"জনক ভারী বীরপুরুষ। দু'খানা তরবার ঘুরাতেন। একখানা জ্ঞান একখানা কর্ম।

[সংসার আশ্রমের জ্ঞান ও সন্ন্যাস আশ্রমের জ্ঞান]

"যদি বল, সংসার আশ্রমের জ্ঞানী আর সন্ন্যাস আশ্রমের জ্ঞানী, এ দুয়ের তফাত আছে কিনা? তার উত্তর এই যে দুই-ই এক জিনিস। এটিও জ্ঞানী উটিও জ্ঞানী—এক জিনিস। তবে সংসারে জ্ঞানীরও ভয় আছে। কামিনী-কাঞ্চনের ভিতর থাকতে গেলেই একটু না একটু ভয় আছে। কাজলের ঘরে থাক্‌তে গেলে যত সিয়ানাই হও না কেন কাল দাগ একটু না একটু গায়ে লাগবেই।

"মাখন তুলে যদি নূতন হাঁড়িতে রাখ, মাখন নষ্ট হবার সম্ভবনা থাকে না। যদি ঘোলের হাঁড়িতে রাখ, সন্দেহ হয়। (সকলের হাস্য)।

"খই যখন ভাজা হয় দু'চারটে খই খোলা থেকে টপ্ টপ্ ক'রে লাফিয়ে পড়ে। সেগুলি যেন মল্লিকা ফুলের মত, গায়ে একটু দাগ থাকে না। খোলার উপর যে সব খই থাকে, সেও বেশ খই, তবে অত ফুলের মত হয় না, একটু গায়ে দাগ থাকে। সংসারত্যাগী সন্ন্যাসী যদি জ্ঞান লাভ করে, তবে ঠিক এই মল্লিকা ফুলের মত দাগশূন্য হয়। আর জ্ঞানের পর সংসার খোলায় থাকলে একটু গায়ে লাল্‌চে দাগ হ'তে পারে। (সকলের হাস্য)।

"জনক রাজার সভায় একটি ভৈরবী এসেছিল। স্ত্রীলোক দেখে জনক রাজা হে'টমুখ হ'য়ে চোখ নীচু করেছিলেন। ভৈরবী তাই দেখে ব'লেছিলেন, 'হে জনক তোমার এখনও স্ত্রীলোক দেখে ভয়!' পূর্ণজ্ঞান হ'লে পাঁচ বছরের ছেলের স্বভাব হয়—তখন স্ত্রী-পুরুষ ব'লে ভেদবুদ্ধি থাকে না।

"যাই হোক যদিও সংসারের জ্ঞানীর গায়ে দাগ থাকতে পারে, সে দাগে কোন ক্ষতি হয় না। চন্দ্রে কলঙ্ক আছে বটে কিন্তু আলোর ব্যাঘাত হয় না।

[জ্ঞানের পর কর্ম—লোকসংগ্রহার্থ]

"কেউ কেউ জ্ঞানলাভের পর লোকশিক্ষার জন্য কর্ম করে, যেমন জনক ও নারদাদি। লোকশিক্ষার জন্য শক্তি থাকা চাই। ঋষিরা নিজের নিজের জ্ঞানের জন্য বিচরণ ক'রে বেড়াতেন। তাঁরা বীরপুরুষ।

"হাবাতে কাঠ যখন ভেসে যায়, পাখী একটি বসলে ডুবে যায়, কিন্তু বাহাদুরী কাঠ যখন ভেসে যায়, তখন গরু, মানুষ, এমন কি হাতী পর্যন্ত তার উপর যেতে পারে। স্টীমবোট আপনিও পারে যায়, আবার কত মানুষকে পার করে দেয়।

"নারদাদি আচার্য বাহাদুরী কাঠের মত, স্টীমবোট-এর মত।

"কেউ খেয়ে গামছা দিয়ে মুখ মুছে ব'সে থাকে, পাছে কেউ টের পায়। (সকলের হাস্য)। আবার কেউ কেউ একটা আম পেলে কেটে একটু একটু সকলকে দেয়, আর আপনিও খায়।

"নারদাদি আচার্য সকলের মঙ্গলের জন্য জ্ঞান লাভের পরও ভক্তি ল'য়ে ছিলেন।"

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

যুগধর্ম কথা প্রসঙ্গে—জ্ঞানযোগ ও ভক্তিযোগ

ডাক্তার—জ্ঞানে মানুষ অবাক হয়, চক্ষু বুজে যায়, আর চক্ষে জল আসে। তখন ভক্তি দরকার হয়।

শ্রীরামকৃষ্ণ—ভক্তি মেয়েমানুষ, তাই অন্তঃপুর পর্যন্ত যেতে পারে। জ্ঞান বারবাড়ি পর্যন্ত যায়। (সকলের হাস্য)।

ডাক্তার—কিন্তু অন্তঃপুরে যাকে তাকে ঢুকতে দেওয়া হয় না। বেশ্যারা ঢুকতে পারে না। জ্ঞান চাই।

শ্রীরামকৃষ্ণ—ঠিক পথ জানে না, কিন্তু ঈশ্বরে ভক্তি আছে, তাঁকে জানবার ইচ্ছা আছে—এরূপ লোক কেবল ভক্তির জোরে ঈশ্বর লাভ করে। একজন ভারী ভক্ত জগন্নাথ দর্শন করতে বেড়িয়েছিল। পুরীর কোন পথ সে জানতো না, দক্ষিণ দিকে না গিয়ে পশ্চিম দিকে গিছিল। পথ ভুলেছিল বটে, কিন্তু ব্যাকুল হ'য়ে লোকদের জিজ্ঞাসা ক'রত। তারা বলে দিলে, 'এ পথ নয়, ঐ পথে যাও।' ভক্তটি শেষে পুরীতে গিয়ে জগন্নাথ দর্শন ক'রলে। দেখ, না জানলেও কেউ না কেউ ব'লে দেয়।

ডাক্তার—সে ভুলে তো গিছিল।

শ্রীরামকৃষ্ণ—হাঁ, তা হয় বটে, কিন্তু শেষে পায়।

একজন জিজ্ঞাসা করিলেন, 'ঈশ্বর সাকার না নিরাকার।'

শ্রীরামকৃষ্ণ—তিনি সাকার আবার নিরাকার। একজন সন্ন্যাসী জগন্নাথ দর্শন ক'রতে গিছিল। জগন্নাথ দর্শন ক'রে সন্দেহ হ'ল ঈশ্বর সাকার না নিরাকার। হাতে দন্ড ছিল, সেই দন্ড দিয়ে দেখ্‌তে লাগল, জগন্নাথের গায়ে ঠেকে, কি, না। একবার এ-ধার থেকে ও-ধারে দন্ডটি নিয়ে যাবার সময় দেখলে যে, জগন্নাথের গায়ে ঠেকল না—দেখে যে সেখানে ঠাকুরের মূর্তি নাই! আবার দন্ড এ-ধার থেকে ও-ধারে লয়ে যাবার সময় বিগ্রহের গায়ে ঠেকল; তখন সন্ন্যাসী বুঝল ঈশ্বর নিরাকার, আবার সাকার।

"কিন্তু এটি ধারণা করা বড় শক্ত। যিনি নিরাকার, তিনি আবার সাকার কিরূপে হবেন? এ সন্দেহ মনে উঠে। আবার যদি সাকার হন, তো নানা রূপ কেন?'

ডাক্তার—যিনি আকার ক'রেছেন, তিনি সাকার। তিনি আবার মন ক'রেছেন, তাই তিনি নিরাকার। তিনি সবই হ'তে পারেন।

শ্রীরামকৃষ্ণ—ঈশ্বরকে লাভ না ক'রতে পারলে, এ সব বুঝা যায় না। সাধকের জন্য তিনি নানাভাবে নানারূপে দেখা দেন। একজনের এক গামলা

রঙ ছিল। অনেকে তার কাছে কাপড় রঙ করাতে আস্‌তো। সে লোকটি জিজ্ঞেসা ক'রতো, তুমি কি রঙে ছোপাতে চাও। একজন হয়তো বললে, 'আমি লাল রঙে ছোপাতে চাই।' অমনি সেই লোকটি গামলার রঙে সেই কাপড়খানি ছুপিয়ে ব'লতো, 'এই লও, তোমার লাল রঙে ছোপান কাপড়।' আর একজন হয়তো বললে, 'আমার হলদে রঙে ছোপান চাই।' অমনি সেই লোকটি সেই গামলায় কাপড়খানি ডুবিয়ে ব'লতো, 'এই লও তোমার হলদে রঙে ছোপান কাপড়।' নীল রঙে ছোপাতে চাইলে আবার সেই একই গামলায় ডুবিয়ে সেই কথা, এই লও তোমার নীল রঙে ছোপান কাপড়।' এই রকমে যে যে রঙে ছোপাতে চাইতো, তার কাপড় সেই রঙে সেই একই গামলা হতে ছোপান হ'ত। একজন লোক এই আশ্চর্য ব্যাপার দেখছিল। যার গামলা, সে জিজ্ঞাসা ক'রলে, 'কেমন হে! তোমার কি রঙে ছোপাতে হবে? তখন সে বললে, 'ভাই! তুমি যে রঙে রঙেছ, আমায় সেই রঙ দাও!" (সকলের হাস্য)।

"একজন বাহ্যে গিছিল—দেখলে, গাছের উপর একটি সুন্দর জানোয়ার রয়েছে। সে ক্রমে আর একজনকে বললে, 'ভাই! অমুক গাছে আমি একটি লাল রঙের জানোয়ার দেখে এলুম।' সে লোকটি বললে, 'আমিও দেখেছি, তা সে লাল রঙ হ'তে যাবে কেন? সে যে সবুজ রঙ।' আর একজন বললে, 'না, না; সে সবুজ হ'তে যাবে কেন; সে যে হলদে! এইরূপে আরও কেউ কেউ বললে, 'বেগুনী, নীল, কাল; ইত্যাদি। শেষে ঝগড়া। তখন তারা গাছ তলায় গিয়ে দেখে একজন লোক ব'সে। জিজ্ঞাসা করায়, সে বললে, 'আমি এই গাছতলায় থাকি, আমি সে জানোয়ারটিকে বেশ জানি। তোমরা যা যা ব'লছো সব সত্য, সে কখনও লাল, কখনও সবুজ কখনও হলদে কখনও নীল আরও সব কত কি হয়। আবার কখনও দেখি কোন রঙই নাই!'

"যে ব্যক্তি সদাসর্বদা ঈশ্বর চিন্তা করে, সেই জানতে পারে, তাঁর স্বরূপ কী। সে ব্যক্তিই জানে যে ঈশ্বর নানারূপে দেখা দেন। নানা ভাবে দেখা দেন। তিনি সগুণ আবার নির্গুণ। গাছতলায় যে থাকে সেই জানে যে, বহুরূপীর নানা রঙ, আবার কখন কখন কোন রঙই থাকে না। অন্য লোকে কেবল তর্ক ঝগড়া ক'রে কষ্ট পায়।

"তিনি সাকার, তিনি নিরাকার। কি রকম জান? যেন সচ্চিদানন্দ সমুদ্র। কূল-কিনারা নাই। ভক্তিহিমে সেই সমুদ্রের স্থানে স্থানে জল বরফ হ'য়ে যায়, যেন জল বরফ আকারে জমাট বাঁধে; অর্থাৎ ভক্তের কাছে তিনি সাক্ষাৎ হ'য়ে কখন কখন সাকার রূপ হ'য়ে দেখা দেন। আবার জ্ঞানসূর্য উঠলে সে বরফ গ'লে যায়।"

* আকার—সূর্য উঠলে বরফ গলে জল হয়; আবার জানেন, জল আবার নিরাকার বাষ্প হয়?

শ্রীরামকৃষ্ণ—অর্থাৎ 'ব্রহ্ম সত্য, জগৎ মিথ্যা' এই বিচারের পর সমাধি হ'লে রূপ-টুপ উড়ে যায়। তখন আর ঈশ্বরকে ব্যক্তি (Person) ব'লে বোধ হয় না। কী তিনি মুখে বলা যায় না। কে বলবে? যিনি বলবেন তিনিই নাই। তাঁর 'আমি' আর খুঁজে পান না। তখন ব্রহ্ম নির্গুণ (Absolute)। তখন তিনি কেবল বোধে বোধ হন। মন বুদ্ধি দ্বারা তাঁকে ধরা যায় না। (Unknown and Unknowable)

"তাই বলে, ভক্তি—চন্দ্র; জ্ঞান—সূর্য। শুনেছি, খুব উত্তরে আর দক্ষিণে সমুদ্র আছে। এত ঠাণ্ডা যে, জল জমে মাঝে মাঝে বরফের চাঁই হয়। জাহাজ চ'লে না। সেখানে গিয়ে আটকে যায়।"

ডাক্তার—ভক্তিপথে মানুষ আটকে যায়।

শ্রীরামকৃষ্ণ—হাঁ, তা যায় বটে, কিন্তু তাতে হানি হয় না, সেই সচ্চিদানন্দ-সাগরের জলই জমাট বেঁধে বরফ হয়েছে। যদি আরও বিচার করিতে চাও, যদি 'ব্রহ্ম সত্য জগৎ মিথ্যা' এই বিচার কর, তাতেও ক্ষতি নাই। জ্ঞানসূর্যে ই বরফ গলে যাবে; তবে সেই সচ্চিদানন্দসাগরই রইল।

[কাঁচা আমি ও পাকা আমি—ভক্তের আমি—বালকের আমি]

"জ্ঞান বিচারের শেষে সমাধি হ'লে, আমি-টামি কিছু থাকে না। কিন্তু সমাধি হওয়া বড় কঠিন। 'আমি' কোন মতে যেতে চায় না। আর যেতে চায় না বলে, ফিরে এই সংসারে আসতে হয়।

"গরু হাম্বা হাম্বা (আমি, আমি) করে তাই এত দুঃখ! সমস্ত দিন লাঙ্গল দিতে হয়—গ্রীষ্ম নাই, বর্ষা নাই। কিম্বা তাকে কসাইয়ে কাটে। তাতেও নিস্তার নাই। চামারে চামড়া করে, জুতা তৈয়ারী করে। অবশেষে নাড়ী-ভুঁড়ী থেকে তাঁত হয়। ধুনুরীর হাতে প'ড়ে যখন তুঁহু তুঁহু (তুমি তুমি) করে, তখন নিস্তার হয়।

"যখন জীব বলে, 'নাহং' 'নাহং' 'নাহং' আমি কেহ নই, হে ঈশ্বর! তুমি কর্ত্তা; আমি দাস তুমি প্রভু—তখন নিস্তার; তখনই মুক্তি।"

ডাক্তার—কিন্তু ধুনুরীর হাতে পড়া চাই। (সকলের হাস্য)।

শ্রীরামকৃষ্ণ—যদি একান্ত 'আমি' না যায়, থাক শালা 'দাস আমি' হ'য়ে। (সকলের হাস্য)।

"সমাধির পর কাহারও কাহারও 'আমি' থাকে—'দাস আমি' 'ভক্তের আমি।' শঙ্করাচার্য 'বিদ্যার আমি' লোকশিক্ষার জন্য রেখে দিছিলেন। 'দাস আমি', 'বিদ্যার আমি', 'ভক্তের আমি', এরই নাম 'পাকা আমি'। কাঁচা আমি কি জান? আমি কর্ত্তা, আমি এত বড়লোকের ছেলে, বিদ্বান, আমি ধনবান আমাকে এমন কথা বলে!—এই সব ভাব। যদি কেউ বাড়িতে চুরি করে, তাকে

যদি ধরতে পারে, প্রথমে সব জিনিস-পত্র কেড়ে লয়; তারপর উত্তম-মধ্যম মারে, তারপর পুলিশে দেয়! বলে, 'কি! জানে না, কার চুরি করেছে।'

"ঈশ্বর লাভ হ'লে পাঁচ বছরের বালকের স্বভাব হয়। 'বালকের আমি' আর 'পাকা আমি।' বালক কোন গুণের বশ নয়। ত্রিগুণাতীত। সত্ত্ব রজঃ তমঃ কোনগুণের বশ নয়। দেখ, ছেলে তমোগুণের বশ নয়। এইমাত্র ঝগড়া মারামারি করলে, আবার তৎক্ষণাৎ তারই গলা ধরে কত ভাব, কত খেলা! রজ গুণেরও বশ নয়। এই খেলাঘর পাতলে কত বন্দোবস্ত, কিছুক্ষণ পরেই সব পড়ে রইলো; মার কাছে ছুটেছে। হয় তো একখানি সুন্দর কাপড় পরে বেড়াচ্ছে। খানিকক্ষণ পরে কাপড় খুলে প'ড়ে গেছে। হয় কাপড়ের কথা একেবারে ভুলে গেল—নয় বগলদাবা ক'রে বেড়াচ্ছে! (হাস্য)।

"যদি ছেলেটিকে বল, 'বেশ কাপড়খানি, কার কাপড় রে?' সে বলে 'আমার কাপড়, আমার বাবা দিয়েছে।' যদি বল 'লক্ষ্মী ছেলে, আমায় কাপড়খানি দাও না।' সে বলে, 'না, আমার কাপড়, আমার বাবা দিয়েছে, না আমি দেবো না।' তারপর ভুলিয়ে একটি পুতুল কি একটি বাঁশী যদি হাতে দাও তা হ'লে পাঁচ টাকা দামের কাপড়খানা তোমায় দিয়ে চলে যাবে। আবার পাঁচ বছরের ছেলের সত্ত্বগুণেরও আঁট নাই। এই পাড়ার খেলুড়েদের সঙ্গে কত ভালবাসা, একদন্ড না দেখ্‌লে থাকতে পারে না। কিন্তু বাপ-মার সঙ্গে যখন অন্য জায়গায় চ'লে গেল, তখন নূতন খেলুড়ে হ'ল। তাদের উপর তখন সব ভালবাসা পড়'ল; পুরানো খেলুড়েদের একেবারে ভুলে গেল। তারপর জাত অভিমান নাই। মা ব'লে দিয়েছে, ও তোর দাদা হয়, তা ষোল আনা জানে যে, এ আমার ঠিক দাদা। তা একজন যদি বামুনের ছেলে হয় আর একজন যদি কামারের ছেলে হয়, তো একপাতে ব'সে ভাত খাবে। আর শুচি-অশুচি নাই, হেগোপোঁদে খাবে! আবার লোকলজ্জা নাই, ছোঁচাবার পর যাকে-তাকে পেছন ফিরে বলে—দেখ, আমার ছোঁচান হয়েছে কি না?

"আবার, 'বুড়োর আমি' আছে। (ডাক্তারের হাস্য)। বুড়োর অনেকগুলি পাশ। জাতি, অভিমান, লজ্জা, ঘৃণা, ভয়, বিষয়বুদ্ধি, পাটোয়ারী, কপটতা। যদি কারুর উপর আক্রোশ হয়, তো সহজে যায় না—হয়তো যতদিন বাঁচে ততদিন যায় না। তারপর পান্ডিত্যের অহঙ্কার, ধনের অহঙ্কার। 'বুড়োর আমি' কাঁচা আমি।

[জ্ঞান কাহাদের হয় না]

(ডাক্তারের প্রতি)—"চার-পাঁচজনের জ্ঞান হয় না। যার বিদ্যার অহঙ্কার, যার পান্ডিত্যের অহঙ্কার, যার ধনের অহঙ্কার, তার জ্ঞান হয় না। এ সব লোককে যদি বলা যায় যে, অমুক জায়গায় বেশ একটি সাধু আছে, দেখতে

যাবে? তারা অমনি নানা ওজর ক'রে বলে, যাব না। আর মনে মনে বলে, আমি এত বড় লোক, আমি যাব?

[তিনগুণ—সত্ত্বগুণে ঈশ্বরলাভ—ইন্দ্রিয় সংযমের উপায়]

"তমোগুণের স্বভাব অহঙ্কার। অহঙ্কার অজ্ঞান থেকে হয়, তমোগুণ থেকে হয়।

"পুরাণে আছে রাবণের রজোগুণ, কুম্ভকর্ণের তমোগুণ, বিভীষণের সত্ত্বগুণ। তাই বিভীষণ রামচন্দ্রকে লাভ করেছিলেন। তমোগুণের আর একটি লক্ষণ—ক্রোধ। ক্রোধে দিক্ বিদিক্ জ্ঞান থাকে না; হনুমান লঙ্কা পুড়ালেন, এ জ্ঞান নাই যে সীতার কুটীর নষ্ট হবে।

"আবার তমোগুণের আর একটি লক্ষণ—কাম। পাথুরেঘাটার গিরীন্দ্র ঘোষ ব'লেছিল, কাম-ক্রোধাদি রিপু এরা তো যাবে না, এদের মোড় ফিরিয়ে দাও। ঈশ্বরের কামনা কর। সচ্চিদানন্দের সহিত রমণ কর। আর ক্রোধ যদি না যায়, তবে ভক্তির তমঃ আন। কি! আমি দুর্গানাম করেছি, উদ্ধার হব না? আমার আবার পাপ কি? বন্ধন কি? তারপর ঈশ্বর লাভ করবার লোভ কর। ঈশ্বরের রূপে মুগ্ধ হও। আমি ঈশ্বরের দাস, আমি ঈশ্বরের ছেলে, যদি অহঙ্কার কর্‌তে হয়, তো এই অহঙ্কার কর। এই রকমে ছয় রিপুর মোড় ফিরিয়ে দিতে হয়।"

ডাক্তার—ইন্দ্রিয়সংযম করা বড় শক্ত। ঘোড়ার চক্ষের দুদিকে ঠুলি দাও। কোন কোন ঘোড়ার চক্ষু একেবারে বন্ধ করতে হয়।

শ্রীরামকৃষ্ণ—তাঁর যদি একবার কৃপা হয়, ঈশ্বরের যদি একবার দর্শন লাভ হয়, আত্মার যদি একবার সাক্ষাৎকার হয়, তা হ'লে আর কোন ভয় নাই—তখন ছয় রিপু আর কিছু করতে পারবে না।

"নারদ, প্রহ্লাদ এই সব নিত্যসিদ্ধ মহাপুরুষদের অত ক'রে চক্ষের দুদিকে ঠুলি দিতে হয় না। যে ছেলে নিজে বাপের হাত ধরে মাঠের আলপথে চলছে সে ছেলে বরং অসাবধান হ'য়ে বাপের হাত ছেড়ে দিয়ে খানায় পড়তে পারে। কিন্তু বাপ যে ছেলের হাত ধরে, সে কখনও খানায় পড়ে না।"

ডাক্তার—কিন্তু বাপ ছেলের হাত ধরা ভাল নয়।

শ্রীরামকৃষ্ণ—তা নয়। মহাপুরুষদের বালক স্বভাব। ঈশ্বরের কাছে তারা সর্বদাই বালক, তাদের অহঙ্কার থাকে না। তাদের সব শক্তি ঈশ্বরের শক্তি, বাপের শক্তি, নিজের কিছুই নয়। এইটি তাদের দৃঢ় বিশ্বাস।

[বিচারপথ ও আনন্দ পথ—জ্ঞানযোগ ও ভক্তিযোগ]

ডাক্তার—আগে ঘোড়ার চক্ষের দুই দিকে ঠুলি না দিলে, ঘোড়া কি এগুতে চায়? রিপু বশ না হ'লে কি ঈশ্বরকে পাওয়া যায়?

শ্রীরামকৃষ্ণ—তুমি যা বলছো, ওকে বিচার পথ বলে—জ্ঞানযোগ বলে। ও পথেও ঈশ্বরকে পাওয়া যায়। জ্ঞানীরা বলে, আগে চিত্তশুদ্ধি হওয়া দরকার। আগে সাধন চাই, তবে জ্ঞান হবে।

"ভক্তিপথেও তাঁকে পাওয়া যায়। যদি ঈশ্বরের পাদপদ্মে একবার ভক্তি হয়, যদি তাঁর নাম গুণগান করতে ভাল লাগে, তা'হলে ইন্দ্রিয় সংযম আর চেষ্টা ক'রে করতে হয় না। রিপুবশ আপনা আপনি হ'য়ে যায়।

"যদি কারও পুত্রশোক হয়, সেদিন সে কি আর লোকের সঙ্গে ঝগড়া করতে পারে, না, নিমন্ত্রণে গিয়ে খেতে পারে? সে কি লোকের সামনে অহঙ্কার ক'রে বেড়াতে পারে, না, সুখ-সম্ভোগ করতে পারে?

"বাদুলে পোকা যদি একবার আলো দেখতে পায়, তা হ'লে কি সে আর অন্ধকারে থাকে?"

ডাক্তার (সহাস্যে)—তা পুড়েই মরুক সেও স্বীকার।

শ্রীরামকৃষ্ণ—না গো! ভক্ত কিন্তু বাদুলে পোকার মত পুড়ে মরে না। ভক্ত যে আলো দেখে ছুটে যায়, সে যে মণির আলো! মণির আলো খুব উজ্জ্বল বটে, কিন্তু স্নিগ্ধ আর শীতল। এ আলোতে গা পুড়ে না, এ আলোতে শান্তি হয়, আনন্দ হয়।

[জ্ঞানযোগ বড় কঠিন]

"বিচারপথে জ্ঞানযোগের পথে, তাঁকে পাওয়া যায়। কিন্তু এ পথ বড় কঠিন। আমি শরীর নই, মন নই, বুদ্ধি নই; আমার রোগ নাই, শোক নাই, অশান্তি নাই; আমি সচ্চিদানন্দ স্বরূপ, আমি সুখ-দুঃখের অতীত, আমি ইন্দ্রিয়ের বশ নই, এ সব কথা মুখে বলা খুব সোজা। কাজে করা, ধারণা হওয়া বড় কঠিন। কাঁটাতে হাত কেটে যাচ্ছে, দর্ দর্ ক'রে রক্ত পড়ছে, অথচ বলছি, কই কাঁটায় আমার হাত কাটে নাই, আমি বেশ আছি। এ সব কথা বলা সাজে না। আগে ঐ কাঁটাকে জ্ঞানাগ্নিতে পোড়াতে হবে তো।

[বইপড়া জ্ঞান বা পাণ্ডিত্য—ঠাকুরের শিক্ষাপ্রণালী]

"অনেকে মনে করে, বই না পড়ে বুঝি জ্ঞান হয় না, বিদ্যা হয় না। কিন্তু পড়ার চেয়ে শুনা ভাল, শুনার চেয়ে দেখা ভাল। কাশীর বিষয় পড়া, কাশীর বিষয় শুনা, আর কাশী দর্শন অনেক তফাত।

"আবার যারা নিজে সতরঞ্চ খেলে, তারা চাল তত বুঝে না, কিন্তু যারা না খেলে, উপর চাল বলে দেয়, তাদের চাল ওদের চেয়ে অনেকটা ঠিক ঠিক হয়। সংসারী লোক মনে করে, আমরা বড় বুদ্ধিমান কিন্তু তারা বিষয়াসক্ত। নিজে খেলছে। নিজের চাল ঠিক বুঝতে পারে না। কিন্তু সংসারত্যাগী

সাধুলোক বিষয়ে অনাসক্ত। তারা সংসারীদের চেয়ে বুদ্ধিমান। নিজে খেলে না, তাই উপর চাল ঠিক ব'লে দিতে পারে।"

ডাক্তার (ভক্তদিগের প্রতি)—বই পড়লে এ ব্যক্তির (পরমহংসদেবের) এত জ্ঞান হ'তো না। Faraday communed with Nature. প্রকৃতিকে ফ্যারাডে নিজে দর্শন করতো, তাই অতো Scientific truth discover করতে পেরেছিল। বই পড়ে বিদ্যা হ'লে অত হ'ত না। Mathematical formulae only throw the brain into confusion—Original inquiry -র পথে বড় বিঘ্ন এনে দেয়।

[ঈশ্বর প্রদত্ত জ্ঞান— Divine wisdom and Book learning]

শ্রীরামকৃষ্ণ (ডাক্তারের প্রতি)—যখন পঞ্চবটীতে মাটিতে প'ড়ে প'ড়ে মাকে ডাকতুম, আমি মাকে বলেছিলাম, 'মা! আমায় দেখিয়ে দাও কর্মীরা কর্ম ক'রে যা পেয়েছে, যোগীরা যোগ ক'রে যা দেখেছে, জ্ঞানীরা বিচার ক'রে যা জেনেছে ' আরও কত কি তা কি বল্‌বো!

"আহা! কি অবস্থাই গেছে! ঘুম যায়!

এই বলিয়া পরমহংসদেব গান করিয়া বলিতে লাগিলেন:—

ঘুম ভেঙেছে আর কি ঘুমাই, যোগে-যাগে জেগে আছি।

এখন যোগনিদ্রা তোরে দিয়ে মা, ঘুমেরে ঘুম পাড়ায়েছি!

"আমি তো বই-টই কিছুই পড়িনি, কিন্তু দেখ মার নাম করি ব'লে আমায় সবাই মানে। শম্ভু মল্লিক আমায় ব'লেছিল, 'ঢাল নাই, তরোয়াল নাই, শান্তি-রাম সিং?" (সকলের হাস্য)।

শ্রীযুক্ত গিরিশচন্দ্র ঘোষের বুদ্ধদেবচরিত অভিনয় কথা হইতে লাগিল। তিনি ডাক্তারকে নিমন্ত্রণ করিয়া ঐ অভিনয় দেখাইয়াছিলেন। ডাক্তার উহা দেখিয়া যার পর নাই আনন্দিত হইয়াছিলেন।

ডাক্তার (গিরিশের প্রতি)—তুমি বড় বদ্‌লোক! আমায় কি রোজ থিয়েটারে যেতে হবে?

শ্রীরামকৃষ্ণ (মাষ্টারের প্রতি)—কি বল্‌ছে, আমি বুঝতে পারছি না।

মাষ্টার—ওঁর থিয়েটার বড় ভাল লেগেছে।

তৃতীয় পরিচ্ছেদ

অবতারকথাপ্রসঙ্গে—অবতার ও জীব

শ্রীরামকৃষ্ণ (ঈশানের প্রতি)—তুমি কিছু বল না; এ (ডাক্তার) অবতার মানছে না।

ঈশান—আজ্ঞা, কি আর বিচার ক'রবো। বিচার আর ভাল লাগে না।

শ্রীরামকৃষ্ণ (বিরক্ত হইয়া)—কেন? সংগত কথা ব'লবে না?

ঈশান (ডাক্তারের প্রতি)—অহংকারের দরুন আমাদের বিশ্বাস কম। কাকভুষণ্ডী রামচন্দ্রকে প্রথমে অবতার ব'লে মানে নাই। শেষে যখন চন্দ্রলোক, দেবলোক, কৈলাস ভ্রমণ ক'রে দেখলে যে রামের হাত থেকে কোনরূপেই নিস্তার নাই, তখন নিজে ধরা দিলে, রামের শরণাগত হ'লো। রাম তখন তাকে ধরে মুখের ভিতর নিয়ে গিলে ফেললেন। ভুষণ্ডী তখন দেখে যে, সে তার গাছে বসে রয়েছে। অহংকার চূর্ণ হ'লে তবে কাকভুষণ্ডী জানতে পারলে যে, রামচন্দ্র দেখতে আমাদের মত মানুষ বটে, কিন্তু তাঁরই উদরে ব্রহ্মাণ্ড। তাঁরই উদরের ভিতর আকাশ, চন্দ্র, সূর্য, নক্ষত্র, সমুদ্র, পর্বত, জীব, জন্তু গাছ ইত্যাদি।

[জীবের ক্ষুদ্র বুদ্ধি—Limited Powers of the conditioned]

শ্রীরামকৃষ্ণ (ডাক্তারের প্রতি)—ঐটুকু বুঝা শক্ত, তিনিই স্বরাট তিনিই বিরাট। যাঁরই নিত্য তাঁরই লীলা। তিনি মানুষ হ'তে পারেন না, এ কথা জোর ক'রে আমরা ক্ষুদ্র বুদ্ধিতে কি বলতে পারি? আমাদের ক্ষুদ্র বুদ্ধিতে এ সব কথা কি ধারণা হ'তে পারে? এক সের ঘটিতে কি চার সের দুধ ধরে?

"তাই সাধু মহাত্মারা যাঁরা ঈশ্বর লাভ করেছেন, তাঁদের কথা বিশ্বাস করতে হয়। সাধুরা ঈশ্বরচিন্তা লয়ে থাকেন, যেমন উকিলরা মোকদ্দমা লয়ে থাকে। তোমার কাকভুষণ্ডীর কথা কি বিশ্বাস হয়?"

ডাক্তার—যেটুকু ভাল, বিশ্বাস করলুম। ধরা দিলেই চুকে যায়, কোন গোল থাকে না। রামকে অবতার কেমন করে বলি? প্রথমে দেখ বালীবধ। লুকিয়ে চোরের মত বাণ মেরে তাকে মেরে ফেলা হ'লো। এ তো মানুষের কাজ, ঈশ্বরের নয়।

গিরিশ ঘোষ—মহাশয়, এ কাজ ঈশ্বরই পারেন।

ডাক্তার—তারপর দেখ সীতাবর্জন।

গিরিশ—মহাশয়, এ কাজও ঈশ্বরই পারেন, মানুষ পারে না।

[সায়েন্স্—না মহাপুরুষের বাক্য?]

ঈশান (ডাক্তারের প্রতি)—আপনি অবতার মানছেন না কেন? এই বললেন, যিনি আকার করেছেন তিনি সাকার, যিনি মন করেছেন তিনি নিরাকার। এই আপনি বললেন, ঈশ্বরের কান্ড সব হ'তে পারে।

শ্রীরামকৃষ্ণ (হাসিতে হাসিতে)—ঈশ্বর অবতার হ'তে পারেন, এ কথা যে ওঁর সায়েন্স'-এ (ইংরাজী বিজ্ঞানশাস্ত্রে) নাই! তবে কেমন ক'রে বিশ্বাস হয়? (সকলের হাস্য)।

"একটা গল্প শোন—একজন এসে বললে, ওহে! ও পাড়ায় দেখে এলুম অমুকের বাড়ি হুড়মুড়্ ক'রে ভেঙেগ পড়ে গেছে। যাকে ও কথা বললে, সে ইংরাজী লেখা-পড়া জানে। সে বললে দাঁড়াও, একবার খপরের কাগজখানা দেখি। খপরের কাগজ পড়ে দেখে যে, বাড়ি ভাঙগার কথা কিছুই নাই। তখন সে ব্যক্তি বললে, ওহে তোমার কথায় আমি বিশ্বাস করি না। কই, বাড়ি ভাঙ্গার কথা তো খপরের কাগজে লেখা নাই। ও সব মিছে কথা।" (সকলের হাস্য)।

গিরিশ (ডাক্তারের প্রতি)—আপনার শ্রীকৃষ্ণকে ঈশ্বর মানতে হবে। আপনাকে মানুষ মানতে দেব না। বল্তে হবে Demon or God (হয় সয়তান, নয় ঈশ্বর)।

[সরলতা ও ঈশ্বরে বিশ্বাস]

শ্রীরামকৃষ্ণ—সরল না হ'লে ঈশ্বরে চট ক'রে বিশ্বাস হয় না। বিষয়-বুদ্ধি থেকে ঈশ্বর অনেক দূর। বিষয়-বুদ্ধি থাক্লে নানা সংশয় উপস্থিত হয়, আর নানা রকম অহঙ্কার এসে পড়ে—পান্ডিত্যের অহঙ্কার, ধনের অহঙ্কার, এই সব। ইনি (ডাক্তার) কিন্তু সরল।

গিরিশ (ডাক্তারের প্রতি)—মহাশয়। কি বলেন? কুরুটের কি জ্ঞান হয়?

ডাক্তার—রাম বলো! তাও কখন হয়!

শ্রীরামকৃষ্ণ—কেশব সেন কি সরল ছিল! একদিন ওখানে (রাসমণির কালী-বাড়িতে) গিছিল। অতিথিশালা দেখে বেলা চারটের সময় বলে, হাঁগা অতিথি-কাঙগালদের কখন খাওয়া হবে?

"বিশ্বাস যত বাড়বে, জ্ঞানও তত বাড়বে। যে গরু বেছে বেছে খায় সে ছিড়িক ছিড়িক ক'রে দুধ দেয়। আর যে গরু শাক-পাতা, খোসা, ভূষী, যা দাও, গব্ গব্ ক'রে খায়, সে গরু হুড় হুড় ক'রে দুধ দেয়। (সকলের হাস্য)।

"বালকের মত বিশ্বাস না হলে ঈশ্বরকে পাওয়া যায় না। মা বলেছেন, 'ও তোর দাদা,' বালকের অমনি বিশ্বাস যে, ও আমার ষোল আনা দাদা। মা ব'লেছেন, জুজু আছে। ষোল আনা বিশ্বাস যে, ও ঘরে জুজু আছে।

এইরূপ বালকের ন্যায় বিশ্বাস দেখলে ঈশ্বরের দয়া হয়। সংসার বুদ্ধিতে ঈশ্বরকে পাওয়া যায় না।”

ডাক্তার (ভক্তদের প্রতি)—গরুর কিন্তু যা তা খেয়ে খুব দুধ হওয়া ভাল নয়। আমার একটা গরুকে ঐ রকম যা তা খেতে দিত। শেষে আমার ভারী ব্যারাম। তখন ভাবলুম, এর কারণ কি? অনেক অনুসন্ধান ক'রে টের পেলুম, খুদ ও আরো কি কি খেয়েছিল। তখন মহা মুস্কিল! লক্ষ্ণৌ যেতে হোলো। শেষে বার হাজার টাকা খরচ! (সকলের হাস্য)।

“কিসে কি হয় বলা যায় না। পাকপাড়ার বাবুদের বাড়িতে সাত মাসের মেয়ের অসুখ করেছিল—ঘুঙরী কাশি (Whooping Cough)—আমি দেখতে গিছলাম। কিছুতেই অসুখের কারণ ঠিক করতে পারি নাই। শেষে জানতে পারলুম, গাধা ভিজেছিল, যে গাধার দুধ সে মেয়েটি খেতো।” (সকলের হাস্য)।

শ্রীরামকৃষ্ণ—কি বলে গো! তেঁতুলতলার আমার গাড়ী গিছলো, তাই আমার অম্বল হয়েছে! (ডাক্তার ও সকলের হাস্য)।

ডাক্তার (হাসিতে হাসিতে)—জাহাজের ক্যাপ্তেনের বড় মাথা ধরেছিল। তা ডাক্তারেরা পরামর্শ ক'রে জাহাজের গায়ে বেলেস্তারা (Blister) লাগিয়ে দিল। (সকলের হাস্য)।

[সাধুসঙ্গ ও ভোগবিলাস ত্যাগ]

শ্রীরামকৃষ্ণ (ডাক্তারের প্রতি)—সাধুসঙ্গ সর্বদাই দরকার। রোগ লেগেই আছে। সাধুরা যা বলেন, সেইরূপ করতে হয়। শুধু শুনলে কি হবে? ঔষধ খেতে হবে, আবার আহারের কট্‌কেনা করতে হবে। পথ্যের দরকার।

ডাক্তার—পথ্যতেই সারে।

শ্রীরামকৃষ্ণ—বৈদ্য তিন প্রকার—উত্তম বৈদ্য, মধ্যম বৈদ্য, অধম বৈদ্য। যে বৈদ্য এসে নাড়ী টিপে 'ঔষধ খেও হে' এই কথা বলে চলে যায়, সে অধম বৈদ্য—রোগী খেলে কি না, এ খবর সে লয় না। আর যে বৈদ্য রোগীকে ঔষধ খেতে অনেক করে বুঝায়, যে মিষ্ট কথাতে বলে, 'ওহে ঔষধ না খেলে কেমন করে ভাল হবে? লক্ষ্মীটি খাও, আমি নিজে ঔষধ মেড়ে দিচ্ছি খাও,' সে মধ্যম বৈদ্য। আর যে বৈদ্য রোগী কোন মতে খেলে না দেখে, বুকে হাঁটু দিয়ে জোর ক'রে ঔষধ খাইয়ে দেয়, সে উত্তম বৈদ্য।

ডাক্তার—আবার এমন ঔষধ আছে, যাতে বুকে হাঁটু দিতে হয় না। যেমন হোমিওপ্যাথিক।

শ্রীরামকৃষ্ণ—উত্তম বৈদ্য বুকে হাঁটু দিলে কোন ভয় নাই।

“বৈদ্যের মত আচার্যও তিন প্রকার। যিনি ধর্ম উপদেশ দিয়ে শিষ্যদের

আর কোন খবর লন না, তিনি অধম আচার্য। যিনি শিষ্যদের মঙ্গলের জন্য তাদের বার বার বুঝান, যাতে উপদেশগুলি ধারণা করতে পারে, অনেক অনুনয় বিনয় করেন, ভালবাসা দেখান—তিনি মধ্যম আচার্য। আর যখন শিষ্যেরা কোনও মতে শুনছে না দেখে, কোনও আচার্য জোর পর্যন্ত করেন, তাঁকে বলি উত্তম আচার্য।

[স্ত্রীলোক ও সন্ন্যাসী—সন্ন্যাসীর কঠিন নিয়ম]

(ডাক্তারের প্রতি)—"সন্ন্যাসীর পক্ষে কামিনী-কাঞ্চন ত্যাগ। স্ত্রীলোকের পট পর্যন্ত সন্ন্যাসী দেখ্‌বে না। স্ত্রীলোক কিরূপ জান? যেমন আচার তেঁতুল! মনে করলে, মুখে জল সরে। আচার তেঁতুল সম্মুখে আনতে হয় না।

"কিন্তু এ কথা আপনাদের পক্ষে নয়,—এ সন্ন্যাসীর পক্ষে। আপনারা যতদূর পার স্ত্রীলোকের সঙ্গে অনাসক্ত হ'য়ে থাকবে। মাঝে মাঝে নির্জন স্থানে গিয়ে ঈশ্বর চিন্তা করবে। সেখানে যেন ওরা কেউ না থাকে। ঈশ্বরেতে বিশ্বাস ভক্তি এলে, অনেকটা অনাসক্ত হ'য়ে থাকতে পারবে। দুই-একটি ছেলে হ'লে স্ত্রী পুরুষ দুইজনে ভাই-বোনের মত থাকবে, আর ঈশ্বরকে সর্বদা প্রার্থনা কর্‌বে, যাতে ইন্দ্রিয় সুখেতে মন না যায়,—ছেলেপুলে আর না হয়।"

গিরিশ (সহাস্যে, ডাক্তারের প্রতি)—আপনি এখানে তিন-চার ঘন্টা র'য়েছেন; কই, রোগীদের চিকিৎসা করতে যাবেন না?

ডাক্তার—আর ডাক্তারী আর রোগী! যে পরমহংস হয়েছে, আমার সব গেল! (সকলের হাস্য)।

শ্রীরামকৃষ্ণ—দেখ কর্মনাশা বলে একটি নদী আছে। সে নদীতে ডুব দেওয়া এক মহাবিপদ। ডুব দিলে কর্মনাশ হ'য়ে যায়—সে ব্যক্তি আর কোন কর্ম করতে পারে না। (ডাক্তারের ও সকলের হাস্য)।

ডাক্তার (মাষ্টার, গিরিশ ও অন্যান্য ভক্তদের প্রতি)—দেখ, আমি তোমাদেরই রইলুম। ব্যারামের জন্য যদি মনে কর, তা হ'লে নয়। তবে আপনার লোক বলে যদি মনে কর, তা হ'লে আমি তোমাদের।

শ্রীরামকৃষ্ণ (ডাক্তারের প্রতি)—একটি আছে অহৈতুকী ভক্তি। এটি যদি হয়, তাহ'লে খুব ভাল। প্রহ্লাদের অহৈতুকী ভক্তি ছিল। সেরূপ ভক্ত বলে, হে ঈশ্বর! আমি ধন, মান, দেহসুখ, এ সব কিছুই চাই না! এই কর যেন তোমার পাদপদ্মে আমার শুদ্ধাভক্তি হয়।"

ডাক্তার—হাঁ, কালীতলায় লোকে প্রণাম ক'রে থাকে দেখেছি; ভিতরে কেবল কামনা—আমার চাকরী ক'রে দাও, আমার রোগ ভাল করে দাও,—এই সব।

(শ্রীরামকৃষ্ণের প্রতি)—"যে অসুখ তোমার হয়েছে, লোকেদের সঙ্গে কথা কওয়া হবে না। তবে আমি যখন আসবো, কেবল আমার সঙ্গে কথা কইবে।" (সকলের হাস্য)।

শ্রীরামকৃষ্ণ—এই অসুখটা ভাল করে দাও: তাঁর নাম-গুণ করতে পাই না।

ডাক্তার—ধ্যান করলেই হ'লো।

শ্রীরামকৃষ্ণ—সে কি কথা! আমি একঘেয়ে কেন হবো? আমি পাঁচ রকম করে মাছ খাই। কখন ঝোলে, কখন ঝালে অম্বলে, কখন বা ভাজায়। আমি কখন পুজো, কখন জপ, কখন বা ধ্যান, কখন বা তাঁর নাম গুণগান করি, কখন তাঁর নাম ক'রে নাচি।

ডাক্তার—আমিও একঘেয়ে নই।

[অবতার না মানিলে কি দোষ আছে?]

শ্রীরামকৃষ্ণ—তোমার ছেলে অমৃত—অবতার মানে না। তাতে দোষ কি? ঈশ্বরকে নিরাকার ব'লে বিশ্বাস থাকলেও তাঁকে পাওয়া যায়। আবার সাকার ব'লে বিশ্বাস থাকলেও তাঁকে পাওয়া যায়। তাঁতে বিশ্বাস থাকা আর শরণাগত হওয়া, এই দুটি দরকার। মানুষ তো অজ্ঞান, ভুল হ'তেই পারে। এক সের ঘটিতে কি চার সের দুধ ধরে? তবে যে পথেই থাকো, ব্যাকুল হ'য়ে তাঁকে ডাকা চাই। তিনি তো অন্তর্যামী—সে আন্তরিক ডাক শুনবেনই শুনবেন। 'ব্যাকুল হ'য়ে সাকারবাদীর পথেই যাও, আর নিরাকারবাদীর পথেই যাও, তাঁকেই (ঈশ্বরকেই) পাবে।'

"মিছরীর রুটি সিধে ক'রেই খাও, আর আড় ক'রেই খাও; মিষ্টি লাগবে। তোমার ছেলে অমৃতটি বেশ।"

ডাক্তার—সে তোমার চেলা।

শ্রীরামকৃষ্ণ (সহাস্যে, ডাক্তারের প্রতি)—আমার কোন শালা চেলা নাই। আমিই সকলের চেলা! সকলেই ঈশ্বরের ছেলে, সকলেই ঈশ্বরের দাস—আমিও ঈশ্বরের ছেলে, আমিও ঈশ্বরের দাস।

"চাঁদা মামা সকলেরই মামা।"

সভাস্থ সকলের আনন্দ ও হাস্য।

ষোড়শ খণ্ড

শ্রীরামকৃষ্ণের সহিত বিজয়, নরেন্দ্র, মাষ্টার, ডাক্তার সরকার প্রভৃতি ভক্তের কথোপকথন ও আনন্দ

প্রথম পরিচ্ছেদ

ঠাকুরের অসুখের অবস্থা জানাইতে ডাক্তার সকাশে মাষ্টার

আজ রবিবার ১০ই কার্ত্তিক; কৃষ্ণাদ্বিতীয়া—২৫শে অক্টোবর, ১৮৮৫। শ্রীরামকৃষ্ণ কলিকাতাস্থ শ্যামপুকুরের বাড়িতে অবস্থান করিতেছেন। গলার পীড়া (ক্যান্সার) চিকিৎসা করাইতে আসিয়াছেন। আজকাল ডাক্তার সরকার দেখিতেছেন।

ডাক্তারের কাছে পরমহংসদেবের অবস্থা জানাইবার জন্য মাষ্টারকে প্রত্যহ পাঠান হইয়া থাকে। আজ সকালে বেলা ৬।।টার সময় তাঁহাকে প্রণাম করিয়া মাষ্টার জিজ্ঞাসা করিলেন, "আপনি কেমন আছেন?" শ্রীরামকৃষ্ণ বলিতেছেন, "ডাক্তারকে বলবে, শেষ রাত্রে এক মুখ জল হয়; কাশি আছে; ইত্যাদি। "জিজ্ঞাসা করবে নাইবো কি না?"

মাষ্টার ৭-টার পর ডাক্তার সরকারের সঙ্গে দেখা করিলেন ও সমস্ত অবস্থা বলিলেন। ডাক্তারের বৃদ্ধ শিক্ষক ও দুই-একজন বন্ধু উপস্থিত ছিলেন। ডাক্তার বৃদ্ধ শিক্ষককে বলিতেছেন, মহাশয়! রাত তিনটে থেকে পরমহংসের ভাবনা আরম্ভ হয়েছে—ঘুম নাই। এখনও পরমহংস চল্‌ছে। (সকলের হাস্য)।

ডাক্তারের একজন বন্ধু ডাক্তারকে বলিতেছেন, মহাশয়, শুনতে পাই, পরমহংসকে কেউ কেউ অবতার বলে। আপনি তো রোজ দেখছেন, আপনার কি বোধ হয়?

ডাক্তার—As man I have the greatest regard for him.

মাষ্টার (ডাক্তারের বন্ধুর প্রতি)—ডাক্তার মহাশয় তাঁকে অনুগ্রহ ক'রে অনেক দেখছেন।

ডাক্তার—অনুগ্রহ!

মাষ্টার—আমাদের উপর, পরমহংসদেবের উপর বলছি না।

ডাক্তার—তা নয় হে। তোমরা জানো না, আমার actual loss হচ্ছে, রোজ রোজ দুই-তিন call -এ যাওয়াই হচ্ছে না। তার পরদিন আপনিই রোগীদের বাড়ি যাই, আর ফি লই না;—আপনি গিয়ে ফি নেবো কেমন করে?

শ্রীযুক্ত মহিমা চক্রবর্তীর কথা হইল। শনিবার যখন ডাক্তার পরমহংস-দেবকে দেখিতে যান, তখন চক্রবর্তী উপস্থিত ছিলেন; ডাক্তারকে দেখিয়া তিনি শ্রীরামকৃষ্ণকে বলিয়াছিলেন, মহাশয়, আপনি ডাক্তারের অহংকার বাড়াবার জন্য রোগ ক'রেছেন।'

মাষ্টার (ডাক্তারের প্রতি)—মহিমা চক্রবর্তী আপনার এখানে আগে আসতেন। আপনি বাড়িতে ডাক্তারী সায়েন্স-এর লেক্‌চার দিতেন, তিনি শুনতে আসতেন।

ডাক্তার—বটে? লোকটার কি তমো! দেখলে—আমি নমস্কার করলাম as God's Lower Third? আর ঈশ্বরের ভিতর তো (সত্ত্ব, রজঃ, তমঃ) সব গুণই আছে। ও কথাটা mark ক'রেছিলে, 'আপনি ডাক্তারের অহংকার বাড়াবার জন্য রোগ ক'রে বসেছেন?'

মাষ্টার—মহিমা চক্রবর্তীর বিশ্বাস যে, পরমহংসদেব মনে করলে নিজে ব্যারাম আরাম করতে পারেন।

ডাক্তার—ওঃ! তা কি হয়? আপনি ব্যারাম ভাল করা! আমরা ডাক্তার আমরা তো জানি ক্যান্সার-এর ভিতর কি আছে!—আমরাই আরাম করতে পারি না। উনি তো কিছু জানেন না, উনি কি রকম ক'রে আরাম করবেন! (বন্ধুদের প্রতি)—দেখুন, রোগ দুঃসাধ্য বটে, কিন্তু এরা সকলে তেমনি devotee-র মত সেবা করছে!

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

শ্রীরামকৃষ্ণ সেবকসঙ্গে

মাষ্টার ডাক্তারকে আসিতে বলিয়া প্রত্যাগমন করিলেন। খাওয়া-দাওয়ার পর বেলা তিনটার সময় আবার শ্রীরামকৃষ্ণকে দর্শন করিয়া সমস্ত নিবেদন করিলেন। ডাক্তার আজ বড় অপ্রতিভ করেছেন।

শ্রীরামকৃষ্ণ—কি হয়েছে?

মাষ্টার—'আপনি হতভাগা ডাক্তারদের অহংকার বাড়াবার জন্য রোগ ক'রে বসেছেন'—এ কথা কাল শুনে গিছলেন।

শ্রীরামকৃষ্ণ—কে বলেছিল?

মাষ্টার—মহিমা চক্রবর্তী।

শ্রীরামকৃষ্ণ—তার পর?

মাষ্টার—তা মহিমা চক্রবর্তীকে বলে 'তমোগুণী ঈশ্বর' (God's Lower (Third)। এখন ডাক্তার বলছেন, ঈশ্বরে সব গুণ (সত্ত্ব, রজঃ, তমঃ) আছে! (পরমহংসদেবের হাস্য)। আবার আমায় বললেন, সাড় তিনটের সময় ঘরে

ভেঙে গেছে আর পরমহংসের ভাবনা! বেলা আটটার সময় বলেন, 'এখনো পরমহংস চ'লছে।'

শ্রীরামকৃষ্ণ (হাসিতে হাসিতে)—ও ইংরাজী প'ড়েছে, ওকে বলবার যো নাই আমাকে চিন্তা কর ; তা আপনিই ক'রছে।

মাস্টার—আবার বলেন As man I have the greatest regard for him, এর মানে এই, আমি তাঁকে অবতার বলি না। কিন্তু মানুষ ব'লে যতদূর সম্ভব ভক্তি আছে।

শ্রীরামকৃষ্ণ—আর কিছু কথা হ'লো ?

মাস্টার—আমি জিজ্ঞাসা করলাম, 'আজ ব্যারামের কি বন্দোবস্ত হবে?' ডাক্তার বললেন, 'বন্দোবস্ত আর আমার মাথা আর মুণ্ডু; আবার যেতে হবে, আর কি বন্দোবস্ত!' (শ্রীরামকৃষ্ণের হাস্য) আরও বললেন, 'তোমরা জান না যে আমার কত টাকা রোজ লোকসান হচ্ছে—দুই-তিন জায়গায় রোজ যেতে সময় হয় না।'

তৃতীয় পরিচ্ছেদ

বিজয়াদি ভক্তসঙ্গে প্রেমানন্দে

কিয়ৎক্ষণ পরে শ্রীযুক্ত বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামী পরমহংসদেবকে দর্শন করিতে আসিলেন। সঙ্গে কয়েকটি ব্রাহ্ম ভক্ত। বিজয়কৃষ্ণ ঢাকায় অনেক দিবস ছিলেন। আপাততঃ পশ্চিমে অনেক তীর্থ ভ্রমণের পর সবে কলিকাতায় পৌঁছিয়াছেন। আসিয়া ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণকে ভূমিষ্ঠ হইয়া প্রণাম করিলেন। অনেকে উপস্থিত ছিলেন,—নরেন্দ্র, মহিমা চক্রবর্তী, নবগোপাল, ভূপতি. লাটু, মাস্টার, ছোট নরেন্দ্র ইত্যাদি অনেকগুলি ভক্ত।

মহিমা চক্রবর্তী (বিজয়ের প্রতি)—মহাশয়, তীর্থ ক'রে এলেন, অনেক দেশ দেখে এলেন, এখন কি দেখলেন বলুন।

বিজয়—কি ব'লবো। দেখছি, যেখানে এখন ব'সে আছি, এইখানেই সব। কেবল মিছে ঘোরা! কোন কোন জায়গায় এ'রই এক আনা কি দুই আনা, কোথাও চারি আনা, এই পর্যন্ত। এইখানেই পূর্ণ ষোল আনা দেখছি!

মহিমা চক্রবর্তী—ঠিক ব'লেছেন, আবার ইনিই ঘোরান, ইনিই বসান!

শ্রীরামকৃষ্ণ (নরেন্দ্রের প্রতি)—দেখ, বিজয়ের অবস্থা কি হয়েছে। লক্ষণ সব বদলে গেছে, যেন আউটে গেছে। আমি পরমহংসের ঘাড় ও কপাল দেখে চিনতে পারি। বলতে পারি, পরমহংস কি না।

মহিমা চক্রবর্তী—মহাশয়! আপনার আহার কমে গেছে?

বিজয়—হাঁ, বোধ হয় গিয়েছে। (শ্রীরামকৃষ্ণের প্রতি)—আপনার পীড়ার কথা শুনে দেখতে এলাম। আবার ঢাকা থেকে—

শ্রীরামকৃষ্ণ—কি?

বিজয় কোন উত্তর দিলেন না। খানিকক্ষণ চুপ করিয়া রহিলেন।

বিজয়—ধরা না দিলে ধরা শক্ত। এইখানেই ষোল আনা।

শ্রীরামকৃষ্ণ—কেদার* বললে, অন্য জায়গায় খেতে পাই না—এখানে এসে পেট ভরা পেলুম!

মহিমা চক্রবর্তী—পেট ভরা কি? উপচে পড়ছে!

বিজয় (হাত জোড় করিয়া শ্রীরামকৃষ্ণের প্রতি)—বুঝেছি আপনি কে। আর বলতে হবে না!

শ্রীরামকৃষ্ণ (ভাবস্থ)—যদি তা হয়ে থাকে, তো তাই।

বিজয়—বুঝেছি।

এই বলিয়া শ্রীরামকৃষ্ণের পাদমূলে পতিত হইলেন ও নিজের বক্ষে তাঁহার চরণ ধারণ করিলেন। শ্রীরামকৃষ্ণ তখন ঈশ্বরাবেশে বাহ্যশূন্য চিত্রার্পিতের ন্যায় বসিয়া আছেন।

এই প্রেমাবেশ, এই অদ্ভুত দৃশ্য দেখিয়া উপস্থিত ভক্তেরা কেহ কাঁদিতেছেন, কেহ স্তব করিতেছেন। যাঁহার যে মনের ভাব তিনি সেই ভাবে একদৃষ্টে শ্রীরামকৃষ্ণের দিকে চাহিয়া রহিলেন! কেহ তাঁহাকে পরম ভক্ত, কেহ সাধু, কেহ বা সাক্ষাৎ দেহধারী ঈশ্বরাবতার দেখিতেছেন, যাঁহার যেমন ভাব।

মহিমাচরণ সাশ্রুনয়নে গাহিলেন—দেখ দেখ প্রেমমূর্তি—ও মাঝে মাঝে যেন ব্রহ্মদর্শন করিতেছেন, এই ভাবে বলিতেছেন—

"তুরীয়ং সচ্চিদানন্দম্ দ্বৈতাদ্বৈতবিবর্জিতম্।"

নবগোপাল কাঁদিতেছেন। আর একটি ভক্ত ভূপতি গাহিলেন—

জয় জয় পরব্রহ্ম অপার তুমি অগম্য,
পরাৎপর তুমি সারাৎসার।
সত্যের আলোক তুমি প্রেমের আকর ভূমি,
মঙ্গলের তুমি মূলাধার।
নানা রসযুত ভব, গভীর রচনা তব,
উচ্ছ্বসিত শোভায় শোভায়,
মহাকবি আদিকবি, ছন্দে উঠে শশী রবি,
ছন্দে পুনঃ অস্তাচলে যায়।
তারকা কনক কুচি, জলদ অক্ষর রুচি,
গীত লেখা নীলাম্বর পাতে।

---

* শ্রীযুক্ত কেদারনাথ চাটুর্য্যে অনেকদিন ঢাকায় ছিলেন। ঈশ্বরের কথা পড়লেই তাঁহার চক্ষু আর্দ্র হইত। একজন পরম ভক্ত। বাটী হালিসহর।

ছয় ঋতু সম্বৎসরে, মহিমা কীর্ত্তন করে,
সুখপূর্ণ চরাচর সাথে।
কুসুমে তোমার কান্তি, সলিলে তোমার শান্তি,
বজ্ররবে রুদ্র তুমি ভীম;
তব ভাব গূঢ় অতি, কি জানিবে মূঢ়মতি,
ধ্যায় যুগযুগান্ত অসীম।
আনন্দে সবে আনন্দে, তোমার চরণ বন্দে,
কোটি চন্দ্র কোটি সূর্য তারা!
তোমারি এ রচনারি, ভাব লয়ে নরনারী,
হাহাকারে নেত্রে বহে ধারা।
মিলি সুর, নর, ঋভু, প্রণমে তোমায় বিভু,
তুমি সর্ব মঙ্গল-আলয়;
দেও জ্ঞান, দেও প্রেম, দেও ভক্তি, দেও ক্ষেম,
দেও দেও ওপদে আশ্রয়।

ভূপতি আবার গাহিতেছেন—

[ঝিঁঝিট—(খয়রা) কীর্ত্তন।]

চিদানন্দ সিন্ধুনীরে প্রেমানন্দের লহরী।
মহাভাব রসলীলা কি মাধুরী মরি মরি
বিবিধ বিলাস রসপ্রসঙ্গ, কত অভিনব ভাবতরঙ্গ,
ডুবিছে উঠিছে করিছে রঙ্গ, নবীন নবীন রূপ ধরি.
(হরি হরি বলে)
মহাযোগে সমুদায় একাকার হইল,
দেশকাল ব্যবধান ভেদাভেদ ঘুচিল,
(আশা পূরিল রে, আমার সকল সাধ মিটে গেল!)
এখন আনন্দে মাতিয়া দুবাহু তুলিয়া, বলরে মন হরি হরি।

[ঝাঁপতাল]

টুটল ভরম ভীতি ধরম করম নীতি
দূর ভেল জাতি কুলমান;
কাঁহা হাম, কাঁহা হরি, প্রাণমন চুরি করি,
বঁধুয়া করিলা পয়ান;
(আমি কেনই বা এলাম গো, প্রেমসিন্ধুতটে,)
ভাবেতে হওল ভোর, অবহিঁ হৃদয় মোর
নাহি যাত আপনা পসান,

প্রেমদাস কহে হাসি, শুন সাধু জগবাসী,
এয়সাহি নূতন বিধান।
(কিছু ভয় নাই! ভয় নাই!)

অনেকক্ষণ পরে ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ প্রকৃতিস্থ হইলেন।

[ব্রহ্মজ্ঞান ও 'আশ্চর্য গণিত'—অবতারের প্রয়োজন]

শ্রীরামকৃষ্ণ (মাস্টারের প্রতি)—কি একটা হয় আবেশে; এখন লজ্জা হচ্ছে। যেন ভূতে পায়, আমি আর আমি থাকি না।

"এ অবস্থার পর গণনা হয় না। গণতে গেলে ১-৭-৮ এই রকম গণনা হয়।"

নরেন্দ্র—সব এক কি না।

শ্রীরামকৃষ্ণ—না, এক দুয়ের পার।*

মহিমাচরণ—আজ্ঞা হাঁ, দ্বৈতাদ্বৈতবিবর্জিতম্।

শ্রীরামকৃষ্ণ—হিসাব পচে যায়! পাণ্ডিত্যের দ্বারা তাঁকে পাওয়া যায় না। তিনি শাস্ত্র,—বেদ, পুরাণ, তন্ত্রের—পার। হাতে একখানা বই যদি দেখি, জ্ঞানী হ'লেও তাকে রাজর্ষি বলে কই। ব্রহ্মর্ষির কোন চিহ্ন থাকে না। শাস্ত্রের কি ব্যবহার জানো? একজন চিঠি লিখেছিল, পাঁচ সের সন্দেশ ও একখানা কাপড় পাঠাইবে। যে চিঠি পেলে সে চিঠি পড়ে, পাঁচ সের সন্দেশ ও একখানা কাপড়, এই কথা মনে রেখে চিঠিখানা ফেলে দিলে! আর চিঠির কি দরকার?

বিজয়—সন্দেশ পাঠানো হয়েছে, বোঝা গেছে।

শ্রীরামকৃষ্ণ—মানুষদেহ ধারণ ক'রে ঈশ্বর অবতীর্ণ হন। তিনি সর্বস্থানে সর্বভূতে আছেন বটে, কিন্তু অবতার না হ'লে জীবের আকাঙ্ক্ষা পুরে না, প্রয়োজন মেটে না। কি রকম জানো? গরুর যেখানটা ছোঁবে, গরুকে ছোঁয়াই হয় বটে। শিঙটা ছুঁলেও গাইটাকে ছোঁয়া হলো; কিন্তু গাইটার বাঁট থেকেই দুধ হয়। (সকলের হাস্য)।

মহিমা—দুধ যদি দরকার হয়, গাইটার শিঙে মুখ দিলে কি হবে? বাঁটে মুখ দিতে হবে। (সকলের হাস্য)।

বিজয়—কিন্তু বাছুর প্রথম প্রথম এদিক-ওদিক ঢু মারে।

শ্রীরামকৃষ্ণ (হাসিতে হাসিতে)—আবার কেউ হয়তো বাছুরকে ঐ রকম করতে দেখে বাঁটটা ধরিয়ে দেয়। (সকলের হাস্য)।

---

* এক দুয়ের পার—The absolute as distinguished from the Relative.

চতুর্থ পরিচ্ছেদ

ভক্তসঙ্গে প্রেমানন্দে

এই সকল কথা হইতেছে, এমন সময়ে ডাক্তার তাঁহাকে দেখিবার জন্য আসিয়া উপস্থিত হইলেন ও আসন গ্রহণ করিলেন। তিনি বলিতেছেন, "কাল রাত তিনটে থেকে আমার ঘুম ভেঙেছে। কেবল তোমার জন্য ভাব্‌ছিলাম, পাছে ঠান্ডা লেগে থাকে। আরও কত কি ভাবছিলাম।"

শ্রীরামকৃষ্ণ—কাশি হয়েছে, টাটিয়েছে; শেষ রাত্রে একমুখ জল, আর যেন কাঁটা বিঁধ্‌ছে।

ডাক্তার—সকালে সব খবর পেয়েছি।

মহিমাচরণ তাঁহার ভারতবর্ষ ভ্রমণের কথা বলিতেছেন। বলিলেন যে, লঙ্কাদ্বীপে 'লাফিং ম্যান্' নাই। ডাক্তার সরকার বলিলেন, তা হবে, এন্‌কোয়ার করতে হবে। (সকলের হাস্য)।

[ডাক্তারের ব্যবসা ও ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ]

ডাক্তারী কর্মের কথা পড়িল।

শ্রীরামকৃষ্ণ (ডাক্তারের প্রতি)—ডাক্তারী কর্ম খুব উঁচু কর্ম বলে অনেকের বোধ আছে। যদি টাকা না লয়ে পরের দুঃখ দেখে দয়া ক'রে কেউ চিকিৎসা করে তবে সে মহৎ, কাজটিও মহৎ। কিন্তু টাকা ল'য়ে এ সব কাজ করতে করতে মানুষ নির্দয় হ'য়ে যায়। ব্যবসার ভাবে টাকার জন্য হাগা, বাহ্যের রং এই সব দেখা—নীচের কাজ।

ডাক্তার—তা যদি শুধু করে, তাহ'লে কাজ খারাপ বটে। তোমার কাছে বলা গৌরব করা—

শ্রীরামকৃষ্ণ—হাঁ, ডাক্তারী কাজে নিঃস্বার্থভাবে যদি পরের উপকার করা হয়, তাহ'লে খুব ভাল।

"তা যে কর্মই লোকে করুক না কেন, সংসারী ব্যক্তির মাঝে মাঝে সাধুসঙ্গ বড় দরকার। ঈশ্বরে ভক্তি থাকলে লোকে সাধুসঙ্গ আপনি খুঁজে লয়। আমি উপমা দিই—গাঁজাখোর গাঁজাখোরের সঙ্গে থাকে, অন্য লোক দেখলে মুখ নীচু করে চ'লে যায়, বা লুকিয়ে পড়ে। কিন্তু আর একজন গাঁজাখোর দেখ্‌লে মহা আনন্দ। হয়তো কোলাকুলি করে। (সকলের হাস্য)। আবার শকুনি শকুনির সঙ্গে থাকে।"

[সাধুর সর্বজীবে দয়া]

ডাক্তার—আবার কাকের ভয়ে শকুনি পালায়। আমি বলি শুধু মানুষ কেন, সব জীবেরই সেবা করা উচিত। আমি প্রায়ই চড়ুই পাখীকে ময়দা দিই।

ছোট ছোট ময়দার গুলি ক'রে ছুঁড়ে ফেলি, আর ছাদে ঝাঁকে ঝাঁকে চড়ুই পাখী এসে খায়।

শ্রীরামকৃষ্ণ—বাঃ, এটা খুব কথা। জীবকে খাওয়ান সাধুর কাজ; সাধুরা পিঁপড়েদের চিনি দেয়।

ডাক্তার—আজ গান হবে না?

শ্রীরামকৃষ্ণ (নরেন্দ্রের প্রতি)—একটু গান কর না।

নরেন্দ্র গাহিতেছেন, তানপুরা সঙ্গে। অন্য বাজনাও হইতে লাগিল—

সুন্দর তোমারি নাম দীন-শরণ হে,
বরিষে অমৃতধার, জুড়ায় শ্রবণ ও প্রাণরমণ হে।
এক তব নাম ধন, অমৃত-ভবন হে,
অমর হয় সেইজন, যে করে কীর্ত্তন হে।
গভীর বিষাদরাশি নিমেষে বিনাশে,
যখনি তব নামসুধা শ্রবণে পরশে;
হৃদয় মধুময় তব নাম গানে,
হয় হে হৃদয়নাথ, চিদানন্দ ঘন হে।

নরেন্দ্র আবার গাইলেন—

আমায় দে মা পাগল ক'রে (ব্রহ্মময়ী)।
আর কাজ নাই মা জ্ঞান বিচারে॥
(ব্রহ্মময়ী দে মা পাগল ক'রে)
(ওমা) তোমার প্রেমের সুরা, পানে কর মাতোয়ারা,
ওমা ভক্তচিত্তহরা ডুবাও প্রেমসাগরে॥
তোমার এ পাগলাগারদে, কেহ হাসে কেহ কাঁদে,
কেহ নাচে আনন্দ ভরে;
ঈশা বুদ্ধ শ্রীচৈতন্য ওমা প্রেমের ভরে অচৈতন্য,
হায় কবে হব মা ধন্য, (ওমা) মিশে তার ভিতরে॥
স্বর্গেতে পাগলের মেলা, যেমন গুরু তেমনি চেলা
প্রেমের খেলা কে বুঝতে পারে;
তুমি প্রেমে উন্মাদিনী, ওমা পাগলের শিরোমণি
প্রেমধনে কর মা ধনী, কাঙ্গাল প্রেমদাসেরে॥

গানের পর আবার অদ্ভুত দৃশ্য। সকলেই ভাবে উন্মত্ত। পণ্ডিত পাণ্ডিত্যাভিমান ত্যাগ করিয়া দাঁড়াইয়াছেন। বলছেন, 'আমায় দে মা পাগল ক'রে আর কাজ নাই জ্ঞান বিচারে।' বিজয় সর্বপ্রথমে আসন ত্যাগ করিয়া ভাবোন্মত্ত হইয়া দাঁড়াইয়াছেন। তাহার পরে শ্রীরামকৃষ্ণ। ঠাকুর দেহের কঠিন অসাধ্য ব্যাধি একেবারে ভুলিয়া গিয়াছেন। ডাক্তার সম্মুখে। তিনিও দাঁড়াইয়া-

ছেন। রোগীরও হুঁশ নাই ; ডাক্তারেরও হুঁশ নাই। ছোট নরেনেরও ভাব-সমাধি হইল। লাটুরও ভাব-সমাধি হইল। ডাক্তার সায়েন্স্ পড়িয়াছেন, কিন্তু অবাক হইয়া এই অদ্ভুত ব্যাপার দেখিতে লাগিলেন। দেখিলেন, যাঁহাদের ভাব হইয়াছে, তাঁহাদের বাহ্য চৈতন্য কিছুই নাই, সকলেই স্থির, নিস্পন্দ; ভাব উপশম হইলে কেহ কাঁদিতেছেন, কেহ কেহ হাসিতেছেন। যেন কতকগুলি মাতাল একত্র হইয়াছে।

পঞ্চম পরিচ্ছেদ

ভক্তসঙ্গে—শ্রীরামকৃষ্ণ ও ক্রোধজয়

এই কাণ্ডের পর সকলে আবার আসন গ্রহণ করিলেন। রাত আটটা হইয়া গিয়াছে। আবার কথাবর্তা হইতে লাগিল।

শ্রীরামকৃষ্ণ (ডাক্তারের প্রতি)—এই যা ভাব-টাব দেখলে তোমার সায়েন্স কি বলে? তোমার কি এ সব ঢং বোধ হয়?

ডাক্তার (শ্রীরামকৃষ্ণের প্রতি)—যেখানে এত লোকের হচ্ছে সেখানে natural (আন্তরিক) বোধ হয়, ঢং বোধ হয় না। (নরেন্দ্রের প্রতি) যখন তুমি গাচ্ছিলে 'দে মা পাগল ক'রে, আর কাজ নাই মা জ্ঞান বিচারে' তখন আর থাকতে পারি নাই। দাঁড়াই আর কি। তারপর অনেক কষ্টে ভাব চাপলুম ; ভাবলুম যে display করা হবে না।

শ্রীরামকৃষ্ণ (ডাক্তারের প্রতি, সহাস্যে)—তুমি যে অটল অচল সুমেরুবৎ (সকলের হাস্য)। তুমি গম্ভীরাত্মা, রূপসনাতনের ভাব কেউ টের পেতো না—যদি ডোবাতে হাতী নামে, তা হ'লেই তোলপাড় হ'য়ে যায়, কিন্তু সায়ের দীঘিতে হাতী নামলে তোলপাড় হয় না। কেউ হয় তো টেরও পায় না। শ্রীমতী সখীকে বললেন, 'সখি, তোরা তো কৃষ্ণের বিরহে কত কাঁদছিস্, কিন্তু দেখ, আমি কি কঠিন, আমার চক্ষে এক বিন্দুও জল নাই। তখন বৃন্দা বললেন সখি, তোর চক্ষে জল নাই তার অনেক মানে আছে। তোর হৃদয়ে বিরহ অগ্নি সদা জ্বলছে ; চক্ষে জল উঠছে আর সেই অগ্নির তাপে শুকিয়ে যাচ্ছে।

ডাক্তার—তোমার সঙ্গে তো কথায় পারবার যো নাই। (হাস্য)।

ক্রমে অন্য কথা পড়িল। শ্রীরামকৃষ্ণ নিজের প্রথম ভাবাবস্থা বর্ণনা করিতেছিলেন। আর কাম ক্রোধাদি কিরূপে বশ করিতে হয়।

ডাক্তার—তুমি ভাবে প'ড়েছিলে, আর একজন দুষ্ট লোক তোমায় বুট জুতার গোঁজা মেরেছিল—সে সব কথা শুনেছি।

শ্রীরামকৃষ্ণ—মাষ্টারের কাছে শুনেছ। সে কালীঘাটের চন্দ্র হালদার। সেজোবাবুর কাছে প্রায় আস্‌তো। আমি ঈশ্বরের আবেশে মাটিতে অন্ধকারে পড়ে আছি। চন্দ্র হালদার ভাবতো, আমি ঢং ক'রে ঐ রকম হ'য়ে থাকি, বাবুর প্রিয়পাত্র হব বলে। সে অন্ধকারে এসে বুট জুতার গোঁজা দিতে লাগলো। গায়ে দাগ হয়েছিল। সবাই বললে, সেজোবাবুকে বলে দেওয়া যাক। আমি বারণ ক'রলুম।

ডাক্তার—এও ঈশ্বরের খেলা ; ওতেও লোক শিখবে, ক্রোধ কি রকম করে বশীভূত ক'রতে হয়। ক্ষমা কাকে বলে, লোক শিখবে।

[বিজয় ও নরেন্দ্রের ঈশ্বরীয় রূপ দর্শন]

ইতিমধ্যে ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণের সম্মুখে বিজয়ের সঙ্গে ভক্তদের অনেক কথা-বার্তা হইতেছে।

বিজয়—কে একজন আমার সঙ্গে সদা-সর্বদা থাকেন, আমি দূরে থাকলেও তিনি জানিয়ে দেন, কোথায় কি হচ্ছে।

নরেন্দ্র—Guardian angel-এর মত।

বিজয়—ঢাকায় এঁকে (পরমহংসদেবকে) দেখেছি। গা ছুঁয়ে।

শ্রীরামকৃষ্ণ (হাসিতে হাসিতে)—সে তবে আর একজন!

নরেন্দ্র—আমিও এঁকে নিজে অনেকবার দেখেছি। (বিজয়ের প্রতি) তাই কি ক'রে বল্‌বো—আপনার কথা বিশ্বাস করি না।

সপ্তদশ খণ্ড

শ্যামপুকুর বাটীতে ভক্তসঙ্গে শ্রীরামকৃষ্ণ

প্রথম পরিচ্ছেদ

শ্রীরামকৃষ্ণ—গিরিশ, মাষ্টার, ছোট নরেন্দ্র, কালী, শরৎ, রাখাল, ডাক্তার সরকার প্রভৃতি ভক্তসঙ্গে

পরদিন আশ্বিনের কৃষ্ণা তৃতীয়া তিথি, সোমবার, ১১ই কার্ত্তিক—২৬শে অক্টোবর, ১৮৮৫। শ্রীশ্রীপরমহংসদেব কলিকাতায় ঐ শ্যামপুকুরের বাটীতে চিকিৎসার্থ রহিয়াছেন। ডাক্তার সরকার চিকিৎসা করিতেছেন। প্রায় প্রত্যহ আসেন, আর তাঁহার নিকট পীড়ার সংবাদ লইয়া লোক সর্বদা যাতায়াত করে।

শরৎকাল। কয়েকদিন হইল শারদীয়া দুর্গাপূজা হইয়া গিয়াছে। এ মহোৎসব শ্রীরামকৃষ্ণের শিষ্যমণ্ডলী হর্ষ-বিষাদে অতিবাহিত করিয়াছেন। কেন না তিন মাস ধরিয়া গুরুদেবের কঠিন পীড়া—কণ্ঠদেশে—ক্যান্সার। সরকার ইত্যাদি ডাক্তার ইঙ্গিত করিয়াছেন, পীড়া চিকিৎসার অসাধ্য। হতভাগ্য শিষ্যেরা এ কথা শুনিয়া একান্তে নীরবে অশ্রু বিসর্জন করেন। এক্ষণে এই শ্যামপুকুরের বাটীতে আছেন। শিষ্যরা প্রাণপণে শ্রীরামকৃষ্ণের সেবা করিতেছেন। নরেন্দ্রাদি কৌমারবৈরাগ্যযুক্ত শিষ্যগণ এই মহতী সেবা উপলক্ষে কামিনীকাঞ্চন-ত্যাগপ্রদর্শী সোপান আরোহন করিতে সবে শিখিতেছেন।

এত পীড়া কিন্তু দলে দলে লোক দর্শন করিতে আসিতেছেন—শ্রীরামকৃষ্ণের কাছে আসিলেই শান্তি ও আনন্দ হয়। অহেতুক-কৃপাসিন্ধু! দয়ার ইয়ত্তা নাই—সকলের সঙ্গেই কথা কহিতেছেন, কিসে তাহাদের মঙ্গল হয়। শেষে ডাক্তারেরা, বিশেষতঃ ডাক্তার সরকার, কথা কহিতে একেবারে নিষেধ করিলেন। কিন্তু ডাক্তার নিজে ৬/৭ ঘণ্টা করিয়া থাকেন। তিনি বলেন, "আর কাহারো সহিত কথা কওয়া হবে না, কেবল আমার সঙ্গে কথা কইবে।"

শ্রীরামকৃষ্ণের কথামৃত পান করিয়া ডাক্তার একেবারে মুগ্ধ হইয়া যান। তাই এতক্ষণ ধরিয়া বসিয়া থাকেন।

বেলা দশটার সময় ডাক্তারকে সংবাদ দিবার জন্য মাষ্টার যাইবেন, তাই ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণের সহিত কথাবার্তা হইতেছে।

শ্রীরামকৃষ্ণ (মাষ্টারের প্রতি)—অসুখটা খুব হাল্কা হয়েছে। খুব ভাল আছি। আচ্ছা, তবে ঔষধে কি এরূপ হয়েছে? তাহ'লে ঐ ঔষধটা খাই না কেন?

মাষ্টার—আমি ডাক্তারের কাছে যাচ্ছি, তাঁকে সব ব'লবো; তিনি যা ভাল হয় তাই বলবেন।

শ্রীরামকৃষ্ণ—দেখ, পূর্ণ* দুই তিন দিন আসে নাই, বড় মন কেমন কচ্ছে।

মাষ্টার—কালীবাবু, তুমি যাও না পূর্ণকে ডাক্‌তে।

কালী—এই যাব।

শ্রীরামকৃষ্ণ (মাষ্টারের প্রতি)—ডাক্তারের ছেলেটি বেশ। একবার আসতে বোলো।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

মাষ্টার ও ডাক্তার সংবাদ

মাষ্টার ডাক্তারের বাড়ি উপস্থিত হইয়া দেখিলেন, ডাক্তার দুই-একজন বন্ধু সঙ্গে বসিয়া আছেন।

ডাক্তার (মাষ্টারের প্রতি)—এই এক মিনিট হ'লো তোমার কথা ক'চ্ছিলাম। দশটায় আস্‌বে বললে, দেড় ঘণ্টা ব'সে। ভাবলুম, কেমন আছেন, কি হ'লো! (বন্ধুকে) 'ওহে সেই গানটা গাও ত'।

বন্ধু গাহিতেছেন,—

কর তাঁর নাম গান, যতদিন দেহে রহে প্রাণ।
যাঁর মহিমা জ্বলন্ত জ্যোতিঃ, জগৎ করে হে আলো ;
স্রোত বহে প্রেমপীযূষ-বারি, সকল জীব সুখকারী হে।
করুণা স্মরিয়ে তনু হয় পুলকিত বাক্যে বলিতে কি পারি।
যাঁর প্রসাদে এক মুহূর্তে সকল শোক অপসারি হে।
উচ্চে নীচে দেশ দেশান্তে, জলগর্ভে, কি আকাশে ;
অন্ত কোথা তাঁর, অন্ত কোথা তাঁর, এই সবে সদা জিজ্ঞাসে হে।
চেতন নিকেতন পরশ রতন সেই নয়ন অনিমেষ,
নিরঞ্জন সেই, যাঁর দরশনে, নাহি রহে দুঃখ লেশ হে।

ডাক্তার (মাষ্টারকে)—গানটি খুব ভাল,—নয়? ঐখানটি কেমন?

'অন্ত কোথা তাঁর, অন্ত কোথা তাঁর এই সবে সদা জিজ্ঞাসে।'

মাষ্টার—হাঁ, ও-খানটি বড় চমৎকার! খুব অনন্তের ভাব।

ডাক্তার (সস্নেহে)—অনেক বেলা হ'য়েছে, তুমি খেয়েছো তো? আমার দশটার মধ্যে খাওয়া হ'য়ে যায়, তারপর আমি ডাক্তারী করতে বেরুই। না খেয়ে বেরুলে অসুখ করে। ওহে, একদিন তোমাদের খাওয়াবো মনে ক'রেছি।

* শ্রীযুক্ত পূর্ণচন্দ্রের বয়স ১৪।১৫

মাষ্টার—তা বেশ তো, মহাশয়।

ডাক্তার—আচ্ছা, এখানে না সেখানে? তোমরা যা বল।—

মাষ্টার—মহাশয়, এইখানেই হোক, আর সেইখানেই হোক, সকলে আহ্লাদ ক'রে খা'ব।

এইবার মা কালীর কথা হইতেছে।

ডাক্তার—কালী তো একজন সাঁওতালী মাগী। (মাষ্টারের উচ্চহাস্য)।

মাষ্টার—ও কথা কোথায় আছে?

ডাক্তার—শুনেছি এই রকম। (মাষ্টারের হাস্য)।

পূর্বদিন শ্রীযুক্ত বিজয়কৃষ্ণ ও অন্যান্য ভক্তের ভাবসমাধি হইয়াছিল। ডাক্তারও উপস্থিত ছিলেন। সেই কথা হইতেছে।

ডাক্তার—ভাব ত দেখলুম। বেশী ভাব কি ভাল?

মাষ্টার—পরমহংসদেব বলেন, ঈশ্বর চিন্তা ক'রে যে ভাব হয় তা বেশী হ'লে কোন ক্ষতি হয় না। তিনি বলেন যে মণির জ্যোতিতে আলো হয় আর শরীর স্নিগ্ধ হয়, কিন্তু গা পুড়ে যায় না!

ডাক্তার—মণির জ্যোতিঃ ; ও যে Reflected light!

মাষ্টার—তিনি আরও বলেন, অমৃতসরোবরে ডুবলে মানুষ মরে যায় না। ঈশ্বর অমৃতের সরোবর। তাঁতে ডুবলে মানুষের অনিষ্ট হয় না ; বরং মানুষ অমর হয়। অবশ্য যদি ঈশ্বরে বিশ্বাস থাকে।

ডাক্তার—হাঁ, তা বটে।

ডাক্তার গাড়ীতে উঠিলেন, দু-চারিটি রোগী দেখিয়া পরমহংসদেবকে দেখিতে যাইবেন। পথে আবার মাষ্টারের সঙ্গে কথা হইতে লাগিল। 'চক্রবর্তীর অহঙ্কার' ডাক্তার এই কথা তুলিলেন।

মাষ্টার—পরমহংসদেবের কাছে তাঁর যাওয়া-আসা আছে। অহঙ্কার যদি থাকে, কিছু দিনের মধ্যে আর থাকবে না। তাঁর কাছে বসলে জীবের অহঙ্কার পলায়ন করে, অহঙ্কার চূর্ণ হয়। ওখানে অহঙ্কার নাই কি না, তাই। নিরহঙ্কারের নিকট আস্‌লে অহঙ্কার পালিয়ে যায়। দেখুন, বিদ্যাসাগর মহাশয় অত বড়লোক, কত বিনয় আর নম্রতা দেখিয়েছেন। পরমহংসদেব তাঁকে দেখতে গিয়েছিলেন, বাদুরবাগানের বাড়িতে। যখন বিদায় লন, রাত তখন ৯টা। বিদ্যাসাগর লাইব্রেরীঘর থেকে বরাবর সঙ্গে সঙ্গে, নিজে এক-একবার বাতি ধ'রে, এসে গাড়ীতে তুলে দিলেন ; আর বিদায়ের সময় হাত জোড় ক'রে রহিলেন।

ডাক্তার—আচ্ছা, এঁর বিষয় বিদ্যাসাগর মহাশয়ের কি মত?

মাষ্টার—সেদিন খুব ভক্তি ক'রেছিলেন। তবে কথা ক'য়ে দেখেছি, বৈষ্ণবেরা যাকে ভাব-টাব বলে, সে সব বড় ভালবাসেন না। আপনার মত।

ডাক্তার—হাত জোড় করা, পায়ে মাথা দেওয়া, আমি ও-সব ভালবাসি না। মাথাও যা, পাও তা। তবে যার পা অন্য জ্ঞান আছে, সে করুক।

মাষ্টার—আপনি ভাব-টাব ভালবাসেন না। পরমহংসদেব আপনাকে 'গম্ভীরাত্মা' মাঝে মাঝে বলেন, বোধ হয় মনে আছে। তিনি কাল আপনাকে বল্‌ছিলেন যে, ডোবাতে হাতী নামলে জল তোলপাড় হয়, কিন্তু সায়ের দীঘি ঘড়, তাতে হাতী নামলে জল নড়েও না। গম্ভীরাত্মার ভিতর ভাবহস্তী নামলে তার কিছু ক'রতে পারে না। তিনি বলেন, আপনি 'গম্ভীরাত্মা।'

ডাক্তার—I don't deserve the Compliment, ভাব আর কি ?feelings ; ভক্তি, আর অন্যান্য feelings —বেশী হ'লে কেউ চাপতে পারে, কেউ পারে না।

মাষ্টার—Explanation কেউ দিতে পারে এরকম ক'রে—কেউ পারে না ; কিন্তু মহাশয়, ভাব ভক্তি জিনিসটা অপূর্ব সামগ্রী। Stebbing on Darwinism আপনার library-তে দেখলাম। Stebbing বলেন, Human mind যার দ্বারাই হউক— evolution দ্বারাই হোক্, বা ঈশ্বর আলাদা বসে সৃষ্টিই করুন —equally wonderful. তিনি একটি বেশ উপমা দিয়েছেন—theory of light. Whether you know the undulatory theory of light or not, light in either case is equally wonderful.

ডাক্তার—হাঁ ; আর দেখেছো, Stebbing, Darwinism মানে, আবার God-ও মানে।

আবার পরমহংসদেবের কথা পড়িল।

ডাক্তার—ইনি (পরমহংসদেব) দেখছি কালীর উপাসক।

মাষ্টার—তাঁর 'কালী' মানে আলাদা। বেদ যাঁকে পরমব্রহ্ম বলে, তিনি তাঁকেই কালী বলেন। মুসলমান যাঁকে আল্লা বলে, খৃষ্টান যাঁকে গড্ বলে, তিনি তাঁকেই কালী বলেন। তিনি অনেক ঈশ্বর দেখেন না, এক দেখেন। পুরাতন ব্রহ্মজ্ঞানীরা যাঁকে ব্রহ্ম বলে গেছেন, যোগীরা যাঁকে আত্মা বলেন, ভক্তেরা যাঁকে ভগবান বলেন, পরমহংসদেব তাঁকেই কালী বলেন।

"তাঁর কাছে শুনেছি, একজনের একটি গামলা ছিল, তাতে রঙ ছিল। কারু কাপড় ছোপাবার দরকার হ'লে তার কাছে যেতো। সে জিজ্ঞাসা করতো, তুমি কি রঙে ছোপাতে চাও। লোকটি যদি বলতো সবুজ রঙ, তা হ'লে কাপড়খানি গামলার রঙে ডুবিয়ে ফিরিয়ে দিত ; ও বলতো, এই লও তোমার সবুজ রঙে ছোপান কাপড়। যদি কেহ বলতো লাল রঙ, সেই গামলায় কাপড়খানি ছুপিয়ে সে বল্‌তো এই লও তোমার লালে ছোপান কাপড়। এই এক গামলার রঙে সবুজ, নীল হল্‌দে, সব রঙের কাপড় ছোপান হ'তো। এই অদ্ভুত ব্যাপার দেখে একজন লোক বল্‌লে, বাবু আমি কি রঙ চাই বলবো? তুমি নিজে যে রঙে ছুপেছো আমায় সেই রঙ দাও। সেইরূপ পরমহংসদেবের

ভিতর সব ভাব আছে,—সব সম্প্রদায়ের লোক তাঁর কাছে শান্তি পায় ও আনন্দ পায়। তাঁর যে কি ভাব, কি গভীর অবস্থা, তা' কে বুঝবে?

ডাক্তার— All things to all men! তাও ভাল নয়, although St. Paul says it.

মাষ্টার—পরমহংসদেবের অবস্থা কে বুঝবে? তাঁর মুখে শুনেছি, সুতার ব্যবসা না ক'রলে ৪০নং সুতা আর ৪১নং সুতার প্রভেদ বুঝা যায় না। পেণ্টার না হ'লে পেণ্টার-এর আর্ট বুঝা যায় না। মহাপুরুষের গভীর ভাব। ক্রাইষ্ট-এর ন্যায় না হ'লে ক্রাইস্ট-এর ভাব বুঝা যায় না। পরমহংসদেবের এই গভীর ভাব হয়তো ক্রাইস্ট যা ব'লেছিলেন তাই,— Be perfect as your Father in heaven is perfect.

ডাক্তার—আচ্ছা, তাঁর অসুখের তদারক তোমরা কিরূপ কর?

মাষ্টার—আপাততঃ, প্রত্যহ একজন সুপার্‌ইন্‌টেন্ড করেন, যাঁহাদের বয়স বেশী। কোনদিন গিরিশবাবু, কোনদিন রামবাবু, কোনদিন বলরামবাবু, কোনদিন সুরেশবাবু, কোনদিন নবগোপাল, কোনদিন কালীবাবু, এই রকম।

তৃতীয় পরিচ্ছেদ

ভক্তসঙ্গে—শুধু পাণ্ডিত্যে কি আছে?

এই সকল কথা হইতে হইতে শ্রীশ্রীঠাকুর পরমহংসদেব শ্যামপুকুরে যে বাড়িতে চিকিৎসার্থ অবস্থান করিতেছেন, সেই বাড়ির সম্মুখে ডাক্তারের গাড়ী আসিয়া লাগিল। তখন বেলা ১টা। ঠাকুর দোতলার ঘরে বসিয়া আছেন। অনেকগুলি ভক্ত সম্মুখে উপবিষ্ট; তন্মধ্যে শ্রীযুক্ত গিরিশ ঘোষ, ছোট নরেন্দ্র, শরৎ ইত্যাদি। সকলের দৃষ্টি সেই মহাযোগী সদানন্দ মহাপুরুষের দিকে। সকলে যেন মন্ত্রমুগ্ধ সর্পের ন্যায় রোজার সম্মুখে বসিয়া আছেন। অথবা বরকে লইয়া বরযাত্রীরা যেন আনন্দ করিতেছেন। ডাক্তার ও মাষ্টার আসিয়া প্রণাম করিয়া আসন গ্রহণ করিলেন।

ডাক্তারকে দেখিয়া হাসিতে হাসিতে শ্রীরামকৃষ্ণ বলিতেছেন, "আজ বেশ ভাল আছি।"

ক্রমে ভক্তসঙ্গে ঈশ্বর সম্বন্ধীয় অনেক কথাবার্তা চলিতে লাগিল।

[পূর্বকথা—রামনারায়ণ ডাক্তার—বঙ্কিম সংবাদ]

শ্রীরামকৃষ্ণ—শুধু পণ্ডিত কি হবে, যদি বিবেক বৈরাগ্য না থাকে। ঈশ্বরের পাদপদ্ম চিন্তা ক'রলে আমার একটি অবস্থা হয়। তখন পরনের কাপড় প'ড়ে যায়, শিড়্ শিড়্ ক'রে গা থেকে মাথা পর্যন্ত কি একটা উঠে। তখন সকলকে

তৃণজ্ঞান হয়। পণ্ডিতের যদি দেখি বিবেক নাই, ঈশ্বরে ভালবাসা নাই, তাহ'লে তাকে খড়-কুটো মনে হয়।

"রামনারায়ণ ডাক্তার আমার সঙ্গে তর্ক ক'রছিল; হঠাৎ সেই অবস্থাটা হ'লো। তারপর তাঁকে বললুম, তুমি কি বল্‌ছো? তাঁকে তর্ক ক'রে কি বুঝবে! তাঁর সৃষ্টিই বা কি বুঝবে। তোমার তো ভারী তেঁতে বুদ্ধি। আমার অবস্থা দেখে সে কাঁদতে লাগলো—আর আমার পা টিপতে লাগলো।"

ডাক্তার—রামনারায়ণ ডাক্তার হিন্দু কিনা! আবার ফুল-চন্দন লয়! সত্য হিন্দু কিনা।

মাষ্টার (স্বগতঃ)—ডাক্তার বলেছিলেন, আমি শাঁক-ঘণ্টায় নাই।

শ্রীরামকৃষ্ণ (ডাক্তারের প্রতি)—বঙ্কিম তোমাদের একজন পণ্ডিত। বঙ্কিমের* সঙ্গে দেখা হ'য়েছিল—আমি জিজ্ঞাসা করলুম, মানুষের কর্ত্তব্য কি? তা বলে, 'আহার, নিদ্রা আর মৈথুন।' এই সকল কথাবার্ত্তা শুনে আমার ঘৃণা হ'লো। বললুম যে, তোমার এ কি রকম কথা! তুমি তো বড় ছ্যাঁচ্‌ড়া। যা সব রাতদিন চিন্তা করছো, কাজে ক'রছো, তাই আবার মুখ দিয়ে বেরুচ্চে। মুলো খেলেই মুলোর ঢেঁকুর উঠে। তারপর অনেক ঈশ্বরীয় কথা হ'লো। ঘরে সংকীর্ত্তন হ'লো। আমি আবার নাচ্‌লুম। তখন বলে মহাশয়! আমাদের ওখানে একবার যাবেন। আমি বললুম, সে ঈশ্বরের ইচ্ছা। তখন বলে, আমাদের সেখানেও ভক্ত আছে, দেখবেন। আমি হাসতে হাসতে বললুম, কি রকম ভক্ত আছে গো? 'গোপাল!' 'গোপাল!' যারা বলেছিল, সেই রকম ভক্ত নাকি?

ডাক্তার—'গোপাল! গোপাল!' ব্যাপারটি কি?

শ্রীরামকৃষ্ণ (সহাস্যে)—একটি স্যাকরার দোকান ছিল। বড় ভক্ত, পরম বৈষ্ণব—গলায় মালা, কপালে তিলক, হস্তে হরিনামের মালা। সকলে বিশ্বাস ক'রে ঐ দোকানেই আসে, ভাবে এরা পরম ভক্ত, কখনও ঠকাতে যাবে না। একদল খদ্দের এলে দেখতো কোনও কারিগর ব'ল্‌ছে 'কেশব!' 'কেশব!' আর একজন কারিগর খানিক পরে নাম করছে 'গোপাল!' 'গোপাল!' আবার খানিকক্ষণ পরে একজন কারিগর বল্‌ছে, 'হরি', 'হরি', তার পর কেউ বলছে 'হর; হর!' কাজে কাজেই এত ভগবানের নাম দেখে খরিদ্দারেরা সহজেই মনে কর্‌তো, এ স্যাকরা অতি উত্তম লোক।—কিন্তু ব্যাপারটা কি জান? যে বললে, 'কেশব, কেশব!' তার মনের ভাব, এ সব (খদ্দের) কে? যে বললে 'গোপাল! গোপাল!'

---

* কলিকাতা বেনেটোলা নিবাসী ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেট পরম ভক্ত শ্রীঅধরলাল সেনের বাটীতে শ্রীযুক্ত বঙ্কিমচন্দ্র চাটুয্যের সহিত শ্রীশ্রীপরমহংসদেবের দেখা হইয়াছিল। বঙ্কিমবাবু তাঁহাকে এই একবার মাত্র দর্শন করিয়াছিলেন।

তার অর্থ এই যে আমি এদের চেয়ে চেয়ে দেখলুম, এরা গরুর পাল (হাস্য)। যে বললে 'হরি হরি'—তার অর্থ এই যে, যদি গরুর পাল, তবে হরি অর্থাৎ হরণ করি। (হাস্য)। যে বললে, 'হর হর!'—তার মানে এই—তবে হরণ কর হরণ কর ; এরা তো গরুর পাল! (হাস্য)।

"সেজোবাবুর সঙ্গে আর এক জায়গায় গিয়েছিলুম ; অনেক পণ্ডিত আমার সঙ্গে বিচার কর্‌তে এসেছিল। আমি তো মুখ্যু! (সকলের হাস্য)। তারা আমার সেই অবস্থা দেখলে, আর আমার সঙ্গে কথাবার্তা হ'লে ব'ললে, মহাশয়! আগে যা পড়েছি, তোমার সঙ্গে কথা কয়ে সে সব পড়া বিদ্যা সব থু হ'য়ে গেল! এখন বুঝেছি, তাঁর কৃপা হ'লে জ্ঞানের অভাব থাকে না, মূর্খ বিদ্বান হয়, বোবার কথা ফুটে! তাই বলছি, বই পড়লেই পণ্ডিত হয় না।

[পূর্বকথা—প্রথম সমাধি—আবির্ভাব ও মূর্খের কণ্ঠে সরস্বতী]

"হাঁ, তাঁর কৃপা হ'লে জ্ঞানের কি আর অভাব থাকে? দেখ না, আমি ত মুখ্যু, কিছুই জানি না, তবে এ সব কথা বলে কে? আবার এ জ্ঞানের ভাণ্ডার অক্ষয়। ও দেশে ধান মাপে, 'রামে রাম, রামে রাম', বল্‌তে বল্‌তে। একজন মাপে, আর যাই ফুরিয়ে আসে, আর একজন্ রাশ ঠেলে দেয়। তার কর্মই ঐ, ফুরালেই রাশ ঠেলে। আমিও যা কথা কয়ে যাই, ফুরিয়ে আসে আসে হয়, মা আমার অমনি তাঁর অক্ষয় জ্ঞান-ভাণ্ডারের রাশ ঠেলে দেন!

"ছেলেবেলায় তাঁর আবির্ভাব হয়েছিল। এগারো বছরের সময় মাঠের উপর কি দেখলুম! সবাই বললে, বেহুঁশ হ'য়ে গিছিলুম, কোন সাড় ছিল না! সেই দিন থেকে আর এক রকম হ'য়ে গেলুম। নিজের ভিতর আর একজনকে দেখ্‌তে লাগলুম। যখন ঠাকুর পূজা করতে যেতুম, হাতটা অনেক সময় ঠাকুরের দিকে না গিয়ে নিজের মাথার উপর আসতো, আর ফুল মাথায় দিতুম! যে ছোকরা আমার কাছে থাকতো, সে আমার কাছে আসতো না ; বলতো, তোমার মুখে কি এক জ্যোতিঃ দেখছি, তোমার বেশী কাছে যেতে ভয় হয়!"

চতুর্থ পরিচ্ছেদ
FREE WILL OR GOD'S WILL ?
'যন্ত্রারূঢ়াণি মায়য়া'

শ্রীরামকৃষ্ণ—আমি তো মূখ্যু, আমি কিছু জানি না, তবে এ সব বলে কে? আমি বলি, মা, আমি যন্ত্র, তুমি যন্ত্রী, আমি ঘর, তুমি ঘরণী; আমি রথ, তুমি রথী; যেমন করাও তেমনি করি, যেমন বলাও তেমনি বলি, যেমন চালাও তেমনি চলি; নাহং নাহং, তুঁহু তুঁহু।' তাঁরই জয়; আমি তো কেবল যন্ত্র মাত্র! শ্রীমতী যখন সহস্রধারা কলসী ল'য়ে যাচ্ছিলেন, জল একটুকুও পড়ে নাই, সকলে তাঁর প্রশংসা করতে লাগল; এমন সতী হবে না। তখন শ্রীমতী বল্লেন, 'তোমরা আমার জয় কেন দাও; বল, কৃষ্ণের জয়, কৃষ্ণের জয়! আমি তাঁর দাসী মাত্র। ঐ অবস্থায় ভাবে বিজয়ের বুকে পা দিলুম; এ দিকে তো বিজয়কে এত ভক্তি করি, সেই বিজয়ের গায়ে পা দিলুম, তা' আর কি বল দেখি!

ডাক্তার—তারপর সাবধান হওয়া উচিত।

শ্রীরামকৃষ্ণ (হাত জোড় ক'রে)—আমি কি করবো? সেই অবস্থাটা এলে বেহুঁশ হ'য়ে যাই! কি করি, কিছুই জানতে পারি না।

ডাক্তার—সাবধান হওয়া উচিৎ, হাত জোড় করলে কি হবে?

শ্রীরামকৃষ্ণ—তখন কি আমি কিছু করতে পারি?—তবে তুমি আমার অবস্থা কি মনে কর? যদি ঢং মনে কর তা হ'লে তোমার সায়েন্স্-মায়েন্স্ সব ছাই পড়েছো।

ডাক্তার—মহাশয়, যদি ঢং মনে করি তা হ'লে কি এত আসি? এই দেখ, সব কাজ ফেলে এখানে আসি; কত রোগীর বাড়ি যেতে পারি না, এখানে এসে ছয়-সাত ঘণ্টা ধরে থাকি।

['ন যোৎস্যে'—ভগবদ্গীতা—ঈশ্বরই কর্ত্তা, অর্জ্জুন যন্ত্র]

শ্রীরামকৃষ্ণ—সেজোবাবুকে ব'লেছিলাম, তুমি মনে করো না, তুমি একটা বড় মানুষ, আমায় মানছো বলে আমি কৃতার্থ হ'য়ে গেলুম! তা তুমি মানো আর নাই মানো। তবে একটা কথা আছে—মানুষ কি ক'রবে, তিনিই মানাবেন। ঈশ্বরীয় শক্তির কাছে মানুষ খড়-কুটো!

ডাক্তার—তুমি কি মনে করেছো অমুক মাড় তোমায় মেনেছে ব'লে আমি তোমায় মান্‌বো? **তবে তোমার সম্মান করি বটে, তোমায় রিগার্ড করি, মানুষকে যেমন রিগার্ড করে—

শ্রীরামকৃষ্ণ—আমি কি মানতে বলছি গা?

গিরিশ ঘোষ—উনি কি আপনাকে মানতে বলছেন?

ডাক্তার (শ্রীরামকৃষ্ণের প্রতি)—তুমি কি বলছো—ঈশ্বরের ইচ্ছে?

শ্রীরামকৃষ্ণ—তবে আর কি বলছি! ঈশ্বরীয় শক্তির কাছে মানুষ কি করবে? অর্জুন কুরুক্ষেত্র যুদ্ধে বললেন, আমি যুদ্ধ ক'রতে পারবো না, জ্ঞাতি বধ করা আমার কর্ম নয়। শ্রীকৃষ্ণ বললেন—'অর্জুন! তোমায় যুদ্ধ কর্‌তেই হবে, তোমার স্বভাবে করাবে!' শ্রীকৃষ্ণ সব দেখিয়ে দিলেন. এই এই সব লোক মরে রয়েছে।* শিখরা ঠাকুর বাড়িতে এসেছিল; তাঁদের মতে অশ্বত্থ গাছে যে পাতা নড়্‌ছে, সেও ঈশ্বরের ইচ্ছায়—তাঁর ইচ্ছা বই একটি পাতাও নড়বার যো নাই।

[Liberty or Necessity ?—Influence of Motives]

ডাক্তার—যদি ঈশ্বরের ইচ্ছা, তবে তুমি বকো কেন? লোকেদের জ্ঞান দেবার জন্য অত কথা কও কেন?

শ্রীরামকৃষ্ণ—তিনি বলাচ্ছেন তাই বলি। 'আমি যন্ত্র—তিনি যন্ত্রী।'

ডাক্তার—যন্ত্র তো বলছো; হয় তাই বল, নয় চুপ ক'রে থাকো। সবই ঈশ্বর।

গিরিশ—মশাই, যা মনে করুন। কিন্তু তিনি করান তাই করি। A single step against the Almighty will (তাঁর ইচ্ছার প্রতিকূলে এক পা) কেউ যেতে পারে?

ডাক্তার—Free Will তিনিই দিয়েছেন তো। আমি মনে করলে ঈশ্বর চিন্তা ক'রতে পারি, আবার না করলে না ক'রতে পারি।

গিরিশ—আপনার ঈশ্বর চিন্তা বা অন্য কোন সৎকাজ ভাল লাগে ব'লে করেন। আপনি করেন না, সেই ভাল লাগাটা করায়।

ডাক্তার—কেন, আমি কর্ত্তব্য কর্ম বলে করি—

গিরিশ—সেও কর্ত্তব্য কর্ম কর্‌তে ভাল লাগে ব'লে।

ডাক্তার—মনে কর একটি ছেলে পুড়ে যাচ্ছে; তাকে বাঁচাতে যাওয়া কর্ত্তব্য বোধে—

গিরিশ—ছেলেটিকে বাঁচাতে আনন্দ হয়, তাই আগুনের ভিতর যান; আনন্দ আপনাকে নিয়ে যায়। চাটের লোভে গুলি খাওয়া! (সকলের হাস্য)।

[জ্ঞানং জ্ঞেয়ং পরিজ্ঞাতা ত্রিবিধা কর্মচোদনা]

শ্রীরামকৃষ্ণ—কর্ম কর্‌তে গেলে আগে একটি বিশ্বাস চাই, সেই সঙ্গে জিনিসটি মনে ক'রে আনন্দ হয়, তবে সে ব্যক্তি কাজে প্রবৃত্ত হয়। মাটির নীচে এক ঘড়া মোহর আছে—এই জ্ঞান, এই বিশ্বাস, প্রথমে চাই। ঘড়া মনে ক'রে সেই সঙ্গে আনন্দ হয়—তারপর খোঁড়ে। খুঁড়তে খুঁড়তে ঠং শব্দ হ'লে আনন্দ বাড়ে। তারপর ঘড়ার কানা দেখা যায়। তখন আনন্দ আরও বাড়ে। এই

* ময়ৈবৈতে নিহতাঃ পূর্ব্বমেব—নিমিত্তমাত্রম্ ভব সব্যসাচিন্।

রকম ক্রমে ক্রমে আনন্দ বাড়্‌তে থাকে। আমি নিজে ঠাকুরবাড়ির বারান্দায় দাঁড়িয়ে দেখেছি,—সাধু গাঁজা তয়ের ক'র্‌ছে আর সাজ্‌তে সাজ্‌তে আনন্দ।

ডাক্তার—কিন্তু আগুন 'হীট'ও (উত্তাপ) দেয়, আর 'লাইট'ও (আলো) দেয়। আলোতে দেখা যায় বটে; কিন্তু উত্তাপে গা পুড়ে যায়। ডিউটি (কর্ত্তব্য কর্ম) ক'র্‌তে গেলে কেবল আনন্দ হয় তা নয়, কষ্টও আছে!

মাষ্টার (গিরিশের প্রতি)—পেটে খেলে পিঠে সয়। কষ্টতেও আনন্দ।

গিরিশ (ডাক্তারের প্রতি)—ডিউটি শুষ্ক।

ডাক্তার—কেন?

গিরিশ—তবে সরস। (সকলের হাস্য)।

মাষ্টার—বেশ, এইবার লোভে গুলি খাওয়া এসে পড়্‌লো।

গিরিশ (ডাক্তারের প্রতি)—সরস; নচেৎ ডিউটি কেন করেন?

ডাক্তার—এইরূপ মনের ইন্‌ক্লিনেসন্‌ (মনের ঐ দিকে গতি)।

মাষ্টার (গিরিশের প্রতি)—'পোড়া স্বভাবে টানে!' (হাস্য)। যদি এক দিকে ঝোঁকই (ইনক্লিনেসন) হ'লো Free Will কোথায়?

ডাক্তার—আমি Free (স্বাধীন) একেবারে বলছি না। গরু খুঁটিতে বাঁধা আছে, দড়ি যতদূর যায়, তার ভিতর ফ্রি। দড়ি টান পড়লে আবার—

[শ্রীরামকৃষ্ণ ও *Free Will*]

শ্রীরামকৃষ্ণ—এই উপমা যদু মল্লিকও বলেছিল। (ছোট নরেন্দ্রের প্রতি) একি ইংরাজীতে আছে?

(ডাক্তারের প্রতি)—"দেখ, ঈশ্বর সব ক'র্‌ছেন, তিনি যন্ত্রী আমি যন্ত্র। এ বিশ্বাস যদি কারু হয়, সে তো জীবন্মুক্ত—'তোমার কর্ম তুমি কর, লোকে বলে করি আমি।' কি রকম জানো? বেদান্তের একটি উপমা আছে—একটা হাঁড়িতে ভাত চড়িয়েছো, আলু বেগুন সব ভাতে দিয়েছ; খানিক পরে আলু বেগুন, চাল লাফাতে থাকে, যেন অভিমান করছে 'আমি নড়ছি', 'আমি লাফাচ্ছি।' ছোট ছেলেরা দেখলে ভাবে, আলু, পটল, বেগুন ওরা বুঝি জীয়ন্ত, তাই লাফাচ্ছে। যাদের জ্ঞান হ'য়েছে তারা কিন্তু বুঝিয়ে দেয় যে, এই সব আলু বেগুন, পটল এরা জীয়ন্ত নয়, নিজে লাফাচ্ছে না। হাঁড়ির নীচে আগুন জ্বলছে, তাই ওরা লাফাচ্ছে। যদি কাঠ টেনে লওয়া যায়, তা হ'লে আর নড়ে না। জীবের 'আমি কর্ত্তা' এই অভিমান অজ্ঞান থেকে হয়। ঈশ্বরের শক্তিতে সব শক্তিমান। জলন্ত কাঠ টেনে নিলে সব চুপ।—পুতুলনাচের পুতুল বাজীকরের হাতে বেশ নাচে, হাত থেকে প'ড়ে গেলে আর নড়ে না চড়ে না!

"যতক্ষণ না ঈশ্বর দর্শন হয়, যতক্ষণ সেই পরশমণি ছোঁয়া না হয়, ততক্ষণ আমি কর্ত্তা এই ভুল থাক্‌বে; আমি সৎ কাজ করেছি, অসৎ কাজ করেছি, এই সব ভেদ বোধ থাকবেই থাক্‌বে। এ ভেদ বোধ তাঁরই মায়া—তাঁর মায়ার সংসার

চালাবার জন্য বন্দোবস্ত। বিদ্যামায়া আশ্রয় কর্‌লে, সৎপথ ধ'রলে তাঁকে লাভ করা যায়। যে লাভ করে, যে ঈশ্বরকে দর্শন করে, সেই মায়া পার হ'য়ে যেতে পারে। তিনিই একমাত্র কর্ত্তা আর আমি অকর্ত্তা, এ বিশ্বাস যার, সেই জীবন্মুক্ত, এ কথা কেশব সেনকে বলেছিলাম।"

গিরিশ—Free Will কেমন করে আপনি জানলেন?

ডাক্তার—Reason (বিচার)-এর দ্বারা নয়—I feel it!

গিরিশ—Then I and others feel it to be the reverse. (আমরা সকলে ঠিক উল্টো বোধ করি, যে আমরা পরতন্ত্র)। (সকলের হাস্য)।

ডাক্তার—ডিউটির ভিতর দুটো এলিমেন্ট্—(১) ডিউটি ব'লে কর্ত্তব্য কর্ম করতে যাই, (২) পরে আহ্লাদ হয়। কিন্তু initial stage-এ (গোড়াতে) আনন্দ হবে বলে যাই না। ছেলেবেলায় দেখতুম পুরুত সন্দেশে পিঁপ্‌ড়ে হ'লে বড় ভাবিত হ'তো। পুরুতের প্রথমেই সন্দেশ চিন্তা ক'রে আনন্দ হয় না। (হাস্য)। প্রথমে বড় ভাবনা।

মাষ্টার (স্বগত)—পরে আনন্দ, কি সঙ্গে সঙ্গে মনে ক'রে আনন্দ হয়, বলা কঠিন। আনন্দের জোরে কার্য হ'লে, Free Will কোথায়?

পঞ্চম পরিচ্ছেদ

অহৈতুকী ভক্তি—পূর্বকথা শ্রীরামকৃষ্ণের দাসভাব

শ্রীরামকৃষ্ণ—ইনি (ডাক্তার) যা ব'লেছেন, তার নাম অহৈতুকী ভক্তি। মহেন্দ্র সরকারের কাছে আমি কিছু চাই না—কোন প্রয়োজন নাই, মহেন্দ্র সরকারকে দেখতে ভাল লাগে, এরই নাম অহৈতুকী ভক্তি। একটু আনন্দ হয় তা কি করবো?

"অহল্যা বলেছিল, হে রাম! যদি শূকরযোনিতে জন্ম হয় তাতেও আমার আপত্তি নাই, কিন্তু যেন তোমার পাদপদ্মে শুদ্ধাভক্তি থাকে—আমি আর কিছু চাই না।

"রাবণ বধের কথা স্মরণ করাবার জন্য নারদ অযোধ্যায় রামচন্দ্রের সঙ্গে দেখা ক'রতে গিয়েছিলেন। তিনি সীতারাম দর্শন করে স্তব ক'রতে লাগলেন। রামচন্দ্র স্তবে সন্তুষ্ট হ'য়ে বললেন, 'নারদ! আমি তোমার স্তবে সন্তুষ্ট হয়েছি, তুমি কিছু বর লও।' নারদ বল্‌লেন, 'রাম! যদি একান্ত আমায় বর দেবে, তো এই বর দাও যেন তোমার পাদপদ্মে আমার শুদ্ধাভক্তি থাকে, আর এই ক'রো যেন তোমার ভুবনমোহিনী মায়ায় মুগ্ধ না হই!' রাম বললেন, 'আরও কিছু বর লও।' নারদ বল্‌লেন, 'আর কিছুই আমি চাই না, কেবল চাই তোমার পাদপদ্মে শুদ্ধাভক্তি।'

"এ'র তাই। যেমন ঈশ্বরকে শুধু দেখতে চায়, আর কিছু ধন মান দেহসুখ—কিছুই চায় না। এরই নাম শুদ্ধাভক্তি।

"আনন্দ একটু হয় বটে, কিন্তু বিষয়ের আনন্দ নয়। ভক্তির, প্রেমের আনন্দ। শম্ভু (মল্লিক) বলেছিল—যখন আমি তার বাড়িতে প্রায় যেতুম—'তুমি এখানে এস; অবশ্য আমার সঙ্গে আলাপ করে আনন্দ পাও তাই এস'—এইটুকু আনন্দ আছে।

"তবে ওর উপর আর একটি অবস্থা আছে। বালকের মত যাচ্ছে—কোনও ঠিক নাই; হয় তো একটা ফড়িং ধর্ছে।

(ভক্তদের প্রতি)—"এঁর (ডাক্তারের) মনের ভাব কি বুঝেছ? ঈশ্বরকে প্রার্থনা করা হয়, হে ঈশ্বর, আমায় সৎ ইচ্ছা দাও যেন অসৎ কাজে মতি না হয়।

"আমারও ঐ অবস্থা ছিল। একে দাস্য বলে। আমি 'মা, মা' বলে এমন কাঁদতুম, লোক দাঁড়িয়ে যেতো। আমার এই অবস্থার পর আমাকে বীড়বার জন্য আর আমার পাগলামি সারাবার জন্য, তারা একজন রাঁড় এনে ঘরে বসিয়ে দিয়ে গেল—সুন্দর, চোখ ভাল। আমি মা! মা! বলে ঘর থেকে বেরিয়ে এলুম, আর হলধারীকে ডেকে দিয়ে বললুম, 'দাদা দেখবে এসো ঘরে কে এসেছে।' হলধারীকে, আর সব লোককে ব'লে দিলুম। এই অবস্থায় 'মা, মা' বলে কাঁদতুম, কেঁদে কেঁদে বলতুম, 'মা! রক্ষা কর। মা! আমায় নিখাদ কর, যেন সৎ থেকে অসতে মন না যায়।' (ডাক্তারের প্রতি) তোমার এ ভাব তো বেশ—ঠিক ভক্তি ভাব, দাস ভাব।

[জগতের উপকার ও সামান্য জীব—নিষ্কামকর্ম ও শুদ্ধসত্ত্ব]

"যদি কারো শুদ্ধসত্ত্ব (গুণ) আসে, সে কেবল ঈশ্বর চিন্তা করে, তার আর কিছুই ভাল লাগে না। কেউ কেউ প্রারব্ধের গুণে জন্ম থেকে শুদ্ধ সত্ত্বগুণ পায়। কামনাশূন্য হ'য়ে কর্ম ক'রতে চেষ্টা করলে, শেষে শুদ্ধসত্ত্ব লাভ হয়। রজোমিশান সত্ত্বগুণ থাক্‌লে ক্রমে নানা দিকে মন হয়, তখন জগতের উপকার ক'রবো এই সব অভিমান এসে জোটে। জগতের উপকার এই সামান্য জীবের পক্ষে ক'রতে যাওয়া বড় কঠিন। তবে যদি কেউ পরোপকারের জন্য কামনাশূন্য হ'য়ে কর্ম করে, তাতে দোষ নাই; একে নিষ্কাম কর্ম বলে। এরূপ কর্ম ক'রতে চেষ্টা করা খুব ভাল। কিন্তু সকলে পারে না। বড় কঠিন। সকলেরই কর্ম ক'রতে হবে; দু-একটি লোক কর্ম ত্যাগ ক'রতে পারে। দু-একজন লোকের শুদ্ধসত্ত্ব দেখতে পাওয়া যায়। এই নিষ্কাম কর্ম ক'র্‌তে ক'র্‌তে রজোমিশান সত্ত্বগুণ ক্রমে শুদ্ধসত্ত্ব হ'য়ে দাঁড়ায়।

"শুদ্ধসত্ত্ব হ'লেই ঈশ্বরলাভ তাঁর কৃপায় হয়।

"সাধারণ লোকে এই শুদ্ধসত্ত্বের অবস্থা বুঝতে পারে না; হেম আমায় ব'লেছিল, কেমন ভট্টাচার্য মহাশয়! জগতে মান লাভ করা মানুষ জীবনের উদ্দেশ্য, কেমন?

অষ্টাদশ খণ্ড

শ্রীরামকৃষ্ণ, নরেন্দ্র, ডাক্তার সরকার, গিরিশ ঘোষ প্রভৃতি ভক্তসঙ্গে কথোপকথন ও আনন্দ

প্রথম পরিচ্ছেদ

ভজনানন্দে—সমাধি মন্দিরে

পরদিন ২৭শে অক্টোবর, ১৮৮৫ মঙ্গলবার, বেলা সাড়ে পাঁচটা। আজ নরেন্দ্র, ডাক্তার সরকার, শ্যাম বসু, গিরিশ, ডাক্তার দোকড়ি, ছোট নরেন্দ্র রাখাল, মাষ্টার ইত্যাদি অনেকে উপস্থিত। ডাক্তার আসিয়া হাত দেখিলেন ও ঔষধের ব্যবস্থা করিলেন।

পীড়া সম্বন্ধীয় কথার পর ও শ্রীরামকৃষ্ণের ঔষধ সেবনের পর ডাক্তার বলিলেন, 'তবে শ্যামবাবুর সঙ্গে তুমি কথা কও, আমি আসি।'

শ্রীরামকৃষ্ণ ও একজন ভক্ত বলিয়া উঠিলেন, 'গান শুনবেন?'

ডাক্তার—তুমি যে তিড়িং মিড়িং করে ওঠো। ভাব চেপে রাখতে হবে।

ডাক্তার আবার বসিলেন। তখন নরেন্দ্র মধুরকণ্ঠে গান করিতেছেন। তৎসঙ্গে তানপুরা ও মৃদঙ্গ ঘন ঘন বাজিতেছে। গাহিতেছেন—

(১) চমৎকার অপার জগৎ রচনা তোমার,
শোভার আগার বিশ্ব সংসার।
অযুত তারকা চমকে রতন-কাঞ্চন-হার
কত চন্দ্র কত সূর্য নাহি অন্ত তার।
শোভে বসুন্ধরা ধনধান্যময়, হায়, পূর্ণ তোমার ভান্ডার
হে মহেশ, অগণনলোক গায় ধন্য ধন্য এ গীতি অনিবার।

(২) নিবিড় আঁধারে মা তোর চমকে অরূপরাশি।
তাই যোগী ধ্যান ধরে হ'য়ে গিরি-গুহাবাসী।
অনন্ত আঁধার কোলে, মহানির্বাণহিল্লোলে,
চিরশান্তি পরিমল, অবিরল যায় ভাসি।
মহাকাল রূপ ধরি, আঁধার বসন পরি,
সমাধি মন্দিরে ও মা কে তুমি গো একা বসি;
অভয়-পদ-কমলে, প্রেমের বিজলী জ্বলে
চিন্ময় মুখমন্ডলে শোভে অট্ট অট্ট হাসি।

ডাক্তার মাষ্টারকে বলিলেন, "It is dangerous to him!"
এ গান ঠাকুরের পক্ষে ভাল নয়, ভাব হইলে অনর্থ ঘটিতে পারে)।

শ্রীরামকৃষ্ণ মাষ্টারকে জিজ্ঞাসা করিলেন, কি বলছে? তিনি উত্তর করিলেন, ডাক্তার ভয় ক'রছেন, পাছে আপনার ভাব সমাধি হয়। বলিতে বলিতে শ্রীরামকৃষ্ণ একটু ভাবস্থ হইয়াছেন; ডাক্তারের মুখপানে তাকাইয়া করজোড়ে বলিতেছেন, "না, না, কেন ভাব হবে?" কিন্তু এ কথা বলিতে বলিতে তিনি গভীর ভাব সমাধিতে মগ্ন হইলেন। শরীর স্পন্দহীন, নয়ন স্থির! অবাক! কাষ্ঠপুত্তলিকার ন্যায় উপবিষ্ট! বাহ্যশূন্য! মন বুদ্ধি অহংকার চিত্ত সমস্তই অন্তর্মুখ। আর সে মানুষ নয়। নরেন্দ্রের মধুরকণ্ঠে মধুর গান চলিতেছে—

এ কি এ সুন্দর শোভা, কি মুখ হেরি এ!
আজি মোর ঘরে আইল হৃদয়নাথ, প্রেম উৎস উথলিল আজি—
বল হে প্রেমময় হৃদয়ের স্বামী, কি ধন তোমারে দিব উপহার?
হৃদয় প্রাণ লহ লহ তুমি, কি বলিব;
যাহা কিছু আছে মম, সকলি লও হে নাথ।

গান—কি সুখ জীবনে মম ওহে নাথ দয়াময় হে
যদি চরণ-সরোজে পরাণ মধুপ চিরমগন না রয় হে।
অগণন ধনরাশি তায় কিবা ফলোদয় হে
যদি লভিয়ে সে ধনে, পরম রতনে যতন না করয় হে।
সুকুমার কুমার মুখ দেখিতে না চাই হে
যদি সে চাঁদবয়ানে তব প্রেমমুখ দেখিতে না পাই হে।
কি ছার শশাঙ্কজ্যোতিঃ, দেখি আঁধারময় হে;
যদি সে চাঁদ প্রকাশে তব প্রেম চাঁদ নাহি হয় উদয় হে।
সতীর পবিত্র প্রেম তাও মলিনতাময় হে,
যদি সে প্রেমকনকে, তব প্রেমমণি নাহি জড়িত রয় হে।
তীক্ষ্ন বিষা ব্যালী সম সতত দংশয় হে,
যদি মোহ পরমাদে নাথ তোমাতে ঘটায় সংশয় হে।
কি আর বলিব নাথ, বলিব তোমায় হে;
তুমি আমার হৃদয়রতন মণি, আনন্দনিলয় হে।

"সতীর পবিত্র প্রেম" গানের এই অংশ শুনিতে শুনিতে ডাক্তার অশ্রুপূর্ণলোচনে বলিয়া উঠিলেন, আহা! আহা।

নরেন্দ্র আবার গাহিলেন—

কতদিনে হবে সে প্রেম সঞ্চার।
হয়ে পূর্ণকাম বোল্‌বো হরিনাম, নয়নে বহিবে প্রেম অশ্রুধার॥
কবে হবে আমার শুদ্ধ প্রাণমন, কবে যাব আমি প্রেমের বৃন্দাবন,
সংসার বন্ধন হইবে মোচন, জ্ঞানাঞ্জনে যাবে লোচন আঁধার॥

করে পরশমণি করি পরশন লোহময় দেহ হইবে কাঞ্চন
হরিময় বিশ্ব করিব দর্শন, লুটাইব ভক্তিপথে অনিবার॥
(হায়) কবে যাবে আমার ধরম করম, কবে যাবে জাতি কুলের ভরম,
কবে যাবে ভয় ভাবনা সরম, পরিহরি অভিমান লোকাচার॥
মাখি সর্ব অঙ্গে ভক্তপদধূলি, কাঁধে লয়ে চির বৈরাগ্যের ঝুলি,
পিব প্রেমবারি দুই হাতে তুলি, অঞ্জলি অঞ্জলি প্রেমযমুনার॥
প্রেমে পাগল হ'য়ে হাসিব কাঁদিব সচ্চিদানন্দ সাগরে ভাসিব,
আপনি মাতিয়ে সকলে মাতাব, হরিপদে নিত্য করিব বিহার।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

জ্ঞান ও বিজ্ঞান বিচারে—ব্রহ্মদর্শন

ইতিমধ্যে ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ বাহ্যসংজ্ঞা লাভ করিয়াছেন। গান সমাপ্ত হইল। তখন পণ্ডিত ও মূর্খের—বালক ও বৃদ্ধের—পুরুষ ও স্ত্রীর—আপামর সাধারণের—সেই মনোমুগ্ধকরী কথা হইতে লাগিল। সভাসুদ্ধ লোক নিস্তব্ধ। সকলেই সেই মুখপানে চাহিয়া রহিয়াছেন। এখন সেই কঠিন পীড়া কোথায়? মুখ এখনও যেন প্রফুল্ল অরবিন্দ,—যেন ঐশ্বরিক জ্যোতিঃ বহির্গত হইতেছে। তখন তিনি ডাক্তারকে সম্বোধন করিয়া বলিতেছেন, "লজ্জা ত্যাগ কর, ঈশ্বরের নাম করবে, তাতে আবার লজ্জা কি? লজ্জা, ঘৃণা, ভয়—তিন থাকতে নয়। 'আমি' এত বড় লোক, আমি 'হরি হরি' ব'লে নাচব? বড় বড় লোক এ কথা শুনলে আমায় কি ব'লবে? যদি বলে, ওহে ডাক্তারটা 'হরি হরি বলে নেচেছে। লজ্জার কথা!' এ ভাব ত্যাগ কর।"

ডাক্তার—আমার ওদিক দিয়েই যাওয়া নাই; লোকে কি বলবে, আমি তার তোয়াক্কা রাখি না।

শ্রীরামকৃষ্ণ—তোমার উটি খুব আছে। (সকলের হাস্য)।

"দেখ, জ্ঞান-অজ্ঞানের পার হও, তবে তাঁকে জানতে পারা যায়। নানা জ্ঞানের নাম অজ্ঞান। পাণ্ডিত্যের অহঙ্কারও অজ্ঞান। এক ঈশ্বর সর্বভূতে আছেন, এই নিশ্চয় বুদ্ধির নাম জ্ঞান। তাঁকে বিশেষরূপে জানার নাম বিজ্ঞান। যেমন পায়ে কাঁটা বিঁধেছে, সে কাঁটাটা তোলবার জন্য আর একটি কাঁটার প্রয়োজন। কাঁটাটা তোলবার পর দুটি কাঁটাই ফেলে দেয়। প্রথমে অজ্ঞান কাঁটা দূর করবার জন্য জ্ঞান কাঁটাটি আনতে হয়। তারপর জ্ঞান-অজ্ঞান দুইটিই ফেলে দিতে হয়। তিনি যে জ্ঞান-অজ্ঞানের পার। লক্ষ্মণ বলেছিলেন, 'রাম! এ কি আশ্চর্য! এত বড় জ্ঞানী স্বয়ং বশিষ্ঠদেব পুত্রশোকে অধীর হ'য়ে কেঁদেছিলেন! রাম বললেন, 'ভাই, যার জ্ঞান আছে, তার অজ্ঞানও আছে, যার এক জ্ঞান আছে, তার অনেক জ্ঞানও আছে। যার আলো বোধ আছে,

তার অন্ধকার বোধও আছে। ব্রহ্ম—জ্ঞান-অজ্ঞানের পার, পাপ-পুণ্যের পার, ধর্মাধর্মের পার, শুচি-অশুচির পার।"

এই বলিয়া শ্রীরামকৃষ্ণ রামপ্রসাদের গান আবৃত্তি করিয়া বলিতেছেন—

আয় মন বেড়াতে যাবি।
কালীকল্পতরুমূলে রে চারিফল কুড়ায়ে পাবি॥ [পৃষ্ঠা ৪৬

[অবাঙ্‌মনসোগোচরম্‌—ব্রহ্মের স্বরূপ বুঝান যায় না]

শ্যাম বসু—দুই কাঁটা ফেলে দেওয়ার পর কি থাক্‌বে?

শ্রীরামকৃষ্ণ—নিত্যশুদ্ধবোধরূপম্‌। তা তোমায় কেমন ক'রে বুঝাবো? যদি কেউ জিজ্ঞাসা করে, 'ঘি কেমন খেলে?' তাকে এখন কি ক'রে বুঝাবে? হদ্দ বল্‌তে পার, 'কেমন ঘি না যেমন ঘি।' একটি মেয়েকে তার একটি সঙ্গী জিজ্ঞাসা ক'রেছিল, তোর স্বামী এসেছে, আচ্ছা ভাই. স্বামী এলে কিরূপ আনন্দ হয়? মেয়েটি বললে, 'ভাই, তোর স্বামী হ'লে তুই জানবি; এখন তোরে কেমন ক'রে বুঝাব।' পুরাণে আছে ভগবতী যখন হিমালয়ের ঘরে জন্মালেন, তখন তাঁকে মা নানারূপে দর্শন দিলেন। গিরিরাজ সব রূপ দর্শন ক'রে শেষে ভগবতীকে বললেন, মা বেদে যে ব্রহ্মের কথা আছে, এইবার আমার যেন ব্রহ্মদর্শন হয়। তখন ভগবতী বল্‌লেন, বাবা ব্রহ্মদর্শন যদি ক'রতে চাও, তবে সাধুসঙ্গ কর।

"ব্রহ্ম কি জিনিস—মুখে বলা যায় না। একজন বলেছিল,—সব উচ্ছিষ্ট হয়েছে, কেবল ব্রহ্ম উচ্ছিষ্ট হন নাই। এর মানে এই যে, বেদ, পুরাণ, তন্ত্র, আর সব শাস্ত্র, মুখে উচ্চারণ হওয়াতে উচ্ছিষ্ট হয়েছে বলা যেতে পারে; কিন্তু ব্রহ্ম কি বস্তু, কেউ এ পর্যন্ত মুখে ব'লতে পারে নাই। তাই ব্রহ্ম এ পর্যন্ত উচ্ছিষ্ট হন নাই! আর সচ্চিদানন্দের সঙ্গে ক্রীড়া, রমণ—যে কি আনন্দের তা মুখে বলা যায় না। যার হয়েছে সে জানে।"

তৃতীয় পরিচ্ছেদ

পণ্ডিতের অহঙ্কার—পাপ ও পুণ্য

ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ আবার ডাক্তারকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন, "দেখ, অহঙ্কার না গেলে জ্ঞান হয় না। 'মুক্ত হ'ব কবে, 'আমি' যাবে যবে।' 'আমি' ও 'আমার' এই দুইটি অজ্ঞান। 'তুমি' ও 'তোমার' এই দুইটি জ্ঞান। যে ঠিক ভক্ত, সে বলে—হে ঈশ্বর! তুমিই কর্ত্তা, তুমিই সব ক'রছো, আমি কেবল যন্ত্র, আমাকে যেমন করাও তেমনি করি। আর এ সব তোমার ধন, তোমার ঐশ্বর্য. তোমার জগৎ। তোমারই গৃহ পরিজন, আমার কিছু নয়। আমি দাস। তোমার যেমন হুকুম, সেইরূপ সেবা করবার আমার অধিকার।

"যারা একটু বই-টই পড়েছে, অমনি তাদের অহঙ্কার এসে জোটে। ক—

ঠাকুরের সঙ্গে ঈশ্বরীয় কথা হয়েছিল। সে বলে, 'ও-সব আমি জানি।' আমি বললুম, যে দিল্লী গিছিলো, সে কি বলে বেড়ায় আমি দিল্লী গেছি, আর জাঁক করে? যে বাবু, সে কি বলে আমি বাবু!"

শ্যাম বসু—তিনি (ক—ঠাকুর) আপনাকে খুব মানেন।

শ্রীরামকৃষ্ণ—ওগো বলবো কি! দক্ষিণেশ্বরে কালীবাড়িতে একটি মেথরাণীর যে অহঙ্কার! তার গায়ে ২/১ খানা গহনা ছিল। সে যে পথ দিয়ে আসছিল, সেই পথে দু-একজন লোক তার পাশ দিয়ে চলে যাচ্ছিল। মেথরাণী তাদের ব'লে উঠলো, 'এই! সরে যা।' তা অন্য লোকের অহঙ্কারের কথা আর কি বলবো?

শ্যাম বসু—মহাশয়! পাপের শাস্তি আছে অথচ ঈশ্বর সব ক'রছেন, এ কি রকম কথা?

শ্রীরামকৃষ্ণ—কি, তোমার সোনার বেনে বুদ্ধি!

নরেন্দ্র—সোনার বেনে বুদ্ধি অর্থাৎ calculating বুদ্ধি!

শ্রীরামকৃষ্ণ—ওরে পোদো, তুই আম খেয়ে নে! বাগানে কত শত গাছ আছে, কত হাজার ডাল আছে, কত কোটি পাতা আছে, এ সব হিসাবে তোর কাজ কি? তুই আম খেতে এসেছিস, আম খেয়ে যা। (শ্যাম বসুর প্রতি) তুমি এ সংসারে ঈশ্বর সাধন জন্য মানব জন্ম পেয়েছ। ঈশ্বরের পাদপদ্মে কিরূপে ভক্তি হয়, তাই চেষ্টা কর। তোমার এত শত কাজ কি? ফিলজফী লয়ে বিচার ক'রে তোমার কি হবে? দেখ, আধপো মদে তুমি মাতাল হ'তে পার। শুঁড়ীর দোকানে কত মণ মদ আছে, এ হিসাবে তোমার কি দরকার?

ডাক্তার—আর ঈশ্বরের মদ Infinite! সে মদের শেষ নাই।

শ্রীরামকৃষ্ণ (শ্যাম বসুর প্রতি)—আর ঈশ্বরকে আমমোক্তারী দাও না। তাঁর উপর সব ভার দাও। সৎ লোককে যদি কেউ ভার দেয়, তিনি কি অন্যায় করেন? পাপের শাস্তি দিবেন, কি, না দিবেন, সে তিনি বুঝবেন।

ডাক্তার—তাঁর মনে কি আছে, তিনিই জানেন। মানুষ হিসাব ক'রে কি বলবে? তিনি হিসাবের পার!

শ্রীরামকৃষ্ণ (শ্যাম বসুর প্রতি)—তোমাদের ঐ এক। কলকাতার লোক-গুলো বলে, 'ঈশ্বরের বৈষম্যদোষ।' কেন না, তিনি একজনকে সুখে রেখেছেন, একজনকে দুঃখে রেখেছেন। শালাদের নিজের ভিতরও যেমন, ঈশ্বরের ভিতরও তেমনি দেখে।

['লোকমান্য' কি জীবনের উদ্দেশ্য?]

"হেম দক্ষিণেশ্বরে যেতো। দেখা হ'লেই আমায় বলতো, 'কেমন ভট্টাচার্য মশাই! জগতে এক বস্তু আছে;—মান? ঈশ্বর লাভ যে মানুষ জীবনের উদ্দেশ্য, তা কম লোকই বলে।"

চতুর্থ পরিচ্ছেদ

স্থূল, সূক্ষ্ম, কারণ ও মহাকারণ

শ্যাম বসু—সূক্ষ্মশরীর কেউ কি দেখিয়ে দিতে পারে? কেউ কি দেখাতে পারে যে, সেই শরীর বাহিরে চলে যায়?

শ্রীরামকৃষ্ণ—যারা ঠিক ভক্ত, তাদের দায় পড়েছে তোমায় দেখাতে! কোন্ শালা মান্‌বে আর না মান্‌বে, তাদের দায় কি! একটা বড়লোক হাতে থাকবে, এসব ইচ্ছা তাদের থাকে না।

শ্যাম বসু—আচ্ছা, স্থূলদেহ, সূক্ষ্মদেহ, এ সব প্রভেদ কি?

শ্রীরামকৃষ্ণ—পঞ্চভূত লয়ে যে দেহ, সেইটি স্থূলদেহ। মন, বুদ্ধি, অহংকার আর চিত্ত, এই লয়ে সূক্ষ্মশরীর। যে শরীরে ভগবানের আনন্দ লাভ হয়, আর সম্ভোগ হয়, সেইটি কারণ শরীর। তন্ত্রে বলে, 'ভাগবতী তনু।' সকলের অতীত 'মহাকরণ' (তুরীয়) মুখে বলা যায় না।

[সাধনের প্রয়োজন—ঈশ্বরে একমাত্র ভক্তিই সার]

"কেবল শুনলে কি হবে? কিছু করো।

"সিদ্ধি সিদ্ধি মুখে বললে কি হবে? তাতে কি নেশা হয়?

"সিদ্ধি বেটে গায়ে মাখলেও নেশা হয় না। কিছু খেতে হয়। কোন্‌টা একচল্লিশ নম্বরের সুতা, কোন্‌টা চল্লিশ নম্বরের—সুতোর ব্যবসা না ক'রলে এ সব কি বলা যায়? যাদের সুতার ব্যবসা আছে, তাদের পক্ষে অমুক নম্বরের সুতা দেওয়া কিছু শক্ত নয়। তাই বলি, কিছু সাধন কর। তখন স্থূল সূক্ষ্ম, কারণ মহাকারণ কা'কে বলে সব বুঝতে পারবে। যখন ঈশ্বরের কাছে প্রার্থনা ক'রবে, তাঁর পাদপদ্মে একমাত্র ভক্তি প্রার্থনা ক'রবে।

"অহল্যার শাপ মোচনের পর শ্রীরামচন্দ্র তাঁকে বললেন, তুমি আমার কাছে বর লও। অহল্যা বললেন, রাম যদি বর দিবে তবে এই বর দাও—আমার যদি শূকর যোনিতেও জন্ম হয় তাতেও ক্ষতি নাই; কিন্তু হে রাম! যেন তোমার পাদপদ্মে আমার মন থাকে।

"আমি মা'র কাছে একমাত্র ভক্তি চেয়েছিলাম। মা'র পাদপদ্মে ফুল দিয়ে হাত জোর ক'রে বলেছিলাম, 'মা, এই লও তোমার অজ্ঞান, এই লও তোমার জ্ঞান, আমায় শুদ্ধা ভক্তি দাও। এই লও তোমার শুচি, এই লও তোমার অশুচি, আমায় শুদ্ধা ভক্তি দাও। এই লও তোমার পাপ, এই লও তোমার পুণ্য, আমায় শুদ্ধাভক্তি দাও। এই লও তোমার ভাল, এই লও তোমার মন্দ, আমার শুদ্ধাভক্তি দাও। এই লও তোমার ধর্ম, এই লও তোমার অধর্ম, আমায় শুদ্ধাভক্তি দাও।'

"ধর্ম কিনা দানাদি কর্ম। ধর্ম নিলেই অধর্ম ল'তে হবে। পুণ্য নিলেই পাপ ল'তে হবে। জ্ঞান নিলেই অজ্ঞান ল'তে হবে। শুচি নিলেই অশুচি ল'তে হবে। যেমন যার আলো বোধ আছে, তার অন্ধকার বোধও আছে। যার এক বোধ আছে, তার অনেক বোধও আছে। যার ভাল বোধ আছে তার মন্দ বোধও আছে।

"যদি কারও শূকর মাংস খেয়ে ঈশ্বরের পাদপদ্মে ভক্তি থাকে, সে পুরুষ ধন্য; আর হবিষ্য খেয়ে যদি সংসারে আসক্তি থাকে—"

ডাক্তার—তবে সে অধম! এখানে একটি কথা বলি—বুদ্ধ শূকর মাংস খেয়েছিল। শূকর মাংস খাওয়া আর কলিক্ (পেটে শূলবেদনা) হওয়া! এ ব্যারামের জন্য বুদ্ধ Opium (আফিং) খেতো। নির্বাণ-টির্বাণ কি জান? আফিং খেয়ে বুঁদ হ'য়ে থাকতো, বাহ্যজ্ঞান থাকতো না;—তাই নির্বাণ!

বুদ্ধদেবের নির্বাণ সম্বন্ধে এই ব্যাখ্যা শুনিয়া সকলে হাসিতে লাগিলেন; আবার কথাবার্ত্তা চলিতে লাগিল।

পঞ্চম পরিচ্ছেদ

গৃহস্থ ও নিষ্কাম কর্ম—Theosophy

শ্রীরামকৃষ্ণ (শ্যাম বসুর প্রতি)—সংসার ধর্ম; তাতে দোষ নাই। কিন্তু ঈশ্বরের পাদপদ্মে মন রেখে, কামনাশূন্য হ'য়ে কাজকর্ম ক'রবে। এই দেখ না, যদি কার পিঠে একটা ফোঁড়া হয়, সে যেমন সকলের সঙ্গে কথাবার্ত্তা কয়, হয়তো কাজ কর্মও করে, কিন্তু যেমন ফোঁড়ার দিকে মন প'ড়ে থাকে, সেইরূপ।

"সংসারে নষ্ট মেয়ের মত থাক্‌বে। মন উপপতির দিকে, কিন্তু সে সংসারের সব কাজ করে। (ডাক্তারের প্রতি) বুঝেছ?"

ডাক্তার—ও-ভাব যদি না থাকে, বুঝব কেমন ক'রে?

শ্যাম বসু—কিছু বোঝো বই কি! (সকলের হাস্য)।

শ্রীরামকৃষ্ণ (হাসিতে হাসিতে)—আর ঐ ব্যবসা অনেক দিন ধ'রে ক'রছেন। কি বল? (সকলের হাস্য)।

শ্যাম বসু—মহাশয়, থিয়সফি কি রকম বলেন?

শ্রীরামকৃষ্ণ—মোট কথা এই, যারা শিষ্য ক'রে বেড়ায়, তারা হাল্‌কা থাকের লোক। আর যারা সিদ্ধাই অর্থাৎ নানা রকম শক্তি চায়, তারাও হাল্‌কা থাক্। যেমন গঙ্গা হেঁটে পার হয়ে যাব, এই শক্তি। অন্য দেশে একজন কি কথা বল্‌ছে তাই বল্‌তে পারা, এই এক শক্তি। ঈশ্বরে শুদ্ধা ভক্তি হওয়া এই সব লোকের ভারী কঠিন।

শ্যাম বসু—কিন্তু তারা (থিয়সফিস্ট্‌রা) হিন্দুধর্ম পুনঃ স্থাপিত করবার চেষ্টা করছে।

শ্রীরামকৃষ্ণ—আমি তাদের বিষয় ভাল জানি না।

শ্যাম বসু—মরবার পর জীবাত্মা কোথায় যায়—চন্দ্রলোকে, নক্ষত্রলোকে ইত্যাদি—এ সব থিয়সফিতে জানা যায়।

শ্রীরামকৃষ্ণ—তা হবে। আমার ভাব কি রকম জান? হনুমানকে একজন জিজ্ঞাসা করেছিল, আজ কি তিথি? হনুমান বললে, 'আমি বার, তিথি, নক্ষত্র এ সব কিছু জানি না; কেবল এক রাম চিন্তা করি। আমার ঠিক ঐ ভাব।

শ্যাম বসু—তারা বলে, মহাত্মা সব আছেন। আপনার কি বিশ্বাস?

শ্রীরামকৃষ্ণ—আমার কথা বিশ্বাস করেন তো আছে। এ সব কথা এখন থাক। আমার অসুখটা কম্‌লে তুমি আসবে। যাতে তোমার শান্তি হয়, যদি আমায় বিশ্বাস কর—উপায় হ'য়ে যাবে। দেখছো তো, আমি টাকা লই না, কাপড় লই না। এখানে প্যালা দিতে হয় না, তাই অনেকে আসে। (সকলের হাস্য)।

(ডাক্তারের প্রতি)—"তোমাকে এই বলা, রাগ কোরো না; ও সব তো অনেক করলে—টাকা, মান, লেকচার;—এখন মনটা দিন কতক ঈশ্বরেতে দাও; আর এখানে মাঝে মাঝে আসবে, ঈশ্বরের কথা শুনলে উদ্দীপন হবে!"

কিয়ৎকাল পরে ডাক্তার বিদায় লইতে গাত্রোত্থান করিলেন। এমন সময় শ্রীযুক্ত গিরিশচন্দ্র ঘোষ আসিলেন ও ঠাকুরের চরণ-ধূলি লইয়া উপবিষ্ট হইলেন। ডাক্তার তাঁহাকে দেখিয়া আনন্দিত হইলেন ও আবার আসন গ্রহণ করিলেন।

ডাক্তার—আমি থাকতে উনি (গিরিশবাবু) আসবেন না! যাই চ'লে যাব যাব হ'য়েছি অমনি এসে উপস্থিত। (সকলের হাস্য)।

গিরিশের সঙ্গে ডাক্তার বিজ্ঞানসভার (Science Association) কথা হইতে লাগিল।

শ্রীরামকৃষ্ণ—আমায় একদিন সেখানে লয়ে যাবে?

ডাক্তার—তুমি সেখানে গেলে অজ্ঞান হ'য়ে যাবে—ঈশ্বরের আশ্চর্য কাণ্ড সব দেখে।

শ্রীরামকৃষ্ণ—বটে?

ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ

গুরু পূজা

ডাক্তার (গিরিশের প্রতি)—আর সব কর—but do not worship him as God (ঈশ্বর ব'লে পূজা ক'রো না)। এমন ভাল লোকটার মাথা খাচ্ছ?

গিরিশ—কি করি মহাশয়? যিনি এ সংসার-সমুদ্র ও সন্দেহসাগর থেকে পার ক'র্‌লেন, তাঁকে আর কি কর্‌বো বলুন। তাঁর গু কি গু বোধ হয়?

ডাক্তার—গু'র জন্য হচ্ছে না। আমারও ঘৃণা নাই! একটা দোকানীর ছেলে এসেছিল, তা বাহ্যে করে ফেল্‌লে! সকলে নাকে কাপড় দিলে! আমি তার কাছে আধ ঘণ্টা বসে! নাকে কাপড় দিই নাই। আর মেথর যতক্ষণ না মাথায় করে নিয়ে যায়, ততক্ষণ আমার নাকে কাপড় দেবার যো নাই। আমি জানি সেও যা, আমিও তা, কেন তাকে ঘৃণা কর্‌ব? আমি কি এঁর পায়ের ধূলা নিতে পারি না?—এই দেখ নিচ্ছি। (শ্রীরামকৃষ্ণের পদধূলি গ্রহণ)।

গিরিশ—Angels (দেবগণ) এই মুহূর্তকে ধন্য ধন্য করছেন।

ডাক্তার—তা পায়ের ধূলা লওয়া কি আশ্চর্য! আমি যে সকলেরই নিতে পারি।—এই দাও! এই দাও! (সকলের পায়ের ধূলা গ্রহণ)।

নরেন্দ্র (ডাক্তারের প্রতি)—এঁকে আমরা ঈশ্বরের মত মনে করি। কি রকম জানেন? যেমন ভেজিটেবল্ ক্রিয়েসন্ (উদ্ভিদ) ও অ্যানিম্যাল ক্রিয়েসন্ (জীবজন্তুগণ) এদের মাঝামাঝি এমন একটি পয়েণ্ট্ (স্থান) আছে, যেখানে এটা উদ্ভিদ কি প্রাণী, স্থির করা ভারী কঠিন। সেইরূপ Man-world (নরলোক) ও God-world (দেবলোক) এই দুয়ের মধ্যে একটি স্থান আছে, যেখানে বলা কঠিন, এ ব্যক্তি মানুষ, না, ঈশ্বর।

ডাক্তার—ওহে, ঈশ্বরের কথায় উপমা চলে না।

নরেন্দ্র—আমি God (ঈশ্বর) বলছি না, God like man (ঈশ্বর তুল্য ব্যক্তি) বল্‌ছি।

ডাক্তার—ও সব নিজের নিজের ভাব চাপতে হয়। প্রকাশ করা ভাল নয়। আমার ভাব কেউ বুঝলে না। My best friends (যারা আমার পরম বন্ধু) আমায় কঠোর নির্দয় মনে করে। এই তোমরা হয়তো আমায় জুতো মেরে তাড়াবে!

শ্রীরামকৃষ্ণ (ডাক্তারের প্রতি)—সেকি!—এরা তোমায় কত ভালবাসে! তুমি আসবে বলে বাসক-সজ্জা করে জেগে থাকে।

গিরিশ— Every one has the greatest respect for you. (সকলেই আপনাকে যৎপরোনাস্তি শ্রদ্ধা করে)।

ডাক্তার—আমার ছেলে—আমার স্ত্রী পর্যন্ত—আমায় মনে করে hard-hearted (স্নেহমমতা শূন্য),—কেন না, আমার দোষ এই যে, আমি ভাব কারু কাছে প্রকাশ করি না।

গিরিশ—তবে মহাশয়! আপনার মনের কবাট খোলা তো ভাল— at least out of pity for your friends (বন্ধুদের প্রতি অন্ততঃ কৃপা করে)—এই মনে করে যে, তারা আপনাকে বুঝতে পারছে না!

ডাক্তার—বল্‌বো কি হে! তোমাদের চেয়েও আমার feelings worked-up হয় (অর্থাৎ আমার ভাব হয়)। (নরেন্দ্রের প্রতি) I shed tears in solitude—(আমি একলা একলা বসে কাঁদি)।

[মহাপুরুষ ও জীবের পাপ গ্রহণ—অবতারাদি ও নরেন্দ্র]

ডাক্তার (শ্রীরামকৃষ্ণের প্রতি)—ভাল, তুমি ভাব হ'লে লোকের গায় পা দাও, সেটা ভাল নয়।

শ্রীরামকৃষ্ণ—আমি কি জান্‌তে পারি গা, কারু গায়ে পা দিচ্ছি কি না!

ডাক্তার—ওটা ভাল নয়, একটু তো বোধ হয়?

শ্রীরামকৃষ্ণ—আমার ভাবাবস্থায় আমার কি হয় তা তোমায় কি ব'লবো? সে অবস্থার পর এমন ভাবি, বুঝি রোগ হচ্চে ঐ জন্য! ঈশ্বরের ভাবে আমার উন্মাদ হয়। উন্মাদে এরূপ হয়, কি ক'রবো?

ডাক্তার—ইনি মেনেছেন। He expresses regret for what he does; কাজটা sinful (অন্যায়) এটি বোধ আছে।

শ্রীরামকৃষ্ণ (নরেন্দ্রের প্রতি)—তুই তো খুব শঠ (বুদ্ধিমান), তুই বল না; একে বুঝিয়ে দে না।

গিরিশ (ডাক্তারের প্রতি)—মহাশয়! আপনি ভুল বুঝছেন। উনি সে জন্য দুঃখিত হন নি। এঁ'র দেহ শুদ্ধ—অপাপবিদ্ধ। ইনি জীবের মঙ্গলের জন্য তাদের স্পর্শ করেন। তাদের পাপ গ্রহণ ক'রে এঁ'র রোগ হবার খুব সম্ভাবনা, তাই কখনও কখনও ভাবেন। আপনার যখন কলিক (শূলবেদনা) হ'য়েছিল তখন আপনার কি রিগ্রেট (দুঃখ) হয় নাই, কেন রাত জেগে এত প'ড়তুম? তা বলে রাত জেগে পড়াটা কি অন্যায় কাজ? রোগের জন্য রিগ্রেট (দুঃখ-কষ্ট) হ'তে পারে। তা বলে জীবের মঙ্গল সাধনের জন্য স্পর্শ করাকে অন্যায় কাজ মনে করেন না।

ডাক্তার (অপ্রতিভ হইয়া, গিরিশের প্রতি)—তোমার কাছে হেরে গেলুম, দাও পায়ের ধুলা দাও। (গিরিশের পদধূলি গ্রহণ)। (নরেন্দ্রের প্রতি)—আর কিছু নয় হে, his intellectual power (গিরিশের বুদ্ধিমত্তা) মান্‌তে হবে।

নরেন্দ্র (ডাক্তারের প্রতি)—আর এক কথা দেখুন। একটা Scientific discovery (জড় বিজ্ঞানের সত্য বাহির) করবার জন্য আপনি life devote

(জীবন উৎসর্গ) করতে পারেন—শরীর অসুখ ইত্যাদি কিছুই মানেন না। আর ঈশ্বরকে জানা grandest of all sciences (শ্রেষ্ঠ বিজ্ঞান)-এর জন্য ইনি health risk (শরীর নষ্ট হয় হউক, এরূপ মনের ভাব) করবেন না?

ডাক্তার—যত religious reformer (ধর্মাচার্য) হয়েছেন, Jesus, চৈতন্য, বুদ্ধ, মহম্মদ শেষে সব অহঙ্কারে পরিপূর্ণ—বলে 'আমি যা বললুম, তাই ঠিক!' এ কি কথা।

গিরিশ (ডাক্তারের প্রতি)—মহাশয়, সে দোষ আপনারও হচ্ছে। আপনি একলা তাদের সকলের অহঙ্কার আছে, এ দোষ ধরাতে ঠিক সেই দোষ আপনারও হচ্ছে।

ডাক্তার নীরব হইলেন।

নরেন্দ্র (ডাক্তারের প্রতি)— We offer to him Worship bordering on Divine Worship (এঁকে আমরা পূজা করি—সে পূজা ঈশ্বরের পূজার প্রায় কাছাকাছি)—

ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ আনন্দে বালকের ন্যায় হাসিতেছেন।

পরিশিষ্ট

বরাহনগর মঠ

প্রথম পরিচ্ছেদ

আজ সোমবার ৯ই মে ১৮৮৭, জ্যৈষ্ঠ-কৃষ্ণা-দ্বিতীয়া তিথি। নরেন্দ্রাদি ভক্তেরা মঠে আছেন। শরৎ, বাবুরাম ও কালী শ্রীক্ষেত্রে গিয়াছেন। নিরঞ্জন মাকে দেখিতে গিয়াছেন। মাষ্টার আসিয়াছেন।

খাওয়া-দাওয়ার পর মঠের ভাইরা একটু বিশ্রাম করিতেছেন। বুড়গোপাল গানের খাতাতে গান নকল করিতেছেন।

বৈকাল হইল। রবীন্দ্র উন্মত্তের ন্যায় আসিয়া উপস্থিত। শুধু পা, কালাপেড়ে কাপড় আধখানা পরা। উন্মাদের চক্ষুর ন্যায় তাঁহার চক্ষের তারা ঘুরিতেছে। সকলে জিজ্ঞাসা করিলেন, "কি হ'য়েছে?" রবীন্দ্র বলিলেন, "একটু পরে সমস্ত ব'লছি। আমি আর বাড়ি ফিরিয়া যাইব না, আপনাদের এইখানেই থাক্‌বো। সে বিশ্বাসঘাতক! বলেন কি মহাশয়, পাঁচ বছরের অভ্যাস, মদ—তার জন্য ছেড়েছি! আট মাস হলো ছেড়েছি! সে কি না বিশ্বাসঘাতক!" মঠের ভাইরা সকলে বলিলেন, "তুমি ঠাণ্ডা হও। কিসে ক'রে এলে?"

রবীন্দ্র—আমি কলিকাতা থেকে বরাবর শুধু পায়ে হেঁটে এসেছি।

ভক্তেরা জিজ্ঞাসা করিলেন, "তোমার আর আধখানা কাপড় কোথা গেল?"

রবীন্দ্র বলিলেন, "সে আসবার সময় টানাটানি করলে, তাই আধখানা ছিঁড়ে গেল।"

ভক্তেরা বলিলেন, "তুমি গঙ্গাস্নান ক'রে এসো; এসে ঠাণ্ডা হও। তার পর কথাবার্তা হবে।"

রবীন্দ্র কলিকাতার একটি অতি সম্ভ্রান্ত কায়স্থবংশে জন্মগ্রহণ করিয়াছেন। বয়ঃক্রম ২০/২২ বৎসর হইবে। ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণকে দক্ষিণেশ্বর কালী-বাড়িতে দর্শন করিয়াছিলেন এবং তাঁহার বিশেষ কৃপাভাজন হইয়াছিলেন। একবার তিন রাত্রি তাঁহার কাছে বাস করিয়াছিলেন। স্বভাব অতি মধুর ও কোমল। ঠাকুর খুব স্নেহ করিয়াছিলেন, কিন্তু বলিয়াছিলেন, "তোর কিন্তু দেরী হবে, এখন তোর একটু ভোগ আছে! এখন কিছু হবে না। যখন ডাকাত পড়ে, তখন ঠিক সেই সময় পুলিশে কিছু করতে পারে না। একটু থেমে গেলে তবে পুলিশ এসে গ্রেপ্তার করে।" আজ রবীন্দ্র বারাঙ্গনার মোহে পড়িয়াছেন। কিন্তু অন্য সকল গুণ আছে। গরীবের প্রতি দয়া, ঈশ্বরচিন্তা, এ সমস্ত আছে। বেশ্যাকে বিশ্বাসঘাতক মনে করিয়া অর্ধবস্ত্রে মঠে আসিয়াছেন। সংসারে আর ফিরিবেন না, এই সঙ্কল্প।

রবীন্দ্র গঙ্গাস্নানে যাইতেছেন। পরামাণিকের ঘাটে যাইবেন। একটি ভক্ত সঙ্গে যাইতেছেন। তাঁহার বড় সাধ যে, ছেলেটির সাধুসঙ্গে চৈতন্য হয়। স্নানের পর তিনি রবীন্দ্রকে ঘাটের নিকটস্থ শ্মশানে লইয়া গেলেন। তাঁহাকে মৃতদেহ দর্শন করাইতে লাগিলেন। আর বলিলেন, "এখানে মঠের ভাইরা মাঝে মাঝে একাকী এসে রাত্রে ধ্যান করেন। এখানে আমাদের ধ্যান করা ভাল। সংসার যে অনিত্য, তা বেশ বোধ হয়।" রবীন্দ্র সেই কথা শুনিয়া ধ্যানে বসিলেন। ধ্যান বেশীক্ষণ করিতে পারিলেন না। মন অস্থির রহিয়াছে।

উভয়ে মঠে ফিরিলেন। ঠাকুরঘরে আসিয়া উভয়ে ঠাকুরকে প্রণাম করিলেন। ভক্তটি বলিলেন, এই ঘরে মঠের ভাইরা ধ্যান করেন, রবীন্দ্রও একটু ধ্যান করিতে বসিলেন, কিন্তু ধ্যান বেশীক্ষণ হইল না।

মণি—কি, মন কি বড় চঞ্চল? তাই বুঝি উঠে পড়লে? তাই বুঝি ধ্যান ভাল হ'লো না?

রবীন্দ্র—আর যে সংসারে ফিরব না, তা নিশ্চিত! তবে মনটা চঞ্চল বটে।

মণি ও রবীন্দ্র মঠের এক নিভৃত স্থানে দাঁড়াইয়া আছেন। মণি বুদ্ধদেবের গল্প করিতেছেন। দেবকন্যাদের একটি গান শুনে বুদ্ধদেবের প্রথম চৈতন্য হয়েছিল। আজকাল মঠে বুদ্ধ-চরিত ও চৈতন্যচরিতের আলোচনা সর্বদাই হয়। মণি সেই গান গাহিতেছেন—

জুড়াইতে চাই কোথায় জুড়াই,
কোথা হতে আসি কোথা ভেসে যাই।
ফিরে ফিরে আসি, কত কাঁদি হাসি,
কোথা যাই সদা ভাবি গো তাই॥

রাত্রে নরেন্দ্র, তারক ও হরিশ—কলিকাতা হইতে ফিরিলেন। আসিয়া বলিলেন, উঃ খুব খাওয়া হয়েছে! তাঁহাদের কলিকাতায় কোন ভক্তের বাড়িতে নিমন্ত্রণ হইয়াছিল।

নরেন্দ্র ও মঠের ভাইরা, মাষ্টার, রবীন্দ্র ইত্যাদি এঁরাও দানাদের ঘরে বসিয়া আছেন। নরেন্দ্র মঠে আসিয়া সমস্ত কথা শুনিয়াছেন।

[সন্তপ্ত জীব ও নরেন্দ্রের উপদেশ]

নরেন্দ্র গাহিতেছেন—গীতচ্ছলে যেন রবীন্দ্রকে উপদেশ দিতেছেন—

ছাড় মোহ, ছাড় ছাড় রে কুমন্ত্রণা, জান তাঁরে তবে যাবে যন্ত্রণা।

নরেন্দ্র আবার গাহিলেন—যেন রবীন্দ্রকে হিতবচন ব'লছেন—

পীলেরে অবধূত হো মত্‌বারা, প্যালা প্রেম হরিরস কা রে।
বাল অবস্থা খেল গঁবাই, তরুণ ভয়ে নারী বশ কা রে।
বৃদ্ধা ভয়ো কফ বায়ুনে ঘেরা, খাট পড়া রহে নাহি
যায় বস্‌কারে মস্‌কা রে।

নাভ কমলমে হ্যায় কস্তুরী ক্যায়সে ভরম মিটে পশুকা রে।
বিনা সৎগুরু নর য়্যাসাহি ঢূঁড়ে, জ্যায়সা মৃগ ফিরে বনকা রে।

কিয়ৎক্ষণ পরে মঠের ভাইরা কালীতপস্বীর ঘরে বসিয়া আছেন। গিরিশের বুদ্ধচরিত ও চৈতন্যচরিত দুইখানি নূতন পুস্তক আসিয়াছে। নরেন্দ্র, শশী, রাখাল, প্রসন্ন, মাষ্টার ইত্যাদি বসিয়া আছেন। নূতন মঠে আসা পর্যন্ত শশী একমনে দিনরাত ঠাকুরের পূজাদি সেবা করেন। তাঁহার সেবা দেখিয়া সকলে অবাক হইয়াছেন। ঠাকুরের অসুখের সময় তিনি রাতদিন যেরূপ তাঁহার সেবা করিয়াছিলেন, আজও সেইরূপ অনন্যমন, একভক্তি হইয়া সেবা করিতেছেন।

মঠের একজন ভাই বুদ্ধচরিত ও চৈতন্যচরিত পড়িতেছেন। সুর করিয়া একটু ব্যঙ্গভাবে চৈতন্যচরিতামৃত পড়িতেছেন। নরেন্দ্র বইখানি কাড়িয়া লইলেন। বলিলেন, "এই রকম ক'রে ভাল জিনিসটা মাটি করে?"

নরেন্দ্র নিজে চৈতন্যদেবের প্রেমবিতরণ কথা পড়িতেছেন।

মঠের ভাই—আমি বলি কেউ কারুকে প্রেম দিতে পারে না।

নরেন্দ্র—আমায় পরমহংস মহাশয় প্রেম দিয়েছেন।

মঠের ভাই—আচ্ছা, তুমি কি তাই পেয়েছ?

নরেন্দ্র—তুই কি বুঝবি? তুই Servant class (ঈশ্বরের সেবকের থাকে)। আমার সবাই পা টিপবে। শরতা মিত্তির আর দেসো পর্যন্ত। (সকলের হাস্য)। তুই মনে করছিস বুঝি যে সব বুঝিছিস্। (হাস্য)। লে তামাক সাজ। (সকলের হাস্য)।

মঠের ভাই—সাজ-বো-না। (সকলের হাস্য)।

মাষ্টার (স্বগত)—ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ মঠের ভাইদের অনেকের ভিতর তেজ দিয়াছেন। শুধু নরেন্দ্রের ভিতর নয়। এ তেজ না থাকলে কি কামিনী-কাঞ্চন ত্যাগ হয়?

[মঠের ভাইদের সাধনা]

পরদিন মঙ্গলবার ১০ই মে। আজ মহামায়ার বার। নরেন্দ্রাদি মঠের ভাইরা আজ বিশেষরূপে মার পূজা করিতেছেন। ঠাকুরঘরের সম্মুখে ত্রিকোণ যন্ত্র প্রস্তুত হইল, হোম হইবে। পরে বলি হইবে। তন্ত্রমতে হোম ও বলির ব্যবস্থা আছে। নরেন্দ্র গীতাপাঠ করিতেছেন।

মণি গঙ্গাস্নানে গেলেন। রবীন্দ্র ছাদের উপর একাকী বিচরণ করিতেছেন। শুনিতেছেন, নরেন্দ্র সুর করিয়া স্তব করিতেছেন।

ওঁ মনো বুদ্ধ্যহঙ্কারচিত্তানি নাহং
ন চ শ্রোত্রজিহ্বে ন চ ঘ্রাণ-নেত্রে।

ন চ ব্যোমভূমির্ন তেজো ন বায়ু
চিদানন্দরূপঃ শিবোঽহং শিবোঽহম্॥
ন চ প্রাণসংজ্ঞো ন বৈ পঞ্চবায়ু
র্ন বা সপ্তধাতুর্ন বা পঞ্চকোষাঃ।
ন বাক্ পাণিপাদং নচোপস্থপায়ু
চিদানন্দরূপঃ শিবোঽহং শিবোঽহম্॥
ন মে দ্বেষরাগৌ, ন মে লোভমোহৌ,
মদোনৈব মে নৈব মাৎসর্যভাবঃ।
ন ধর্মো ন চার্থো ন কামো ন মোক্ষ
শ্চিদানন্দরূপঃ শিবোঽহং শিবোঽহম্॥
ন পুণ্যং ন পাপং ন সৌখ্যং ন দুঃখং
ন মন্ত্রো ন তীর্থং ন বেদা ন যজ্ঞাঃ।
অহং ভোজনং নৈব ভোজ্যং ন ভোক্তা,
চিদানন্দরূপঃ শিবোঽহং শিবোঽহম্॥

এইবার রবীন্দ্র গঙ্গাস্নান করিয়া আসিয়াছেন; ভিজে কাপড়।

নরেন্দ্র (মণির প্রতি, একান্তে)—এই নেয়ে এসেছে, এবার সন্ন্যাস দিলে বেশ হয়। (মণি ও নরেন্দ্রের হাস্য)।

প্রসন্ন রবীন্দ্রকে ভিজে কাপড় ছাড়িতে বলিয়া তাঁহাকে একখানা গেরুয়া কাপড় আনিয়া দিলেন।

নরেন্দ্র (মণির প্রতি)—এইবার ত্যাগীর কাপড় পরতে হবে।

মণি (সহাস্যে)—কি ত্যাগ?

নরেন্দ্র—কামকাঞ্চন ত্যাগ।

রবীন্দ্র গেরুয়া কাপড়খানি পরিয়া কালীতপস্বীর ঘরে গিয়া নির্জনে বসিলেন। বোধ হয় একটু ধ্যান করিবেন।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

শ্রীরামকৃষ্ণ অশ্বিনীকুমার প্রভৃতি ভক্তসঙ্গে

শ্রীযুক্ত কেশব সেন (১৮৮১), দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর অচলানন্দ, শিবনাথ, হৃদয়, নরেন্দ্র, গিরিশ

প্রাণের ভাই শ্রীম, তোমার প্রেরিত শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণকথামৃত, চতুর্থ খণ্ড, কোজাগর পূর্ণিমার দিন পেয়ে আজ দ্বিতীয়ায় শেষ করেছি। ধন্য তুমি! এত অমৃত দেশময় ছড়ালে! * * যাক্, তুমি অনেকদিন হ'ল ঠাকুরের সঙ্গে আমার কি আলাপ হয়েছিল জানতে চেয়েছিলে। তাই জানাবার একটু চেষ্টা করি। কিন্তু আমি তো আর শ্রীম'র মত কপাল করে আসিনি, যে শ্রীচরণ দর্শনের দিন, তারিখ মুহূর্ত আর শ্রীমুখনিঃসৃত সব কথা একেবারে ঠিক ঠিক লিখে রাখবো। যতদূর মনে আছে লিখে যাই, হয়তো একদিনের কথা আর একদিনের বলে লিখে ফেলবো। আর কত ভুলে গেছি।

বোধ হয় ১৮৮১ সালের শারদীয় অবকাশের সময় প্রথম দর্শন। সেদিন কেশববাবুর আসিবার কথা। আমি নৌকায় দক্ষিণেশ্বর গিয়ে ঘাট থেকে উঠে একজনকে জিজ্ঞাসা করিলাম, "পরমহংস কোথায়?" তিনি উত্তর দিকের বারান্দায় তাকিয়া ঠেসান দেওয়া এক ব্যক্তিকে দেখিয়ে বললেন, "এই পরমহংস।" কালাপেড়ে ধুতি-পরা আর তাকিয়া ঠেসান দেওয়া দেখে ভাবলাম, 'এ আবার কি রকম পরমহংস?' কিন্তু দেখলাম, দুটি ঠ্যাং উঁচু ক'রে, আবার তাই দু'হাত দিয়ে বেষ্টন ক'রে আধাচিৎ হয়ে তাকিয়ায় ঠেসান দেওয়া হয়েছে। মনে হ'ল 'এ'র কখনও বাবুদের মত তাকিয়া ঠেসান দেওয়া অভ্যাস নাই, তবে বোধ হয় ইনিই পরমহংস হবেন।' তাকিয়ার অতি নিকটে তাঁহার ডান পাশে একটি বাবু ব'সে আছেন। শুনলাম তার নাম রাজেন্দ্র মিত্র, যিনি বেঙ্গল গভর্ণমেণ্টের এ্যাসিসট্যাণ্ট সেক্রেটারী হয়েছিলেন। আরও ডান দিকে কয়েকটি লোক বসে আছেন। একটু পরেই রাজেন্দ্রবাবুকে বললেন, "দেখো দিখিন্, কেশব আস্ছে কি না?" একজন একটু এগিয়ে ফিরে এসে বললেন,—"না।" আবার একটু শব্দ হ'তে বললেন—"দেখো, আবার দেখো।" এবারও একজন দেখে এসে বল্লেন—"না।" অমনি পরমহংসদেব হাসতে হাসতে বললেন, 'পাতের উপর পড়ে পাত, রাই বলে—ওই এল বুঝি প্রাণনাথ।' হাঁ, দেখো কেশবের চিরকালই কি এই রীত! আসে, আসে, আসে না। কিছুকাল পরে সন্ধ্যা হয় হয় এমন সময় কেশব দলবলসহ এসে উপস্থিত।

এসে যেমন ভূমিষ্ঠ হ'য়ে ওঁকে প্রণাম করলেন, উনিও, ঠিক তদ্রূপ ক'রে একটু পরে মাথা তুললেন। তখন সমাধিস্থ,—বল্ছেন—"রাজ্যের কলকাতার

লোক জুটিয়ে নিয়ে এসেছেন—আমি কি না বক্তৃতা করবো। তা আমি পারবো-টারবো নি। করতে হয় তুমি কর। আমি ও-সব পারবো নি।”

ঐ অবস্থায় একটু দিব্য হাসি হেসে বল্‌ছেন—“আমি তোমার খাবো-দাবো থাকবো, আমি তোমার খাবো শোবো আর বাহ্যে যাবো। আমি ও-সব পার্‌বো নি।” কেশববাবু দেখ্‌ছেন আর ভাবে ভরপুর হ'য়ে যাচ্ছেন, এক-একবার ভাবের ভরে “আঃ আঃ” কর্‌ছেন।

আমি ঠাকুরের অবস্থা দেখে ভাবছি, “এ কি ঢং?” আর তো কখনও এমন দেখি নাই; আর যেরূপ বিশ্বাসী তাতো জানোই।

সমাধি ভঙ্গের পরে কেশববাবুকে বললেন, “কেশব একদিন তোমার ওখানে গেছলাম, শুনলাম তুমি বলছো, 'ভক্তি নদীতে ডুব দিয়ে সচ্চিদানন্দ-সাগরে গিয়ে পড়বো।' আমি তখন উপর পানে তাকাই (যেখানে কেশববাবুর স্ত্রী ও অন্যান্য স্ত্রীলোকগণ বসেছিলেন) আর ভাবি, তা'হলে এদের দশা হবে কি? তোমরা গৃহী, একেবারে সচ্চিদানন্দ সাগরে কি ক'রে গিয়ে পড়বে? সেই নেউলের মত পেছনে বাঁধা ইট, কোনো কিছু হ'লে কুলুঙ্গায় উঠে বসলো, কিন্তু থাকবে কেমন ক'রে। ইটে টানে আর ধুপ ক'রে নেবে পড়ে। তোমরাও একটু ধ্যান-ট্যান করতে পার কিন্তু দারাসুত ইট টেনে আবার নামিয়ে ফেলে। তোমরা ভক্তি নদীতে একবার ডুব দেবে আবার উঠবে, আবার ডুব দেবে আবার উঠবে। এমনি চলবে। তোমরা একেবারে ডুবে যাবে কি ক'রে?”

কেশববাবু বললেন, “গৃহস্থের কি হয় না? মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর?”

পরমহংসদেব “দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর, দেবেন্দ্র, দেবেন্দ্র” দুই-তিন বার বলে উদ্দেশে ক'বার প্রণাম করলেন, তারপর বললেনঃ—“তা জানো, একজনার বাড়ি দুর্গোৎসব হ'তো, উদয়াস্ত পাঁঠাবলি হ'তো। কয়েক বৎসর পরে আর বলির সে ধুমধাম নাই। একজন জিজ্ঞাসা করলে মশাই আজকাল যে আপনার বাড়িতে বলির ধুমধাম নাই? সে বল্‌লে আরে! এখন যে দাঁত পড়ে গেছে। দেবেন্দ্রও এখন ধ্যানধারণা করছে, তা করবেই তো। তা কিন্তু খুব মানুষ।

দেখো, যতদিন মায়া থাকে, ততদিন মানুষ থাকে ডাবের মত। নারকেল যতদিন ডাব থাকে, তার নেয়াপাতি তুলতে গেলেই সঙ্গে মালার একটু উঠে আসবেই। আর যখন মায়া শেষ হ'য়ে যায় তখন হয় ঝুনো। ঐ শাঁস আর মালা পৃথক হ'য়ে যায়, শাঁসটা ভিতরে ঢপর ঢপর করে। আত্মা হয় আলাদা, শরীর হয় আলাদা। দেহটার সঙ্গে যোগ থাকে না।

“ঐ যে 'আমি'টে ওটাতেই বড় মুস্কিল বাধায়। শালার 'আমি' কি যাবেই না? এই পোড়ো বাড়ি অশ্বত্থ গাছ উঠেছে; খুড়ে ফেলে দাও আবার পরদিন দেখো, এক ফেকড়ী গজিয়েছে;—ঐ 'আমি'ও অমনি ধারা। পেঁয়াজের বাটি সাতবার ধোও শালার গন্ধ কি কিছুতেই যাবে নি?

কি বলতে বলতে কেশববাবুকে বললেনঃ—"হাঁ কেশব, তোমাদের কলকাতার বাবুরা নাকি বলে ঈশ্বর নাই?' বাবু সিঁড়ি দিয়ে উঠছেন, এক পা ফেলে আর এক পা ফেলতেই 'উঃ পাশে কি হল' বলে অজ্ঞান। ডাক ডাক ডাক্তার ডাক!—ডাক্তার আস্‌তে আস্‌তে হ'য়ে গেছে। অ্যাঁ—এরা বলেন ঈশ্বর নাই।"

এক কি দেড় ঘণ্টা পরে কীর্ত্তন আরম্ভ হ'ল। তখন যা দেখলাম তা বোধ হয় জন্ম-জন্মান্তরেও ভুলব না। সকলে নাচতে লাগলেন, কেশবকেও নাচতে দেখলাম, মাঝখানে ঠাকুর আর সবাই তাঁকে ঘিরে নাচ্‌ছেন। নাচ্‌তে নাচ্‌তে একেবারে স্থির—সমাধিস্থ। অনেকক্ষণ এইভাবে গেল। শুন্‌তে শুন্‌তে দেখ্‌তে দেখ্‌তে বুঝলাম, 'এ পরমহংস বটে।'

আর একদিন, বোধ হয় ১৮৮৩ সনে শ্রীরামপুরের কয়েকটি যুবক সঙ্গে নিয়ে গেছলাম। সেদিন তাদের দেখে বললেন—"এরা এসেছেন কেন?"

আমি—আপনাকে দেখতে।

ঠাকুর—আমায় দেখবে কি? এরা সব বিল্ডিং-টিল্‌ডিং দেখুক না?

আমি—এরা তা দেখতে আসে নাই, আপনাকে দেখতে এসেছে।

ঠাকুর—তবে এরা বুঝি চকমকির পাথর। ভিতরে আগুন আছে। হাজার বছর জলে ফেলে রাখ, যেমন ঠুক্‌বে অমনি আগুন বেরুবে। এরা বুঝি সেই জাতীয় জীব। আমাদের ঠুক্‌লে আগুন বেরোয় কই?

আমরা এই শেষ কথা শুনে হাসলাম। সেদিন আর কি কি কথা হ'ল ঠিক মনে নাই। তবে 'আমি'র গন্ধ যায় না আর কামিনী-কাঞ্চন, ত্যাগের কথাও যেন হ'য়েছিল।

আর একদিন গেছি। প্রণাম করে বসেছি, বলিলেনঃ—"সেই যে কাক খুললে ফস্‌ ফস্‌ ক'রে উঠে, একটু টক একটু মিষ্টি, তার একটা এনে দিতে পার?" আমি বললাম—লেমনেড? ঠাকুর বললেন—"আন না?" মনে হয় একটা এনে দিলাম। এ দিন যতদূর মনে পড়ে আর কেউ ছিল না। কয়েকটি প্রশ্ন করেছিলাম—"আপনার কি জাতিভেদ আছে?"

ঠাকুর—কই আর আছে? কেশব সেনের বাড়ি চচ্চড়ি খেয়েছি, তবে একদিনের কথা বলছি। একটা লোক লম্বা দাড়িওয়ালা বরফ নিয়ে এসেছিল, তা কেমন খেতে ইচ্ছা হ'লো না, আবার একটু পরে একজন—তারই কাছ থেকে বরফ নিয়ে এল—ক্যাচর-ম্যাচর ক'রে চিবিয়ে খেয়ে ফেললাম। তা জানো জাতিভেদ আপনি খসে যায়। যেমন নারিকেল গাছ, তাল গাছ বড় হয়, বেল্লো তো আপনি খসে পড়ে। জাতিভেদ তেমনি খসে যায়। টেনে ছিঁড়ো না, ঐ শালাদের মত।

আমি জিজ্ঞাসা করলাম—"কেশববাবু কেমন লোক?"

ঠাকুর—ওগো, সে দৈবী মানুষ।

আমি—আর ত্রৈলোক্যবাবু?

ঠাকুর—বেশ লোক, বেড়ে গায়।

আমি—শিবনাথবাবু?

ঠাকুর—* * বেশ মানুষ, তবে তর্ক করে যে।

আমি—হিন্দুতে ও ব্রাহ্মতে তফাৎ কি? বললেন—"তফাৎ আর কি? এইখানে রোশনচৌকি বাজে, একজন সানাইয়ের ভোঁ ধরে থাকে আর একজন তারই ভিতর 'রাধা আমার মান করেছে' ইত্যাদি রং পরং তুলে নেয়। ব্রাহ্মেরা নিরাকার ভোঁ ধরে বসে আছে। আর হিন্দুরা রং পরং তুলে নিচ্ছে।

"জল আর বরফ—নিরাকার আর সাকার। যা জল তাই ঠাণ্ডায় বরফ হয়, জ্ঞানের গরমীতে বরফ জল হয়, ভক্তির হিমে জল বরফ হয়।

"সেই একই জিনিস, নানা লোকে নানা নাম করে। যেমন পুকুরের চারিপাশে চার ঘাট। এ ঘাটের লোক জল নিচ্ছে; জিজ্ঞাসা কর, বলবে 'জল।' ও ঘাটে যারা জল নিচ্ছে বলবে 'পানি।' আর এক ঘাটে 'ওয়াটার'; আর এক ঘাটে 'অ্যাকোয়া'; জল তো একই।"

বরিশালে অচলানন্দ তীর্থাবধূতের সঙ্গে দেখা হ'য়েছিল বলাতে বললেন:—"সেই কোতরঙের রামকুমার তো?" আমি বললাম 'আজ্ঞা হাঁ।'

ঠাকুর—তাকে কেমন লাগ্‌লো?

আমি—খুব ভাল লাগ্‌লো।

ঠাকুর—আচ্ছা, সে ভাল, না, আমি ভাল?

আমি—তাঁর সঙ্গে কি আপনার তুলনা হয়? তিনি পণ্ডিত বিদ্বান লোক আর আপনি কি পণ্ডিত জ্ঞানী? উত্তর শুনে একটু অবাক হ'য়ে চুপ ক'রে রইলেন। এক আধ মিনিট পরে আমি বললাম:—"তা তিনি পণ্ডিত হ'তে পারেন, আপনি মজার লোক। আপনার কাছে মজা খুব।"

এইবার হেসে বল্‌লেন, "বেশ বলেছো, ঠিক বলেছো।"

আমায় জিজ্ঞাসা করলেন, "আমার পঞ্চবটী দেখেছো?" বললাম, আজ্ঞা হাঁ। সেখানে কি কি করতেন তাও কিছু বললেন, সেই নানা ভাবের সাধনের কথা, ন্যাংটার কথাও বললেন। আমি জিজ্ঞাসা করলাম, "তাঁকে পাবো কি করে?"

উত্তর—ওগো সে তো চুম্বক লোহাকে যেমন টানে, তেমনি আমাদের টান-তেই আছে। লোহার গায়ে কাদা মাখা থাক্‌লেই লাগতে পারে না। কাঁদতে কাঁদতে যেমন কাদাটুকু ধুয়ে যায় অমনি টুক করে লেগে যায়।

আমি ঠাকুরের উক্তিগুলি শুনে শুনে লিখছিলাম, বললেন:—"হাঁ দেখো, সিদ্ধি সিদ্ধি করলে হবে না। সিদ্ধি আনো, সিদ্ধি ঘোঁট, সিদ্ধি খাও।" * *

এর পর আমায় বললেন "তোমরা তো সংসারে থাকবে, তা একটু গোলাপী নেশা ক'রে থেকো। কাজকর্ম কর্‌ছ অথচ নেশাটি লেগে আছে। তোমরা তো আর শুকদেবের মত হ'তে পারবে না—যে খেয়ে খেয়ে ন্যাংটা-ভ্যাংটো হ'য়ে পড়ে থাকবে।

"সংসারে থাকবে তো একখানি আম্‌মোক্তারনামা লিখে দাও—বকলমা দিয়ে দাও। উনি যা হয় ক'রবেন। তুমি থাকবে বড়লোকের বাড়ির ঝি'-এর মত। বাবুর ছেলে-পুলেকে কত আদর করছে, নাওয়াচ্ছে, ধোয়াচ্ছে, খাওয়াচ্ছে যেন তারই ছেলে; কিন্তু মনে মনে জান্‌ছে, 'এ আমার নয়'; যেমন জবাব দিলে—ব্যাস, আর কোন সম্পর্ক নাই।

"যেমন কাঁঠাল খেতে হ'লে হাতে তেল মেখে নিতে হয়, তেমনি ঐ তেল মেখে নিও তাহ'লে আর সংসারে জড়াবে না, লিপ্ত হবে না।"

এতক্ষণ মেঝেয় বসে কথা হচ্ছিল; এখন তক্তপোষের উপরে উঠে লম্বা হ'য়ে শুলেন। আমায় বললেন, "হাওয়া কর।" আমি হাওয়া করতে থাকলাম। চুপ করে রইলেন। একটু পরে বললেন, "বড্ড গরম গো, পাখাখানা একটু জলে ভিজিয়ে নাও। আমি বললাম, "আবার শোক ত আছে দেখছি।" হেসে বললেন—"কেন থাক্‌বে নি? ক্যা-নো-থাক্‌বে নি?" আমি বললাম, "তবে থাক্‌ থাক্‌, খুব থাক।" সেদিন কাছে ব'সে যে সুখ পেয়েছি সে আর বলবার নয়।

শেষবার—যে বারের কথা তুমি তৃতীয় খণ্ডে (৩য় ভাগ, ১৬শ খণ্ড) উল্লেখ করেছ—সেইবার আমার স্কুলের হেডমাষ্টারকে নিয়ে গেছলাম। তাঁর বি-এ পাশ করার অব্যবহিত পরে। এইবার এই সেদিন তোমার সঙ্গে তাঁর দেখা হয়েছে।

ওঁকে দেখেই বললেন—"আবার ইটি পেলে কোথায়? বেড়ে তো।"

"ওগো তুমি ত উকিল। উঃ বড় বুদ্ধি! আমায় একটু বুদ্ধি দিতে পার? তোমার বাবা যে সেদিন এসেছিলেন, এখানে তিন দিন ছিলেন।"

আমি জিজ্ঞাসা কর্‌লাম্‌, "তাঁকে কেমন দেখলেন?"

বললেন—"বেশ লোক, তবে মাঝে মাঝে হিজিবিজি বকে।"

আমি বললাম, "আবার দেখা হ'লে হিজিবিজিটি ছাড়িয়ে দেবেন।"

একটু হাসলেন। আমি বললাম, "আমাদের গোটা কতক কথা শুনান।" বললেন, "হৃদয়কে চেনো?" (হৃদয় মুখোপাধ্যায়)।

আমি বললাম, "আপনার ভাগ্‌নে ত? আমার সঙ্গে আলাপ নাই।"

ঠাকুর—হৃদে বলতো, 'মামা' তোমার বুলিগুলি সব এক সময়ে ব'লে ফেলো না! ফি বার এক বুলি কেন বলবে?' আমি বলতাম, তা তোর কি রে শালা? আমার বুলি আমি লক্ষবার ঐ এক কথা বলবো, তোর কিরে?

আমি হাসতে হাসতে বললাম, "তা বটেই ত।"

কিঞ্চিৎ পরে বসে ওঁ ওঁ করতে করতে গান ধরলেন—

ডুব্ ডুব্ ডুব্ রূপসাগরে আমার মন।

দুই এক পদ গাইতে গাইতে ডুব ডুব বলতে বলতে ডুব।

সমাধি ভঙ্গ হলো, পায়চারী করতে লাগিলেন। ধুতি পরা ছিল তা দুই হাত দিয়ে টানতে টানতে একেবারে কোমরের উপর তুলেছেন, এদিক দিয়ে খানিকটা মেঝে ঝেটিয়ে যাচ্ছে, ও দিক দিয়ে খানিকটা অমনি পড়েছে। আমি আর আমার সঙ্গী টেপা-টেপি করছি আর চুপি চুপি বলছি, 'ধুতিটি পরা হয়েছে ভালো!' একটু পরেই 'দূর শালার ধুতি' ব'লে ধুতিটা ফেলে দিলেন। দিয়ে দিগম্বর হয়ে পায়চারী কর্‌তে লাগলেন। উত্তরদিক থেকে কার যেন ছাতা ও লাঠি আমাদের সম্মুখে এনে জিজ্ঞাসা করলেন—"এ ছাতা লাঠি তোমাদের?" আমি বললাম, 'না।' অমনি বললেন, "আমি আগেই বুঝেছি, এ তোমাদের নয়। আমি ছাতা লাঠি দেখেই মানুষ বুঝতে পারি। সেই একটা লোক হাঁউ মাঁউ ক'রে কতকগুলো গিলে গেল, এ তারই নিশ্চয়।"

কিছুকাল পরে ঐ ভাবেই খাটের উত্তর পাশে পশ্চিমমুখো হ'য়ে ব'সে পড়লেন। বসেই আমায় জিজ্ঞাসা—"ওগো আমায় কি অসভ্য মনে করছো?"

আমি বললাম, না আপনি খুব সভ্য। আবার এ জিজ্ঞাসা করছেন কেন?

ঠাকুর—আরে শিবনাথ-টিবনাথ অসভ্য মনে করে। ওরা এলে কোন রকমে একটা ধুতি-টুতি জড়িয়ে বসতে হয়। গিরিশ ঘোষকে চেনো?

আমি—কোন্ গিরিশ ঘোষ? থিয়েটার করে যে?

ঠাকুর—হাঁ।

আমি—দেখিনি কখনও, নাম জানি।

ঠাকুর—ভাল লোক।

আমি—শুনি মদ খায় নাকি?

ঠাকুর—খাক্‌না, খাক্‌না ক'দিন খাবে?

বললেন—"তুমি নরেন্দ্রকে চেনো?"

আমি—আজ্ঞা, না।

ঠাকুর—আমার বড় ইচ্ছা, তার সঙ্গে তোমার আলাপ হয়, সে বি-এ পাশ দিয়েছে, বিয়ে করে নি।

আমি—যে আজ্ঞা, আলাপ করবো।

ঠাকুর—আজ রাম দত্তের বাড়ি কীর্ত্তন হবে সেইখানে দেখা হবে। সন্ধ্যার সময় সেইখানে যেও।

আমি—যে আজ্ঞা।

ঠাকুর—যাবে ত? যেও কিন্তু।

আমি—আপনার হুকুম হ'লো, তা মান্‌বো না? অবশ্য যাবো।

ঘরে ছবি ক'খানা দেখলেন, পরে জিজ্ঞাসা করলেন, "বুদ্ধদেবের ছবি পাওয়া যায়?"

আমি—শুনতে পাই, পাওয়া যায়।

ঠাকুর—সেই ছবি একখানি তুমি আমায় দিও।

আমি—যে আজ্ঞা, যখন এবার আসবো, নিয়ে আসবো।

আর দেখা হল না! আর সেই শ্রীচরণপ্রান্তে বসতে ভাগ্যে ঘটে নাই।

সেদিন সন্ধ্যার সময় রামবাবুর বাড়ি গেলাম। নরেন্দ্রের সঙ্গে দেখা হল। ঠাকুর একটি কামরায় তাকিয়া ঠেস দিয়ে বসেছেন, নরেন্দ্র তাঁর ডান-পাশে। আমি সম্মুখে। নরেন্দ্রকে আমার সহিত আলাপ করতে বললেন।

নরেন্দ্র বললেন, আজ আমার বড় মাথা ধরেছে। কথা কইতে ইচ্ছা হচ্ছে না। আমি বললাম, "থাক আর একদিন আলাপ হবে।"

সেই আলাপ হয় ১৮৯৭ সনের মে কি জুন মাসে, আলমোরায়।

ঠাকুরের ইচ্ছা ত পূর্ণ হতেই হবে, তাই বার বছর পরে পূর্ণ হল। আহা সেই স্বামী বিবেকানন্দের সঙ্গে আলমোরায় ক'টা দিন কত আনন্দেই কাটাইয়াছিলাম। কখনও তাঁর বাড়িতে, কখনও আমার বাড়িতে, আর একদিন নির্জনে তাঁকে নিয়ে একটি পর্বতশৃঙ্গে। আর তার সঙ্গে পরে দেখা হয় নাই। ঠাকুরের ইচ্ছা পূর্ণ করতেই সে বারের দেখা।

ঠাকুরের সঙ্গেও মাত্র চার-পাঁচ দিনের দেখা, কিন্তু ঐ অল্প সময়ের মধ্যেই এমন হয়েছিল, যে তাঁকে (ঠাকুরকে) মনে হত যেন এক ক্লাসে পড়েছি, কেমন বেয়াদবের মত কথা বলেছি; সম্মুখ থেকে সরে এলেই মনে হ'ত, 'ওরে বাপ্‌রে কার কাছে গেছলাম।' ঐ কদিনেই যা দেখেছি ও পেয়েছি তাতে জীবন মধুময় করে রেখেছে। সেই দিব্যামৃতবর্ষী হাসিটুকু, যতনে পেটরায় পুরে রেখে দিইছি। সে যে নিঃসম্বলের অফুরন্ত সম্বল গো! আর সেই হাসিচ্যুত অমৃতকণার আমেরিকা অবধি অমৃতায়িত হচ্ছে—এই ভেবে "হ্রষ্যামি চ মুহুর্মুহুঃ হৃষ্যামি চ পুনঃ পুনঃ।" আমারই যদি এই, এখন বোঝ তুমি কেমন ভাগ্যধর।"

প্রথম ভাগ সমাপ্ত

শ্রীম (মহেন্দ্রনাথ গুপ্ত)

১২৬১ সালের ৩১শে আষাঢ়, শুক্রবার, ইংরাজী ১৮৫৪ খৃষ্টাব্দের ১৪ই জুলাই নাগ পঞ্চমীর দিন মহেন্দ্রনাথ, কলিকাতা সিমুলিয়া পল্লীস্থ শিবনারায়ণ দাস লেনে জন্মগ্রহণ করেন। পিতার নাম মধুসূদন গুপ্ত, মাতা স্বর্ণময়ী দেবী। মধুসূদন ভক্ত ছিলেন এবং তাঁহার ভক্তির কথাও ঠাকুর জানিতেন। মহেন্দ্রনাথ, মধুসূদনের তৃতীয় পুত্র। কথিত আছে একে একে দ্বাদশবার শিবের পুজো মানসিক করিবার পর এই পুত্রটি জন্মে। এ জন্য মধুসূদনের এই পুত্রটির উপর স্নেহদৃষ্টি ছিল এবং যাহাতে বালকের কোন অনিষ্ট না হয় সে বিষয়ে তিনি বিশেষ সতর্ক থাকিতেন। বালক মহেন্দ্র অতিশয় সুশীল ও জনক-জননীর প্রতি অনুরক্ত ছিলেন। তিনি অতি অল্প বয়সের কথা স্মরণ করিয়া বলিতে পারিতেন। যেমন পাঁচ বৎসর বয়সে তিনি জননীর সহিত মাহেশের রথ দেখিতে যান। প্রত্যাবর্তনকালে তাঁহাদের নৌকা দক্ষিণেশ্বরের ঘাটে লাগে। সকলে যখন মন্দিরের মধ্যে দেব-দেবী দর্শনে ব্যস্ত, তখন তিনি কেমন করিয়া শ্রীশ্রীভবতারিণীর মন্দিরের সম্মুখে নাট-মন্দিরে একাকী হইয়া পড়েন এবং মাকে দেখিতে না পাওয়ায় ক্রন্দন করিতে থাকেন। কে একজন এই সময় তাহাকে ক্রন্দনপরায়ণ দেখিয়া সান্ত্বনা প্রদান করিয়া তাহার ক্রন্দন দূর করিয়া দেন। মহেন্দ্রনাথ বলিতেন, সে ঘটনা তাঁহার মনে সর্বদা বেশ জাগরূক ছিল। তিনি মানশ্চক্ষে সেই সদ্য নির্মিত ও প্রতিষ্ঠিত দেবায়তনের শ্বেতকান্তি মনের মধ্যে পরিষ্কার দেখিতে পাইতেন এবং মনে করিতেন, যিনি তাহাকে তখন সান্ত্বনা দিয়াছিলেন তিনি হয় তো স্বয়ং শ্রীঠাকুরই বা হইবেন।

মহেন্দ্রনাথ বাল্যকালে হেয়ার স্কুলে পড়া-শুনা করিতেন। তিনি অতিশয় মেধাবী ছাত্র ছিলেন এবং পরীক্ষাকালে তিনি সর্বদাই প্রথম বা দ্বিতীয় স্থান অধিকার করিতেন। স্কুলে যাইবার ও তথা হইতে ফিরিবার পথে পড়িত ঠনঠনে শীতলামাতার মন্দির। এই মন্দির বর্তমানে কলেজ ষ্ট্রীট মার্কেটের সম্মুখে অবস্থিত। যাতায়াতকালে মহেন্দ্রনাথ এই মন্দির সম্মুখে দাঁড়াইয়া দেবীকে প্রণাম করিতে কখনও ভুলিতেন না। তিনি মেধা ও পরিশ্রমের বলে Entrance, F.A., B.A., পরীক্ষায় প্রত্যেকটিতে বৃত্তি ও সম্মানের সহিত উত্তীর্ণ হন। এণ্ট্রান্সে দ্বিতীয় স্থান অধিকার করেন। এফ-এ পরীক্ষাকালে অঙ্কের খাতা একখানি না দিয়াও পঞ্চম স্থান অধিকার করেন এবং ১৮৭৪ সালে বি, এ পরীক্ষায় তৃতীয় স্থান অধিকার করেন। প্রেসিডেন্সী কলেজে তিনি টনি সাহেবের প্রিয় ছাত্র ছিলেন। বিদ্যার্জনকালে ১৮৭৪ সালে তিনি কেশব সেনের ভগ্নি সম্পর্কিয়া ঠাকুরচরণ সেনের কন্যা শ্রীমতী নিকুঞ্জ দেবীকে বিবাহ করেন। নিকুঞ্জ দেবীকেও ঠাকুর ও শ্রীশ্রীমাতাঠাকুরাণী বিশেষ স্নেহ ও ভালবাসিতেন। পুত্রশোকে নিকুঞ্জ দেবী যখন উন্মাদিনীপ্রায় সেই সময় ঠাকুর তাঁহার গায়ে হাত বুলাইয়া মনে শান্তি আনয়ন করেন।

অধ্যাপনার কার্যে ব্রতী হইবার পূর্বে তিনি কিছুদিন সরকারী কার্য, তৎপরে সওদাগরী অফিসে কর্ম করেন, কিন্তু এ সব কার্য স্থায়ী হয় নাই। ঠাকুর তাহার জীবনের অন্যরূপ ধারা নির্দিষ্ট করিয়া রাখিয়াছিলেন' তিনি প্রফেসারী ও অধ্যাপনার কার্যে প্রবেশ করিলেন। রিপন্, সিটি. মেট্রোপলিটন কলেজে ইংরাজী, মনোবিজ্ঞান ও অর্থনীতি-র অধ্যাপনা করিয়াছেন। যখন

বেড়াইতে পারিত। ঠাকুর তাহাকে মধ্যে মধ্যে সান্ত্বনা বাক্যে শান্ত করিতেন, বলিতেন, "মনে ত্যাগ হলেই ত্যাগী, এখানে যারা আসে তারা কেউ গৃহী নয়।" "চৈতন্যদেবের সংসারী-ভক্তেরা সংসারে অনাসক্ত হয়ে থাকতেন।" "তুমি যে কাজ কর তাহাতে বিষয়বুদ্ধি খুব কম হয়" ইত্যাদি। দুর্বল শিশু যেমন ভয়ে উদ্বেগে মাকে প্রধান ও নিরাপদ আশ্রয় জানিয়া সর্বশক্তির সহিত আঁকড়াইয়া ধরে, মহেন্দ্রনাথও তেমনি নিজের গৃহস্থ জীবনের দুর্বলতার ভয়ে ঠাকুরকে এমন ধরিয়াছিলেন যে আমরণকাল ঐ রসে ডুবিয়া গিয়াছিলেন। মুখে ঠাকুরের কথা ছাড়া অন্য কথা নাই। তাহার ভাব ছিল একমাত্র শ্রেয়ঃ, কাম্য, লভ্য প্রতিপাদ্য ঐ ঠাকুর। মহেন্দ্রনাথের জীবন ঠাকুরময় হইয়া উঠিল। ঠাকুরই পরম পুরুষার্থ—

যং লব্ধা চাপরং লাভং মন্যতে নাধিকং ততঃ
যস্মিন স্থিতো ন দুঃখেন গুরুনাপি বিচাল্যতে।"

দিনরাতই তাঁহার মুখে শুনা যাইত কলিতে জীবের বাঁচিবার কৌশল—সাধুসঙ্গ ও নির্জনে কিছুদিন সাধন ও গুরুবাক্যে বিশ্বাস। বৃদ্ধ বয়সে মহেন্দ্রনাথকে যাহারা দেখিয়াছেন মনে করিতেন, বুঝি কোন যোগী, কোন ঋষি, জীবকে যাচিয়া শ্রীরামকৃষ্ণ ভক্তি বিলাইতে আশ্রমবাসী হইয়া রহিয়াছেন। প্রাতে মধ্যাহ্নে, সন্ধ্যায় যখনই যাও দেখিবে ভক্তিকথা ও ভক্তসঙ্গ। বেদ, পুরাণ বাইবেল, কোরান, বৌদ্ধশাস্ত্র, গীতা, ভাগবত অধ্যাত্ম সকল শাস্ত্র হইতে হরি-কথা অজস্র ঝরিয়া পড়িতেছে। শ্রান্তি, ক্লান্তি নাই—কেবল সর্ব ধর্ম সর্ব-সাধনময় ঠাকুরের কথা। একি অসাধারণ ঠাকুরের সেবা তন-মন-ধন সবই তাঁহারি কাজে লাগিয়া আছে! এরই নাম কি 'দাস আমি' যাহা হনুমানের ভাব?—

শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণদেবের দাস হইবার ভাগ্য লাভ করিতে কেই-বা চাহিতেন না, বা চাহিবে না এবং তাঁহার সাঙ্গপাঙ্গেরা তাহার দাস ত বটেই। ইঁনিও শ্রীরাম-কৃষ্ণের চিহ্নিত "তুমি আপনার লোক, এক সত্তা—যেমন পিতা আর পুত্র।" এই ঠাকুরের শ্রীমুখের কথা তাঁহারই পরিচায়ক। ঠাকুরের কার্য করিবেন এ কথা ঠাকুর নরেন্দ্রনাথ সম্বন্ধে লিখিয়াই দিয়াছিলেন। মহেন্দ্রনাথও (শ্রীম) ঠাকুরের কর্ম করিবেন তাহার আভাস তিনি মধ্যে মধ্যে দিয়াছেন আমরা শ্রীশ্রীকথামৃতে মধ্যে মধ্যে দেখিতে পাই—"মা, আমি আর বকিতে পারি না—রাম, মহেন্দ্র, বিজয় প্রভৃতিকে শক্তি দাও এরা এখন থেকে তোমার কাজ করুক!" মা ওকে (মাষ্টারকে) এক কলা শক্তি দিলি কেন? ওঃ বুঝেছি, ওতেই তোর কাজ হবে।" (শ্রীশ্রীঠাকুর, মাষ্টার মহাশয়ের ভিতর যে আসামান্য শক্তির সঞ্চার করিয়াছিলেন তাহার সামান্য এক কলার প্রয়োগের ফলই কি 'কথামৃতের' রচনা?) মাষ্টার মহাশয়কে একদিন ঠাকুর বলিয়াছিলেন—"মা ভাগবতের পণ্ডিতকে একটা পাশ দিয়ে সংসারে রাখেন, নয় তো ভাগবত কে শোনাবে?" ইত্যাদি। কাজেই দেখা যায় নরেন্দ্রনাথ যেমন ঠাকুরের কার্যের জন্য আসিয়া ছিলেন এবং ঠাকুরও তাহাকে শক্তির চাপরাস দিয়াছিলেন, মহেন্দ্রনাথও সেই-রূপ পিতৃ-ধনে বঞ্চিত হন নাই। তিনিও শক্তি ও ভক্তির অধিকারী হইয়া-ছিলেন। লোক সংগ্রহ কার্যের উপযুক্ত করিবার জন্য ঠাকুর তাহাকে মধ্যে মধ্যে তপস্যা করাইতেন। ১৮৮৩, ১৪ই ডিসেম্বর হইতে ১৮৮৪, জানুয়ারীর মাঝামাঝি পর্যন্ত তিনি মাসাধিককাল শ্রীশ্রীঠাকুরের পদছায়ায় দক্ষিণেশ্বরে

থাকিয়া নিরবিচ্ছিন্ন সাধনা করেন। ঠাকুরের সঙ্গ করিতে করিতে যেমন তাহার হৃদয়-কপাট খুলিয়া যায় অমনি সঙ্গে সঙ্গে অহঙ্কারও নাশ হইতে থাকে। ঠাকুর বলিতেন "এর অহঙ্কার নাই।" অহঙ্কার থাকিলে তাহার জীবনে যে কাজ করিবার ভার তিনি ঠাকুরের কাছে পাইলেন, তাহা করিতে পারিতেন না। সে কাজ ঠাকুরের কথা লোককে শোনান। পাঁচ ভাগ শ্রীশ্রীকথামৃতের মধ্যে 'শ্রীম' নিজেকে প্রচ্ছন্ন রাখিয়া শ্রীরামকৃষ্ণদেবকে সম্পূর্ণরূপে প্রকাশ করিয়াছেন। তিনি বহু কাল্পনিক নামের সাহায্য লইয়াছেন—মণি, মোহিনীমোহন, একটি ভক্ত, মাষ্টার, শ্রীম, ইংলিশম্যান্ ইত্যাদি। লেখকের ব্যক্তিত্বের অভিব্যক্তি কোথাও নাই। দুই-একস্থানের দুই-একটি নিভৃত চিন্তার মাত্র পরিচয় পাওয়া যায় তাহাও ঠাকুরের ভাবের উপর ভিত্তি করিয়া তাঁহারই মহিমা প্রকাশের প্রয়াস মাত্র। সেগুলি সেবকের নির্মল হৃদয়াকাশে শ্রীরামকৃষ্ণদেবের ছবি ছাড়া আর কিছুই নয়। এমনি করিয়া নিজেকে মুছিয়া ফেলিয়াছিলেন বলিয়াই স্বামী বিবেকানন্দ গস্‌পেল পড়িয়াই ১৮৯৭ খৃঃ লিখিয়াছিলেন............

"I now understand why none of us attempted his life before. It has been reserved for you—this great work. Socratic dialogues are Plato all over. You are entirely hidden.

শ্রীকেশব গুপ্ত লিখিয়াছেন,—সাহিত্য যশের লোভ দমন শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ-কথামৃতের সার্থকতা। রাতের ফুলের মত নিজেকে লুকিয়ে রেখে বাস বিলানোই এই ধর্মগ্রন্থের প্রগাঢ় সৌন্দর্য।

মধ্যে মধ্যে ঠাকুর যে তাহার পরীক্ষা লইতেন তাও শ্রীশ্রীকথামৃতে পাওয়া যায়—১৮৮৪, ৯ই নভেম্বর। এইভাবে দেখা যাইতেছে এই কার্য মহেন্দ্রনাথের জন্য নির্দিষ্ট ছিল। মহেন্দ্রনাথ শ্রীঠাকুরের সঙ্গকালীন তাঁহার অমৃতময়ী অমর বাণী দৈনন্দিন বিবরণে ড্যায়ারি-তে লিপিবন্ধ করিয়াছিলেন। বর্ষ, তারিখ, বার, তিথি সমেত। ইহারই উপর ভিত্তি করিয়া Gospel ও শ্রীশ্রীরাম-কৃষ্ণকথামৃত পাঁচ ভাগের উৎপত্তি। এ কাজ ইতিহাসে দ্বিতীয় বার হইয়াছে বলিয়া শোনা যায় নাই এবং অবতার পুরুষের জীবন-চরিত এমনভাবে আর কখনও কোন অবতারেই লেখা হয় নাই। ইহা এক নূতন ধরণের এবং শ্রীশ্রীকথামৃত সম্বন্ধে ইণ্ডিয়ান্ নেশন্ পত্রে Mr. N. Ghose মহাশয় সত্যই লিখিয়াছিলেনঃ—

"They take us straight to the truth and not through meta-physical maze. The Style is Biblical in simplicity. What a treasure would it have been to the world, if all the sayings of Sreekrishna, Buddha ; Jesus ; Mohammad ; Nanak ; Chaitanya could have been thus preserved."

এ কাজ কি যে-সে করিতে পারে, করিলেও এমন খাঁটি ভাবে হয় না। এ কার্যে ঠাকুরের ইচ্ছা ও কৃপা চাইই। তাই তিনি আগে পাত্রকে নিরহঙ্কার করাইয়া লইলেন। তাই মহেন্দ্রনাথ নিজেকে লুকাইবার জন্য বহু কাল্পনিক নাম গ্রহণ করিয়াছেন তাহাও শ্রীশ্রীকথামৃতে পাওয়া যায়।

মহেন্দ্রনাথের মুখের কথা ও ভাবে দেখা যাইত যে সর্বতোভাবে ঠাকুরের দাস হইয়া তাঁহার সঙ্গে সঙ্গে রহিয়াছেন এবং নিজেকে সন্ন্যাসী রাখিয়াছিলেন।

প্রায়ই বলিতেন আমাদের একমাত্র লক্ষ্য হওয়া উচিত—"To be as perfect as our Father in Heaven is Perfect." ঠাকুরের দেহান্তের পর তিনি বরাহনগর মঠে মধ্যে মধ্যে গিয়া গুরু-ভাইদের সঙ্গে থাকিতেন যাহাতে তাহাদের সেবা ও সাধনা—ত্যাগ ও কঠোরতার আদর্শ নিজের মধ্যে ঘনীভূত হয়। মাঝে মাঝে ঈশ্বরের উপর সম্পূর্ণ নির্ভর করিবার উদ্দেশে নিঃস্ব লোকের ন্যায় সেনেট হলের সম্মুখে রাত্রিযাপন করিতেন। মাঝে মাঝে পশ্চিমে কুটিতে থাকিয়া সাধুদের ন্যায় তপস্যা করিতেন। সময় সময় তীর্থ হইতে আগত যাত্রীদের দেখিবার উদ্দেশে হাওড়া ষ্টেশনে যাইতেন এবং তাঁহাদের প্রণাম করিতেন। তাহাদের নিকট হইতে প্রসাদ লইয়া নিজে গ্রহণ করিতেন এবং সঙ্গে কেহ থাকিলে তাঁহাদের দিয়া বলিতেন—"প্রসাদ ভগবানের সঙ্গে যোগাযোগ করিয়ে দেয়।" মহেন্দ্রনাথ সুযোগ-সুবিধা পাইলেই ঠাকুরের সঙ্গ করিতেন, দক্ষিণেশ্বরে বা কোন ভক্তমন্দিরে। এমন কি টিফিনের সময়ও তিনি ঠাকুরের সঙ্গ করিতেন যখন কোন ভক্তমন্দিরে ঠাকুর আসিতেন। এই ঘন ঘন ঠাকুরের কাছে আসায় শ্যামপুকুর স্কুলের পরীক্ষার ফল ভাল না হওয়ায় বিদ্যাসাগর মহাশয় খোঁটা দিয়া বলিয়াছিলেন—মাষ্টার পরমহংসকে নিয়ে ব্যস্ত, স্কুলের কাজ ভাল-মন্দ হওয়ার দিকে লক্ষ্য করিবার সময় নাই।" এই গঞ্জনায়, গুরুর নাম তুলিয়া খোঁটা দেওয়ায়, তিনি তৎক্ষণাৎ স্কুলের চাকরী ছাড়িয়া দেন। পরে ঠাকুর শুনিয়া বলিয়াছিলেন—"বেশ ক'রেছ, মা চালিয়ে দেবেন।" ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণের কোন কিছুর প্রয়োজন হইলেই তিনি মহেন্দ্রনাথকে তাহা বলিতেন। এই সঙ্গে বলিতেন—"সকলের জিনিস গ্রহণ করিতে পারি না।"

মহেন্দ্রনাথ তাঁহার আচার-ব্যবহার ও সরলতার জন্য শ্রীরামকৃষ্ণভক্তমণ্ডলীর মধ্যে বিশেষ প্রিয় ছিলেন। নরেন্দ্রনাথের পিতৃবিয়োগের পর যখন সংসারে ভারী কষ্ট অথচ সাধনের জন্য প্রাণ আটুবাটু করিতেছে তখন মহেন্দ্রনাথ তিন মাসের ব্যয়ভারের ব্যবস্থা করিয়া তাঁহাকে ঠাকুরের নির্দেশমত নিশ্চিন্তমনে সাধনা করিবার সুযোগ করিয়া দিয়াছিলেন। মহেন্দ্রনাথ মধ্যে মধ্যে নরেন্দ্রনাথের মাতার নিকট অতি গোপনে কিছু কিছু সাহায্য দিয়া আসিতেন।

শ্রীশ্রীঠাকুরের মহাসমাধির পর তাঁহার সন্তানগণ বরাহনগরে একটি মঠ স্থাপন করেন। ৺সুরেশ মিত্র, ৺বলরাম বসু, শ্রীম প্রভৃতি প্রথমাবস্থায় মঠে বিশেষ আর্থিক সাহায্য করিতেন। মহেন্দ্রনাথ এই সময় দুই স্থানে অধ্যাপনা করিতেন—এক স্থানের উপার্জন মঠে খরচের জন্য দিতেন। ১৮৯০ হইতে ১৮৯৩ পর্যন্ত নরেন্দ্রনাথ পরিব্রাজক হইয়া রহিলেন, তাঁহার দেখা-দেখি অন্য গুরু ভাইদের কেহ কেহ তপস্যার জন্য হিমালয় বা উত্তরখণ্ডে চলিয়া গেলেন। এই সময় মহেন্দ্রনাথ ড্যায়রিগুলির মধ্যে ডুবিয়া দিবারাত্র শ্রীশ্রীঠাকুরের চিন্তা এবং শ্রীশ্রীমাকে অবলম্বন করিয়া কাটাইয়া দিতেন। মনের মধ্যে যখনই দ্বন্দ্ব আসিত, মায়ের নিকটই শরণাগতি স্বীকার করিতেন। এই সময় মহেন্দ্রনাথ শ্রীশ্রীমাতাঠাকুরাণীকে মধ্যে মধ্যে নিজ বাটীতে আনিয়া সেবা করিতেন।

শ্রীশ্রীমাতাঠাকুরাণীও মহেন্দ্রনাথের বাটীতে কখনও পক্ষাধিক, কখনও বা মাসাধিককাল বাস করিয়া যাইতেন। ঘট-প্রতিষ্ঠা করিতে ঠাকুরের দ্বারা স্বপ্নাদিষ্ট হইলে শ্রীশ্রীমা মহেন্দ্রনাথের বাটীতে আসিয়া নিজ হস্তে 'ঘট-স্থাপনা' ও পূজা ব্যবস্থা করেন। তখন হইতেই শ্রীম'র বসতবাটী 'ঠাকুর বাড়ী' নামে

পরিচিত ও প্রসিদ্ধি লাভ করে। কলেজ স্ট্রীটে ঠন্‌ঠনিয়া এলাকায় বিদ্যাসাগর কলেজের খুব সন্নিকটেই এই ঠাকুরবাড়ী (১৩/২, গুরুপ্রসাদ চৌধুরী লেন কলিকাতা-৬)। ঠাকুর ঘরে ঠাকুরের ব্যবহৃত চটীজুতা, জপের মালা, শ্রীমায়ের সিন্দুর কৌটা ও পদচিহ্ন, ঠাকুর ও মায়ের মস্তকের কেশ ও শ্রীহস্ত ও শ্রীচরণের নখরাজি সকাল-বৈকাল-ও সন্ধ্যায় পূজা ও আরতি হয়। এই ঠাকুর ঘরে শ্রীমা কতই না পূজা, ধ্যান ও জপ করিয়াছেন! স্বামীজি ও অন্যান্য ঠাকুরের অন্তরঙ্গ সন্ন্যাসী ও গৃহীভক্তরাও এই ঠাকুরঘরে পূজা করিয়া গিয়াছেন। শ্রীম'র ঘরে ঠাকুরের ব্যবহৃত জামা, গ্লাস, মোলেস্কিনের র‍্যাপার, মাষ্টারমহাশয়কে ঠাকুর প্রদত্ত দেওয়া ছবি ভক্তদের দর্শনের জন্য রক্ষিত আছে। এই ঘরেই কথামৃত রচিত হয়। বেলুড় মঠ, মায়ের বাটী (উদ্বোধন), বলরাম মন্দির প্রভৃতির ন্যায়ই শ্রীম'র ঠাকুরবাড়ী এক মহাতীর্থ স্থান ও দেশদেশান্তর হইতে এখানে ভক্ত-মণ্ডলীর সমাগম উত্তরোত্তর বাড়িতেছে।

১৮৮৯ খৃষ্টাব্দ হইতে নিয়মিতভাবে প্রতি মাসে মহেন্দ্রনাথ শ্রীশ্রীমায়ের সেবার জন্য টাকা পাঠাইতেন। শ্রীশ্রীমাতাঠাকুরাণীও কোন কিছুর প্রয়োজন হইলে মহেন্দ্রনাথকে জানাইতেন। জগদ্ধাত্রী পূজার নিমিত্ত জমি খরিদ করিবার কালে মহেন্দ্রনাথের প্রতি হুকুম ও আদেশ করিয়াছিলেন—জমি ক্রয়ের টাকা পাঠাইতে। তিনিও পত্রপাঠ ৩২০্ টাকা পাঠাইয়াছিলেন। দেশে জলকষ্টের সময় কূপ খননের জন্য মায়ের হুকুমে একশত টাকা পাঠাইয়াছিলেন। মঠে সাধু-ভক্তরা সাধন-ভজন করিবার জন্য পাহাড়ে বা দূরস্থানে গমন করিলে তাহাদের জন্য অর্থ পাঠাইতেন।

একদিন শ্রীশ্রীমায়ের আদেশে শ্রীম তাঁহাকে "কথামৃত" শুনাইয়াছিলেন। ইহা শ্রবণে শ্রীশ্রীমাতাঠাকুরাণী অত্যন্ত সন্তুষ্ট হইলেন। শ্রীমকে আশীর্বাদ করিয়া বলিলেন—তোমার মুখে ঐ সকল কথা শুনিয়া আমার বোধ হইল, তিনিই ঐ সমস্ত কথা বলিতেছেন। এবং এই পুস্তক প্রকাশ করিতে আদেশ দিলেন। ১৮৯৭ খৃষ্টাব্দে মহেন্দ্রনাথ ইংরাজীতে 'Gospel of Sri Ramakrishna' (According to M., a Son of the Lord and disciple) প্রথম প্রকাশ করেন। ইংরাজীতে গস্‌পেল প্রচারিত হইতে আরম্ভ হইলে, রামচন্দ্র দত্ত যোগোদ্যান হইতে প্রকাশিত "তত্ত্বমঞ্জরীতে (অগ্রহায়ণ ১৩০৪) লিখিলেন—"শ্রদ্ধাস্পদ মহেন্দ্রনাথ গুপ্ত...প্রভুর প্রতি তাঁহার যেরূপ বিশ্বাস সেইরূপ বিশ্বাসের পরিচয়স্বরূপ, প্রভুর উক্তিগুলি মনুষ্যশক্তিসংগত চেষ্টায় সাধারণের শিক্ষার নিমিত্ত পুস্তিকাকারে মুদ্রিত করিয়া বিতরণ করিতেছেন... গুপ্ত মহাশয়ের নিকট আমাদের অনুরোধ, এই উপদেশগুলি খণ্ডাকারে বাহির না করিয়া একেবারে বৃহদাকারে মুদ্রিত করিলে ও বাংলা ভাষায় লিখিলে সাধারণের বিশেষ কল্যাণ হইবে।" পরে তাহাই হইল। "শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণকথামৃত—শ্রীম-কথিত" নাম ধারণ করিয়া তত্ত্বমঞ্জরী, বঙ্গদর্শন, উদ্বোধন, হিন্দু পত্রিকা প্রভৃতি তৎকালীন প্রচারিত মাসিক পত্রিকায় প্রকাশিত হইতে লাগিল। পরে এইসব একত্রীভূত করিয়া স্বামী ত্রিগুণাতীতানন্দ কর্তৃক উদ্বোধন প্রেস হইতে ১৯০২ সালে প্রথম ভাগ প্রকাশিত হয়। পরে দ্বিতীয় ভাগ—১৯০৪, তৃতীয় ভাগ—১৯০৮, চতুর্থ ভাগ—১৯১০ এবং পঞ্চম ভাগ—১৯৩২ খৃষ্টাব্দে প্রকাশিত হয়। ভারতীয় ও বিদেশীয় অনেকগুলি ভাষায় এই পুস্তকের অনুবাদ হইয়াছে।

সকলেই বলিতে লাগিলেন—বঙ্গ সাহিত্যে এক অমূল্য রত্নের প্রচার হইয়াছে। নব্যভারত লিখিলেন—'ম' ভিন্ন এই রত্ন আর কাহারও ঘরে নাই। সঞ্জীবনী লিখিলেন—শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণকথামৃত বস্তুতঃ অমৃতের নিধি। মনীষী রোমা রোঁলা লিখিলেন— "The exactitude is almost stenographic."

শ্রীশ্রীকথামৃত প্রকাশের পর মঠে ও শ্রীশ্রীমায়ের বাটীতে নূতন নূতন ভক্তের সমাগম হইতে লাগিল। শ্রীশ্রীকথামৃত পাঠে—সন্ন্যাসী সংখ্যা বৃদ্ধি হইতে লাগিল। শোকতাপের সংসারে শান্তির মন্দাকিনীধারা প্রবাহিত হইল। স্বামী প্রেমানন্দ লিখিলেন—"কথামৃত পাঠে হাজার হাজার লোক প্রাণ পাচ্ছে, সহস্র সহস্র ভক্ত আনন্দ উপলব্ধি করছে, কত শত লোক সংসারের তাপে তাপিত হ'য়ে শান্তি পাচ্ছে এই শোক মোহের সংসারে।" সকলে চিনিতে পারিলেন যুগাবতার শ্রীরামকৃষ্ণ লোকপাবনরূপে আবির্ভূত হইয়াছিলেন। তাঁহার চরণে প্রাণ সমপর্ণ করিলেই জীবের শান্তি আসিবে ও জীব নির্ভয় হইবে। ১৯৫৫ খৃষ্টাব্দে শ্রীম'র জন্মোৎসব উপলক্ষে সভাপতির ভাষণে হেমেন্দ্রপ্রসাদ ঘোষ বলেন—"শ্রীম প্রথম তাঁহার কথামৃতের মাধ্যমে শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণদেবকে অতি অল্প সময়ের মধ্যেই লোকচক্ষুর সম্মুখে উদ্‌ঘাটিত করেন। এই কথামৃত তিনি রচনা না করিলে শ্রীঠাকুরকে চিনিতে বহু বিলম্ব হইত। গার্হস্থ্য ধর্ম পালন করিয়াও যে ভগবৎ সত্তাকে লাভ করা যায় শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ দর্শিত এই সত্য শ্রীম'র মধ্যে মূর্ত হইয়া ফুটিয়া উঠিয়াছে।" পাশ্চাত্ত্য দেশ হইতেও বহু ভক্তের তাঁহার বাটীতে সমাগম হইল। তিনি দিনের পর দিন, মাসের পর মাস, বছরের পর বছর একমাত্র গুরুদেব শ্রীরামকৃষ্ণের কথাই তাঁহাদের শুনাইতেন। মহেন্দ্রনাথ বলিতেন—"I am an insignificant person, but I live by the side of an ocean, and I keep with me a few pitchers of sea water. When a visitor comes, I entertain him with that. What else can I speak of but his words ?"

এমন প্রাণস্পর্শী ও দরদপূর্ণভাবে বলিতেন, মনে হইত যেন ঠাকুরের নিকট বসিয়াই তাঁহারা উহা শুনিতেছেন। যে স্থানে বসিয়া তিনি ঠাকুর সম্বন্ধে আলোচনা করিতেন, সেই স্থানে ও ঠাকুরের লীলা ক্ষেত্রগুলির মধ্যে যেন সেতু নির্মিত হইত। তাঁহার আলোচনা বাস্তবরূপে রূপায়িত হইত। পল্‌ ব্রান্টন মহেন্দ্রনাথের সঙ্গে সাক্ষাৎ করেন এবং তাঁহার সাক্ষাৎকারের বিবরণী Search in Secret India পুস্তকে লিপিবদ্ধ করেন। প্রথম সাক্ষাৎকারের বিবরণী প্রসঙ্গে একস্থানে লিখিয়াছেন—"A venerable patriarch has stepped-out from the pages of Bible and a figure from Mosaic times has turned to flesh !" স্বামী যোগানন্দ ভবিষ্যৎ অধ্যাত্ম জীবন লাভে প্রথমাবস্থায় মহেন্দ্রনাথের নিকট কিরূপ অনুপ্রেরণা পাইয়াছিলেন সে বিষয় "Autobiography of a Jogi পুস্তকে লিপিবদ্ধ করিয়াছেন। মহেন্দ্রনাথ গৃহী-সন্ন্যাসী; তাঁহার জীবনকথা ত্যাগের উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত। শ্রীম-কথিত শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ-কথামৃত শুদ্ধ অপরূপ সাহিত্য নয়—ইহা দিব্যজীবনের অমরবাণী। মহেন্দ্রনাথের সংস্পর্শে আসিয়া বহু যুবক সন্ন্যাসী হইয়াছেন ও ধর্মজীবনে নূতন অনুপ্রেরণা পাইয়াছেন। যাঁহারা একবার তাঁকে দর্শন করিয়াছেন, তাঁহার যোগীজনোচিত মূর্তি, নিরহংকার ও সরলতা কখনও ভুলিবার নয়। স্বামী

বিজ্ঞানানন্দ একসময় বলেন "যে মঠের চৌদ্দ আনা সাধু দেখছি সন্ন্যাসী হয়েছেন "কথামৃত" পড়ে ও মাষ্টার মহাশয়ের সঙ্গ করে।" স্বামীজীর সৃষ্ট মঠে সন্ন্যাসীরা ঈশ্বরচিন্তায় মগ্ন থাকিবেন, এবং "শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণকথামৃত—শ্রীম'-কথিত" পাঠে যেন সেই সন্ন্যাসীমণ্ডলী তৈয়ারী হইবেন!

Gospel of Sri Ramakrishna Vol. II এবং Morn, Star-এ শ্রীশ্রীকথামৃতের অন্য অধ্যায়গুলির অনুবাদ তাঁহার অনুমতি ও পরামর্শ উপেক্ষা করিয়া হওয়ায়, তিনি কিরূপ ব্যথিত ও অন্তরে আঘাত পাইয়াছিলেন তাহা তাঁহার পত্রে পরিলক্ষিত হইয়াছে– "Dear Avyakta Babaji. My love and salutations to you all. The translation of Gospel (শ্রীশ্রীকথামৃত) in the morn. Star is, I regret to say, not satisf., to me. Being an eye witness I naturally want the spirit to be kept up in the translation. Moreover the report of a meeting should not appear in a mutilated form. The translation should be done by myself. You may do the work after my passing away which is by no means at a distant contingency. I am 76 and my health is not at all good. It is painful to see the Gospel presented in this way. I do not approve the translation which has appeared as Vol II from Madras..." মহেন্দ্রনাথ কখনও কাহাকেও শিষ্য করেন নাই, মন্ত্র বা দীক্ষা দেন নাই। ঠাকুরের প্রতিটি কথা অক্ষরে অক্ষরে পালন করিবার চেষ্টা করিতেন। তাঁহার ধর্মবিষয়ে গোঁড়ামী ছিল না এবং সকল ক্ষেত্রেই একমাত্র শ্রীরামকৃষ্ণের সমন্বয় মূর্তি দেখিতেন। সারাজীবন ধরিয়া ঠাকুরের অমিয় অমৃতবাণী পরিবেশন জীবনের ব্রতরূপে পালন করিয়াছেন। মাষ্টার মশায়ের অনুধ্যান পুস্তকে স্বামীজির ভ্রাতা পূজ্যপাদ মহেন্দ্রনাথ দত্ত লিখিয়াছেন—

"তাঁহার ভাব ছিল গুরু, ইষ্ট এক। গুরুই ইষ্ট, ইষ্টই গুরু, উভয়েতে অভিন্ন। শ্রীরামকৃষ্ণ প্রসঙ্গ, তাঁহার বিষয় চিন্তা, অনুধ্যান ও নিরবিচ্ছিন্ন চর্চা করিয়া তাঁহার অন্তরটা শ্রীরামকৃষ্ণময় হইয়াছিল এবং বাহিরটা মহেন্দ্র গুপ্ত ছিল। তাঁহার ব্যক্তিত্ব বা স্বাতন্ত্র্যভাব ত্যাগ করিয়া তিনি রামকৃষ্ণময় হইবার চেষ্টা করিয়াছিলেন। অন্যবিধ চিন্তা, নিজের স্বাধীন চিন্তা বা ভাব নিজে কিছুই রাখেন নাই। যাহাকে ইংরাজীতে বলে—Fiery independent Spirit বা Self Assertion— তিনি তাহা রাখেন নাই অর্থাৎ প্রজ্বলিত অগ্নিশিখার ন্যায় স্বাধীন চিন্তা বা আত্মবিকাশের ইচ্ছা সম্পূর্ণ ত্যাগ করিয়াছিলেন। তাঁহার রামকৃষ্ণময় অন্তর হইয়াছিল। শ্রীরামকৃষ্ণের প্রতিবিম্ব হইয়া থাকাই যেন তাঁহার জীবনের মুখ্য উদ্দেশ্য ছিল। এইজন্য বলিতেছি তিনি তাঁহার স্বাধীন চিন্তা বা ব্যক্তিত্ব বা স্বাতন্ত্র্যভাব বিসর্জন দিয়া গুরুগত প্রাণ হইয়াছিলেন। গুরুর আদেশ, গুরুর বাণী, গুরুর প্রসঙ্গ এই হইল তাঁহার পক্ষে অভ্রান্ত ও একমাত্র ধ্যেয় বিষয়। অবশ্য সংসারের কার্যে বা স্কুলে পড়াইবার সময় অর্থাৎ নিম্নস্তরের কার্যের সময় তাঁহার নিজের ব্যক্তিত্ব ও স্বাতন্ত্র্য ছিল। তিনি যখন ঘর সংসার করিতেন বা স্কুলের তত্ত্বাবধান করিতেন তখন তাঁহার নিজের স্বতন্ত্র মত ছিল. এই সকল নিম্নস্তরের কথা। কিন্তু নিম্নস্তরের কার্যের ভিতরেও যে তাঁহার রামকৃষ্ণময় দৃষ্টি ও রামকৃষ্ণবর্ণ সংমিশ্রিত ছিল তাহা বেশ স্পষ্ট